বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস

[প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ]

আব্বাস আলী খান

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

সূচীপত্র

দ্বিতীয় ভাগ

গ্রন্থকারের কথা

প্রায় দেড় যুগ পূর্বে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস লেখার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়। কথা ছিল বাংলায় মুসলমানদের প্রথম আগমন থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস লেখার। তবে বিশেষভাবে বলা হয় যে, ইংরেজদের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার পর মুসলমানদের প্রতি বৃটিশ সরকার ও হিন্দুদের আচরণ কেমন ছিল তা যেন নির্ভরযোগ্য তথ্যাদিসহ ইতিহাসে উল্লেখ করি। Government of India Act-1935 পর্যন্ত ইতিহাস লেখার পর আর কলম ধরার ফুরসৎ মোটেই পাইনি। সম্প্রতি কয়েক বছরের শ্রম ও চেষ্টা সাধনায় ইতিহাস লেখার কাজ সমাপ্ত করতে পেরেছি বলে আল্লাহ তা'য়ালার অসংখ্য শুকরিয়া জানাই।

এ ইতিহাসের কোথাও কণামাত্র অসত্য, স্বকপোলকল্পিত অথবা অতিরঞ্জিত উক্তি করিনি। অনেকের কাছে তিক্ত হতে পারে, কিন্তু আগাগোড়া সত্য ঘটনাই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি।

আমি ইতিহাসের একজন একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলাম বলে তখন থেকেই সত্য ইতিহাস জানা ও লেখার প্রবণতা মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। রংপুর কারমাইকেল কলেজের বিএ চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে আকবর ও আওরংজেবের উপরে ইংরেজীতে এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করি। কিছু বিরোধিতা ও বাধা সত্ত্বেও প্রবন্ধটি কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা জীবন শেষ করার পর সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীতে জীবনের পঁচিশটি বছর কেটে যায়। ইতিহাসের উপর কোন গবেষণামূলক কাজ করার সুযোগ থেকে একেবারে বঞ্চিত হই। বরঞ্চ ইতিহাসই ভুলে যেতে থাকি। দেড় যুগ পূর্বে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নতুন করে ইতিহাস চর্চার সুযোগ হয়েছে।

ইতিহাস একটা জাতির মধ্যে জীবনীশক্তি সঞ্চার করে। কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তার অতীত ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে হবে অথবা বিকৃত করে পেশ করতে হবে। একজন তথাকথিত মুসলমান যদি ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের সুযোগ না পায় এবং তার জাতির অতীত ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তাহলে তার মুখ থেকে এমন সব মুসলিম ও ইসলাম বিরোধী কথা বেরুবে যেসব কথা একজন অমুসলমান মুখ থেকে বের করতে অনেক সাতপাঁচ ভাববে। এ ধরনের হস্তীমূর্খ মুসলমানের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে এবং মুসলমানদের জাতশত্রুগণ তাদেরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করছে।

মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে তাদের সঠিক অতীত ইতিহাসের সাথে ইসলামেরও সঠিক জ্ঞান ও ধারণা নতুন প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশনের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ একেবারে অপরিহার্য। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে প্রসংগক্রমে ইসলামের মূলনীতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। আধিপত্য ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রুখতে হলে ইতিহাসের পর্যালোচনা ও ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা সর্বস্তরে তুলে ধরতে হবে।

মুসলমানী জীবনটাই এক চিরন্তন সংগ্রামী জীবন। সংগ্রাম বিমুখতার ইসলামে কোন স্থান নেই। তাই ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করতে হবে। নতুবা জাতিকে শত্রুর নির্যাতনের যাঁতাকলে নিস্পেষিত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে।

'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে' প্রায় দু'শ' বছর যাবত মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের উৎপীড়ন অবিচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অতীতের কথা কেউ কেউ মনগড়া মনে করতে পারেন। বর্তমান সময়ে ভারতে কি হচ্ছে তা কি তাঁরা দেখছেন না? সেখানে প্রতিনিয়ত সংঘটিত লোমহর্ষক দাংগায় যে মুসলমানদেরকে নির্মূল করা হচ্ছে তা কি তাঁদের চোখে পড়েনা? সম্প্রতি বোম্বাইয়ে সংঘটিত দাংগার জন্য যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল, তার রায় প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনের রায়ে দাংগাকারিদের সহযোগিতা করার জন্য পুলিশকে দায়ী করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ও

প্রধানমন্ত্রীর বৈষম্যমূলক আচরণেরও সমালোচনা করা হয়েছে। এরপর উগ্র মুসলিম বিদ্বেষীদের দেশ ভারতে মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা কোথায়? ভবিষ্যতে হয়তো এসবের সঠিক ইতিহাস প্রণীত হবে।

পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে জাতির নতুন প্রজন্মকে তাদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ রাখা হয়েছে। এ ষড়যন্ত্রের ভূত বিভাগোত্তর কালের পাকিস্তানী শাসকদের ঘাড়েও শক্ত করে চেপে বসেছিল। পাকিস্তান কি কারণে হয়েছিল, এর আদর্শিক পটভূমি কি ছিল, কেন সুদীর্ঘ সাত বছর নিরলস ও আপোষহীনভাবে পাকিস্তান আন্দোলন করা হলো, কেন লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশু খুনের দরিয়া সাঁতার দিয়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল, তার কোন কিছুই নতুন প্রজন্মকে জানানো হয়নি।

আমাকে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। তখনকার পাঠ্য ইতিহাসে পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাসের কোন উল্লেখ ছিলনা। যার ফলে পাকিস্তানের ভিত্ আরও নানা কারণে দুর্বল হতে থাকে। পাকিস্তান ও তার শাসকদের প্রতি জনগণের অসন্তোষ ও ক্ষোভ বাড়তে থাকে যার পরিণামে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ নামে আত্মপ্রকাশ করে।

অত্র ইতিহাসটিতে মুসলিম জাতির গৌরবময় অতীত ইতিহাসের দিকে নতুন প্রজন্মের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মুসলিম জাতির ইতিহাস কালের কোন এক বিশেষ সময় থেকে শুরু হয়ে কোন এক বিশেষ সময়ে গিয়ে শেষ হয়নি। এ ইতিহাসের সূচনা দুনিয়ায় প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ) এর আগমন থেকে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এ ইতিহাস অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে সময়, কাল ও পরিবেশ পরিস্থিতির চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে এবং চলতে থাকবে যতোদিন দুনিয়া বিদ্যমান থাকবে। মুসলমানদেরকে অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই সামনে অগ্রসর হতে হবে।

এ ইতিহাস লেখার জন্য বহু খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের গ্রন্থ থেকে মালমশলা সংগ্রহ করেছি। তার জন্য তাঁদের সকলের নিকটে চির কৃতজ্ঞ রইলাম। অতঃপর

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার গ্রন্থখানার প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন বলে এর ডাইরেক্টর আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ সাহেবকে জানাই আমার অশেষ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ এ গ্রন্থ থেকে কিছু শিক্ষা ও ইসলামী প্রেরণা লাভ করতে পারলে আমার কয়েক বছরের অধ্যবসায় ও শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব। আল্লাহ তায়ালা এ গ্রন্থখানা কবুল করুন—আমীন।

ঢাকা, ১৫ই জমাদিউল আউয়াল
১৭ই কার্তিক
পয়লা নভেম্বর ১৯৯৩ সাল।

গ্রন্থকার

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

বাংলায় মুসলমানদের আগমন

বাংলায় সর্বপ্রথম মুসলমানদের আগমন কখন হয়েছিল, তার সন তারিখ নির্ধারণ করা বড়োই দুঃসাধ্য কাজ। প্রাচীন ইতিহাসের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্তুপ থেকে তা উদ্ধার করা বড়ো কষ্টসাধ্য কাজ সন্দেহ নেই। তবুও ইতিহাসবেত্তাদের এ কাজে মনোযোগ দেয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

তৎকালীন ভারত উপমহাদেশে বহির্জগত থেকে যেসব মুসলমান আগমন করেছিলেন, তাদেরকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর মুসলমান ব্যবসা–বাণিজ্য ব্যপদেশে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আগমন করে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করেন। কতিপয় অলী দরবেশ ফকীর শুধুমাত্র ইসলামের দাওয়াত ও তবলিগের জন্যে আগমন করেন এবং এ মহান কাজে সারা জীবন অতিবাহিত করে এখানেই দেহত্যাগ করেন।

আর এক শ্রেণীর মুসলমান এসেছিলেন—বিজয়ীর বেশে দেশজয়ের অভিযানে। তাঁদের বিজয়ের ফলে এ দেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। বলা বাহুল্য ৭১২ খৃষ্টাব্দে ভারতের সিন্ধু প্রদেশে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ বিন কাসিম আগমন করেন বিজয়ীর বেশে এবং এটা ছিল ইসলামের বিরাট রাজনৈতিক বিজয়। তাঁর বিজয় সিন্ধুপ্রদেশ পর্যন্তই সীমিত থাকেনি। বরঞ্চ তা বিস্তার লাভ করে পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত। আমরা যথাস্থানে তার বর্ণনা সন্নিবেশিত করব।

অপরদিকে বাংলায় মুসলমানদের আগমন দূর অতীতের কোন এক শুভক্ষণে হয়ে থাকলেও তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল—হিজরী ৬০০ সালে অর্থাৎ ১২০৩ খৃষ্টাব্দে। তৎকালীন ভারত সম্রাট কুতুবুদ্দীন আইবেকের সময়ে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিল্‌জী, বলতে গেলে অলৌকিকভাবে, বাংলায় তাঁর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মুসলমানদের এ উভয় রাজনৈতিক বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এসবের অনেক পূর্বেই যে এ দেশে ইসলামের বীজ বপন করা হয়েছিল এবং সে উপ্ত বীজ

অংকুরিত হয়ে পরবর্তীকালে তা যে একটি মহীরুহের আকার ধারণ করেছিল, তাও এক ধ্রুব সত্য—কিন্তু তার সময়কাল নির্ধারণটাই হলো আসল কাজ যা ইতিহাসের প্রতিটি অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের জন্যে একান্ত বাঞ্ছনীয়। আসুন ঐতিহাসিক দিকচক্রবাল থেকে কোন দিগদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তা একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরববাসী শুধু বর্বর, কলহপ্রিয় ও রক্তপিপাসু জাতিই ছিল না। বরঞ্চ তাদের মধ্যে যারা ছিল অভিজাত ও বিত্তশালী, তারা জীবিকার্জনের জন্যে ব্যবসা–বাণিজ্য করতো। মরুময় দেশে জীবন ধারণের জন্যে খাদ্য এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আবহমান কাল থেকেই ব্যবসা–বাণিজ্য করতে হতো। যে বণিক দল হযরত ইউসুফকে (আ) কূপ থেকে উদ্ধার করে মিশরের জনৈক অভিজাত বংশীয় রাজকর্মচারীর কাছে বিক্রয় করে, তারা ছিল আরববাসী। অতএব আরববাসীদের ব্যবসার পেশা ছিল অত্যন্ত প্রাচীন এবং বিস্তৃত ছিল দেশ–দেশান্তর পর্যন্ত।

স্থলপথ জলপথ উভয় পথেই আরবগণ তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতো। উটের সাহায্যে স্থলপথে এবং নৌযানের সাহায্যে তারা বাণিজ্য–ব্যপদেশে দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ করতো। প্রাক ইসলামী যুগেই তারা একদিকে সমুদ্র পথে আবিসিনিয়া এবং অপরদিকে সুদূর প্রাচ্য চীন পর্যন্ত তাদের ব্যবসার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেছিল। আরব থেকে সুদূর চীনের মাঝপথে তাদের কয়েকটি ঘাঁটিও ছিল। এ পথে তাদের প্রথম ঘাঁটি ছিল মালাবার। মালাবার মাদ্রাজ প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তী একটি জেলা। ভৌগোলিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ উপদ্বীপটিকে মালাবার নামে অভিহিত করা হয়। আরব ভৌগোলিকগণের অনুলিখনে একে মালিবার (ملیبار) বলা হয়েছে।

মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর 'মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন :

"আধুনিক গ্রীকদিগের মলি (MALI) শব্দে বর্তমান মালাবার নামের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ 'মালাবার' নাম আরববাসী কর্তৃক প্রদত্ত হয়—বিশ্বকোষ সম্পাদকের এই সিদ্ধান্তটা খুবই সংগত। আমাদের মতে মালাবার, আরবী ভাষার শব্দ—মলয় + আবার = মালাবার। আরবী অনুলিখনে ملی মলয় + আবার। মলয় মূলতঃ একটি পর্বতের নাম, আবার অর্থ কূপপুঞ্জ, জলাশয়। আরবরা

এদেশকে মা'বারও معبر বলিয়া থাকেন। উহার অর্থ, অতিক্রম করিয়া যাওয়ার স্থল, পারঘাট। আজকালকার ভূগোলে পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট। যেহেতু আরব বণিক ও নাবিকরা এই ঘাট দুইটি পার হইয়া মাদ্রাজে ও হেজাজ প্রদেশে যাতায়াত করিতেন, এবং মিশর হইতে চীনদেশে ও পথিপার্শ্বস্থ অন্যান্য নগরে বন্দরে গমনাগমন করিতেন, এই জন্য তাহারা এই দেশকে মা'বার বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এই নাম দুইটি হইতে ইহাও জানা যাইতেছে, এই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয় অতি পুরাতন এবং সম্বন্ধ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ।" (মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ৪৭–৪৮)।

নবী মুহাম্মদ মুস্তাফার (সা) দুনিয়ায় আগমনের বহুকাল পূর্বে বহুসংখ্যক আরব বণিক এদেশে (মালাবারে) আগমন করেছিলেন। তারা হরহামেশা এ পথ দিয়ে অর্থাৎ মালাবারের উপর দিয়ে চট্টগ্রাম এবং সেখান থেকে সিলেট ও কামরূপ হয়ে চীন দেশে যাতায়াত করতেন। এভাবে বাংলার চট্টগ্রাম এবং তৎকালীন আসামের সিলেটও তাদের যাতায়াতের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এর থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাক ইসলামী যুগেই মালাবার, চট্টগ্রাম, সিলেট প্রভৃতি স্থানে আরবদের বসতি গড়ে উঠেছিল।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে নবী মুস্তাফা (সা) আরবের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং চল্লিশ বৎসর বয়সে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে দ্বীন ইসলামের প্রচার কার্য শুরু করেন। তাঁর প্রচার আন্দোলন ছিল অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক। এ বিপ্লবের ঢেউ আরব বণিকদের মাধ্যমে মালাবার, চট্টগ্রাম, সিলেট ও চীনদেশেও—যে পৌঁছেছিল, তা না বল্লেও চলে। নবী মুহাম্মদের (সা) বিপ্লবী আন্দোলনের যেমন চরম বিরোধিতা করেছে এক দল, তেমনি এ আন্দোলনকে মনেপ্রাণে গ্রহণও করেছে এক দল। মালাবারের আরববাসীগণ খুব সম্ভব হিজরী সনের প্রারম্ভেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এটাও এক ঐতিহাসিক সত্য যে, সপ্তম শতক পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় ইসলামের বাণী প্রচারিত হয়েছিল আরব বণিকদের দ্বারাই।

মালাবারে যেসব আরব মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করার পর স্থায়ীভাবে বসবাস করে তারা মোপ্‌লা নামে পরিচিত। ছোটো বড়ো নৌকার সাহায্যে মাছ ধরা এবং মাল ও যাত্রী বহন করা ছিল তাদের জীবিকার্জনের প্রধান পেশা। অনেক সময়ে তাদেরকে জীবিকার্জন ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের জন্যে ভারত মহাসাগর পাড়ি

দিয়ে আরব দেশে যাতায়াত করতে হতো। এভাবেই তারা ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াতের সংস্পর্শে এসেছিল।

মোপ্‌লাদের সম্পর্কে পরবর্তী কোন এক অধ্যায়ে আলোচনার বাসনা রইলো। এখানে, তাদের সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলে রাখতে চাই যে, তারা ছিল অত্যন্ত কর্মঠ ও অধ্যবসায়ী। সুন্দর ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ছিল তারা। সাহসিকতায় এরা চিরপ্রসিদ্ধ। এরা দাড়ি রাখে এবং মাথায় টুপি পরিধান করে, এদের মধ্যে অনেকেই ধীবর জাতীয় এবং ধীবরদের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার করা ছিল এদের প্রধান কাজ।

মালাবারের অনারব অধিবাসীদের মধ্যেও ধীরে ধীরে ইসলামের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেকালে ভারতে বৌদ্ধ এবং জৈন মতাবলম্বীদের উপরে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের নিষ্ঠুর ও অমানুষিক নির্যাতন চলছিল। এসব নির্যাতন উৎপীড়নের মুখে মুসলমান সাধুপুরুষের সাহচর্য ও সান্নিধ্য তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে।

মালাবারের অনারব অধিবাসীদের মধ্যে ইসলামের দ্রুত বিস্তার লাভের প্রধান কারণ মালাবারের স্থানীয় রাজার ইসলাম গ্রহণ। মালাবার-রাজের ইসলাম গ্রহণের চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত আছে।

মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর পূর্ব বর্ণিত গ্রন্থে বলেন ঃ

"হিন্দু সমাজের প্রাচীন শাস্ত্রে ও সাহিত্যে মালাবার সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ দেখা যায়। বিশ্বকোষের সম্পাদক মহাশয় তাহার অনেকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেগুলির অধিকাংশই মহাভারত ও পুরাণাদি পুস্তক হইতে উদ্ধৃত পরশুরামের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে কতকগুলি উদ্ভট উপকথা ছাড়া আর কিছুই নহে। তবে এই কোষকার নিজে মালাবারের হিন্দুরাজা সম্বন্ধে একটা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন ঃ পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, চেরর রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমল পেরুমল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ অভিলাষে মক্কা নগরীতে গমন করেন—(বিশ্বকোষ-১৪ঃ২৩৪)।

শেখ যয়নুদ্দিন কৃত তোহ্‌ফাতুল মুজাহেদীন পুস্তকেও একজন রাজার মক্কা গমন, তাঁহার হযরত রসূলে করীমের খেদমতে উপস্থিত হওয়া এবং স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। .... তাহার এই বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে যে, মালাবারের রাজা-যে মক্কায় সফর করিয়াছিলেন এবং হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট ইসলামের বয়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্থানীয় মুসলমানদিগের মধ্যে ইহাই মশহুর ছিল।"

মওলানা তাঁর উক্ত গ্রন্থে আরও মন্তব্য করেন ঃ

"স্থানকালাদির খুঁটিনাটি বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও এবং সেগুলিকে অবিশ্বাস্য বলিয়া গৃহীত হইলেও রাজার মক্কায় যাওয়ার, হযরতের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার এবং কিছুকাল মক্কায় অবস্থান করার পর দেশে ফিরিয়া আসার জন্য সফর করার বিবরণকে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার কোন কারণ নাই। মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে একটা দেশের সমস্ত অধিবাসী আবহমান কাল হইতে যে ঐতিহ্যকে সমবেতভাবে বহন করিয়া আসিতেছে তাহাকে অনৈতিহাসিক ও ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কোনও মতে বিবেচিত হইতে পারে না। এই প্রসংগে বিশেষভাবে বিবেচ্য হইতেছে বিশ্বকোষের বিবরণটি। কোষকার বলিতেছেন ঃ 'পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, চেরর (মালাবার) রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমল পেরুমল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণাভিলাষে মক্কা নগরীতে গমন করেন।' সুতরাং মালাবার রাজ্যের রাজার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সিংহাসন ত্যাগ করা এবং হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করার বিবরণকে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া আদৌ সংগত হইতে পারে না।" (মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস)

এখন শেখ যয়নুদ্দীন প্রণীত তোহ্‌ফাতুল মুজাহেদীন গ্রন্থের বিবরণ, বিশ্বকোষের বিবরণ, মালাবারের মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকল অধিবাসীর আবহমান কালের ঐতিহ্য অনুযায়ী রাজার ইসলাম গ্রহণ ব্যাপারটি সত্য বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাসংকোচ থাকার কথা নয়। কিন্তু তথাপি একটি প্রশ্ন মনের মধ্যে রয়ে যায়। তা হচ্ছে এই যে, এত বড়ো একটি ঘটনা হাদীসের কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি কেন? অবশ্য শেখ যয়নুদ্দীন তাঁর বিবরণে কতিপয় রাবীর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাদীসবেত্তাদের মতে তা' সন্দেহমুক্ত নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসল ব্যাপারটি তাহলে কি ছিল? ঘটনাটিকে একেবারে ভিত্তিহীন বলে গ্রহণ করলে হাদীসগ্রন্থে তার উল্লেখের কোন প্রশ্নই আসে না। কিন্তু এমন হওয়াটাও আশ্চর্যের কিছু নয় যে, মালাবারের আরব মুহাজিরগণ যেমন হিজরী প্রথম সনে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেন, সম্ভবতঃ মালাবারের রাজা

সিংহাসন ত্যাগ করতঃ এসব আরব মুহাজিরগণের সংগে ইসলাম গ্রহণ করেন। সিংহাসন ত্যাগের পর তাঁর পরিচয় গোপন করাটাও অসম্ভব কিছু নয়—আর এই কারণেই হয়তো তাঁর ইসলাম গ্রহণ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোন কৌতূহলের উদ্রেক করেনি। তথাপি তোহ্‌ফাতুল মুজাহেদীনের গ্রন্থকার কতিপয় হাদীসের ও রাবীর উল্লেখ করেছেন।

মালাবারের আরব মুহাজিরগণের এবং স্থানীয় রাজার ইসলাম গ্রহণের পর স্থানীয় মালাবারবাসীগণও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তারা দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়। তারপর মালাবারে পরপর দশটি মসজিদ নির্মিত হয়। প্রথম মসজিদ পেরুমলের রাজধানী কর্ণক্লোর (কোড়ঙ্গনূর) বা ক্রাঙ্গানূরে নির্মাণ করেন মালেক ইব্‌নে দীনার। এভাবে ত্রিবাংকোরের অন্তর্গত কওলাম বা কোল্লমে, ডিল্লি পর্বতে, দক্ষিণ কানাডার অন্তর্গত কুর্কবে, মঙ্গলোর নগরে, ধর্মপত্তন নগরে, চালিয়াম নগরে, সুরুকুন্তপুরমে, পন্থারিণীতে এবং কঞ্জারকোটে মসজিদ নির্মিত হয়।

"বিশ্বকোষ প্রণেতা বলেন ঃ মসজিদ প্রতিষ্ঠার সংগে সংগেই যে এদেশে মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সকল মসজিদের ব্যয়ভার বহনের জন্য অনেক সম্পত্তিও প্রদত্ত হইয়াছিল। . . .ঐ সময়ে উপকূলবাসী মুসলমানগণের এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত দেশীয় অধিবাসীদিগের সংখ্যায় পরিবৃদ্ধি হইয়াছিল। ক্রমে তাহারা রাজ্য–মধ্যে প্রভাব সম্পন্ন হইয়া উঠে।" (মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস)

উপরের আলোচনায় এ সত্য প্রকট হয়ে যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকেই ভারতের মালাবার মুসলমানদের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। তাদের ছিল না কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য। ব্যবসা–বাণিজ্য ও ইসলামের প্রচার ও প্রসার ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য।

মালাবারের পরেই মুসলিম আরব মুহাজিরদের বাণিজ্য পথের অন্যান্য মনযিল্ চট্টগ্রাম ও সিলেটের কথা আসে। মালাবারে আরব মুহাজিরদের স্থায়ী বসবাসের পর তাদের অনেকেই চট্টগ্রাম বন্দরে ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরী করে এবং এখানেও তাদের অস্থিত্বর বসতি গড়ে উঠে। এটাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, মালাবারে যেমন প্রথম হিজরী শতকেই ইসলাম দানা বেঁধেছিল, চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার কি সমসাময়িক কালেই হয়েছিল, না তার অনেক পরে। এ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন করা সম্ভবপর নয়। তবে খৃষ্টীয়

অষ্টম–নবম শতকে আরবের মুসলমান বণিকদের চট্টগ্রামের সাথে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল তা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে।

ডক্টর আবদুল করিম তাঁর 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন ঃ . . .খৃষ্টীয় অষ্টম/নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রামের সংগে আরবীয় মুসলমান বণিকদের যোগাযোগ ছিল। পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে আরব ব্যবসায়ীদের আনা–গোনার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। আরব বণিকেরা চট্টগ্রামে স্বাধীন রাজ্যগঠন না করলেও আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে তাদের প্রভাব এখনও পরিলক্ষিত হয়। চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্বে 'না' সূচক শব্দ ব্যবহারও আরবী ভাষার প্রভাবের ফল। অনেক চট্টগ্রামী পরিবার আরব বংশসম্ভূত বলে দাবী করে। চট্টগ্রামী লোকের মুখাবয়ব আরবদের অনুরূপ বলেও অনেকে মনে করেন। তাছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকা যেমন, আলকরণ, সুলুক বহর (সুলুক–উল–বহর), বাকালিয়া ইত্যাদি এখনও আরবী নাম বহন করে। আগেই বলা হয়েছে যে, কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, আরবী শব্দ শৎ (বদ্বীপ) এবং গঙ্গা (গঙ্গ) থেকেই চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হয়। (ইস্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, চট্টগ্রাম পৃঃ–১)।

চট্টগ্রামে কয়েক শতাব্দী যাবত মুসলমান বসবাস করলেও তারা কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেননি। তাদের কাজ ছিল ব্যবসা–বাণিজ্য ও ইসলাম প্রচার। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলায় মুসলমান শাসন কায়েমের অনেক পরে সোনার গাঁয়ের স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮–৪৯ খৃঃ) সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করে তা মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিজয়ীর বেশে মুসলমান

সাধারণভাবে এ কথা সর্বজন বিদিত যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুরাজ দাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে সিন্ধু প্রদেশে ইসলামের বিজয়–পতাকা উড্ডীন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত সামরিক অভিযান পরিচালনার কাজ বহু পূর্ব থেকেই শুরু হয়। হিজরী প্রথম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সিন্ধু অভিযানের সূচনা হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে কয়েকবার সিন্ধু প্রদেশের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিমের পূর্বে মুসলমানগণ এখানে কোন স্থায়ী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেননি। সিন্ধুরাজের সহায়তায় জলদস্যু কর্তৃক মুসলিম বণিকগণ বার বার লুণ্ঠিত হওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির পুনরুদ্ধার ও বন্দী বণিকদের মুক্ত করার পর মুসলমানগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

পঞ্চদশ হিজরীতে হযরত ওমরের (রা) খেলাফত আমলে উস্মান ইবনে আবুল আবী সাকাফী বাহ্‌রাইন ও ওমানের গভর্নর নিযুক্ত হন। উসমান আপন ভাই হাকামকে বাহ্‌রাইনে রেখে নিজে ওমান চলে যান। সেখান থেকে তিনি একটি সেনাবাহিনী ভারত সীমান্তে প্রেরণ করেন। উক্ত অভিযানের পর পুনরায় তিনি তাঁর ভ্রাতা মুগীরাকে সেনাবাহিনীসহ দেবল (বর্তমান করাচী) অভিমুখে প্রেরণ করেন। মুগীরা সিন্ধুর জলদস্যু ও তাদের সহায়ক শক্তিকে পরাজিত করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত আলীর (রা) খেলাফতের সময় ৩৯ হিজরীর প্রারম্ভে হারীস ইবনে মুররা আবৃদী সিন্ধু সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করে জয়ী হন। বহু শত্রুসেনা বন্দী করেন এবং প্রচুর গণীমতের মাল হস্তগত করেন।

আমীর মুয়াবিয়ার (রা) শাসনামলে মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফ্‌রা সিন্ধুর সীমান্ত আক্রমণ করেন এবং মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী স্থান বান্না ও আহ্‌ওয়াজ পর্যন্ত অগ্রসর হন।

খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত হলে তিনি সিন্ধু অভিযানের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ ইবনে হারুন নসিরী, উবায়দুল্লাহ ইবনে নবহান এবং বুদায়েল ইবনে তোহ্‌ফা বজলীকে পর পর প্রেরণ করেন। অবশেষে ৯৩ হিজরীতে মুহাম্মদ বিন কাসিম জল ও স্থল উভয় পথে অভিযান পরিচালনা করে সিন্ধু জয় করেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক চূড়ান্তভাবে সিন্ধু প্রদেশ বিজিত হবার বহু পূর্বে তদানীন্তন ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও জারী করা হয়েছিল। তার প্রমাণ এই যে, রাজা দাহির যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর সমগ্র সিন্ধু প্রদেশ মুসলমানদের করতলগত হয়। সেখানে শাসন শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করার পর মুহাম্মদ বিন কাসিম সম্মুখের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। পুরাতন ব্রাহ্মণাবাদ জয় করার পর সম্মুখে অগ্রসর হওয়া কালে তাঁকে নাওয়াশারবাসীদের সম্মুখীন হতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আক্রান্ত জনপদের অধিবাসী ছিল মুসলমান। স্বভাবতঃই তাদের সাথে একটা মিটমাট করার পর অন্যান্য বহু স্থান জয় করে মুহাম্মদ বিন কাসিম পাঞ্জাবের মুলতান নামক স্থানে উপনীত হন। মুলতানও তাঁর করতলগত হয়।

বাংলায় মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা

মালিক ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বাংলা বিজয়ের ফলে এ দেশে মুসলমানদের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এ সময় থেকে ক্রমাগত অব্যাহত গতিতে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল, আফগানিস্তান, ইরান, আরব ও তুরস্ক থেকে অসংখ্য মুসলমান বাংলায় আগমন করতে থাকেন। অধিকাংশ এসেছিলেন সৈনিক হিসাবে, অবশিষ্টাংশ ব্যবসা–বাণিজ্য, ইসলাম প্রচার ও আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে। এভাবে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা হয়ে পড়ছিল ক্রমবর্ধমান।

মুহাম্মদ বিন বখ্‌তিয়ারের বাংলা বিজয় ছিল এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। বলতে গেলে এ মানুষটিই এক ঐতিহাসিক বিস্ময়। তিনি ছিলেন তুর্কিস্তানের খালজ বংশসম্ভূত। তাই তাঁর বংশ পরিচয়ের জন্যে তাঁর নামের শেষে খাল্‌জী বা খিলজী শব্দ যুক্ত করা হয়। তাঁর পূর্ব পুরুষদের আবাসভূমি ছিল সীস্তানের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত গারামসীর অথবা দাশ্‌তে মার্গো। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ

বখ্‌তিয়ার খাল্‌জী জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি ত্যাগ করে গজনী এবং অতঃপর ভারতের বাদাউনে আগমন করেন। তাঁর দেহ ছিল খর্ব ও হস্তদ্বয় অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ। সম্ভবতঃ এ কারণেই গজনী ও দিল্লীর সামরিক বাহিনীতে তাঁর চাকুরীর আবেদন গৃহীত হয়নি। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে অসীম সাহসিকতা ও দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনার যোগ্যতা ছিল তা বুঝতে পেরে বাদাউনের সিপাহ্‌সালার তাঁকে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করেন। এখান থেকেই তাঁর ভাগ্যোন্নয়ন শুরু হয়। তিরৌরী বা তরাইনের যুদ্ধের পর বখ্‌তিয়ারের চাচা, মুহাম্মদ-ই-মাহমুদ নাগাওরীর শাসনকর্তা আলী নাগাওরীর নিকট থেকে কষমন্ডী বা কষ্টমন্ডীর অধিকার লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বখ্‌তিয়ার তার অধিকার লাভ করেন। কিছুকাল পর তিনি অযোধ্যার মালিক মুয়াজ্জম হিসামউদ্দীনের নিকট গমন করেন। এ সময়ে তিনি অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করেছিলেন বলে মালিক হিসামউদ্দীন তাঁকে দু'টি গ্রাম উপঢৌকন স্বরূপ দান করেন। গ্রাম দুটি কারো মতে ভগবৎ ও ভোইলি, কারো মতে সহলত ও সহিলী অথবা কম্পিলা ও পতিয়ালি ছিল। গোলাম হোসেন সলিমীর 'রিয়াযুস্‌ সালাতীনে' এ গ্রাম দুটির নাম বলা হয়েছে কম্বালা ও বেতালি।

এখান থেকে মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার বিহারের দিকে অগ্রসর হয়ে কয়েকস্থানের ভূস্বামী বা প্রধানদেরকে পরাজিত করে প্রচুর মালে গণীমত হস্তগত করেন। তার দ্বারা তিনি বহু অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করতে থাকেন। তাঁর বীরত্বের খ্যাতিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ঘোর, গজনী, খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চলে বার বার বিদ্রোহ, যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত সংঘটিত হতে থাকায় তথাকার বহুসংখ্যক অধিবাসী দেশত্যাগ করে ভারতে আগমন করে ভাগ্যের অন্বেষণে ঘুরাফেরা করতে থাকে। বখ্‌তিয়ারের সুনাম সুখ্যাতি শ্রবণ করে তারা দলে দলে তাঁর সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। এভাবে বখ্‌তিয়ার হয়ে ওঠেন প্রবল শক্তিশালী।

তৎকালীন দিল্লীর সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেক বখ্‌তিয়ারের অসীম বীরত্বের কথা জানতে পেরে তাঁর সম্মানের জন্যে 'খিলাত' প্রেরণ করেন এবং এতে করে বখ্‌তিয়ারের শক্তি ও সাহস বহুগুণে বেড়ে যায়। তারপর তিনি সমগ্র বিহার প্রদেশে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। অতঃপর তাঁর অভিযান বাংলার দিকে পরিচালিত হয় এবং ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বাংলার রাঢ় ও বরিন্দ অঞ্চল অধিকার করেন।

বাংলা আক্রমণকালে এর শাসক ছিলেন রায় লক্ষ্মণ সেন। রাজধানী ছিল নদিয়া। রাজধানীসহ এ অঞ্চলটিকে লক্ষ্মণাবতী বলা হতো। 'তাবাকাতে নাসিরী'তে এ সম্পর্কে এক মজার কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

রাজ দরবারের গণক ব্রাহ্মণের দল এক ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন যে, এ দেশ অচিরেই তুর্কী মুসলমানদের হস্তগত হবে। দেশ আক্রান্ত হলে রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। অন্যথায় দেশবাসীকে প্রচুর রক্তপাত ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হবে।

রাজা ব্রাহ্মণ-পন্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে এহেন মুসলিম অভিযানকারীর কোন চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে কিনা, যা দেখে তাকে যথাসময়ে চিনতে পারা যায়। তাঁরা বলেন যে, সে তুর্কী সেনা সোজা দন্ডায়মান হলে তাঁর হস্তদ্বয় হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত হবে। রাজা রায় লক্ষ্মণ সেন এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবার জন্যে একদল বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করেন। তাঁরা অনুসন্ধানের পর রাজাকে বলেন যে, মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ারের মধ্যে উপরোক্ত চিহ্ন বিদ্যমান। এদিকে মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ারের দুঃসাহসিক অভিযান ও তাঁর জয়জয়কার কারো অজ্ঞাত ছিল না। ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণ, সম্মানী ও জ্ঞানী-গুণী, ভূস্বামী ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি দেশ-পরিত্যাগ করে জগন্নাথ, কামরূপ এবং অন্যান্য নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা তখনো তাঁর রাজধানী পরিত্যাগ করা সমীচীন মনে করেননি। হঠাৎ এক সময় মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার নদিয়া আক্রমণ করে রাজধানীতে প্রবেশ করলে, রাজা রাজ-প্রাসাদের পশ্চাদ্বার দিয়ে পলায়ন করে বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এভাবে সমগ্র লক্ষ্মণাবতী বখ্‌তিয়ারের করতলগত হয়— বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মাত্র সতেরো জন অশ্বারোহীসহ মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার নদিয়া আক্রমণ ও জয় করেন।

অতঃপর তাঁর অভিযান বিস্তার লাভ করে এবং নবদ্বীপ ও গৌড় তাঁর করতলগত হয়। 'তারিখে ফেরেশতা'য় বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার বাংলাদেশে রংপুর নামে এক নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন। এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে, বাংলার শুধু পূর্বাঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রাঢ় ও বরেন্দ্র অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিম ও উত্তর বংগ তাঁর শাসনাধীন হয়েছিল। রায় লক্ষ্মণ সেন বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করলেও তাঁর পশ্চাদানুসরণ বখ্‌তিয়ার করেননি। যার ফলে বাংলার পূর্বাঞ্চল ছিল তাঁর শাসনের বাইরে। এক শতাব্দীকাল পর ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে

মুহাম্মদ তোগলোক শাহ্ পূর্বাঞ্চল জয় করেন এবং সাতগাঁও ও সোনারগাঁও–এ যথাক্রমে রাজধানী স্থাপন করেন।

যাহোক, মুহাম্মদ বখতিয়ারের বাংলা বিজয়ের ফলে বহিরাগত মুসলমান দলে দলে এ দেশে বসতিস্থাপন করেন। ব্যবসা বাণিজ্য, সেনাবাহিনীতে চাকুরী ও অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে জীবিকার্জনের নিমিত্ত অসংখ্য মুসলমান এ দেশে আগমন করেন এবং এ আগমনের গতিধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত।

মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী প্রান্তরে মুসলিম রাজ্যের পতন পর্যন্ত পাঁচ শত চুয়ান্ন বৎসরে একশত একজন বা ততোধিক শাসক বাংলায় শাসন পরিচালনা করেন।

বাংলার মুসলিম শাসনকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

বাংলা–	খিলজীদের অধীনে—	১২০৩–১২২৭ খৃঃ
বাংলা–	দিল্লীর অধীনে—	১২২৭–১৩৪১ খৃঃ
বাংলা–	ইলিয়াস শাহী বংশের অধীনে (প্রথম ধারা)—	১৩৪২–১৪১৩ খৃঃ
বাংলা–	গনেশ জালাল উদ্দীনের অধীনে—	১৪১৪–১৪৪১ খৃঃ
বাংলা–	ইলিয়াস শাহী বংশের অধীনে (দ্বিতীয় ধারা)—	১৪৪২–১৪৮৭ খৃঃ
	হাবশী শাসনাধীন বাংলা—	১৪৮৭–১৪৯৩ খৃঃ
	হুসেনশাহী বংশের অধীনে বাংলা—	১৪৯৩–১৫৩৮ খৃঃ
	পাঠানদের অধীনে (শের শাহ্ ও সূর বংশ) বাংলা—	১৫৩৮–১৫৬৪ খৃঃ
	কররাণী বংশের অধীনে বাংলা—	১৫৬৫–১৫৭৬ খৃঃ
	মোগল শাসনাধীন বাংলা—	১৫৭৬–১৭৫৭ খৃঃ

সাড়ে পাঁচশত বৎসরাধিক কাল যাঁরা বাংলার মসনদে সমাসীন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যক এমন ছিলেন যাঁরা আপন বাহুবলে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করে দিল্লীর সম্রাটের অনুমোদন লাভ করেন। কিছুসংখ্যক শাসক ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর অবশিষ্টাংশ দিল্লীর দরবার থেকে নিয়োগপত্র লাভ করে গভর্ণর অথবা নাজিম হিসাবে বাংলা শাসন করেন।

মুসলমানগণ বিজয়ীর বেশে এ দেশে আগমন করার পর এ দেশকে তাঁরা মনেপ্রাণে ভালোবাসেন, এ দেশকে স্থায়ী আবাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং

এ দেশের অমুসলিম অধিবাসীর সাথে মিলে মিশে বাস করতে চেয়েছেন। শাসক হিসাবে শাসিতের উপরে কোন অন্যায়–অবিচার তাঁরা করেননি। জনসাধারণও তাঁদের শাসন মেনে নিয়েছিল। মুহাম্মদ বখতিয়ার বাংলা বিজয়ের পর আভ্যন্তরীণ আইনশৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মুসলমানদের জন্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করলেও অমুসলিমদের প্রতি উদার নীতি অবলম্বন করেন। তিনি ইচ্ছা করলে পলাতক লক্ষ্মণসেনের পশ্চাদানুসরণ করে তাকে পরাজিত করতে পারতেন। কিন্তু সে কথা তিনি মনে আদৌ স্থান দেননি। যদুনাথ সরকার তাঁর 'বাংলার ইতিহাসে' বলেন ঃ

" . . . .কিন্তু তিনি রক্তপিপাসু ছিলেন না। নরহত্যা ও প্রজাপীড়ন তিনি পছন্দ করতেন না। দেশে এক ধরনের জায়গীর প্রথা বা সামন্ততান্ত্রিক সরকার কায়েমের দ্বারা আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও সামরিক প্রধানদের সন্তুষ্টি সাধন করতেন।". . .

— (History of Bengal Vol. II, Muslim period p. 9)

বাংলার শাসনকর্তাগণ		দিল্লীর সমসাময়িক সম্রাট
১২০৩–৬ খৃঃ	মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী	কুতুব উদ্দীন আইবেক
১২০৬–৮ খৃঃ	মালিক ইজ্জুদ্দীন মুহাম্মদ শিরীন খিলজী	ঐ
১২০৮–১০ খৃঃ	হুসাম উদ্দীন ইওয়াজ	ঐ
১২১০–১৩ খৃঃ	আলী মর্দান (সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী)	ঐ
১২১৩–২৭ খৃঃ	সুলতান গিয়াস উদ্দীন–ইওয়াজ খিলজী	আরাম শাহ (কুতুবউদ্দীন আইবেকের পুত্র)।

বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ

সমগ্র বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ছিলেন শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ্। অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লী সম্রাট ফিরোজশাহ তোগলোক যুদ্ধযাত্রা করে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করে দিল্লীর সম্রাটের প্রীতি অর্জনের উদ্দেশ্যে পঞ্চাশটি হাতী উপঢৌকন স্বরূপ দিল্লী প্রেরণ করেন। এ সময়

থেকে ১৪০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যাঁরা বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা হলেন—

সিকান্দার শাহ (১ম)	১৩৫৮–৯১ খৃঃ
গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ	১৩৯১–৯৬ খৃঃ
সাইফুদ্দীন হামজা শাহ	১৩৯৬–১৪০৬ খৃঃ
শামসুদ্দীন	১৪০৬–১৪০৯ খৃঃ

রাজা গণেশ

পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলায় হিন্দুজাতির পুনরুত্থান আন্দোলন শুরু হয়। মুহাম্মদ বখতিয়ারের বাংলা বিজয়ের পর হতে চতুর্দশ শতকের শেষ অবধি মুসলমান শাসকগণ কখনো দিল্লী সুলতানের নিযুক্ত গভর্ণর হিসাবে, কখনো স্বাধীন সুলতান হিসাবে এবং কখনো উপঢৌকনাদির মাধ্যমে দিল্লী দরবারকে প্রীত ও সন্তুষ্ট রেখে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ দুই শতকের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়—মুসলমানগণ নিশ্চিন্ত মনে শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে আত্মকলহ ও বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের প্রবল আকাংখাই ছিল সে শান্তি বিনষ্টের কারণ। কিন্তু তাই বলে মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক হিন্দুজাতি দলন ও প্রজাপীড়ন হয়নি কখনো। ফলে জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে প্রজাগণ সুখ–শান্তি ও জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেছিল। বখতিয়ার খিলজীর পূর্বে এদেশে বহু স্বাধীন হিন্দু রাজা বাস করতেন। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা তাঁরা মনে প্রাণে মেনে না নিলেও মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে আসা সমীচীন মনে করেননি। তার দুটি মাত্র কারণ হতে পারে। প্রথম কারণ এই যে, বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল মুসলমানদের হাতে এবং বখতিয়ারের পর থেকে ক্রমাগত বহির্দেশ থেকে অসংখ্য মুসলমান বাংলায় আসতে থাকে। মুসলিম ধর্ম প্রচারক অলী ও দরবেশগণ এদেশে আগমন করতঃ ইসলামের সুমহান বাণী, ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রচার করতে থাকেন। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা নিষ্পেষিত হিন্দু জনসাধারণ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। তথাপি এখানকার বর্ণহিন্দুরা মুসলমান শাসকদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও আত্মকলহের সুযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারতো। কিন্তু তা করেনি। তার কারণও আছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, তারা এক দীর্ঘ পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছিল। তা হলো মুসলিম শাসকদের বিরাগভাজন না হয়ে বরঞ্চ শাসন কার্যের বিভিন্ন স্তরে এরা নিজেদের স্থান করে নিয়ে কোন এক মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তারা তাদের এ পরিকল্পনায় পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছিল। তবে সে সময়ে নিজেরা ক্ষমতালাভ না করে মুসলিম শাসন বিলুপ্ত করে ইংরেজদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করেছিল। পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে তাদের সাফল্য স্থায়ী না হলেও এ ছিল তাদের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার প্রথম প্রকাশ।

এ সময়ে বাংলার একজন হিন্দু জমিদার প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠেন। ফার্সি ভাষায় লিখিত ইতিহাসে তার নাম 'কান্‌স্' বলা হয়েছে। কান্‌স্ প্রকৃতপক্ষে 'কংস' অথবা 'গণেশ' ছিল। তিনি গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে রাজস্ব ও শাসন বিভাগের অধিকর্তা হয়েছিলেন। 'রিয়াযুস্ সালাতীনে'র বর্ণনা অনুসারে গণেশ শামসুদ্দীন ইলিয়াসের পৌত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহকে হত্যা করেন। অতঃপর গিয়াসউদ্দিনের পৌত্র শামসুদ্দীনকেও তিনি হত্যা করে গৌড় ও বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইলিয়াস শাহী বংশ

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৩৯–৫৮ খৃঃ)
|
সিকান্দার শাহ (১৩৫৮–৮৯ খৃঃ)
|
গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯–৯৬ খৃঃ)
|
সাইফউদ্দীন হামজা শাহ (১৩৯৬–১৪০৬ খৃঃ)

শামসুদ্দীন (১৪০৬–১৪০৯ খৃঃ) শাহাবুদ্দীন বায়েজিদ শাহ (১৪০৯–১৪ খৃঃ)

ব্লকম্যান (Blockman) বলেন যে, গণেশ নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেননি। তবে তিনি শামসুদ্দীনকে হত্যা করে তাঁর ভ্রাতা শাহাবুদ্দীন বায়েজিদ শাহকে ক্রীড়াপুত্তলিকা স্বরূপ রেখে স্বয়ং রাজদন্ড পরিচালনা করতেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলার ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ডে ১৪০৯–১৪১৪

খৃঃ পর্যন্ত বাংলার সিংহাসনে দু'জন শাসনকর্তার নাম উল্লেখ করেছেন। যথা, শাহাবুদ্দীন বায়েজিদ শাহ ও গণেশ।

রাজা গণেশ বাঙালী বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। উত্তর বংগের (দিনাজপুর) ভাতুরিয়া পরগণার শক্তিশালী রাজা গণেশ তাঁর নিজস্ব একটি সেনাবাহিনী রাখতেন। দুর্ধর্ষ মংগল গোত্র থেকে তিনি তাঁর সৈন্য সংগ্রহ করতেন। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে তাঁকে বাংলার সুলতানের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত করা হয় এবং ক্রমশঃ তিনি রাজ্যের খাজাঞ্চিখানার একচ্ছত্র মালিক মোখতার (সাহেব-ই-ইখতিয়ার-ই-মুল্‌ক ও মাল) হয়ে পড়েন। এ পদমর্যাদার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এক গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি প্রথমে গিয়াস উদ্দীন আজম শাহকে হত্যা করেন এবং কয়েক বৎসর পর শামসুদ্দীন শাহকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গণেশের বাংলার সিংহাসনে আরোহণ দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা ও গভীর ষড়যন্ত্রের ফল। গণেশ ও তাঁর সমমনা হিন্দু সামন্তবর্গ বাংলায় মুসলমানদের শাসন মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। যদিও বিগত দুই শতকের ইতিহাসে মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক অমুসলমানদের প্রতি কোনপ্রকার উৎপীড়নের নজির পাওয়া যায়না, তথাপি মুসলিম শাসনকে তারা হিন্দুজাতির জন্যে চরম অবমাননাকর মনে করতেন। তাই গণেশ সিংহাসনে আরোহণ করার পর মুসলিম দলনে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে মুসলমানদের প্রতি তাঁর বহুদিনের পুঞ্জিভূত আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

বুকানন হ্যামিল্টন কর্তৃক লিখিত দিনাজপুর বিবরণীতে আছে যে, জনৈক শায়খ বদরে ইসলাম এবং তদীয় পুত্র ফয়জে ইসলাম গণেশকে অবনত মস্তকে সালাম না করার কারণে তিনি উভয়কে হত্যা করেন। শুধু তাই নয়, বহু মুসলমান অলী দরবেশ, মনীষী, পন্ডিত ও শাস্ত্রবিদকে গণেশ নির্মমভাবে হত্যা করেন। একদা শায়খ মুঈনুদ্দীন আব্বাসের পিতা শায়খ বদরুল ইসলাম বিধর্মী রাজা গণেশকে সালাম না করার কারণে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। অতঃপর একদিন তিনি উক্ত শায়খকে দরবারে তলব করেন। তাঁর কামরায় প্রবেশের দরজা এমন সংকীর্ণ ও খর্ব করে তৈরী করা হয় যে, প্রবেশকারীকে উপুড় হয়ে প্রবেশ করতে হয়। শায়খ রাজার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে প্রথমে তাঁর দু'খানি পা কামরার ভিতরে রাখেন এবং মস্তক অবনত না করেই প্রবেশ করেন। কারণ, ইসলামের

নির্দেশ অনুযায়ী কোন মুসলমানই আল্লাহ ব্যতীত আর কারো সামনে মস্তক অবনত করতে পারেন না। রাজা গণেশ তাঁকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করেন এবং অন্যান্য আলেমগণকে একটি নৌকায় করে নদী-গর্ভে নিমজ্জিত করে মারেন।

মুসলিম নিধনের এ লোমহর্ষক কাহিনী শ্রবণ করে শায়খ নূরে কুতুবে আলম মর্মাহত হন এবং জৌনপুরের গভর্ণর সুলতান ইব্রাহিম শার্কীকে বাংলায় আগমন করতঃ ইসলাম ধর্ম রক্ষার জন্যে আবেদন জানান। সুলতান ইব্রাহিম বিরাট বাহিনীসহ বাংলা অভিমুখে যাত্রা করে সরাই ফিরোজপুরে শিবির স্থাপন করেন। রাজা গণেশ জানতে পেরে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কুতুবে আলমের শরণাপন্ন হন। কুতুবে আলম বল্লেন, তিনি এ শর্তে সুলতান ইব্রাহিমকে প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ দিতে পারেন, যদি গণেশ ইসলাম গ্রহণ করেন। গণেশ স্বীকৃত হলেও তার স্ত্রী তাঁকে বাধা দান করেন। অবশেষে তাঁর পুত্র যদুকে ইসলামে দীক্ষিত করে গণেশের স্থলে তাকে সিংহাসন ছেড়ে দেয়ার জন্যে বলা হয়। গণেশ এ কথায় স্বীকৃত হন। যদুর মুসলমানী নাম জালালউদ্দীন রেখে তাঁকে বাংলার সুলতান বলে ঘোষণা করা হয়।

সুলতান ইব্রাহিম অত্যন্ত ক্ষুণ্ন মনে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাওয়া মাত্র গণেশ জালালউদ্দীনের নিকট থেকে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। সরলচেতা কুতুবে আলম গণেশের ধূর্তুমি বুঝতে পারেননি। তাই পুত্রকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে চাইলে পিতার নরহত্যার অপরাধ ক্ষমা করেন।

গণেশ সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার পর সুবর্ণধেনু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মচ্যুত যদুর শুদ্ধিকরণ ক্রিয়া সম্পাদন করেন। অর্থাৎ একটি নির্মিত সুবর্ণধেনুর মুখের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে তার মল ত্যাগের দ্বার দিয়ে হিন্দু শাস্ত্রের বিশেষ ধর্মীয় পদ্ধতিতে বহির্গত হওয়াই হলো শুদ্ধিকরণ পদ্ধতি।

এ শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানের পর গণেশ দেশ থেকে মুসলমানদের মূলোৎপাটনের কাজ শুরু করেন। তিনি পূর্বের চেয়ে অধিকতর হিংস্রতার সাথে মুসলিম নিধনকার্য চালাতে থাকেন। তিনি কুতুবে আলমের পুত্র শায়খ আনওয়ার ও পৌত্র শায়খ জাহিদকে বন্দী অবস্থায় সোনারগাঁও পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তাঁদের পিতা-পিতামহের ধনসম্পদের সন্ধান দেয়ার জন্যে তাঁদেরকে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার করা হয়। পরে শায়খ আনওয়ারকে হত্যা করা হয়। স্বাধীনভাবে গণেশ সাত বৎসর যাবত বাংলায় এক বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম

করেন এবং মুসলমানদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলেন।

গণেশের মৃত্যুর পর পুনরায় জালালউদ্দীন (যদু) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

হিন্দুজাতির পুনরুত্থান

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলার ইতিহাস ২য় খন্ডে লিখেছেন, "গণেশ নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুবর্ণধেনু ব্রত দ্বারা যদুর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণাভাস মাত্র। রাজা গণেশের সময় হইতে গৌড়ে ও বংগে সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনাও আরম্ভ হইয়াছিল এবং বাংলা ভাষার উন্নতির সূচনা হইয়াছিল। এই সকল কারণের জন্য গণেশ বাংলার ইতিহাসে, ভারতের ইতিহাসে ও ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন।" (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৫-৩৬)

গণেশের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁর মুসলমান হওয়ার প্রকৃত কারণ কি ছিল তা অবশ্য বলা কঠিন। তবে একজন প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রাহ্মণ হিন্দুরাজার পুত্র মুসলমান হয়েছিলেন—মুসলিম বিদ্বেষী ঐতিহাসিক একে হিন্দুজাতির পক্ষে চরম অবমাননাকর মনে করে অনেক কল্পিত কাহিনী রচনা করেছেন।

রাখালদাস তাঁর উক্ত ইতিহাসে বলেন, "বরেন্দ্রভূমিতে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে যদু ইলিয়াস শাহের বংশজাতা কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান রমণীর রূপে মোহিত হইয়া স্বধর্ম বিসর্জন দিয়াছিলেন।"

রাখালদাস স্বজাতির গ্লানি অপর ধর্মাবলম্বীর উপর চাপিয়ে বলেন-

"ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট (Stewart) অনুমান করেন যে, যদু বা জালালউদ্দীন গণেশের মুসলমান উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র।"

কিভাবে মুসলিম জাতির ইতিহাস কলংকিত করা হয়েছে, উপরের বর্ণনা তাঁর এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে, তৎকালে মুসলমানদের নৈতিক অধঃপতন এতখানি হয়নি যে, মুসলমান রমণীগণ তখন বেশ্যাবৃত্তি শুরু করেছে অথবা কোন অমুসলমানের স্বামীত্ব গ্রহণ করেছে। অথবা বর্তমান কালের মতো মুসলমান রমণীগণ বেপর্দায় পর-পুরুষের সামনে চলাফেরা করতো যার ফলে গণেশপুত্র যদু কোন সুন্দরী মুসলমান যুবতীর প্রেমাসক্ত হয়ে তাঁর পাণি গ্রহণের

অনেকে মুসলমান হয়েছে। ইতিহাস একথার সাক্ষ্যদান করে যে, সে সময়ে দলে দলে মুসলমান ফকীর দরবেশ এদেশে ইসলামের মহান বাণী প্রচার করতেন এবং তাঁদের অনেকে শাসনকার্যেও অংশগ্রহণ করেছেন। শাসকগণের উপর ছিল তাঁদের বিরাট প্রভাব।

গণেশের আমলের কথাই ধরা যাক। বিখ্যাত অলী নূরে কুতুবে আলম, তাঁর পুত্র শায়খ আনওয়ার গণেশের সমসাময়িক লোক। তাঁদের প্রভাব শুধু বাংলার মুসলমান ও শাসকদের উপরেই ছিলনা, বরঞ্চ অযোধ্যার গভর্ণর সুলতান ইব্রাহিম শার্কীর উপরেও ছিল। যার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। তাঁদের আচার আচরণ, নির্মল চরিত্র ও তাঁদের মুখনিঃসৃত ইসলামের অমিয় বাণী শ্রবণ করে বহু হিন্দু স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করে—যাদের মধ্যে গণেশপুত্র যদু একজন। সমাজে তাঁদের এতখানি প্রভাব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মুসলমান নারী বেশ্যাবৃত্তি করবে অর্থাৎ কোন পুরুষের উপপত্নী হবে, অথবা বস্ত্রাহীনভাবে চলাফেরার কারণে কোন হিন্দু প্রেমাসক্ত হবে, এ একেবারে কল্পনার অতীত। অতএব গণেশের মুসলিম উপপত্নী রাখা এবং যদুর মুসলিম রমণীর প্রেমাসক্ত হওয়া একেবারে কপোলকল্পিত এবং দুরভিসন্ধিমূলক। নিজের গ্লানি অপরের ঘাড়ে চাপাবার হাস্যকর প্রয়াস মাত্র।

আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তা হলো এই যে, মুসলমান এদেশে এসেছিল বিজয়ীর বেশে। স্বভাবতঃই বহিরাগত বিজয়ী মুসলমানদের মধ্যে ছিল শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি (Superiority Complex)। সম্ভ্রান্ত মুসলমান বলতে বহিরাগত মুসলমানকেই বুঝাতো। তাঁদের কোন রমণী হিন্দুর স্বামীত্ব গ্রহণ করবে— এ চিন্তার অতীত।

তারপর কথা থাকে এই যে, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুজাতির ইসলাম গ্রহণের পর তাদের কোন রমণী গণেশকে স্বামীত্বে বরণ করেছে, এটাও ছিল অবাস্তব। কারণ গণেশ ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদের ধারক-বাহক। যে হিন্দু ইসলাম গ্রহণের পর যবন ও ম্লেচ্ছ হয়েছে তাঁদের ঘরে বিবাহ করা গণেশের পক্ষে ছিল এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। অতএব এসব কাহিনী-যে অলীক কল্পনাপ্রসূত মাত্র, তাতে সন্দেহ নেই।

কেউ কেউ বলেন, যদু রাজ্যলোভে মুসলমান হয়েছিলেন। আমাদের মতে একথা সত্য নয়। অবশ্য সুলতান ইব্রাহিম শার্কীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার

জন্যে গণেশ তদীয় পুত্রকে নূরে কুতুবে আলমের হস্তে ইসলাম গ্রহণের জন্যে সমর্পণ করেন। যদুর ইসলাম গ্রহণ এবং তাঁকে সুলতান হিসাবে ঘোষণা করার পর সুলতান ইব্রাহিম শার্কী বাংলা আক্রমণ না করে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই গণেশ পুনরায় যদুকে অপসারিত করে নিজে সিংহাসনে পুনঃ আরোহণ করেন। তারপর হিন্দুমতে যদুর প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। গণেশ প্রবল পরাক্রমসহ সাত বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁকে কোনক্রমেই সিংহাসনচ্যুত করা যায়নি। যদু যদি শুধুমাত্র রাজ্যলোভেই ইসলাম গ্রহণ করে থাকতেন, তাহলে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত ও সুবর্ণধেনুর শুদ্ধিকরণের পর নির্বিঘ্নে হিন্দু হিসাবে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করতে পারতেন। কিন্তু যদু ইসলাম ত্যাগ করেননি।

অতঃপর মানুষের মধ্যে থাকে একটি বিবেক যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যাকে উপলব্ধি করতে পারা যায়। তার সাথে মানুষের মধ্যে থাকে একটা নৈতিক অনুভূতি। গণেশের যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা দেখে বাংলার সুলতান তাঁকে রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে নিযুক্ত করেন।

কিন্তু ষড়যন্ত্র ও হত্যাকান্ডের মাধ্যমে তিনি বাংলার সিংহাসন দখল করেন। প্রথমতঃ তিনি প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করেন এবং অতঃপর নিরীহ মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ শুরু করেন। কিন্তু তথাপি তাঁর পুত্র ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন নূরে কুতুবে আলম। শায়খ নূরে কুতুবে আলমের আচরণ, ইসলামের সহনশীলতা ও উদারতার প্রতি অবশ্য যদু মুগ্ধ হয়ে থাকবেন। পিতার বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা ও নিষ্ঠুরতা অবশ্য অবশ্যই যদুসেনের মনের গভীরে দাগ কেটে থাকবে। উপরন্তু, কামেল অলীর সংস্পর্শে যদুর অন্তর সত্য সত্যই ইসলামের নূরে উদ্ভাসিত হয়েছিল। এটাই আমাদের ধারণা। তা মোটেই অযৌক্তিকও নয় এবং অসম্ভবও নয়।

এখন মুসলিম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণের মতে, যদু যখন ইসলামে অবিচলিত ছিলেন, তখন তাঁকে নানাভাবে কলংকিত করতেই হবে। প্রথমতঃ তাঁকে একজন মুসলমান উপপত্নীর সন্তান বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের বক্তব্য এই'যে, আসলে তিনি হিন্দুই ছিলেন না ছিলেন জারজ (?) সন্তান।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ইতিহাসে এ সময়ের একটি চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর ইতিহাসের (বাংলার ইতিহাস ২য় খন্ড) ১৩৭ পৃষ্ঠায় বলেন—

"গণেশ অথবা যদু যাহা করিতে পারেন নাই, অথবা করিতে ভরসা করেন নাই আর একজন বাঙালী হিন্দুরাজা কর্তৃক তাহা স্বচ্ছন্দে সম্পাদিত হইয়াছিল। তাহার নাম দনুজমর্দন দেব।"

অতঃপর তিনি উক্ত গ্রন্থের ১৩৯ পৃষ্ঠায় উক্ত কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন—

"গণেশ অথবা যদু যাহা করিতে পারেন নাই, আর্যাবর্তে কোনও হিন্দু রাজা যাহা করিতে পারেন নাই, তাহাই সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া দনুজমর্দন দেব ও মহেন্দ্র দেবের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে।"

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, গণেশ-যদু কি করতে পারেননি, আর দনুজমর্দন দেব কি করেছেন তার কোন উল্লেখ ই তাঁর গ্রন্থে নেই।

এ সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার বলেন—

"In this very year we find coins with Bengali lettering issued from Pandua and Chatgaon by a King named Mahendra Dev—exactly resembling those of Danujmardan Dev. He was most probably the younger son of Ganesh, who has remained a Hindu and to whom his elder brother Jadusen Jalaluddin had offered to leave the paternal throne in case he was not permitted to embrace Islam. Mahendra was evidently set up on the throne by Hindu ministers just after the death of Ganesh . . .I believe that Mahendra (then not more than 12 years old) was a mere puppet in the hands of a selfish ministerial faction . . .The attempt of the Kingmakers was shortlived and ended in their speedy defeat, as no coin was struck in Mahendra's name after that one year 1418 A.D.

"ঠিক এ বৎসরেই পান্ডুয়া ও চাটগাঁও থেকে বাংলা অক্ষরে মহেন্দ্র দেবের নামাংকিত মুদ্রা আমরা দেখতে পাই। এগুলো দেখতে অবিকল দনুজমর্দন দেবের মুদ্রার ন্যায়। খুব সম্ভব তিনি ছিলেন গণেশের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি হিন্দুই রয়ে গিয়েছিলেন এবং যদুসেন জালালউদ্দীন তাঁকে বলেছিলেন যে, যদি তাঁকে মুসলমান হতে দেয়া না হয় তাহলে যেন পিতার সিংহাসন ছেড়ে দেন। গণেশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু মন্ত্রীবর্গ মহেন্দ্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। আমার

বিশ্বাস মহেন্দ্র (যার বয়স বার বছরের বেশী ছিলনা) একটা স্বার্থান্ধ মন্ত্রীচক্রের কাষ্ঠপুত্তলিকা ছিলেন মাত্র। এ সকল মন্ত্রীবর্গের রাজা বানাবার প্রচেষ্টা বেশীদিন চলতে পারেনি এবং অচিরেই তাঁদের পরাজয় ঘটেছে। কারণ এই একটি বছর ১৪১৮ খৃষ্টাব্দের পর মহেন্দ্রের নামে আর কোন মুদ্রা অংকিত হয়নি।"

যদুনাথ সরকার আরও বলেন–

"Ganesh placed his son, a lad of twelve only, under protective watch in his harem and ruled in his own account under the proud title of Danujmardan Dev.

"গণেশ তাঁর বার বৎসর বয়স্ক পুত্রকে হারেমের মধ্যে প্রতিরক্ষামূলক পাহারায় রেখে স্বয়ং গৌরবজনক 'দনুজমর্দন দেব' উপাধি ধারণ করে ইচ্ছামতো শাসন চালান।"

এর থেকে বুঝা গেল গণেশই আসলে ছিলেন দনুজমর্দন দেব। অথবা দনুজমর্দন ছিল তাঁর উপাধি যা তিনি তাঁর জন্যে এবং গোটা হিন্দুজাতির জন্যে গৌরবজনক মনে করতেন।

রাখালদাস এখানেই ভুল করেছেন। তিনি দনুজমর্দনকে ভিন্ন ব্যক্তি মনে করে তাঁর অসীম গুণগান গেয়েছেন।

এখন আসুন, আমরা দেখি দনুজমর্দন শব্দের অর্থ কি। দনুজমর্দন শব্দের অর্থ 'দৈত্যদলন'। উগ্র হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠাকামী গণেশ মুসলমান ও মুসলিম শাসন কিছুতেই বরদাশত করতে পারেননি। তাঁর একান্ত বাসনা ছিল মুসলমানদেরকে বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে উগ্র হিন্দুরাজ কায়েম করা। বহিরাগত মুসলমানদেরকে গণেশের ন্যায় হিন্দুগণ 'যবন–ম্লেচ্ছ' মনে করতেন। কিন্তু মুসলমানগণ হিন্দুদের তুলনায় শারীরিক গঠন ও শৌর্যবীর্যে বলিষ্ঠতর ছিলেন। তাই তাঁদেরকে যবন ও ম্লেচ্ছ দৈত্যের মতো মনে করা হতো। এই দৈত্য স্বরূপ যবন ও ম্লেচ্ছদের দলন ও নিধনই ছিল গণেশের ব্রত। ইব্রাহিম শার্কীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর গণেশ পূর্ব থেকে শতগুণে এ দলন ও নিধন কার্য চালিয়েছেন। দনুজমর্দনের মুসলিম নিধন কার্যকলাপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে রাখালদাস বলেছেন, "আর্যাবর্তে কোনও হিন্দু রাজা যাহা করিতে পারেন নাই তাহাই সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া দনুজমর্দন দেব ও মহেন্দ্র দেবের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে।"

গণেশের মৃত্যুর পর পরই তাঁর নিযুক্ত হিন্দু মন্ত্রীবর্গ তাঁর বার বৎসর বয়স্ক পুত্র মহেন্দ্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে গণেশেরই পদাংক অনুসরণে মুসলিম-দলন কার্য অব্যাহত রাখেন। তাই দনুজমর্দন গণেশ ও তদীয় পুত্র মহেন্দ্রের ক্রিয়াকলাপে আনন্দে গদগদ হয়ে রাখালবাবু তাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কিন্তু মহেন্দ্রের শাসন ছিল অল্প দিনের জন্যে।

গণেশের বংশ

গণেশ দনুজমর্দন

যদুসেন ওরফে জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৪–৩১ খৃঃ)   মহেন্দ্র

শামসুদ্দীন আহমদ শাহ (১৪৩১–৪২ খৃঃ)

ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরুত্থান

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের দু'জন সুলতানকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। গণেশ পৌত্র শামসুদ্দীন আহমদ শাহকে হত্যা করে পুনরায় ইলিয়াস শাহী বংশ বাংলার মসনদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৪২–৫৯ খৃঃ)
রুকন উদ্দীন বারবাক শাহ (১৪৫৯–৭৪ খৃঃ)
শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪–৮১ খৃঃ)
দ্বিতীয় সিকান্দার শাহ (১৪৮১ খৃঃ)
জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ (১৪৮১–৮৬ খৃঃ)

বাংলার মসনদে হাবশী সুলতান

কিছুকাল যাবত আবিসিনিয়াবাসীগণ বাংলায় আগমন করতে থাকে। বাররাক শাহ ও ইউসুফ শাহ তাঁদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। এদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ফতেহ শাহ তাঁদেরকে দমন করার চেষ্টা করলে তিনি নিহত হন এবং জনৈক হাবশী সুলতান শাহজাদা বাররাক নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান শাহজাদা বাররাক (১৪৮৬–৮৭ খৃঃ)
সাইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৪৮৭–৯০ খৃঃ)
নাসীরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৯০–৯১ খৃঃ)
শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ (১৪৯১–৯৩ খৃঃ)
আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩–১৫১৯ খৃঃ)

উপরে বর্ণিত চতুর্থ হাবশী সুলতান শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ, হোসেন নামে এক অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিকে তাঁর সরকারের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত করেন। ক্রমশঃ তাঁর পদোন্নতি হতে থাকে এবং অবশেষে মুজাফফর শাহের প্রধানমন্ত্রীর পদে তিনি বরিত হন। পরবর্তীকালে নানান ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী হোসেন আপন প্রভুকে নিহত করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি বাংলার ইতিহাসে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ শরীফ মক্কী নামে পরিচিত। পরে তিনি 'খলিফাতুল্লাহ' উপাধিও ধারণ করেন।

হোসেন শাহ

ইতিহাসের এক অতি বিস্ময় এ হোসেন শাহ। তাঁর পঞ্চমুখ প্রশংসায় বিরাট বিরাট গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান কালে ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের মনে তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগে। সেসব জবাব ইতিহাস থেকে খুঁজে বের করতে হবে।

মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর 'মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে হোসেন শাহের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

"সুলতান হোসেন শাহ নামে পরিচিত এই ভদ্রলোকটির জাতি, ধর্ম, পূর্বাসন এবং তাঁহার উপাধি সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বহু অনুসন্ধান সত্ত্বেও আমরা এ পর্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই।"

প্রকৃতপক্ষে তাঁর সম্পর্কে কিছু ইতিহাস, কিছু কিংবদন্তী এবং কিছু অলীক কাহিনীর জগাখিঁচুড়ি তৈরী হয়ে আছে।

স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর 'দি হিষ্ট্রী অব বেঙ্গল'–এ বলেন—

"প্রায় সব ঐতিহাসিক বিবরণে তাঁকে একজন আরব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাঁর পিতাসহ বাংলায় এসে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর প্রথম জীবনের ঘটনাবলী বহু লোককাহিনী ও উপাখ্যানের বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছে। তার

অধিকাংশের ঘটনাকেন্দ্র হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলার জংগীপুর মহকুমার একটি গ্রাম যাকে বলা হয়—'একআনি চাঁদপাড়া'। বেশ কিছু প্রাচীন ভগ্নাবশেষ আছে এ গ্রামে। জনশ্রুতি ও শিলালিপি অনুযায়ী এগুলোকে হোসেন শাহের আমলের বলা হয়ে থাকে।" (উক্ত গ্রন্থ, ২য় খন্ড ১৪২–৪৩)

তাঁর সম্পর্কে আরও প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, সাইয়েদ আশরাফ তাঁর দুই পুত্রসহ গৌড় যাবার কালে চাঁদপাড়া নামে একটি রাঢ় গ্রামে স্থানীয় মুসলমান কাজীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কাজী অতিথির বংশ পরিচয় জানতে পেরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হোসেনের সাথে আপন কন্যার বিয়ে দেন। অতঃপর বিদ্যাশিক্ষা করার পর হোসেন গৌড়ে হাবশী সুলতান মুজাফফর শাহের অধীনে একটি সামান্য চাকুরী গ্রহণ করেন। এ ধরনের কাহিনী সলিম লিপিবদ্ধ করেন একটি বেনামী পুস্তিকার বরাত দিয়ে।

এ ধরনের গল্পও তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত আছে যে, বাল্যকালে হোসেন একজন স্থানীয় ব্রাহ্মণের অধীনে রাখালের চাকুরী করতেন। এ বালক ভবিষ্যতে এক বিরাট ব্যক্তি হবে এরূপ অলৌকিক লক্ষণ তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়ে উক্ত ব্রাহ্মণ তাঁকে গৌড়ে নিয়ে যান।

পরবর্তীকালে হোসেন বাংলার সুলতান হলে সেই ব্রাহ্মণকে মাত্র এক আনা খাজনার বিনিময়ে চাঁদপাড়া গ্রাম দান করেন। এ গল্পটি হুবহু হাসান গাংগু বাহমনীর বাল্যজীবনের কাহিনীর অনুরূপ। তবে বিনা বিচারে একে সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না। সামান্য ব্যক্তি থেকে কেউ একটি রাজ্যের মালিক মোখতার হয়ে বসলে তার সম্পর্কে নানান ধরনের আজগুবি কাহিনী তৈরী করা হয়ে থাকে। হোসেন শাহ সম্পর্কেও তা–ই হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, হোসেনের পিতা সাইয়েদ আশরাফ মক্কার শরীফ ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তিরমিজে বাস করেন। বুকানন হ্যামিল্টন বলেন, হোসেন রংপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন বলেও জনশ্রুতি আছে। গোবিন্দগঞ্জ থেকে ষোল মাইল দূরে অবস্থিত দেবনগর গ্রামে তাঁর জন্ম। কোন কোন ঐতিহাসিক আবার তাঁকে গৌড়ের সুলতান ইব্রাহীম শাহের প্রপৌত্র বলেও উল্লেখ করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে তাঁর বংশপরিচয় ও জন্মস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যেও যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে।

ঐতিহাসিকগণের কেউ কেউ বলেন, তিনি শুধু আরবই ছিলেন না, ছিলেন

সাইয়েদ বংশীয়। তারপর কিছুটা কল্পনার রং দিয়ে হোসেনের বংশমর্যাদা রঞ্জিত করার চেষ্টা করে বলা হয়েছে যে, তাঁর পিতা সাইয়েদ আশরাফ ছিলেন মক্কার শরীফ। ভাগ্য অন্বেষণের জন্যে তিনি তাঁর দুই পুত্রসহ বাংলায় আগমন করেন।

এখন অতি ন্যায়সংগতভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, হোসেনের পিতা মক্কার শরীফ হওয়াতো দূরের কথা, মোটেই আরববাসী ছিলেন কিনা। হোসেনের সাইয়েদ হওয়া কেন, মুসলমান হওয়াটাও সন্দেহমুক্ত নয় বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর আচরণ ও কার্যকলাপই তার সাক্ষ্য দান করে।

প্রথমতঃ তাঁর বংশ পরিচয়ের কথাই ধরা যাক। তাঁর পিতা সাইয়েদ আশরাফ মক্কার অধিবাসী ও শরীফ ছিলেন—এর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় না। উপরন্তু মক্কার শরীফ তাঁর দুই পুত্রসহ ভাগ্য অন্বেষণের জন্যে বাংলায় আগমন করেন, এ এক অলীক কল্পনা মাত্র। তিনি কি কোন কারণে শরীফের পদমর্যাদা থেকে অপসারিত হয়ে স্থাবর অস্থাবর সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন যার জন্যে তাঁকে বাংলায় আসতে হয়েছিল অন্ন বস্ত্রের অনুসন্ধানে? কেউ কেউ আবার তাঁকে তিরমিজের অধিবাসীও বলেছেন। তাহলে কোন্‌টাকে সত্য বলে গ্রহণ করা যাবে?

উল্লেখ্য যে, মক্কার শরীফ ছিলেন সেকালে হেজাজের সর্বময় কর্তা, একচ্ছত্র বাদশাহ, বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক, অতুলনীয় রাজপ্রাসাদের ভোগদখলকারী। ইতিহাসে এমন কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না যে, মক্কার কোন শরীফ কোন কালে তাঁর মসনদ ত্যাগ করে ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে স্ত্রীপুত্রসহ বাংলায় এসে অপরের আশ্রয়প্রার্থী হয়েছেন। সম্ভবতঃ সুচতুর ও প্রতারক হোসেন নিজকে সাইয়েদ বংশীয় ও শরীফপুত্র বলে পরিচয় দিয়ে মুসলমানদের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন।

তারপর মজার ব্যাপার এই যে, সিংহাসন লাভের পর হোসেন চাঁদপাড়া গ্রামের কাজী সাহেবকে (তাঁর শ্বশুর), মতান্তরে তাঁর বাল্যজীবনের প্রভু জনৈক ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে মাত্র একআনা রাজস্বের বিনিময়ে গোটা গ্রাম দান করলেন, পরে সে গ্রাম বা মৌজা 'একআনি চাঁদপাড়া' নামে অভিহিত হয়। কিন্তু হতভাগ্য পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্ন সংস্থানের কোন ব্যবস্থা হোসেন করেছেন কিনা, তাঁর বিবরণ ইতিহাসে কোথাও নেই।

তারপর আবার লক্ষ্য করুন, হোসেনের কথিত পিতা সাইয়েদ আশরাফ মুর্শিদাবাদের জংগীপুর মহকুমার চাঁদপুর গ্রামের জনৈক কাজীর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাজী সাহেব সাইয়েদ বংশীয় লোক দেখে তাড়াতাড়ি হোসেনকে তাঁর কন্যা দান করে বসেন। আবার একথা সমানভাবে প্রচলিত আছে যে, হোসেন চাঁদপাড়া গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণের অধীনে রাখালের চাকুরী করেন। এ সময়ে একদিন কোন গুরুতর অপরাধে ব্রাহ্মণ তাঁকে বেদম বেত্রাঘাত করেন। আবার কখনো হোসেনকে বলা হচ্ছে রংপুর জেলার দেবনগর গ্রামের অধিবাসী। এসব বিপরীতমুখী বিবরণ থেকে একথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, হোসেন প্রকৃতপক্ষে ছিলেন অজ্ঞাত কুলশীল। একজন অজ্ঞাত কুলশীলের স্বার্থের খাতিরে সুযোগ বুঝে মুসলমান না হলেও মুসলমান বলে পরিচয় দেয়াটাও আশ্চর্যের কিছু নয়। মোটকথা ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার মাধ্যমে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর বংশ পরিচয় ও বাল্যজীবন সম্পর্কে নানান কল্পিত কাহিনী রচনা করা হয়। কল্পনাবিলাসী গল্পকারগণ হয়তো হোসেনের কথিত পিতার কোন সমাধি আবিষ্কার করে তৎপার্শ্বে হোসেন কর্তৃক বিরাট মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপনের উল্লেখ করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা বাংলার পরম পরাক্রমশালী বাদশাহ হোসেনের কাহিনী রচনায় এত মশগুল ছিলেন যে, হতভাগ্য পিতা ও ভ্রাতার কথা তাঁরা বেমালুম ভুলে গেছেন।

কিভাবে হোসেন ক্ষমতা লাভ করেন এবং ক্ষমতা লাভের পর তাঁর কার্যকলাপ কি ছিল তারও বিশদ আলোচনা করে দেখা যাক।

হাবশী শাসক মুজাফফর শাহ হোসেনকে প্রথমতঃ সামান্য চাকুরীতে নিযুক্ত করেন। অতঃপর প্রখর বুদ্ধি বলে হোসেন তাঁর প্রভুকে প্রীত ও সন্তুষ্ট করে অবশেষে প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ লাভ করেন। সুচতুর হোসেন বুঝতে পেরেছিলেন হাবশী শাসকগণ বাংলার লোকের কাছে ছিলেন অনভিপ্রেত। অতএব আপন প্রভুকে সেনাবাহিনী, অমাত্যবর্গ ও জনসাধারণের কাছে অধিকতর অপ্রিয় করে তুলে হোসেন স্বয়ং ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তিনি তাঁর প্রভু মুজাফ্‌ফর শাহকে নানাভাবে কুপরামর্শ দিতে থাকেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— "সৈয়দ হোসেন শরীফ মক্কী মুজাফ্‌ফর শাহের উজির ও প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে মুজাফ্‌ফর শাহ সৈনিকদিগের বেতন হ্রাস করিয়া অর্থ সঞ্চয়ে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন।" (বাংলার ইতিহাস, ২য় খন্ড পৃঃ ১৮৭)।

রিয়াযুস সালাতীন ও তারিখে ফেরেশতায় বলা হয়েছে যে, হোসেন উজির হওয়ার পর জনসাধারণের সাথে সদ্ব্যবহার করতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে একথাও বলতে থাকেন যে, মুজাফ্ফর শাহ অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির লোক এবং বাদশাহ হওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। হোসেন শাহের পরামর্শে মুজাফ্ফর শাহ অবাঞ্ছিত কাজ করতেন। ফলে হোসেন তাঁকে জনসাধারণের কাছে দোষী ও হেয় প্রতিপন্ন করার সুযোগ পেতেন। এভাবে তিনি সেনাবাহিনী, আমীর-ওমরা ও জনগণকে মুজাফ্ফর শাহের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তোলেন। অবশেষে তাঁর নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী মুজাফ্ফর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ঐতিহাসিকগণ বলেন, যুদ্ধে উভয়পক্ষের এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। সেকালে এতবড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পৃথিবীর অন্য কোথাও হয়েছে বলে জানা যায় না।

যুদ্ধে মুজাফ্ফর শাহ নিহত হন। কেউ বলেন, হোসেন প্রাসাদ রক্ষীকে হাত করার পর প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে স্বহস্তে আপন প্রভুকে হত্যা করেন।

মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর 'মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে বিশ্বকোষের বরাত দিয়ে বলেন,

"সকল শ্রেণীর মুসলমান সামন্ত এবং হিন্দুরাজগণ তাঁহাকেই (সৈয়দ হোসেন) রাজ সিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তিনিও তাঁহাদের মনোরঞ্জনার্থ নির্দিষ্ট সময়মত গৌড় রাজধানী লুন্ঠনের আদেশ দেন। ঐ সময়ে গৌড় নগরে অনেক ধনশালী হিন্দু প্রজা সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।"

মজার ব্যাপার এই যে, হোসেনেরই আদেশে যারা লুন্ঠন করেছিল, তাদেরকে আবার হোসেনের আদেশেই হত্যা করা হয়। এদের সংখ্যা ছিল বার হাজারেরও বেশী। হোসেন তাঁর আপন হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে লক্ষ লক্ষ লোকের রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করেন। হয়তো লুন্ঠনের আদেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান হত্যার বাহানা মাত্র।

এত গণহত্যার পর, যার মধ্যে ছিল সেনাবাহিনীর লোক, আমীর ওমরা, অমাত্যবর্গ, জ্ঞানীগুণী প্রভৃতি, হোসেনের বিরুদ্ধে টু শব্দ করার আর কেউ রইলো না। ফলে তিনি হয়ে পড়েন দেশের সর্বময় কর্তা।

সাইয়েদ হোসেন মক্কী (?) সিংহাসন লাভের পর কোন্ ভূমিকা পালন করেন তা পাঠকগণের কৌতূহল সঞ্চার না করে পারবে না। রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি তাঁর মন্ত্রীপরিষদ নতুন করে ঢেলে সাজালেন। তাঁর উজির ও প্রধান কর্মকর্তা হলেন— গোপীনাথ বসু ওরফে পুরন্দর খান, রাজ চিকিৎসক মুকুন্দ দাস, প্রধান দেহরক্ষী কেশব ছত্রী, টাকশাল প্রধান অনুপ। নানা শাস্ত্র বিশারদ ও বৈষ্ণব চূড়ামনী শ্রীরূপ ও সনাতনও তাঁর মন্ত্রী হলেন। স্যার যদুনাথ সরকার বৈষ্ণব লেখকদের বরাত দিয়ে বলেন যে, শ্রীচৈতন্য যে অবতার ছিলেন, হোসেন শাহ তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। চৈতন্য গৌড় নগরে আগমন করলে হোসেন তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং রাজকর্মচারীগণের প্রতি ফরমান জারী করেন যেন প্রভু চৈতন্যকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় ও তাঁর ইচ্ছামত যত্রতত্র ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধা করে দেয়া হয়।

শ্রদ্ধেয় আকরাম খাঁ তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থের ৯৮ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

"হিন্দু লেখকগণের মতে হোসেন শাহের সিংহাসন আরোহণের পর হইতে গৌড় দেশে 'রামরাজ্য' আরম্ভ হইয়া গেল। মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এ বিষয়ের ভূমিকা হিসাবে বলিতেছেন ঃ মুসলমান ইরান, তুরান প্রভৃতি স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণ বাঙালী হইয়া পড়িলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেব মন্দিরের ঘন্টা বাজিতে লাগিল, মহরম, ঈদ, শবে বরাত প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাম, দোল উৎসব চলিতে লাগিল। . . . এহেন পরিস্থিতির মধ্যে সুলতান হোসেনের অভ্যুদয় ঘটিল। তিনি রাজকীয় ঝামেলা হইতে মুক্ত হইয়া খুব সম্ভব সর্বপ্রথমে চৈতন্যদেবের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ভক্ত শ্রেণীভুক্ত হইয়া গেলেন। 'চৈতন্য চরিতামৃতে' লিখিত আছে যে, ইনি (হোসেন) শ্রীচৈতন্যের একজন ভক্ত হইয়াছিলেন।"

সুলতান হোসেন ও শ্রীচৈতন্য ছিলেন সমসাময়িক এবং চৈতন্যের সাথে হোসেনের গভীর সম্পর্ক এক ঐতিহাসিক সত্য। অতএব শ্রীচৈতন্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে অপ্রাসংগিক হবেনা নিশ্চয়।

শ্রীচৈতন্য

শ্রী চৈতন্যকে বৈষ্ণব সমাজ শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে, এমনকি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। গোটা হিন্দু সমাজের মধ্যে শ্রীচৈতন্য এক নব জাগরণ সৃষ্টি করেন।

স্যার যদুনাথ সরকার বলেন ঃ

" . . . এ এমন এক সময় যখন প্রভু গৌরাংগের প্রতীক স্বরূপ বাংগালীর

মনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তাঁর প্রেম ও ক্ষমার বাণী সমগ্র ভারতকে বিমোহিত করে। বাংগালীর হৃদয়মন সকল বন্ধন ছিন্ন করে রাধাকৃষ্ণের লীলা গীতিকার দ্বারা সম্মোহিত হয়। বৈষ্ণব ধর্মের আবেগ অনুভূতিতে, কাব্যে, গানে, সামাজিক সহনশীলতা এবং ধর্মীয় অনুরাগে মনের উচ্ছ্বাস পরবর্তী দেড় শতাব্দী যাবত অব্যাহত গতিতে চলে। এ হিন্দু রেনেসাঁ এবং হোসেন শাহী বংশ ওতপ্রোত জড়িত। এ যুগে বৈষ্ণব ধর্মের এবং বাংলা সাহিত্যের যে উন্নতি অগ্রগতি হয়েছিল তা অনুধাবন করতে গেলে গৌড়ের মুসলমান প্রভুর উদার ও সংস্কৃতি সম্পন্ন শাসকের কথা অবশ্যই মনে পড়ে।"

(যদুনাথ সরকার, দি হিষ্ট্রী অব বেঙল, ২য় খন্ড পৃঃ ১৪৭)

প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কি ছিল, তা তাঁর নিজের কথায় আমরা সুস্পষ্টরূপে জানতে পারি। চৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা, ১২০ পৃষ্ঠায় তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন–

"পাষন্ডি সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষন্ডি সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার।"

এখন বুঝা গেল পাষন্ডি সংহার করাই তাঁর জীবনের আসল লক্ষ্য। ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায়, মুসলমানগণ বাংলা অধিকার করার সময় বৌদ্ধ মতবাদ দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের যে বিপুলসংখ্যক লোক এদেশে বাস করতো, ব্রাহ্মণগণ তাঁদেরকে ধর্মের আশ্রয়ে আনতে অস্বীকার করেন। তার ফলে তারা বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশ করতে থাকে। তাহলে এদেশে হিন্দু, বৈষ্ণব সমাজ ও মুসলমান ব্যতীত সে সময়ে আর কোন ধর্মাবলম্বীর অস্তিত্ব ছিল না। তাহলে পাষন্ডি ছিল কারা যাদের সংহারের জন্যে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়েছিল?

মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর উপরে বর্ণিত গ্রন্থে বলেন ঃ

"মনুর মতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অহিন্দু মাত্রেই এই পর্যায়ভুক্ত (সরল বাংলা অভিধান)। আভিধানিক সুবল চন্দ্র মিত্র তাঁহার Beng-Eng Dictionary তে পাষন্ডি শব্দের অর্থে বলিতেছেন— "Not conforming himself to the tenets of Vedas : Atheistic, Jaina or Buddha, a non-Hindu— বেদ অমান্যকারী, অন্য বর্ণের চিহ্নধারী এবং অহিন্দু— পাষন্ডির এই তিনটি বিশেষণ সর্বত্র প্রদত্ত হইয়াছে।"

এখন পাষন্ডি বলতে যে একমাত্র মুসলমানদেরকেই বুঝায়, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ রইলো না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, সত্য সত্যই-কি চৈতন্য পাষন্ডি তথা মুসলমানদেরকে এদেশ থেকে উচ্ছেদ করতে পেরেছিলেন? আপাতঃদৃষ্টিতে দেখা যায়, চৈতন্যের সমসাময়িক সুলতান হোসেন শাহের পরেও এদেশে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু হোসেন শাহ কর্তৃক চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ ও বৈষ্ণব সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর সাহায্য সহযোগিতার দ্বারা মুসলমানদের আকীদাহ বিশ্বাসের মধ্যে শির্ক বিদয়াতের যে আবর্জনা জমে উঠেছিল তা-ই পরবর্তী যুগে মুসলিম সমাজের অধঃপতনের কারণ হয়।

'মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থ প্রণেতা বলেন—

"প্রকৃত কথা এই যে, বৌদ্ধ সমাজ ও বৌদ্ধ ধর্মকে তাহাদের মাতৃভূমি হইতে সমূলে উৎখাত করার পর তাঁহাদের নেকনজর পড়িয়াছিল মুসলমান সমাজের উপর। তাই যুগপৎভাবে তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন 'যবন' রাজাদিগকে রাজনৈতিক কৌটিল্যের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতে। পক্ষান্তরে ধর্মের নামে একটা মোহজাল বিস্তার করিয়া মুসলমান সমাজকে আত্মবিস্মৃত ও সম্মোহিত করিয়া রাখিতে। পূর্বে বলিয়াছি, ইহাই তৎকালের অবতার ও তাঁহার ভক্ত ও সহকারীদের চরম ও পরম উদ্দেশ্য।"

সত্য নারায়ণের পূজা পদ্ধতির উল্লেখ হিন্দু পুরাণে আছে। হিন্দুর প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে এই পূজার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কিন্তু মুসলমানকে দিয়ে এ সত্য নারায়ণের পূজা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তাই হিন্দু মুসলমানের বিভেদ মিটাবার মহান (?) উদ্দেশ্যে সুলতান হোসেন সত্যপীরের প্রতিষ্ঠা ও তাঁর পূজা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে সত্যপীরের দরগাহ প্রতিষ্ঠা, সত্যপীরের নামে মানৎ ও শির্নি বিতরণ, ঢাক-ঢোলের বাদ্য-বাজনাসহ সত্যপীরের দরগায় অনুষ্ঠানাদি পালন প্রকৃতপক্ষে সত্যনারায়ণ পূজারই মুসলিম সংস্করণ যার প্রবর্তক ছিলেন হোসেন শাহ। এসব কারণেই হোসেন শাহকে অবতার বলে মান্য করে হিন্দু সমাজ।

নৃপতি হসেন শাহ হয়ে মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি।।
অস্ত্রশস্ত্রে সুপন্ডিত মহিমা অপার।

কলিকালে হবু যেন কৃষ্ণ অবতার।।

('বংগভাষা ও সাহিত্য' দীনেশ চন্দ্র সেন)।

দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'বংগভাষা ও সাহিত্যে' বলেন ঃ

"কবীন্দ্র পরমেশ্বর ইঁহাকে (হোসেন শাহ) কৃষ্ণের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।. . . চৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবতে দৃষ্ট হয়, তিনি চৈতন্যপ্রভুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।. . . যে গুণে আকবর ভারত ইতিহাসের কণ্ঠে কণ্ঠহার হইয়া আছেন, সেই গুণে হোসেন শাহ বংগের ইতিহাসে উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া গণ্য হইবেন।"

হিন্দুদের সাধারণ ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের অবতার। অথবা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এজন্যে তাঁর ভক্তবৃন্দ অতি মারাত্মকভাবে কৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ধর্মের নামে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের মধ্যে যে অতি জঘন্য ধরনের যৌন অনাচার চলে, তা পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের যৌন আবেদনমূলক প্রেমলীলার পরিপূর্ণ অনুকরণ। এসবের পূর্ণ বিবরণ বহু হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থে দেখা যায়। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে যৌন অনাচারের মাধ্যমে যে সর্বনাশটা হয়েছে তা হিন্দু সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ স্বীকার করেন। পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, বাংলার একজন শক্তিশালী মুসলিম শাসক হোসেন শাহের এ বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরাগের কারণে মুসলিম বাংলার লক্ষ লক্ষ লোকও এ সমস্ত নোংরা ও অশ্লীল আচার অনুষ্ঠানকে তাদের জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করে মুসলিম সমাজকে অভিশপ্ত ও অধঃপতিত করেছে। এভাবেই শ্রীচৈতন্য পাষন্ডি সংহারে পূর্ণ সফলতা অর্জন করেছেন বল্লে অত্যুক্তি হবে না।

এখানে আমরা রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের উক্তির পুনরাবৃত্তি করে তার মধ্যে কিছু সংশোধনীসহ বলতে চাই—

'দনুজমর্দন দেব-গণেশ যাহা করিতে পারেন নাই, আর্যাবর্তের কোনও হিন্দু রাজা যাহা করিতে পারেন নাই তাহাই সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া সুলতান হোসেন শাহের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে।"

এত আলোচনার পর এখন হোসেন শাহের বংশ ও জাতিধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ অধিকতর ঘনীভূত হচ্ছে। হতে পারে যে, হোসেন শাহ আদৌ মুসলমান ছিলেন না। একজন সাইয়েদ বংশীয় মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিয়ে মুসলমানদের ভক্তি

শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে প্রতারণার মাধ্যমে ক্রমশঃ উচ্চতম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। অথবা বাংলারই অজ্ঞাত কুলশীল হিন্দু অথবা মুসলমান কোন নিরাশ্রয় বালককে মুর্শিদাবাদের চাঁদপাড়া গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ আশ্রয় দান করে রাখালের কাজে নিযুক্ত করেন। উক্ত ব্রাহ্মণ এ বালকের মধ্যে এক বিরাট প্রতিভা দেখতে পান এবং 'পাষন্ডি সংহার নিমিত্ত' তাঁকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মুজাফ্ফর শাহের দরবারে অন্নসংস্থানের অজুহাতে প্রেরণ করেন। এখানেই সাইয়েদ ও মক্কী বলে তাঁর পরিচয় দেয়া হয়। মুজাফ্ফর শাহের অনুগ্রহে তাঁর ভাগ্যের দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়। তাঁর গোটা জীবন, তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের পরস্পর বিরোধী বিবরণ, তাঁর পরবর্তীকালের ধর্মবিশ্বাস, কার্যকলাপ ও আচার-আচরণ, অসংখ্য প্রতিভাবান মুসলমান হত্যা করে হিন্দু ও বৈষ্ণব সমাজের লোকদের দ্বারা তাঁর মন্ত্রীসভা ও রাজদরবারের শোভাবর্ধন, প্রভৃতি লক্ষ্য করার পর তাঁর জাতিধর্ম সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণা পোষণ করলে কি ভুল হবে?

মোটকথা, হোসেন শাহ মুসলমানই হন, আর যা-ই হন, অসংখ্য অগণিত মুসলমান সৈন্য, আমীর ওমরা ও সম্রান্ত মুসলমানদের হত্যার পর শক্তিশালী হিন্দু সামন্ত প্রভুদের তুষ্টি সাধন করে মুসলিম সমাজের কোন্ সর্বনাশটা করেছেন, তা চিন্তা করার অবকাশ তাঁর ছিল কোথায়? ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কালে এমনি এক একজন মুসলমানকে কাষ্ঠপুত্তলিকা সাজিয়ে ইসলাম বৈরীগণ তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ করেছেন। সেজন্যে অমুসলিম ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণকে আমরা হোসেন শাহের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেখতে পাই।

তাঁর আমলে বাংলা ভাষার মাধ্যমে হিন্দু জাতির রেনেসাঁ আন্দোলন জোরদার হয়েছিল। বাংলা গ্রন্থ প্রণেতা মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত এবং যশোরাজ খান তাঁদের সাহিত্যে হোসেন শাহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাসহ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। মালাধর বসু ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ বাংলায় অনুবাদ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বিষয়ক 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নামক একখানি বাংলা মহাকাব্য রচনা করেন। হোসেন প্রীত হয়ে তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বলেন—

"নির্গুণ অধম মুক্রি নাহি কোন ধাম
গৌড়েশ্বর দিল নাম গুণরাজ খান।"

মালাধর বসুর ভ্রাতা গোপীনাথ বসু ওরফে পুরন্দর খান শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা

বিষয়ে কৃষ্ণমংগল নামক একখানি মহাকাব্য রচনা করেন। ব্রাহ্মণ বিপ্রদাস মনসামংগল কাব্য রচনা করেন। পরাগল খাঁকে হোসেন শাহ চট্টগ্রামে বিরাট ভূসম্পত্তি দান করেন।

এসব গ্রন্থাদি ও মহাকাব্য রচনায় হোসেন শাহ ও তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের সাহায্য সহযোগিতা ছিল বলে মুসলিম সমাজে তার বিরাট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

উপরে বর্ণিত বিপ্রদাস রচিত মনসামংগল কাব্য মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করে যে পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে মনসাপূজা প্রচলিত হয়। পাঠকগণের অবগতির জন্যে মওলানা আকরাম খাঁ'র গ্রন্থের কিঞ্চিৎ এখানে সন্নিবেশিত করছি।

"মহাভারত ও দেবী ভাগবতে আমরা মনসার আংশিক বিবরণ দেখিতে পাই। তাহার জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও আমরা তাহাকে শিবের কন্যা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ভাষার শালীনতা রক্ষা করিয়া মনসার কাহিনী বর্ণনা করা সম্ভব নহে। মোদ্দাকথা, জন্মের পর মুহূর্তেই তিনি পরিপূর্ণ যৌবনবতী হইয়া উঠেন এবং শিব বা মহাদেব তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া যান। শিবের পত্নী চণ্ডী বা দুর্গা যে কারণেই হউক তাঁহাকে দেখা মাত্র আক্রোশে ফাটিয়া পড়েন। ফলে দুই দেবীর মধ্যে যে সংঘর্ষ বাধে তাহাতে মনসা তাঁহার একটি চক্ষু হারান। মনসা দুর্গার প্রতি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। শিবও তাঁহার রোষ হইতে বাদ পড়িলেন না। (সাপ নাচানো বর্ণনা এখানে আমরা বাদ দিতেছি- মনসা কিন্তু সাপের দেবী হিসাবে পূজিত হন)। মনসা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাঁহার এই অপমানের প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবেন না। তাঁহার সহচরী নেত্রবতীর সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি শিব ও দুর্গা-ভক্তদের মনসা পূজায় বাধ্য করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। এই উদ্দেশ্য লইয়া বাংলাদেশে তিনি এক বিশেষ রূপে আবির্ভূত হইলেন এবং অতি অনায়াসে ধীরে ধীরে রাখাল, জেলে ও গরীব মুসলমানদের তাহার পূজায় প্রবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন। (বাংলা সাহিত্যের কথা-১৬ পৃষ্ঠা)

চাঁদ সওদাগরের স্ত্রী একজন মনসাভক্ত নারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী কোনক্রমেই মনসার পূজা করিতে রাজী হইলেন না। রাগান্বিত হইয়া মনসা তাঁহাকে নানা বিপদ ও ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে ফেলিতে লাগিলেন। কিন্তু সাতটি সন্তান ও প্রচুর ধনসম্পদসহ তাঁহার সমুদয় জাহাজ সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও

সওদাগর নিজের মতে অটল রহিলেন। অবশেষে কঠোর সতর্কতা সত্ত্বেও তাঁহার একমাত্র জীবিত পুত্র লখিন্দর সর্পাঘাতে নিহত হয় এবং লখিন্দরের স্ত্রী বেহুলা তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও মনসার দয়ায় তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম হয়। চাঁদ সওদাগরের হারানো সকল পুত্র ও ধনৈশ্বর্য পুনরায় তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এই মনসা পূজা এবং ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বেহুলার ভাসান বিংশতি শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত যশোহর, খুলনা ও চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।" (মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস-পৃঃ ৭৮-৭৯)

শুধু দক্ষিণ বংগেরই নয় বাংলার প্রায় সকল অঞ্চলের একশ্রেণীর মুসলমান উপরোক্ত শির্ক ও কুফরী ধারণা পোষণ করে গ্রামে গ্রামে বেহুলার ভাসান বা ভাসান যাত্রা উৎসাহ উদ্যম সহকারে অনুষ্ঠিত করতো।

এখন আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই যে, হোসেন শাহ ও তাঁর বংশধরগণের সাহায্যে কিভাবে পৌত্তলিকতার বিষবাষ্প মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সংক্রমিত করেছিল। যার ফলে পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতিকে এক ও অভিন্ন করার হাস্যকর প্রচেষ্টা চলেছে।

হোসেন শাহী বংশ
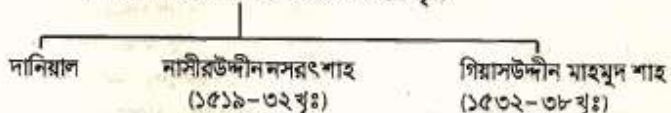
বাংলার ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম হোসেন শাহী আমলেই মুসলমানদের আচার-আচরণ ও ধর্ম বিশ্বাসে পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব সমাজের বিরাট প্রভাব যে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস কলুষিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। হোসেন শাহ কর্তৃক লক্ষ লক্ষ সম্ভ্রান্ত মুসলমান আমীর-ওমরা, ধার্মিক ও পীর-অলী নিহত হওয়ায় এবং হোসেন শাহের স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার কারণে মুসলিম সমাজে পৌত্তলিক ভাবধারার অনুপ্রবেশ সহজতর হয়েছিল।

এম আর তরফদার তাঁর Husain Shahi Bengal গ্রন্থে বলেন : ....
"Some of the influential Muslims used to worship the snake goddess, Manasa, out of fear for snake bite. It is probably the result of the Hindu influence on the Muslims. Nasrat Shah constructed a building in order to preserve therein the Qadam Rasul or the footprint of the Prophet. But the preservation of the Prophet's footprint does not find support in Orthodox Islam . . ." (Husain Shahi Bengal, M.R. Tarafdar, p. 164, 166, 167, 89-91)

"কোন কোন প্রভাবশালী মুসলমান মনসা দেবীর পূজা করতো সর্পদংশনের ভয়ে। এ ছিল সম্ভবতঃ মুসলমানদের উপর হিন্দু প্রভাবের ফল। নসরৎ শাহ (হোসেন শাহের পুত্র) কদম রসূল বা নবীর পদচিহ্ন রক্ষণের জন্যে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করেন। নবীর পদচিহ্নের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সত্যিকার ইসলাম সমর্থন করেনা।"

ডাঃ জেমস্ ওয়াইজ বলেন, গয়ার ব্রাহ্মণগণ তীর্থ যাত্রীদেরকে বিষ্ণুপদ (বিষ্ণুর পদচিহ্ন) দেখিয়ে প্রচুর রোজগার করে। তাদের অনুকরণে মুসলমান সমাজে কদম রসূলের পূজার প্রচলন শুরু হয় হোসেন শাহী বাংলায়।

হোসেন শাহী বংশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বাংলার শাসন পরিচালন করার পর আর তাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। তারপর শের শাহ, সুর ও কররাণী বংশ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত থাকে। অতঃপর দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে নিযুক্ত গভর্ণরগণ বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। তবে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর কর্তৃক মানসিংহ দ্বিতীয়বারের জন্যে বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শান্তির সঙ্গে বাংলায় শাসনকার্য পরিচালনা সম্ভব হয়নি। বাংলার মোগল আধিপত্য বার বার প্রতিহত ও বিপন্ন হয়। মানসিংহের পর জাহাঙ্গীর কুতুবউদ্দীন খান কোকাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর কুলী খান এবং ১৬৩৯ সাল পর্যন্ত আরও নয়জন বাংলার সুবাদার গভর্ণর হিসাবে শাসন পরিচালনা করেন। ১৬৩৯ সালে যুবরাজ সুজা বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ার পর সর্বপ্রথম ইংরেজগণ ব্যবসায়ীর বেশে বাংলায় আগমন করে এবং ১৭৫৭ সালে

তারা চিরতরে মুসলিম শাসনের মূলোৎপাটন করে বাংলা বিহারের হর্তাকর্তা বিধাতা হয়ে পড়ে।

যুবরাজ মুহাম্মদ সুজার পর ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত যাঁরা বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা হলেন :

যুবরাজ মুহাম্মদ সুজা—১৬৩৯-৬০ খৃঃ
মুয়াজ্জাম খান মীর জুমলা—১৬৬০-৬৩ খৃঃ
দিলির খান-দাউদ খান—১৬৬৩-৬৪খৃঃ
শায়েস্তা খান (মুমতাজ মহলের ভ্রাতা)—১৬৬৪-৭৮ খৃঃ
ফিদা খান আজম খান কোকা—১৬৭৮ খৃঃ
যুবরাজ মুহাম্মদ আজম—১৬৭৮-৭৯ খৃঃ
শায়েস্তা খান—১৬৭৯-৮৮ খৃঃ
খানে জাহান—১৬৮৮-৮৯খৃঃ
ইব্রাহিম খান—১৬৮৯-৯৮ খৃঃ
যুবরাজ আজীম উদ্দীন—১৬৯৮-১৭১৭খৃঃ
মুর্শিদ কুলী খান—১৭১৭-২৭খৃঃ
সুজাউদ্দীন মুহাম্মদ খান—১৭২৭-৩৯ খৃঃ
সরফরাজ খান—১৭৩৯-৪০খৃঃ
আলীবর্দী খান—১৭৪০-৫৬খৃঃ
সিরাজদ্দৌলা—১৭৫৬-৫৭খৃঃ

তৃতীয় অধ্যায়

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলায় আগমন

যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ইংরেজগণ শতাধিক বৎসরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাধ্য সাধনায় ব্যবসায়ী থেকে শাসকে পরিণত হয়েছিল, সাড়ে পাঁচশত বৎসরব্যাপী প্রতিষ্ঠিত মুসলিম শাসনের মূলোৎপাটন করে এ দেশবাসীকে গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ করেছিল, তাদের এ দেশে আগমন ও পরবর্তী কার্যকলাপ আমাদের ভালো করে জেনে রাখা দরকার।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১৫৯৯ খৃঃ) কতিপয় ব্যবসায়ীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জন্ম হয়। রাণী এলিজাবেথের অনুমোদনক্রমে তারা ভারতের সাথে ব্যবসা শুরু করে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট থেকে সনদ লাভ করে এ কোম্পানী সর্বপ্রথম সুরাট বন্দরে তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে।

প্রথম প্রথম তাদেরকে খুব ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে চলতে হয় বলে ব্যবসা বাণিজ্যে বেশী সুবিধা করতে পারে না। ১৬৪৪ সালে বাদশাহ শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে তাঁর কন্যা আগুনে দগ্ধীভূত হয়। তার চিকিৎসার জন্যে সুরাটের ইংরেজ–কুঠির অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রেরিত সুদক্ষ সার্জন ডাঃ গ্যাব্রিল বাউটন তাকে নিরাময় করেন। তাঁর প্রতি বাদশাহ শাহজাহান অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং বাউটনের অনুরোধে ইংরেজ বণিকগণ বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। ১৬৪৪ সালে তারা যখন বাদশাহর ফরমানসহ বাংলায় উপস্থিত হয়, তখন বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন যুবরাজ মুহাম্মদ শাহসুজা।

কোম্পানীর পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, শাহ সুজার পরিবারের জনৈক সদস্যের চিকিৎসার ভার ডাঃ বাউটনের উপর অর্পিত হয় এবং এখানেও তিনি চিকিৎসায় সুনাম অর্জন করেন। অতএব শাহ সুজা মাত্র তিন হাজার টাকা সালামীর বিনিময়ে ইংরেজদেরকে বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ দান করেন। বাদশাহ শাহজাহান ও তদীয় পুত্র ইংরেজদের প্রতি যে চরম উদারতা প্রদর্শন

করেছিলেন সেই উদারতা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনকে অকৃতজ্ঞ ইংরেজ বণিকগণ পরবর্তীকালে মোগল সাম্রাজ্যের ও বাংলা বিহারের স্বাধীনতার মৃত্যুপরোয়ানা হিসাবে ব্যবহার করে।

শাহ সুজার ফরমানবলে ইংরেজ বণিকগণ হুগলীতে তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে এবং পাটনায় এজেন্সি স্থাপন করে।

মীর জুমলা থেকে সিরাজদ্দৌলা

শাহ সুজার পর আওরংজেবের সেনাপতি মীর জুমলা বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। বিচক্ষণ মীর জুমলা ইংরেজদের গতিবিধির প্রতি তিক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। একবার পাটনা থেকে হুগলীগামী কয়েকখানি মাল বোঝাই নৌকা মীর জুমলা আটক করেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হুগলীর ইংরেজ কুঠিয়াল জনৈক মুসলমানের মাল বোঝাই নৌকা আটক করে পণ্যদ্রব্যাদি হস্তগত করে। তার এ ঔদ্ধত্যের জন্যে মীর জুমলা হুগলীর কুঠি অধিকার করার আদেশ জারী করেন। কুঠিয়াল বেগতিক দেখে আটক নৌকা ও মালপত্র মালিককে ফেরৎ দিয়ে মীর জুমলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

নবাব শায়েস্তা খান

মীর জুমলার পর শায়েস্তা খান বাংলার নবাব সুবাদার পদে নিযুক্ত হন। শায়েস্তা খানের জন্যে ইংরেজগণ সর্বত্র সন্ত্রস্ত থাকতো। তাদের ঔদ্ধত্যের জন্যে শায়েস্তা খান পূর্ববর্তী ফরমানগুলি বাতিল করে দেন। তারা তাদের আচরণের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হলে এবং সততার সাথে ব্যবসা করার প্রতিশ্রুতি দিলে পূর্বতন ফরমানগুলি পুনর্বহাল করা হয়। অতঃপর শায়েস্তা খান বাংলা ত্যাগ করেন।

ফিদা খান ও যুবরাজ মুহাম্মদ আজম

শায়েস্তা খানের পর ফিদা খান ও সম্রাট আওরংজেবের পুত্র যুবরাজ মুহাম্মদ আজম পর পর বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৭৮ সালে মুহাম্মদ আজম সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পর কোম্পানী তাদের হীনস্বার্থ সিদ্ধির জন্যে মুহাম্মদ আজমকে একুশ হাজার টাকা ঘুষ প্রদান করে। সম্রাট আওরংজেব তা জানতে

পেরে তাকে পদচ্যুত করে পুনরায় শায়েস্তা খানকে বাংলায় প্রেরণ করেন। এ সময়ে ইংরেজদের ঔদ্ধত্য চরমে পৌঁছে। আকবর নামক জনৈক ব্যক্তি সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং ইংরেজগণ তাকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। শায়েস্তা খান এ ষড়যন্ত্র জানতে পেরে পাটনা কুঠির অধিনায়ক মিঃ পিককে কারারুদ্ধ করেন। কোম্পানীর ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় লন্ডন থেকে ক্যাপ্টেন নিকলসনের নেতৃত্বে কয়েকখানি যুদ্ধ জাহাজ ভারতে প্রেরণ করা হয় এবং চট্টগ্রাম অধিকারের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু ক্যাপ্টেন নিকলসন বিফল মনোরথ হন। ইংরেজদের এহেন দুরভিসন্ধির জন্যে নবাব শায়েস্তা খান তাদেরকে সুতানটি থেকে বিতাড়িত করেন। ১৬৮৭ সালে কাশিমবাজার কুঠির প্রধান জব চার্ণক নবাব প্রদত্ত সকল শর্ত স্বীকার করে নিলে পুনরায় তাদেরকে ব্যবসার অনুমতি দেয়া হয়। নবাব কর্তৃক প্রদত্ত শর্তগুলি জব চার্ণক কর্তৃক মেনে নেয়ার কথা ইংলন্ডে পৌঁছলে কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ এটাকে অবমাননাকর মনে করে। অতঃপর তারা ক্যাপ্টেন হীথ্ নামক একজন দুর্দান্ত নাবিকের পরিচালনাধীনে 'ডিফেন্স' নামক একটি রণতরী বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে ভারতে প্রেরণ করে। হীথ্ সুতানটি পৌঁছে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর লোকজনসহ বালেশ্বর গমন করে। এখানে তারা জনগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে এবং তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। অতঃপর হীথ্ বালেশ্বর থেকে চট্টগ্রাম গমন করে আরাকান রাজের সাহায্য প্রার্থনা করে। এখানেও সে ব্যর্থ হয় এবং নিরাশ হয়ে মাদ্রাজ চলে যায়। তাদের এসব দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র জানতে পেরে বাদশাহ আওরংজেব ইংরেজদের মসলিপট্টম ও ভিজেগাপট্টমের বাণিজ্য কুঠিসমূহ বাজেয়াপ্ত করেন। এভাবে কোম্পানী তাদের দুষ্কৃতির জন্যে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

সুবাদার ইব্রাহীম খান

শায়েস্তা খানের পর অল্পদিনের জন্যে খানে জাহান বাংলার সুবাদার হন এবং ১৬৮৯ সালে ইব্রাহীম খান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন। এ দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারকল্পে কোম্পানীর বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হয়। অতঃপর উড়িষ্যার বন্দী ইংরেজদেরকে মুক্তিদান করে জব চার্ণককে পুনরায় বাংলায় বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়। জব চার্ণক পলায়ন করে মাদ্রাজ

অবস্থান করছিল। ধূর্ত জব চার্ণক অনুমতি পাওয়া মাত্র ১৬৯১ সালে ইংরেজ বণিকদেরকে নিয়ে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করে এবং কোলকাতা নগরীর পত্তন করে নিজেদেরকে এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যে, এর সুদূরপ্রসারী ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজগণ বাংলা তথা সমগ্র ভারতভূমিতে তাদের আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদ অক্ষুণ্ন রাখে।

এ সময়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়। কনস্টান্টিনোপলের শায়খুল ইসলাম বাদশাহ আওরংজেবকে জানান যে, ইংরেজরা ভারত থেকে যে বিপুল পরিমাণ যবক্ষার সংগ্রহ করে তা ইউরোপে রপ্তানী করা হয় এবং তাই দিয়ে গোলাবারুদ তৈরী করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। আওরংজেব যবক্ষার ক্রয় নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু গোপনে তারা যবক্ষার পাচার করতে থাকে। অতঃপর ইউরোপীয়দের সাথে ব্যবসা নিষিদ্ধ করে বাদশাহ আওরংজেব এক ফরমান জারী করেন। হুগলী কুঠির অধ্যক্ষ বাংলার সুবাদারের কৃপাপ্রার্থী হলে তিনি এ নিষেধাজ্ঞার কঠোরতা হ্রাস করে দেন।

সুবাদার আজিমুশ্শান

ইব্রাহীম খানের অযোগ্যতার কারণে সম্রাট আওরংজেব তাঁর স্থলে স্বীয় পৌত্র আজিমুশ্শানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন।

আজিমুশ্শান ছিলেন অত্যন্ত আরামপ্রিয় ও অর্থলোভী। তার সুযোগে ইংরেজগণ তাঁকে প্রভূত পরিমাণে উপঢৌকনাদি নজর দিয়ে সুতানটি বাণিজ্যকুঠি সুরক্ষিত করার অনুমতি লাভ করে। তারপর পুনরায় ষোল হাজার টাকা নজরানা ও মূল্যবান উপহারাদি দিয়ে সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রাম তিনটি লাভ করে।

১৭০৭ সালে আওরংজেবের মৃত্যুর পর আজিমুশ্শানের পিতা বাহাদুর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফলে পুনরায় আজিমুশ্শান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন। অযোগ্য, অকর্মণ্য ও আরামপ্রিয় সুবাদারকে রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে মুর্শিদ কুলী খানকে দেওয়ান নিযুক্ত করে বাংলায় পাঠানো হয়।

মুর্শিদ কুলী খান

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে ফরোখশিয়ার কর্তৃক আজিমুশ্‌শান নিহত হন এবং ফরোখশিয়ার মুর্শিদ কুলী খানকেই বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। মুর্শিদ কুলী খান ইংরেজদের হাতের পুতুল সাজার অথবা অর্থদ্বারা বশীভূত হবার পাত্র ছিলেন না। অতএব তাঁর কাছ থেকে অবৈধ সুযোগ সুবিধা লাভে ইংরেজগণ ব্যর্থ হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা সম্রাটের নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে হ্যামিল্টন নামে একজন সুদক্ষ চিকিৎসক ছিল। বাংলার সুবাদার ছিলেন ইংরেজদের প্রতি বিরাগভাজন। তাঁর মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে সম্রাট ছিলেন নারাজ। কিন্তু এখানে একটি প্রেমঘটিত নাটকের সূত্রপাত হয় যার ফলে ইংরেজদের ভাগ্য হয় অত্যন্ত সুপ্রসন্ন।

উদয়পুরের মহারাণা অজিৎ সিংহের এক পরম রূপসী কন্যার প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন যুবক সম্রাট ফরোখশিয়ার। বিবাহ স্থিরীকৃত হওয়ার পর হঠাৎ তিনি ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হন। বিবাহ অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত হয়ে যায়। কোন চিকিৎসায়ই কোন ফল হয় না। অবশেষে সম্রাট হ্যামিল্টনের চিকিৎসাধীন হন। তাঁর চিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের পর মহারাণার কন্যার সাথে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

প্রিয়তমাকে লাভ করার পর সম্রাট ফরোখশিয়ার ডাঃ হ্যামিল্টনের প্রতি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং ইংরেজ বণিকদিগকে কোলকাতার দক্ষিণে হুগলী নদীর উভয় তীরবর্তী আটত্রিশটি গ্রাম দান করেন। তার নামমাত্র বার্ষিক খাজনা নির্ধারিত হয় মাত্র আট হাজার একশ' একুশ টাকা। সম্রাটের নিকটে এতকিছু লাভ করার পরও মুর্শিদ কুলী খানের ভয়ে তারা বিশেষ কোন সুবিধা করতে পারেনি।

সুজাউদ্দীন

১৭২৫ সালে মুর্শিদ কূলীর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারের পদ অলংকৃত করেন। তাঁর আমলে ইংরেজরা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি করে এবং তাদের ঔদ্ধত্যও বহুগুণে বেড়ে যায়। হুগলীর ফৌজদার একবার ন্যায়সংগত কারণে ইংরেজদের একটি মাল বোঝাই নৌকা

আটক করেন। একথা জানতে পেরে ইংরেজরা একদল সৈন্য পাঠিয়ে প্রহরীদের কাছ থেকে নৌকা কেড়ে নিয়ে যায়। তাদের এ ঔদ্ধত্যের জন্যে সুবাদার তাদেরকে শাস্তিদানের কথা চিন্তা করছিলেন। কোম্পানীর ধূর্ত কুঠিয়াল তা জানতে পেরে তাড়াতাড়ি অপরাধ স্বীকার করে মোটা রকমের জরিমানা দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। এভাবে তারা রক্ষা পায়।

সরফরাজ খান

সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খান সুবাদার নিযুক্ত হন। নাদির শাহের ভারত আক্রমণ তাঁর সময়ে হয়েছিল।

আলীবর্দী খান

সরফরাজ খান ছিলেন অযোগ্য ও দুর্বলচিত্ত। তাঁর সেনাপতি আলীবর্দী খানের সংগে সংঘর্ষে নিহত হন এবং আলীবর্দী খান ১৭৪১ সালে বাংলার সুবাদার হন।

আলীবর্দী খানের সময় বার বার বাংলার উপর আক্রমণ চলে বর্গী দস্যুদের। তাদের দৌরাত্ম্য থেকে দেশকে রক্ষার জন্যে তিনি কয়েকবার ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থ আদায় করেন। দেশের আর্থিক উন্নতিকল্পে তিনি ব্যবসা বাণিজ্যে উৎসাহ দান করতেন।

বহু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও বর্গীদস্যুরা একবার প্রবেশ করে লুঠতরাজ ও হত্যাকান্ড চালায়। জলপথে আগমনকারী বর্গীদস্যুদের দমন করার জন্যে আলীবর্দী খান ইংরেজদের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজনবোধ করছিলেন। কারণ নৌশক্তি বলতে বাংলার কিছুই ছিলনা। পক্ষান্তরে ইংরেজদের ছিল শক্তিশালী নৌবহর। আলীবর্দীর প্রধান সেনাপতি একবার ইংরেজদের মতো ক্রমবর্ধমান এক অশুভ শক্তিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার পরামর্শ দেন। তদুত্তরে বৃদ্ধ আলীবর্দী বলেন যে, একদিকে বর্গীরা স্থলপথে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। আবার ইংরেজদের ক্ষুব্ধ করলে তারা সমুদ্রপথে আগুন জ্বালাবে যা নির্বাপিত করার ক্ষমতা বাংলার নেই। আলীবর্দীর বার্ধক্য এবং পরিস্থিতির নাজুকতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা পাকাপোক্ত হয়ে বসে এ দেশে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যার পরিসমাপ্তি ঘটে পনেরো বৎসর পরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে।

সিরাজদ্দৌলা

সতেরোশত ছাপ্পান্ন খৃষ্টাব্দে সুদীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকার পর আলীবর্দী মৃত্যুবরণ করেন এবং সিরাজদ্দৌলা তাঁর উত্তরাধিকারী হন। তাঁর সিংহাসন অরোহণের পর আলীবর্দী–কন্যা ঘেসেটি বেগম ও তাঁর অপর দৌহিত্র পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জং–এর সকল ষড়যন্ত্র তিনি দক্ষতার সাথে বানচাল করে দেন। আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন আরোহণ করার সাথে সাথেই ঘেসেটি বেগম বিশ হাজার সৈন্যকে তাঁর দলে ভিড়াতে সক্ষম হন এবং মুর্শিদাবাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। সিরাজদ্দৌলা ক্ষিপ্রতার সাথে ঘেসেটি বেগমের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন ও বেগমকে রাজপ্রাসাদে বন্দী করেন। অপরদিকে শওকত জং নিজেকে বাংলার সুবাদার বলে ঘোষণা করলে যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলা কর্তৃক নিহত হন।

ঘেসেটি বেগম ও শওকত জং–এর বিদ্রোহে নওয়াজেশ মুহাম্মদের দেওয়ান রাজবল্লভ ইন্ধন যোগাচ্ছিল। সিরাজদ্দৌলা তা জানতে পেরে রাজবল্লভের কাছে হিসাবপত্র তলব করেন। ঢাকার শাসনকর্তা নওয়াজেশ মুহাম্মদের অধীনে দেওয়ান হিসাবে রাজস্ব আদায়ের ভার তার উপরে ছিল। আদায়কৃত বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেছিল বলে হিসাব দিতে অপারগ হওয়ায় নবাব সিরাজদ্দৌলা রাজবল্লভের ঢাকাস্থ ধনসম্পদ আটক করার আদেশ জারী করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ আদায়কৃত রাজস্ব ও অবৈধভাবে অর্জিত যাবতীয় ধনসম্পদসহ গঙ্গাস্নানের ভান করে পালিয়ে গিয়ে ১৭৫৬ সালে কোলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়গ্রহণ করে। সিরাজদ্দৌলা ধনরত্নসহ পলাতক কৃষ্ণবল্লভকে তাঁর হাতে অর্পণ করার জন্যে কোলকাতার গভর্ণর মিঃ ড্রেককে আদেশ করেন। ভারতের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ধনকুবের ও রাজ্যের মধ্যে অতি প্রভাবশালী হিন্দুপ্রধান মাহতাব চাঁদ প্রমুখ অন্যান্য হিন্দু বণিক ও বেনিয়াদের পরামর্শে ড্রেক সিরাজদ্দৌলার আদেশ পালন করতে অস্বীকার করে। তারপর অকৃতজ্ঞ ক্ষমতালিপ্সু ইংরেজগণ ও তাদের দালাল হিন্দু প্রধানগণ সিরাজদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করে চিরদিনের জন্যে মুসলিম শাসন বিলুপ্ত করার যে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করে তা চূড়ান্তভাবে কার্যকর হয়— পলাশীর ময়দানে। পলাশীর যুদ্ধ, তার পটভূমি ও সিরাজদ্দৌলার পতন সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা দরকার তৎকালে বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা কি ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলার মুসলিম শাসন বিলুপ্তির পশ্চাৎ পটভূমি

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর ভারতীয় মুসলমানদের জীবনে নেমে এসেছিল চরম দুর্যোগ। নামেমাত্র একটি কেন্দ্রীয় শাসন দিল্লীতে অবশিষ্ট থাকলেও তা ছিল অত্যন্ত দুর্বল যার সুযোগে বিভিন্ন স্থানে মুসলমান শাসকগণ একপ্রকার স্বাধীনতা ভোগ করছিলেন। তাঁরা তাঁদের এ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনসাধারণ, জমিদার–জায়গীরদার ও ধনিক–বণিক শ্রেণীর সন্তুষ্টি সাধনের আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ফলে তাঁরা হয়ে পড়েছিলেন স্বভাবতঃই হীনমন্যতার শিকার। সুযোগ সন্ধানী বিজিত জাতি এ সুযোগে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ও তামাদ্দুনিক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের সাহস পায়। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ, প্রচার ও প্রসার, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন, বৈষ্ণব সমাজের নোংরা, অশ্লীল ও যৌন উত্তেজনামূলক ক্রিয়াকলাপ মুসলমান সমাজকে অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত করে দেয়। শত্রুকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করার উপায় না থাকলে তার ধর্মবিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারলে তাকে সহজেই পরাজিত করা যায়। ভারতের এবং বিশেষ করে বাংলার সুচতুর হিন্দুজাতি তাদের কয়েক শতাব্দীর পুঞ্জিভূত বিক্ষোভের প্রতিশোধ এভাবেই নিয়েছে। উপরন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে তারা মুসলিম জাতির অধঃপতন ত্বরান্বিত করে তাদের স্বার্থ সাধনের জন্যে তাদেরই একান্ত মনঃপূত নামধারী একজন মুসলমানকে নির্বাচন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। এই কাষ্ঠপুত্তলিকার দ্বারা তারা তাদের স্বার্থ ষোলআনা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। তার সাথে ইসলামী ঈমান আকীদাহর মধ্যে কুফর ও পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ এবং মুসলিম সংস্কৃতির উপর হিন্দুজাতির প্রাধান্য মুসলমানদেরকে তাদের মানসিক গোলামে পরিণত করেছে। তার অতি স্বাভাবিক পরিণাম যা হবার তাই হয়েছে।

ডঃ এ, আর, মল্লিক তাঁর গ্রন্থে মন্তব্য করেন ঃ

"This long years of association with a non-Muslim people

who far outnumbered them, cut off from original home of Islam, and living with half converts from Hinduism, the Muslims had greatly deviated from the original faith and had become Indianised. This deviation from the faith apart, the Indian Muslims in adopting the caste system of the Hindus, had given a disastrous blow to the Islamic conception of brotherhood and equality in which their strength had rested in the past and presented thus in the 19th century the picture of a disrupted society, degenerate and weakened by division and sub-division to a degree, it seemed, beyond the possibility of repair. No wonder, Sir Mohammad Iqbal said, surely we have out-Hindued the Hindu himself,—we are suffering from a double caste system—religious caste system, sectarian and social caste system—which we have either learned or inherited from the Hindus. This is one of the quiet ways in which the conquered nation revenged themselves on their conquerors." (British Policy and the Muslims in Bengal— A. R. Mallick)

—"মুসলমানগণ ইসলামের মূল উৎসকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের আধা ধর্মান্তরিত মুসলমানসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমানদের সাথে বহু বৎসর যাবত একত্রে বসবাস করে মূল ধর্মবিশ্বাস থেকে সরে পড়েছিল এবং হয়ে পড়েছিল ভারতীয়। অধিকন্তু এই ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দুদের বর্ণপ্রথা অবলম্বন করে— অতীতে যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের মধ্যে তাদের শক্তি নিহিত ছিল— তার প্রতি চরম আঘাত হানে। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তারা বহু ভাগে বিভক্ত, ছিন্নভিন্ন ও অধঃপতিত জাতি হিসাবে চিত্রিত হয়, যার সংশোধনের কোন উপায় থাকে না। তাই স্যার মুহাম্মদ ইকবালের এ উক্তিতে বিস্ময়ের কিছু নেই : নিশ্চিতরূপে আমরা হিন্দুদেরকে ছাড়িয়ে গেছি। আমরা দ্বিগুণ বর্ণপ্রথার রোগে আক্রান্ত—ধর্মীয় বর্ণপ্রথা, ফের্কা-উপফের্কা এবং সামাজিক বর্ণপ্রথা, যা আমরা শিক্ষা করেছি, অথবা হিন্দুদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। যেসব নীরব পন্থায় বিজিতগণ বিজেতাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকে, এ হলো তার একটি।"

এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে, বাংলা তথা ভারতের হিন্দুজাতি মুসলিম শাসন কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা মুসলিম সংহতি সমূলে ধ্বংস করার জন্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নীরবে কাজ করে গেছে। তাদের প্রচেষ্টায় তারা পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। মুসলমানদেরকে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে ও তাদের তাহ্‌জিব তামাদ্দুনে পৌত্তলিকতার কলুষ কালিমা লেপন করেছে। তাদেরকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত না করে হিন্দু ভাবাপন্ন মুসলমান বানিয়ে তাদের দ্বারা হিন্দুস্বার্থ চরিতার্থ করা যে অতিসহজ– এ তত্ত্বজ্ঞান তাদের ভালো করেই জানা ছিল এবং এ কাজে তারা সাফল্য অর্জন করেছে পুরাপুরি।

মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

বাংলার মুসলমানদের অধঃপতন কোন্ কোন্ পথে নেমে এসেছিল এবং রংগমঞ্চের অন্তরাল থেকে কোন্ অশুভ শক্তি ইন্ধন যোগাচ্ছিল, তা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে আমাদের জানতে হবে তৎকালে তাদের ধর্মবিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতি কতখানি বিকৃত হয়ে পড়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে বাংলার মুসলমানদের আকীদাহ্ বিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতিতে পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বাংলার শাসনকর্তা আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময় থেকে। হিন্দু রেনেসাঁ আন্দোলনের ধারক ও বাহকদের দ্বারা পরিপূর্ণ ও পরিবেষ্টিত মন্ত্রীসভার দ্বারা পরিচালিত হোসেন শাহ শ্রীচৈতন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত এ কথা সত্য হলে অতঃপর হোসেন শাহের তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস কতটুকু ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় বৈষ্ণববাদের প্রবল প্লাবন বাংলার মানব সমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানকে সহজেই আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছিল হিন্দু তান্ত্রিকদের অপরাধমূলক অশ্লীল ও জঘন্য সাধন পদ্ধতি, বামাচারীদের পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ যৌনধর্মী নোংরা আচার অনুষ্ঠান, বৈষ্ণবদের প্রেমলীলা প্রভৃতি। এসব আচার অনুষ্ঠান ও প্রেমলীলা হিন্দু সমাজের পবিত্রতা, রুচিবোধ ও নৈতিক অনুভূতি বহুলাংশে বিনষ্ট করলেও নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভংগের এ অস্ত্র দ্বারাই মুসলমানের ধর্ম ও তামাদ্দুনকে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে। মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে ঘুণ ধরিয়েছিল এ সময়ের মুসলিম নামধারী কবি-সাহিত্যিকগণ

যাদেরকে কাষ্ঠপুত্তলিকা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, বাংলা ভাষার উন্নয়নের নামে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু রেনেসাঁ আন্দোলনের ধ্বজাবাহীগণ। দ্বিতীয় যুগের হিন্দু কবিগণকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে এসব মুসলিম কবিগণ হিন্দু দেব-দেবীর স্তুতিমূলক কবিতা, পদাবলী ও সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়। তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা, যৌন আবেদনমূলক কীর্তন, মনসার ভাসান সংগীত, দুর্গা ও গঙ্গার স্তোত্র ও হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে বহু পুঁথিপুস্তক রচনা করে।

শেখ ফয়যুল্লাহ 'গোরক্ষ বিজয়' নামক একখানি মহাকাব্য রচনা করে বাংলার নাথ সম্প্রদায় ও কোলকাতা কালীমন্দির প্রতিষ্ঠাতা গোরক্ষ নাথ ও তার নাথ মতবাদের স্তুতি কীর্তন করে। জাফর খান অথবা দরাফ খান হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গাস্তোত্র রচনা করে- (বঙ্গাভাষা ও সাহিত্য : দীনেশ চন্দ্র সেন)। অনুরূপভাবে আবদুস শুকুর ও সৈয়দ সুলতান শৈব ও তান্ত্রিক মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে সাহিত্য রচনা করে। (গোলাম রসূল কর্তৃক প্রকাশিত শুকুর মাহমুদের পাঁচালি দ্রষ্টব্য)

কবি আলাউল ও মীর্জা হাফেজ যথাক্রমে শিব ও কালীর স্তবস্তুতি বর্ণনা করে কবিতা রচনা করে (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : দীনেশ চন্দ্র সেন)। সৈয়দ সুলতান নবী বংশের তালিকায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং কৃষ্ণকে সন্নিবেশিত করে— (ব্রিটিশ পলিসি ও বাংলার মুসলমান : এ আর মল্লিক)। হোসেন শাহের আমলে সত্য নারায়ণকে সত্যপীর নাম দিয়ে মুসলমানগণ পূজা শুরু করে। পূর্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোক্ত কবি-সাহিত্যিকগণের ধর্মমত ও জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে কিছু জানবার উপায় নেই। সাহিত্যক্ষেত্রে শুধু তাদের নাম পাওয়া যায়। হয়তো তারা ধর্মান্তরিত মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে মাত্র এবং পরিপূর্ণ হিন্দু পরিবেশে তাদের জীবন গড়ে উঠেছে। অথবা মুসলমান থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে হরিদাসের ন্যায় মুরতাদ হয়ে গেছে। তবে তাদের কবিতা, সাহিত্য, পাঁচালী, সংগীত প্রভৃতি তৎকালীন মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

পরবর্তীকালে ইসলাম-বৈরীগণ বাদশাহ আকবরকে তাদের অভীষ্ট সাধনে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। জয়পুরের রাজা বিহারীমলের সুন্দরী রূপসী কন্যা যোধবাই আকবরের মহিষী হিসাবে মোগল হারেমের শোভাবর্ধন করে। আকবরের একাধিক হিন্দু পত্নী ছিল বলে জানা যায়। তৎকালে হিন্দু রাজাগণ

আকবরের কাছে তাদের কন্যা সম্প্রদান করে তাঁকে তাঁদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। এসব হিন্দু পত্নীগণকে রাজপ্রাসাদের মধ্যে মূর্তিপূজা ও যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়। মুসলমান মোগল বাদশাহের শাহী মহল মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজার মন্দিরে পরিণত হয়। এভাবে আকবরের উপরে শুধু হিন্দু মহিষীগণই নয়, হিন্দু ধর্মেরও বিরাট প্রভাব পড়েছিল। এসব মহিষীর গর্ভে যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করে এহেন পরিবেশে জ্ঞানচক্ষু খুলেছে, পালিত-বর্ধিত হয়েছে, তাদের মনমানসিকতার উপরে পৌত্তলিকতার প্রত্যক্ষ প্রভাব কতখানি ছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়। এর স্বাভাবিক পরিণাম হিসাবে আমরা দেখতে পাই, হিন্দু মহিষীর গর্ভজাত সম্রাট জাহাঙ্গীর দেওয়ালী পূজা করতেন এবং শিবরাত্রিতে ব্রাহ্মণ পন্ডিত ও যোগীদেরকে তাঁর সাথে একত্রে নৈশভোজে নিমন্ত্রিত করতেন। তাঁর শাসনের অষ্টম বৎসরে আকবরের সমাধি সৌধ সেকেন্দ্রায় হিন্দু মতানুসারে পিতার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পালন করেন।

শাহজাহান পুত্র দারা শিকোহ্ তাঁর রচিত গ্রন্থ 'মাজমাউল বাহ্‌রাইনে' হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আলীবর্দী খানের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহামত জংগ এবং সাওলাত জং মতিঝিল রাজপ্রাসাদে সাতদিন ধরে হোলিপূজার অনুষ্ঠান পালন করেন। এ অনুষ্ঠানে আবির ও কুমকুম স্তূপীকৃত করা হয়। মীর জাফরও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ হোলির অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। কথিত আছে যে, মীর জাফর মৃত্যুকালে কীরিটেশ্বরী দেবীর পদোদক (মূর্তি ধোয়া পানি) পান করেন। ('ব্রিটিশ পলিসি ও বাংলার মুসলমান' : এ আর মল্লিক; 'মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস' : মওলানা আকরাম খাঁ)

হোলি বলতে গেলে শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের অবতার শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণববাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের পূজা অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দোলউৎসব অন্যতম। অতএব বৈষ্ণববাদের প্রভাব যে মুসলিম সমাজের মূলে তখন প্রবেশ করেছিল, উপরের বর্ণনায় তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

মুসলিম সমাজের এহেন ধর্মীয় অধঃপতনের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মুসলিম সমাজে পৌত্তলিক ভাবধারা অনুপ্রবেশের প্রধানতম কারণ হলো ভারতীয় নও-মুসলিমদের পৌত্তলিক থেকে অর্ধমুসলমান, (Half-Conversion) হওয়া। অর্থাৎ একজন পৌত্তলিক ইসলামকে না বুঝেই

মুসলমান হয়।অতঃপর তার কোন ইসলামী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়নি। হয়নি তার চিন্তাধারার পরিশুদ্ধি। পৌত্তলিকতার অসারতা ও তার বিপরীত ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সুযোগ তার হয়নি। ইসলামী পরিবেশের মধ্যে জীবনযাপন করে আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র ও মনমানসিকতার পরিবর্তন ও সংশোধন হয়নি। তাই এ ধরনের মুসলমান হিন্দুর দুর্গোৎসবের অনুকরণে মহররমের অনুষ্ঠান পালন, দেওয়ালী-কালী পূজার অনুকরণে শবে বরাতে আলোকসজ্জা ও বাজীপোড়ানো প্রভৃতির মাধ্যমে হয়তো কিছুটা আনন্দ লাভের চেষ্টা করে। আকবর, জাহাঙ্গীর ও বাংলার পরবর্তী শাসকগণ প্রকাশ্যে হিন্দু পূজার অনুষ্ঠানে যোগদান করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

ঐতিহাসিক এম. গ্রাসিন ডি ট্যাসিন বলেন, মহররমের তাজিয়া অবিকল হিন্দু দুর্গাপূজার অনুকরণ। দুর্গোৎসব যেমন দশ দিন ধরে চলে এবং শেষ দিন ঢাক-ঢোল বাদ্যবাজনাসহ পূজারিগণ প্রতিমাসহ মিছিল করতঃ তাকে নদী অথবা পুকুরে বিসর্জন দেয়, মুসলমানগণও অনুরূপভাবে দশ দিন ধরে মহররমের উৎসব পালন করে। শেষ দিন দুর্গা বিসর্জনের ন্যায় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মিছিল করে তাজিয়া পানিতে বিসর্জন দেয়া হয়।

ডাঃ জেমস্ ওয়াইজ মহররম উৎসবকে হিন্দুদের রথযাত্রা উৎসবের অনুরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। মিসেস্ এইচ্ আলী বলেন, দীর্ঘদিন হিন্দুদের সংস্পর্শে থেকে মুসলমানগণ তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলিকে হিন্দুদের অনুকরণে মিছিলের আকারে বাহ্যিক জাঁক-জমকপূর্ণ করে তুলেছে। ইউরোপীয়দের ন্যায় বিদেশী মুসলমানগণ বাংলার মুসলমানদের এ ধরনের ধর্মীয় উৎসবাদিকে ইসলামের বিকৃতকরণ ও অপবিত্রকরণ মনে করেছেন। (বৃটিশ পলিসি ও বাংলার মুসলমান ঃ এ আর মল্লিক)।

ইসলাম ও মুসলমানদের এহেন পতন যুগে পীরপূজা ও কবরপূজার ব্যাধি মুসলমান সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক এম. টি. টিটাসের মতে এ কুসংস্কার আফগানিস্তান, পারস্য ও ইরাক থেকে আমদানী করা হয়। হিন্দুদের প্রাচীন গুরু-চেলা পদ্ধতি এবং স্থানীয় বহু দেব-দেবীর পূজায় তাদের অদম্য বিশ্বাস মুসলিম সমাজকে এ কুসংস্কারে লিপ্ত হতে প্রেরণা যোগায়। তিনি বলেন, ইসলামের বাধ্যতামূলক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান অপেক্ষা বহুগুণ উৎসাহ উদ্যম সহকারে তারা পীরপূজা করে। অতীতে যে সকল অলীদরবেশ ইসলামের মহান

বাণী প্রচার করে গেছেন, পরবর্তীকালে অজ্ঞ মুসলমান তাঁদেরই কবরকে পূজার কেন্দ্র বানিয়েছে।

একমাত্র বাংলায় যেসব অলীদরবেশের কবরে মুসলমানগণ তাদের মনস্কামনা পূরণের জন্য ফুলশির্ণি ও নজর-নিয়াজ দিত, তার সংখ্যা ডাঃ জেমস ওয়াইজ নিম্নরূপ বলেন ঃ

সিলেটের শাহ জালাল, পাঁচ পীর, মুন্নাশাহ্ দরবেশ, সোনার গাঁয়ের খোন্দকার মুহাম্মদ ইউসুফ, মীরপুরের শাহ আলী বাগদাদী, চট্টগ্রামের পীর বদর, ঢাকার শাহ জালাল এবং বিক্রমপুরের আদম শহীদ। চট্টগ্রামে বায়েজিদ বুস্তামীর দরগাহ বলে কথিত, হয়তো একেবারে কল্পিত একটি দরগাহ আছে তা সম্ভবতঃ ডাঃ জেমস ওয়াইজের পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাংলা বিহারে এ ধরনের বহু দরগার উল্লেখ—ব্রক্‌ম্যানের গ্রন্থে আছে।

সোনার গাঁয়ের হিন্দু মুসলমান উভয়ে পূজাপার্বণ করতো বলে কথিত আছে। কৃষক ভালো ধান্য-ফসল লাভ করলে কয়েক আঁটি ধান দরগায় দিয়ে আসতো। সকল প্রকার ব্যাধি ও বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে দরগায় চাউল ও বাতাসা দেয়া হতো।

ঢাকা শহরের পূর্বে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে একটি দরগায় কালো রঙ্গের একটি প্রস্তর রাখা ছিল যাকে বলা হতো কদম রসূল [নবীর (সা) পদচিহ্ন]। অদ্যাবধি তা বিদ্যমান আছে বলে বলা হয়। ডাঃ জেমস ওয়াইজ বলেন, গয়ার ব্রাহ্মণগণ তীর্থযাত্রীদেরকে বিষ্ণুপদ (বিষ্ণুর পদচিহ্ন) দেখিয়ে প্রচুর অর্থ রোজগার করে। অনুরূপভাবে দরগার মুতাওয়াল্লী গ্রামের অজ্ঞ ও বিশ্বাসপ্রবণ লোকদেরকে কদমরসূল দেখিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে।

আজমীরে খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতীর (রহ) মাজারের গিলাফ সরিয়ে বেহেশতের দরজা (?) দেখিয়ে মাজারের দালালগণ জিয়ারতকারীদের নিকট থেকে প্রচুর অর্থ রোজগার করে।

এ ধরনের অসংখ্য অগণিত কবর ও দরগাহ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে বিদ্যমান আছে, যেখানে আজো এক শ্রেণীর মুসলমান পূজাপার্বণ তথা শিরক বিদ্আত করে থাকে।

মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতিতে পৌত্তলিকতা ও বিধর্মী ভাবধারার অনুপ্রবেশ যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা পরিপূর্ণ করে দেয় এক শ্রেণীর ভন্ড পীর-ফকীরের

দল। এমনকি ধর্মের নামে তারা বৈষ্ণব ও বামাচারী তান্ত্রিকদের অনুকরণে যৌন অনাচারের আমদানীও করে। মুসলমান নামে তারা যে মত ও পথ অবলম্বন করে তার উৎস যেহেতু বাংলার বৈষ্ণববাদ, সেজন্যে বৈষ্ণবদের আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ এখানে প্রয়োজন মনে করি। মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর 'মুসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে কিঞ্চিৎ পাঠকগণকে পরিবেশন করছি।

"চৈতন্যদেব হইতেছেন বাংলার বৈষ্ণবদের চৈতন্য সম্প্রদায়ের পূজিত দেবতা। হিন্দুদের সাধারণ বিশ্বাস অনুযায়ী চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের একজন অবতার অথবা পরিপূর্ণ অর্থেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এই কারণেই তাঁহার ভক্তগণ, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সত্তা হইতে মানুষ চৈতন্যকে বাদ দিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণচৈতন্যে উন্নীত করে এবং অতি মারাত্মকভাবে কৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ধর্মের নামে নেড়া-নেড়ী তথা মুন্ডিত কেশ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের মধ্যে যে জঘন্য যৌন অনাচারের শ্রোত বহিয়া চলে, তাহা পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের যৌন আবেগমূলক প্রণয়লীলার পুনরাবৃত্তি বা প্রতিরূপ ব্যতীত কিছুই নহে।

তান্ত্রিক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশনা দিতেছেন যে, কলিকালে (বর্তমান যুগে) মদ্যপান শুধু সিদ্ধই নহে বরং অপরিহার্য্যভাবে তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সত্য, ত্রেতা ও দাপর যুগে মদ্যপানের রীতি প্রচলিত ছিল, তেমনি এই কলি যুগেও বর্ণধর্ম নির্বিশেষে তোমরা ইহা পান করিবে- (মহানির্বাণতন্ত্র, ৪র্থ উল্লাস, ৫৬ শৎ শ্লোক)।'

'মহাদেব গোরীকে বলিতেছেন ঃ পাথরে বীজ বপন করিলে তাহার অংকুরিত হওয়া যেমন অসম্ভব, পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত পূজা উপাসনাও তেমনি নিষ্ফল। অধিকন্তু পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত পূজা উপাসনা করিলে পূজারীকে নানা বিপদ আপদ ও বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়— (মহানির্বাণতন্ত্র, ৫ম উল্লাস, ২৩-২৪ শ্লোক)।'

মহাদেবের নিজমুখে এ পঞ্চতত্ত্ব রহস্যের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে আমরা পাঠকগণকে আমন্ত্রণ জানাইতেছি ঃ

'হে আদ্যে, শক্তিপূজা পদ্ধতিতে অপরিহার্য্য করণীয় হিসেবে মদ্যপান মাংস, মৎস্য ও মুদ্রাভক্ষণ এবং সংগমের নির্দেশ দেয়া যাইতেছে।'

(মদ্যং মাংসং ততো মৎস্যং মৈথুনে মেরচ শক্তিপূজা বিবাবাদ্যে পঞ্চতত্ত্বং প্রকৃতিতম—মহানির্বাণতন্ত্র, ৫ম উল্লাস, ২২ শ্লোক।)

"আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ বামাচারী তান্ত্রিকদের এই পূজা পদ্ধতি সম্পর্কে লিখিতেছেন ঃ বামাচারীগণ বেদবিরুদ্ধ এই সকল মহা অধর্মের কার্যকে পরম ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়াছে। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও যৌন সংগমের এক বিস্বাদ মিশ্রণকে তাহারা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে। পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ যৌন সংগমের ব্যাপারে প্রত্যেক পুরুষ নিজেকে শিব ও প্রত্যেক নারীকে পার্বতী কল্পনা করিয়া এবং প্রত্যেক নারী নিজেকে পার্বতী ও প্রত্যেক পুরুষকে শিব কল্পনা করিয়া. . . মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবেই সংগমে লিপ্ত হইতে পারে। ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সহিত সংগম শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু বামাচারীগণ তাহাদিগকে অর্থাৎ রজস্বলা স্ত্রীলোকদিগকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে . . .।

"বামাচারীদের শাস্ত্র রুদ্রমংগলতন্ত্রে বলা হইয়াছে ঃ রজস্বলার সহিত সংগম পুষ্করে স্নানতুল্য, চন্ডালী সংগম কাশীযাত্রার তুল্য, চর্মকারিনীর সহিত সংগম প্রয়াগে স্নানের তুল্য, রজকী সংগম মথুরা যাত্রার তুল্য এবং ব্যাধ কন্যার সহিত সংগম অযোধ্যা তীর্থ পর্যটনের তুল্য।"

"যখন বামাচারীরা ভৈরবী চক্রে (নির্বিচারে অবাধে যৌনসম্ভোগের জন্য মিলিত নরনারীদের একটি চক্র) মিলিত হয়, তখন ব্রাহ্মণ-চন্ডালের কোন ভেদ থাকেনা। একদল নরনারী অন্যলোকের অগম্য একটি নির্জনস্থানে মিলিত হইয়া ভৈরবীচক্র নামে একটি চক্র রচনা করিয়া উপবেশন করে অথবা দন্ডায়মান হয়। এই কামুকদের সকল পুরুষ একজন স্ত্রীলোককে বাছিয়া লইয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার পূজা করে। অনুরূপ সকল নারী একজন পুরুষকে বাছিয়া বাহির করে এবং তাহাকে উলংগ করিয়া পূজা করে। পূজাপর্ব শেষ হওয়ার পর শুরু হয় উদ্দাম মদ্যপানের পালা। মদ্যপানের ফলে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইলে পরিধানের সকল বস্ত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া তাহারা সম্পূর্ণ উলংগ হইয়া পড়ে এবং যাহাকে যাহার ইচ্ছা তাহার সহিত এবং যতজনের সংগে সম্ভব ততজনের সংগে অবাধ যৌন সংগমে মাতিয়া উঠে— যৌন সংগী যদি মাতা, ভগ্নি অথবা কন্যাও হয় তাহাতেও তাহাদের কিছু যায় আসেনা। বামাচারীদের তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, একমাত্র মাতা ব্যতীত যৌন সংগম হইতে অবশ্যই অন্য কোন নারীকে বাদ দিবেনা এবং কন্যা হউক অথবা ভগ্নি হউক আর সকল নারীর সংগেই যৌন কার্য করিবে। (জ্ঞান সংকলনীতন্ত্র ঃ মাতৃং

যোনিং পরিত্যজ্য বিহারেৎ সর্বযোনীষু।—এসব বৈষ্ণবতান্ত্রিক বামাচারীদের আরও এত জঘন্য অশ্লীল ক্রিয়াকলাপ আছে যে তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।" – (মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস, মওলানা আকরাম খাঁ।)

উপরে বর্ণিত জঘন্য ও নোংরা পরিবেশের প্রভাবে বাংলার তৎকালীন মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতন এবং সামাজিক ও তামাদ্দুনিক বিশৃংখলার এক অতি শোচনীয় স্তরে নেমে আসে। এ অধঃপতনের চিত্র পাঠক সমাজে পরিস্ফুট করে তুলে ধরতে হলে এখানে মুসলমান নামধারী মারফতী বা নেড়ার পীর–ফকীরদের সাধন পদ্ধতির উল্লেখ প্রয়োজন। এ ভন্ড ফকীরের দল বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। যথা আউল, বাউল, কর্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি। এগুলি হচ্ছে হিন্দু বৈষ্ণব ও চৈতন্য সম্প্রদায়ের মুসলিম সংস্করণ যাতে করে সাধারণ অজ্ঞ মুসলমানদেরকে বিপথগামী করা যায়।

এদের মধ্যে বাউল সম্প্রদায় মনে হয় সর্বাপেক্ষা জঘন্য ও যৌনপ্রবণ। মদ্য পান, নারীপুরুষে অবাধ যৌনক্রিয়া এদের সকল সম্প্রদায়েরই সাধনপদ্ধতির মধ্যে অনিবার্যরূপে শামিল। তবে বাউলগণ উপরে বর্ণিত তান্ত্রিক বামাচারীদের ন্যায় যৌনসংগমকে যৌনপূজা বা প্রকৃতি পূজা রূপে জ্ঞান করে। তাদের এ যৌনপূজার মধ্যে 'চারিচন্দ্র ভেদ' নামে একটি অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। একে তারা একটি অনিবার্য পবিত্র অনুষ্ঠান মনে করে। তাদের মতে মানুষ এ চারিচন্দ্র বা মানব দেহের নির্যাস যথা রক্ত, বীর্য, মল ও মুত্র পিতার অন্ডকোষ ও মাতার গর্ভ থেকে লাভ করে থাকে। অতএব এ চারিচন্দ্র বাইরে নিক্ষেপ না করে দেহে ধারণ করা কর্তব্য। বাউল বা নেড়ার ফকীরগণ এ চারিচন্দ্র সাধনের সাথে 'পঞ্চরস সাধন'ও করে থাকে। পঞ্চরস হচ্ছে তাদের ভাষায় কালো সাদা লাল হলুদ ও মুর্শিদবাক্য। এ চারবর্ণ যথাক্রমে মদ, বীর্য, রজঃ ও মলের অর্থজ্ঞাপক। আপন স্ত্রী অথবা পরস্ত্রীর সাথে সংগমের পর তারা মুর্শিদবাক্য পালনে এ চারবর্ণের পদার্থ ভক্ষণ করে থাকে।

শ্রদ্ধেয় মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর উপরে বর্ণিত গ্রন্থে এসব বাউলদের সম্পর্কে বলেন ঃ

"কোরআন মজিদের বিভিন্ন শব্দ ও মূলতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা এই সমস্ত শয়তান নেড়ার ফকীরের দল দিয়াছে, তাহাও অদ্ভুত। 'হাওজে কাওসার' বলিতে তাহারা বেহেশতী সঞ্জীবনী সুধার পরিবর্তে স্ত্রীলোকের রজঃ বা ঋতুস্রাব বুঝে। যে

পূজাপদ্ধতিতে এ ঘৃণ্য ফকীরের দল বীর্য পান করে, তাহার সূচনায় বীজ যে আল্লাহ (মায়াযাল্লাহ, মায়াযাল্লাহ) অর্থাৎ বীর্যে আল্লাহ অবস্থান করেন— এই অর্থে 'বিসমিল্লাহ' শব্দ উচ্চারণ করে থাকে।....

"এই মুসলিম ভিক্ষোপজীবী নেড়ার ফকীরের দলের পুরোহিত বা পীরেরা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপিনীদের বস্ত্র হরণের অনুরূপ এক অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যখন পীর তাহার মুরীদানের বাড়ী তশরিফ আনে, তখন গ্রামের সকল যুবতী ও কুমার উত্তম বসনে সজ্জিত হইয়া, বৃন্দাবনের গোপিনীদের অনুকরণে একটি গৃহকক্ষে পীরের সহিত মিলিত হয়। নাটকের প্রথম অংকে এই সকল স্ত্রীলোক নৃত্যগীত শুরু করে। নিম্নে এই সখীসংগীতের গদ্যরূপ প্রদত্ত হইল ঃ

ও দিদি যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসিতে চাও,
আর আত্মপ্রতারণা না করিয়া শীঘ্র আস,
দেখ, প্রেমের দেবতা আসিয়াছে।
আঁখি তোল, তাহার প্রতি তাকাও
গুরু আসিয়াছে তোমাদের উদ্ধারের জন্য
এমন গুরু আর কোথাও পাইবে না।
হাঁ, গুরুর যাহাতে সুখ
তাহা করিতে লজ্জা করিও না–।

'গানটি গীত হইলে পর এ সমস্ত নারী তাহাদের গাত্রাবরণ খুলিয়া ফেলিয়া, সম্পূর্ণ উলংগ হইয়া পড়ে এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। পীর এখানে কৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেও তদ্রূপ এই সমস্ত উলংগ নারীর পরিত্যক্ত বস্ত্র তুলিয়া লইয়া গৃহের একটি উঁচু তাকে রক্ষা করে। এই পীর–কৃষ্ণের যেহেতু বাঁশী নাই, তাই সে নিম্নোক্তভাবে মুখে গান গাহিয়াই এইসব উলংগ রমণীদিগকে যৌনভাবে উত্তেজিত করিয়া তোলে ঃ

'হে যুবতীগণ। তোমাদের মোক্ষের পথ ভক্তকুলের পুরোহিতকে অর্ঘস্বরূপ দেহদান কর।'

কোনরূপ সংকোচ বোধ না করিয়া পীরের যৌন লালসা পরিতৃপ্ত করাই ইহাদের প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য।" (মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস)

যৌনক্রিয়া, আনন্দদায়ক ও সুখকর বস্তু সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষ অবৈধ যৌনসংগমে ভীত শংকিত হয়, লজ্জাসংকোচ অনুভব করে— পাপের ভয়ে, ধর্মের ভয়ে। কিন্তু ধর্ম স্বয়ং যদি ঘোষণা করে যে, এ কাজ পাপের নয়, পুণ্যের এবং এতেই মোক্ষলাভ হয়ে থাকে, তাহলে মানুষ এ পথে আকৃষ্ট হবে না কেন? একশ্রেণীর লম্পট পাপাচারী লোক ধর্মের নামে এভাবে অজ্ঞমূর্খ মানুষকে ফাঁদে ফেলে প্রতারিত ও বিপথগামী করেছে।

উপরে বর্ণিত ভন্ড পীর-ফকীর দলের আরও বহু অপকীর্তি ও অশ্লীল ক্রিয়াকান্ড আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হলো। এর থেকে তৎকালীন মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতন পাঠকবর্গ উপলব্ধি করতে পারবেন সন্দেহ নেই। যদিও গোটা মুসলিম সমাজের অধঃপতন এতটা হয়েছিল না, কিন্তু সমাজে পৌত্তলিক ও বৈষ্ণব মতবাদের প্রবল বন্যা-যে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে ভাসিয়ে নিয়ে তাদের সাথে একাকার করে দিচ্ছিল, তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মুসলিম সমাজের ছিল না। কারণ, তৎকালীন মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ছিল পৌত্তলিকতাবাদ ও বৈষ্ণববাদের প্রতি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ-প্রাচীর গড়ে তুলেছিল সাইয়েদ আহমদ শহীদের (রহ) ইসলামী আন্দোলন, ইতিহাসে যার ভ্রান্ত নাম দেয়া হয়েছে 'ওহাবী আন্দোলণ'। যথাস্থানে সে আলোচনা আসবে। সাইয়েদ তিতুমীর এবং হাজী শরিয়তুল্লাহও ওসবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তথাপি ওসব গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার বিষক্রিয়া বিংশতি শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত মুসলিম সমাজের একটা অংশকে জর্জরিত করে রেখেছিল। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় ঈসায়ী ১৯১১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্টে। এ রিপোর্টে বলা হয় যে, লোক গণনার সময় এমন কিছু সম্প্রদায়ের দেখা পাওয়া গেছে, যারা নিজেরা স্বীকারোক্তি করেছে যে, তারা হিন্দুও নয় এবং মুসলমানও নয়। বরঞ্চ উভয়ের সংমিশ্রণ। (Census of India Report, 1911 A.D.)

কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলমানের পৌত্তলিক ভাবধারার রস এখনো সঞ্জীবিত রেখেছে বাংলা ভাষার কতিপয় বৈষ্ণববাদ ভক্ত ও পৌত্তলিক ভাবাপন্ন মুসলিম কবি। ভক্ত কবি লাল মামুদ তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বৈষ্ণববাদের প্রতি এতটা বিশ্বাসী হয়ে পড়েন যে, একটি বট বৃক্ষমূলে তুলসী বৃক্ষ স্থাপন করে

নিয়মিত সেবা-পূজা করতে থাকেন। যেদিন গোস্বামীপ্রভু লালুর আশ্রমে উপস্থিত হন, সেদিন নিম্নোক্ত গান গেয়ে প্রভুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

দয়াল হরি কই আমার
আমি পড়েছি ভব কারাগারে, আমায় কে করে উদ্ধার।
শত দোষের দোষী বলে, জন্ম দিলে যবন কুলে
বিফলে গেল দিন আমার।

তারপর আসে কবি লালন শাহের কথা। তাঁর কয়েকটি গান নিম্নে প্রদত্ত হলো : "পার কর, চাঁদ গৌর আমায়,বেলা ডুবিল
আমার হেলায় হেলায় অবহেলায় দিনত বয়ে গেল।
আছে ভব নদীর পাড়ি
নিতাই চাঁদ কান্ডারী। ....
ও চাঁদ গৌর যদি পাই, ও চাঁদ গৌর হে,
কুলে দিয়ে ছাই
ফকীর লালন বলে শ্রীচরণের দাসী হইব।"

উপরে কবি লাল মামুদ আক্ষেপ করে বলেন যে, মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে তাঁর জীবন বিফল হলো। লালন শাহ বলেন, গৌর নিতাইকে পেলে মুসলমানী ত্যাগ করে তাঁর শ্রীচরণের সেবায় রত হবেন।

লালন শাহের কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কীয় গান :

কৃষ্ণপ্রেম করব বলে, ঘুরে বেড়াই জনমভরে
সে প্রেম করব বলে ষোলআনা
এক রতির সাধ মিটল নারে।
রাধারাণীর ঋণের দায়
গৌর এসেছে নদিয়ায়
বৃন্দাবনের কানাই আর বলাই
নৈদে এসে নাম ধরেছে গৌর আর নিতাই।

মুসলিম সমাজের একশ্রেণীর পৌত্তলিকমনা লোক লালন শাহের মতবাদকে মুসলিম সমাজে সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় আছে।

মুসলিম সমাজের এহেন অধঃপতনের কারণ বর্ণনা করে ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেন ঃ

"পৃথিবীর অন্যান্য বিজয়ী জাতিসমূহ যেমন বিজিত জাতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তেমন ভারতীয় মুসলমানগণও বিজিত হিন্দুজাতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। আচার–আচরণ, জীবনের দৃষ্টিভংগী এবং এমনকি বিশ্বাসের দিক দিয়েও এ প্রভাব এখনো সুস্পষ্ট। ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া গোটা মুসলিম শাসন আমলে চলেছে। বিভিন্ন সময়ে এ ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার বেগ মুসলিম শাসকদের উদারনীতির ফলে বর্ধিত হয়েছে। তার ফলস্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে ইসলাম এমন এক রূপ ধারণ করে যার জন্যে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ভারতীয় মুসলমানগণ, বিশেষ করে বাংলা ও বিহারের মুসলমান তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের সাথে এমন সব কুফরী আচার–আচরণ অবলম্বন করেছে, তা ছিল অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মধ্যে বিরল। বাংলা–বিহারে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল যেমন বিরাট, তাদের রীতিনীতি ও আচার–আচরণও ছিল তেমনি ধর্মহীন ও নীতি বিগর্হিত।"– ('ব্রিটিশ পলিসি ও বাংলার মুসলমান' ঃ এ আর মল্লিক)।

"ভারতীয় ইসলামের মধ্যে অনৈসলামিক রীতিপদ্ধতি অনুপ্রবেশের কারণ হচ্ছে এই যে, অমুসলমানদের ধর্মান্তরগ্রহণ ছিল অপূর্ণ।" ('ভারতের ইতিহাস'– ইলিয়ট ও ডাউসন) ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার এক চিত্র উপরে বর্ণনা করা হলো। তৌহিদের অনুসারী মুসলমান যখন এমনি বিকৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ এবং তখন ভিতর ও বাইর থেকে যে বিরুদ্ধ শক্তি তাদেরকে পরাভূত ও নিশ্চিহ্ন করার জন্যে সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়, সে আক্রমণ প্রতিহত করার কোন প্রাণশক্তি তখন বিদ্যমান ছিল না। যাদের মাত্র সতেরো জন এককালে বাংলার উপরে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল, কয়েক শতাব্দী পরে তাদের লক্ষ লক্ষ জন মিলেও সে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা রক্ষা করতে পারলো না।

বাংলার পতনের রাজনৈতিক কারণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ও বাংলার পতন কোন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার ফল নয়। যেসব রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জের ফল স্বরূপ

পলাশীর বিয়োগান্ত নাটকের সমাপ্তি ঘটে, তা সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের অবশ্য জেনে রাখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে মোগল সাম্রাজ্যের পতন গোটা উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের পতন ডেকে আনে। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ্ আওরংজেবের মৃত্যুর পর থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরে ক্রমপক্ষে সাত জন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কারো এ যোগ্যতা ছিল না যে পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। অবশ্য কতিপয় অবিবেচক ঐতিহাসিক আওরংজেবকে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের জন্যে দায়ী করেন। ইতিহাসের পুংখানুপুংখ যাচাই–পর্যালোচনা করলে এ সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ধ্বংসের বীজ বহু পূর্বেই স্বয়ং বাদশাহ আকবর কর্তৃক বপন করা হয়েছিল এবং তা ধীরে ধীরে একটি বিরাট বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করছিল। আওরংজেব সারাজীবন ব্যাপী তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে সে ধ্বংসকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ যদি তাঁর মতো শক্তিশালী ও বিচক্ষণ হতেন— তাহলে সম্ভবতঃ ভারতের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতো। শ্রদ্ধেয় আকরাম খাঁ তাঁর 'মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেন ঃ

"আকবরের রাজত্বকালের সকল অপকর্মের পরিণাম ভোগ তাঁহার মৃত্যুর সাথেই শেষ হইয়া যায় নাই। মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার সকল উত্তরাধিকারীকে জীবনের যথাসর্বস্ব দিয়া এই অপকর্মের ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভারতের দশ কোটি মুসলমান আজ পর্যন্ত আকবরের অপকর্মের দরুন ক্ষতিপূরণের অবশিষ্ট উত্তরাধিকার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পায় নাই। মুসলমান পাঠকদের নিকট এই উত্তরাধিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত কোন আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করিনা।"

বলতে গেলে আকবর ছিলেন নিরক্ষর অথবা অতি অল্প শিক্ষিত। পনেরো–ষোল বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। একটি নিরক্ষর বালক যুবরাজের পক্ষে শত্রু পরিবেষ্টিত দিল্লীর রাজশাসন পরিচালনা কিছুতেই সম্ভব হতো না, যদি অতি বিচক্ষণ ও পারদর্শী বাইরাম খান, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য না করতেন। সৎ সংসর্গ লাভের অভাবে আকবর বিরাট সাম্রাজ্য লাভের পর স্বভাবতঃই ভোগ বিলাস, উচ্ছৃংখলতা ও নৈতিক অধঃপতনের মধ্যে নিমজ্জিত হন। বাইরাম খান তাঁকে সকল প্রকার চেষ্টা করেও

সুপথে আনতে পারেননি। মদ্যপান ও তার স্বাভাবিক আনুষংগিক পাপাচার এবং তাঁর আশাতীত রাজনৈতিক সাফল্য তাঁর চরিত্র গঠন বা সংশোধনের কোন সুযোগই দেয়নি। কিন্তু তার এই ব্যাধিগ্রস্ত প্রতিভা তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধর ও মুসলিম জাতির কোন কল্যাণ সাধন করার পরিবর্তে অকল্যাণ ও ধ্বংসের বীজ বপন করে গেছে। মুসলমানদের তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল শক্তি নিঃশেষ করে দিয়ে তাদেরকে অপরের রাজনৈতিক ও মানসিক গোলামে পরিণত করার জন্যে ভারতের হিন্দু মানসিকতা নীরবে ও অব্যাহত গতিতে যে কাজ করে যাচ্ছিল, আকবরের তীক্ষ্ণ অথচ অসুস্থ প্রতিভা তার পূর্ণ সহায়ক হয়েছে। ভারতে তাঁর রাজনৈতিক শক্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে আকবর হিন্দুদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েই ক্ষান্ত হননি, বরঞ্চ তাদের মনস্তুষ্টির জন্যে 'দ্বীনে এলাহী' নামে এক উদ্ভট ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্ম ও তামাদ্দুনকে ধ্বংস করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আকবরনামায় এর বিস্তারিত বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়।

মজার ব্যাপার এই যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রয়োজনে আকবরের জীবনের বৃহত্তম স্বপ্নসাধ এই স্বকপোলকল্পিত 'দ্বীনে এলাহী' হিন্দু জাতিকে মোটেই আকৃষ্ট করতে পারেনি। একমাত্র বীরবল ব্যতীত কেউ এ নবধর্মমত গ্রহণে সম্মত হননি। তাঁর দরবারের নবরত্নের মধ্যে অন্যতম রত্নাবলী মানসিংহ ও তোডরমল এ ধর্মমত প্রত্যাখ্যান করেছেন। আকবর কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা জড়িত করে চন্দন চর্চিত দেহে হিন্দু সন্যাসীর বেশে দরবারে উপস্থিত হলে হিন্দুপন্ডিত ও সভাসদগণ 'দিল্লীশ্বরো' বা 'জগতীশ্বরো' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করতেন এবং ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করে তাঁর প্রতি কৃত্রিম আনুগত্য প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করলেও তাঁর উদ্ভট ধর্মের প্রতি কণামাত্র আনুগত্য প্রকাশ করেননি। অতএব কোন এক চরম অশুভ শক্তি শুধুমাত্র মুসলমানদের তৌহিদী আকীদাহ্ বিশ্বাস ও ইসলামী তামাদ্দুন ধ্বংসের জন্যে আকবরের প্রতিভাকে ব্যবহার করেছে, তা বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই সহজে উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু আকবর তাঁর জীবনের স্বপ্নসাধ বাস্তবায়িত করতে চরমভাবে ব্যর্থ হন।

এ তো গেল তাঁর জীবনের একদিক। তাঁর রাজনৈতিক জীবনেও এসেছিল চরম ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের গ্লানি।

আকবর ভারতের তদানীন্তন পাঠানশক্তি তথা দুর্ধর্ষ মুসলিম সামরিক শক্তি ধ্বংস করেছিলেন। এ বিধ্বস্ত সামরিক শক্তির বিকল্প কোন মুসলিম শক্তি গড়ে তোলা তো দূরের কথা, যা অবশিষ্ট ছিল তাও দুর্বল ও নিঃশেষ করে ফেলেন। বাইরাম খান, আহসান খান, মুয়াজ্জম খান প্রভৃতির হত্যাকান্ডের মধ্যে আকবরের এ ধ্বংসাত্মক নীতির প্রকাশ পাওয়া যায়। এমনকি বহিরাগত বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের বিরুদ্ধেও তিনি দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এমনিভাবে শত্রুর ইংগিতে তিনি আপন গৃহ স্বহস্তে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করেন। মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিপদের সময় কাজে লাগতে পারে এরূপ সকল শক্তি ও প্রতিভাকে ধ্বংস করে দেয়ার ফলে তিনি ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলি দ্রুত তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার করে চলেছিল এবং তাদের অশুভ তৎপরতার ঢেউ মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্তে এসে আঘাত করছিল। যে ইসলামের প্রাণশক্তি এসব তৎপরতা সাফল্যের সাথে রুখে দাঁড়াতে পারতো, তা আগেই ধ্বংস করেছেন। অতএব খৃষ্টানদের রাজনৈতিক স্বার্থের সাথে অসম্মানকর সন্ধি স্থাপনে এবং তাদের ধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য করেও মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ রুদ্ধ করতে পারলেন না।

বৈদেশিক বিধর্মী শক্তির ন্যায় দেশের অভ্যন্তরেও যে হিন্দুশক্তি দ্রুত মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল, তাও আকবরের দৃষ্টির অগোচর ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে তিনি হয়ে পড়েছিলেন ভারতের হিন্দুশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অতএব তাদেরকে তুষ্ট করার বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। হিন্দু নারীগণকে মহিষীরূপে শাহীমহলে এনে তথায় মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজার নিয়মিত অনুষ্ঠান করেও মোগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারলেন না। সর্বশক্তিমান সত্তা পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীর খোদাকে পরিত্যাগ করে অন্যান্য বিভিন্ন খোদার আশ্রয়প্রার্থী হয়েও কোন লাভ হলোনা।

ইসলাম ধর্মকে পুরাপুরি পৌত্তলিকতার ছাঁচে ঢেলে এবং হিন্দুধর্ম অক্ষুণ্ন রেখে 'দ্বীনে এলাহী' নামে নতুন এক ধর্মের ছায়াতলে ভারতের হিন্দু মুসলমানকে একজাতি বানাবার হাস্যকর পরিকল্পনাও তাঁর ব্যর্থ হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি যে মনমানসিকতার সৃষ্টি করে অশুভ উত্তরাধিকার রেখে গেলেন তা শুধু তাঁর সুযোগ্য পুত্র জাহাঙ্গীরই আঁকড়ে ধরেননি বরঞ্চ বিংশতি শতাব্দীর

শেষার্ধেও এক শ্রেণীর মুসলমান সে উত্তরাধিকার দ্বারা লালিত পালিত হচ্ছেন। মুসলিম ধর্মীয়, জাতীয় ও সাংস্কৃতিক অধঃপতনের এ এক চরম বেদনাদায়ক নিদর্শন সন্দেহ নেই।

জাহাঙ্গীর মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসে ত্বরান্বিত করেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স আগ্রায় আগমন করলে তাকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে গ্রহণ করেন, খেতাব ও বৃত্তিদান করেন। বিবাহ করে ভারতে বসবাস করার ইচ্ছা পোষণ করলে শাহী মহলের একজন শ্বেতাংগী তরুণীর সাথে বিবাহের প্রস্তাব দেন।

শাহী মহলে খৃষ্টধর্মের এতখানি প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, কয়েকজন শাহজাদা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং হকিন্সের নেতৃত্বে অন্যান্য খৃষ্টান প্রবাসীদের সাথে পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী পরিবেষ্টিত মিছিল সহকারে গীর্জায় গমন করতেন। জাহাঙ্গীর তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুবান্ধবসহ সারারাত্রি শাহী মহলে মদ্যপানে বিভোর হয়ে থাকতেন। মোগল সাম্রাজ্যের সমাধি রচনার কাজ আকবর নিজেই করেছিলেন, তা আগেই বলা হয়েছে। অতঃপর তাঁর আদর্শহীন মদ্যপায়ী পুত্র জাহাঙ্গীর, স্যার টমাস রো ও তাঁর উপদেষ্টা ও গুরু সুচতুর কূটনীতিবিদ রেভারেন্ড ই. ফেরী মিলে এ সমাধি রচনার কাজ ত্বরান্বিত করেন। টমাস রো তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া মঞ্জুর করে নিতে জাহাঙ্গীরকে সম্মত করেন। সুরাটে প্রতিষ্ঠিত কারখানাটির দ্বারা ইংরেজগণ শুধু বাণিজ্যিক সুবিধা লাভেরই সুযোগ পায়নি, বরঞ্চ এ কারখানাটি তাদের একটি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। শাহী সনদের শর্ত অনুযায়ী শুধু সুরাটেই নয়, মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও, যথা আগ্রা, আহমদাবাদ ও ব্রুচে ইংরেজদের কারখানা তথা সামরিক ঘাঁটি গড়ে উঠে। এভাবে আকবর ও জাহাঙ্গীর মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে খাল খনন করে দূরদেশ থেকে সর্বগ্রাসী কুম্ভীর আমদানি করেন।

একদিকে বিদেশী শক্তি ইংরেজ ভারতে উড়ে এসে জুড়ে বসলো, অপরদিকে ভারতের হিন্দুশক্তিও প্রবল হয়ে উঠলো। রাজপুত এবং মারাঠা শক্তি মোগল সাম্রাজ্যের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। আকবর যে মুসলিম শক্তির ধ্বংস সাধন করেছিলেন, আওরংজেব পাদ্‌শাহ্ গাজী সেই লুপ্ত শক্তির পুনরুদ্ধারের জন্যে আজীবন সংগ্রাম করেন। মারাঠা ও রাজপুত শক্তি দমনে তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। তাঁর পর যদি তাঁর উত্তরাধিকারীগণ শক্তিশালী ও বিচক্ষণ

হতেন, তাহলে হয়তো পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা যেতো। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আরম্ভ করে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত যাঁরাই দিল্লীর সিংহাসন অলংকৃত করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন শাসন কার্য পরিচালনায় অযোগ্য, বিলাসী ও অদূরদর্শী।

একথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের জন্যে একমাত্র আওরংজেবকেই দায়ী করেন। বাংলার হোসেন শাহ ও সম্রাট আকবরের উচ্চ প্রশংসায় যতটা তাঁরা পঞ্চমুখ, ততটা আওরংজেবের চরিত্রে কলংক লেপনে তাঁরা ছিলেন সোচ্চার। তাঁকে চরম হিন্দু বিদ্বেষী বলে চিত্রিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাঁর অনুসৃত হিন্দু স্বার্থের পরিপন্থী শাসননীতি এবং বিশেষ করে জিজিয়া প্রথার পুনঃপ্রবর্তন ভারতের হিন্দুজাতিকে মোগলদের শত্রুতা সাধনে বাধ্য করে। কিন্তু এ অভিযোগগুলি নিছক কল্পনাপ্রসূত ও দুরভিসন্ধিমূলক। ইতিহাস থেকে এর কোন প্রমাণ পেশ করা যাবে না। সত্য কথা বলতে গেলে, রাজপুত এবং মারাঠাগণ ভারতের মুসলিম শাসনকে কিছুতেই মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও শত্রুতার মনোভাব লক্ষ্য করে আকবর তাদেরকে তুষ্ট করার জন্যে অতিশয় উদারনীতি অবলম্বন করেও ব্যর্থ হয়েছেন। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাগণ আওরংজেবের চরম বিরোধিতা করেন। তিনি জিজিয়া কর প্রবর্তিত করার এক বৎসর পূর্বে, ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে শিবাজী মৃত্যুবরণ করেন। অতএব জিজিয়া করই হিন্দুজাতির বিরোধিতার কারণ ছিল, একথা মোটেই ন্যায়সংগত নয়।

একথা অনস্বীকার্য যে, তৎকালীন ভারতের ইতিহাস যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা সকলেই বলতে গেলে ছিলেন মুসলমান। তাই সে সময়ের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে অধ্যয়নের প্রয়োজন হবে বাদাউনী, আকবরনামা, কাফীখান, তারিখে ফেরেশতা, মা'য়াসিরে আলমগীরী প্রভৃতি। কিন্তু ইউরোপীয় খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের বহু ঘটনাকে বিকৃত করে পেশ করেছেন। পরবর্তীকালে অর্ধপৃথিবী জুড়ে তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। সর্বত্র তাঁদের সাম্রাজ্য জুড়ে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল ইংরেজী ভাষা। এ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতার ছত্রছায়ায় মুসলমানদের ইতিহাসের এক বিকৃত ও কল্পিত রূপ তাঁরা তুলে ধরেছেন ইংরেজী ভাষার ইতিহাসের ছাত্রদের

সামনে। ভারতে ইংরেজদের দু'শ বছরের শাসনকালে এ বিকৃত ও ভ্রান্ত ইতিহাস ছাত্রদের মনমস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিল।

এ বিকৃতকরণের কারণও ছিল। বাদশাহ্ আওরংগজেবের কথাই ধরা যাক। বাদশাহ্ আকবর ও জাহাঙ্গীর কর্তৃক ইংরেজদেরকে অন্যায়ভাবে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দানের ফলে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তারা একটা শক্তি হিসাবে গড়ে উঠছিল। বাদশাহ আওরংগজেব তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর আমলে বাংলার মীর জুমলা ও নবাব শায়েস্তা খান বার বার ইংরেজদের ঔদ্ধত্য দমিত ও প্রশমিত করেছেন। ব্যবসায় দুর্নীতি, চোরাচালান, মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রভৃতির কারণে তাদেরকে বার বার শাস্তিও দেয়া হয়েছে, তাদের কুঠি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এক পর্যায়ে বাদশাহ আওরংগজেব ইউরোপীয়দের সাথে তাদের সকল ব্যবসা নিষিদ্ধ করে এক ফরমান জারী করেন। আকবর যে মুসলিম সামরিক শক্তি ধ্বংস করে মোগল সাম্রাজ্যকে শত্রুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন, বাদশাহ আওরংগজেব সেই মুসলিম সামরিক শক্তি পুনর্গঠনে আজীবন চেষ্টা করেন। খৃষ্টান ও হিন্দুজাতির কাছে উপরোক্ত কারণে আওরংগজেব ছিলেন দোষী। তাই তাঁর শাসনকালকে কলংকময় করে চিত্রিত করতে এবং তাঁর নানাবিধ কুৎসা রটনা করতে তাঁরা তৎপর হয়ে উঠেন। অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে আলমগীর আওরংগজেবের চরিত্রে যেসব কলংক আরোপ করেছেন, ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির দ্বারা তার সবটাই খন্ডন করেছেন শিবলী নো'মানী তাঁর "আওরংগজেব আলমগীর পর এক নজর" গ্রন্থে। এ সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল গ্রন্থখানিতে তিনি আওরংগজেবের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলির সমুচিত জবাব দিয়েছেন।

অতএব ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, আওরংগজেবের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের মধ্যে সত্যতার লেশমাত্র নেই। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্যে তাঁকে কণামাত্র দায়ী করা যেতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আকবর কর্তৃক দুর্ধর্ষ মুসলিম সেনাবাহিনীর বিলোপ সাধনের পর ভারতের হিন্দু মারাঠা রাজপুতদের উপর তাঁর নির্ভরশীলতা, বৈদেশিক ও বিধর্মী ইংরেজদের ব্যবসার নামে রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়, মুসলিম শাসন উৎখাতের জন্যে হিন্দু ও ইংরেজদের মধ্যে অশুভ আঁতাত এবং তার সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধঃপতন প্রভৃতি বাংলা তথা ভারত থেকে

মুসলিম শাসনের বিলোপ সাধন করেছিল। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি কিভাবে পলাশী ক্ষেত্রে বাংলা-বিহারের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়ে ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন করে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তোলার পিছনে বিরাট রাজনৈতিক অভিসন্ধি লুক্কায়িত ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসে একটা বিরাট সাম্রাজ্যের মালিক মোখতার হয়ে পড়া কোন আকস্মিক বা অলৌকিক ঘটনার ফল নয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভৌগলিক আবিষ্কারের ফলে আন্তর্জাতিক ব্যবসার পথ উন্মুক্ত হয় এবং ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। ফলে আমেরিকায় স্পেন সাম্রাজ্য, মশলার দ্বীপে ওলন্দাজ সাম্রাজ্য, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ফরাসী সাম্রাজ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলন্ডের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে অগ্রগতির নীতি (Forward Policy) অবলম্বন করে এবং যেসব বাণিজ্যিক এলাকায় তাদের প্রতিনিধিগণ বাস করতো তারা একটা রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হোক এ ছিল তাদের একান্ত বাসনা। ১৬৮২ খৃষ্টব্দে ইংরেজগণ ওলন্দাজদের নিকটে ইন্দোনেশিয়ায় মার খেয়ে সেখান থেকে পাততাড়ি গুটায়। পর বৎসর (১৬৮৩ খৃঃ) ইংলন্ডের রাজদরবার থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে যে সনদ দান করা হয় তার বলে তারা ভারতের যেকোন শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সন্ধি করতে অথবা যেকোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারতো। দ্বিতীয় জেম্স কর্তৃক প্রদত্ত সনদে তাদেরকে অধিকতর ক্ষমতা দান করা হয়। এর ফলে তারা ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে পরাজয় বরণ করে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্যাপ্টেন হীথের নেতৃত্বে 'ডিফেন্স' নামক রণতরী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে ভারতে পাঠানো হয়। হীথ্ সুতানটি থেকে যুদ্ধের জন্যে অগ্রসর হয়ে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। এর ফলে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ কিছুটা দমে গেলেও ভারতে অবস্থানকারী প্রতিনিধিগণ নতুন উৎসাহ উদ্যমে কাজ করে যায়। তাদের দৃষ্টি এবার ফরাসী বণিকদের উপর নিবদ্ধ হয়। ফরাসীদের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র ছিল পন্ডিচেরী এবং তার অধীনে মুসলিপট্টম, কারিকল, মাহে, সুরাট প্রভৃতি স্থানে তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। পক্ষান্তরে ইংরেজদের বাণিজ্যিক হেড কোয়ার্টার ছিল মাদ্রাজে এবং তার অধীনে বোম্বাই ও কলকাতায়, তাদের

গুরুত্বপূর্ণ কারখানা ছিল। এদের মধ্যে শুরু হয় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শেষ পর্যন্ত তা যুদ্ধের আকার ধারণ করে। ফরাসীগণ তাদের মনোনীত ব্যক্তি মুজাফফর জং ও চান্দা সাহেবকে যথাক্রমে হায়দরাবাদ ও কর্ণেটিকের সিংহাসন লাভে সাহায্য করে। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ কর্ণাটকের রাজধানী আরকট দখল করে। এভাবে ইংরেজ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে।

বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের উচ্চাভিলাষ

বাংলায় রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ইংরেজগণ কোলকাতায় দুর্গ নির্মাণের কাজ ব্যাপকভাবে চালাতে থাকে। বাংলার নবাব আলীবর্দী খান তখন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং এই দুর্বলতার সুযোগে সুচতুর ইংরেজগণ তাদের দুর্গ নির্মাণের কাজ দ্রুততার সাথে করে যাচ্ছিল। আর তাদের এ কাজে সাহস ও উৎসাহ যোগাচ্ছিল বাংলার হিন্দু শেঠ ও বেনিয়া শ্রেণী। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত বাংলায় ইংরেজদের যে ব্যবসা দানা বেঁধে উঠেছিল, তার দালাল ও কর্মচারী হিসাবে কাজ ক'রে একশ্রেণীর হিন্দু প্রভূত অর্থশালী ও প্রভাবশালী হয়ে পড়েছিল। উপরন্তু তারা নবাব আমলে রাজস্ব প্রশাসনের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদেও অধিষ্ঠিত ছিল। সুদী মহাজনী ও ব্যাংক ব্যবসার মাধ্যমেও তারা অর্থনীতি ক্ষেত্রে ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। তারা মুসলিম শাসন মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের সাহসও তাদের ছিলনা এবং এটাকে তারা অবস্থার প্রেক্ষিতে সংগতও মনে করতোনা। তাই মুসলিম শাসনের অবসান ঘটাতে হলে ইংরেজদের সাহায্য সহযোগিতা ব্যতীত গত্যন্তর ছিলনা। ইংরেজরা এ সুবর্ণ সুযোগ ভালোভাবেই গ্রহণ করে। প্রশাসন ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুদের এতটা প্রভাব হয়ে পড়েছিল যে, তারা হয়ে পড়েছিল বাংলার নবাবদের ভাগ্যবিধাতা (Kingmakers)। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র সরফরাজ খানকে উত্তরাধিকার মনোনীত করা হলে হিন্দু প্রধানগণ বাধা দান করে। কারণ তাঁকে তারা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করতো। তারা সরফরাজ খানের পিতা সুজাউদ্দীনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর শাসন কালে (১৭২৭–৩৯ খৃঃ) এ সকল হিন্দু শেঠ বেনিয়াগণ প্রকৃতপক্ষে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা হয়ে পড়ে। তাদের দলপতি আলম চাঁদ ও জগতশেঠ হয়ে পড়েছিল দেশের প্রকৃত শাসক (De facto ruler)।

সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর এ ষড়যন্ত্রকারী দলটি উড়িষ্যার নায়েব নবাব আলীবর্দী খানকে বাংলার সিংহাসন লাভে সাহায্য করে। তাঁর আমলে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র চরমে পৌঁছে। এ অবস্থার সুযোগে মারাঠাগণ বার বার বাংলার উপর চড়াও করে। বেগতিক দেখে আলীবর্দী খান এসব প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকারীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তিনি তাঁদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। ফলে রায় দুর্লভ রায়, মাহতাব রায়, স্বরূপ চাঁদ, রাজা জানকী রায়, রাজা রাম নারায়ণ, রাজা মানিক চাঁদ প্রভৃতির নেতৃত্বে এ দলটি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে পড়ে। মুর্শিদকুলী খানের পর সম্ভ্রান্ত মুসলিম রাজকর্মচারীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে পেতে শূন্যের কোঠায় পৌঁছে এবং এ সময়ে কার্যতঃ তাদেরকে যবনিকার অন্তরালে নিক্ষেপ করা হয়। জগতশেঠ–মানিকচাঁদ দলটি শুধু নবাবের অধীনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভেই সন্তুষ্ট ছিল না। এ সময়ে সারা ভারতে হিন্দুজাতির পুনর্জাগরণের প্রাণবন্যা প্রবাহিত হচ্ছিল। মারাঠা এবং শিখদের ন্যায় তারা কোন সামরিক শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি যার দ্বারা তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে পারতো। অতএব ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সংগে যোগসাজসে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটাতে পারলেই মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিহিংসার বহ্নি নির্বাপিত হয়।

জগৎশেঠ–মানিকচাঁদ চক্রের নেতৃত্বে বাংলার হিন্দুজাতির দু'টি লক্ষ্য ছিল। একটিরাজনৈতিক—অপরটি অর্থনৈতিক। বাংলার শাসন পরিবর্তন বা হস্তান্তরের দ্বারা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থকরণ এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ। এ দু'টি লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে কোম্পানীর সংগে মৈত্রীবদ্ধ হতে তারা ছিল সদাপ্রস্তুত ও অত্যন্ত আগ্রহশীল।

পক্ষান্তরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও তাদের ব্যবসার প্রসার ও উন্নতিকল্পে হিন্দুদের কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ ছিল। কারণ, তাদের ব্যবসা বাণিজ্য হিন্দু দালাল গোমস্তা ও ঠিকাদারদের সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই চলতে পারতো না। উপরন্তু ১৭৩৬–৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোলকাতায় তাদের মূলধন বিনিয়োগে ৫২ জন স্থানীয় বণিকের অংশ ছিল এবং তারা সকলেই হিন্দু। কাশিমবাজারের কারখানা স্থাপনে ২৫ জন হিন্দু বণিকের সাথে ছিল তারা সংশ্লিষ্ট। শুধু ঢাকায় তাদের ১২ জন অংশীদারের মধ্যে দু'জন ছিল মাত্র মুসলমান। (সিরাজউদ্দৌলার পতন—ডঃ মোহর আলী)

কোলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের সামরিক ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল স্কটের নিকট লিখিত এক পত্রে চার্লস্ এফ. নোবল বলেন যে,—হিন্দু রাজাগণ ও অধিবাসীবৃন্দ মুসলিম শাসনের প্রতি ছিল অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। এ শাসনের অবসান কিভাবে ঘটানো যায়—এ ছিল তাদের গোপন অভিলাষ। ইংরেজদের দ্বারা কোন বিপ্লব সংঘটন সম্ভব হলে তারা তাদের সাথে যোগদান করবে বলে অভিমত প্রকাশ করে।

নোবল বলেন,— "উর্মিচাঁদ আমাদের বিরাট কাজে লাগবে বলে আমি মনে করি। হিন্দু রাজা ও জনসাধারণের উপর পুরোহিত নিমু গোঁসাই-এর যথেষ্ট প্রভাব আছে। বিরাট সংখ্যার সশস্ত্র একটি দল তার একান্ত অনুগত। সন্যাসী দলকেও আমরা আমাদের কাজে লাগাতে পারি। নিমু গোঁসাই-এর দ্বারা এ কাজ হবে বলে আমার বিশ্বাস আছে।"

নিমু গোঁসাই কর্ণেল স্কটকে দেশের পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর ও পরামর্শ দিত এবং বলতো যে—দরকার হলে ইংরেজদের সাহায্যে সে মাত্র চার দিনের মধ্যে এক হাজার সশস্ত্র লোক হাজির করতে পারবে। (সিরাজউদ্দৌলার পতন-ডঃ মোহর আলী, পৃঃ ১১)

মনে রাখতে হবে যে, হিন্দু জাতির পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ফলে বাংলায় সন্যাসী আন্দোলনের নামে গোপনে একটি সশস্ত্র দলগঠন করা হয়েছিল এবং তারাও মুসলিম শাসন অবসানে সহায়ক হয়েছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল কোলকাতায় দুর্গ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করে। অপরদিকে বাংলার নবাবের নিকটে যে জমিদারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী লাভ করে তার উপরে সার্বভৌম অধিকারও তারা প্রতিষ্ঠিত করে। দেশের আইনে অপরাধীগণ শাস্তি এড়াবার জন্যে কোম্পানীর জমিদারীর অধীনে আশ্রয় লাভ করতে থাকে। এ সকল অপরাধী সকলেই ছিল হিন্দু। চোরাচালানের অপরাধে দোষী রামকৃষ্ণ শেঠ নামক জনৈক ব্যবসায়ীকে কোম্পানী আশ্রয় দান করে এবং নবাবের হাতে তাকে সমর্পণ করার নির্দেশ কোম্পানী অমান্য করে। এমনি নবাবের আরও বহু আইনসম্মত নির্দেশ তারা লংঘন করে। তাছাড়া তারা ব্যবসা সংক্রান্ত বহু চুক্তি লংঘন করে।

ইংরেজদের ষড়যন্ত্র, কুকর্ম ও হীন আচরণ নবাব আলীবর্দীর জানা ছিলনা তা নয়। তবে শয্যাশায়ী মরণোন্মুখ নবাবের কিছু করার ক্ষমতা ছিলনা। তাঁর ভাবী

উত্তরাধিকারী সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের ষড়যন্ত্র বানচাল করতে চেয়েছিলেন বলে তিনি তাদের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। আলীবর্দীর পর দু'জন বাংলার সিংহাসনের দাবীদার হয়ে পড়েন। আলীবর্দীর বিধবা কন্যা ঘেসেটি বেগম এবং পূর্ণিয়ার নবাব শওকত জং। ইংরেজগণ ঘেসেটি বেগমের দাবী সমর্থন করে। বেগম ও তার দেওয়ান রাজবল্লভ তাদের যাবতীয় ধনসম্পদ নিরাপদে সঞ্চিত করার জন্যে কোলকাতায় কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে রাখেন। রাজবল্লভ আত্মসাৎকৃত সরকারী অর্থ তিপ্পান্ন লক্ষ টাকাসহ তার পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে কোম্পানীর আশ্রয়ে প্রেরণ করে। কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দিয়ে ইংরেজগণ নবাবের সংগে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ঘেসেটি বেগমকে বিশ হাজার সৈন্যসহ সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্যে উদ্বুদ্ধ ক'রে তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতার কাজ করে। এ সবকিছুই জানার পর সিরাজ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁর কোন কথায় কর্ণপাত করতে ইংরেজগণ প্রস্তুত ছিলনা।

জনৈক ইংরেজ কারখানার মালিক William Tooke বলেন যে, প্রাচ্যের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী নতুন রাজাভিষেকের পর বিদেশী নাগরিকগণ বিভিন্ন উপঢৌকনাদিসহ নতুন বাদশাহ বা নবাবের সাথে সাক্ষাৎ করে থাকে। কিন্তু এই প্রথমবার তারা এ প্রথা লংঘন করে। তিনি আরও বলেন, কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দান এবং তাকে নবাবের হাতে সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি এটাই প্রমাণ করে, যে, সিরাজদ্দৌলার রাজনৈতিক শত্রুর সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভীর যোগসাজস ছিল যার জন্যে তারা এতটা ঔদ্ধত্য দেখাতে সাহস করে। (হিলের ইতিহাস, ১ম খন্ড ও সিরাজউদ্দৌলার পতন- ডঃ মোহর আলী)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ বাংলা সরকারের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারের অনুরূপ। সিরাজদ্দৌলা তাদের সাথে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার সকল প্রকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত করেন। তিনি এ ব্যাপারে হুগলীর জনৈক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী খাজা ওয়াজেদকে যে পত্র দেন (১লা জুন, ১৭৫৬) তার মর্ম নিম্নরূপ ঃ

প্রধানতঃ তিনটি কারণে ইংরেজদেরকে এ দেশে আর থাকার অনুমতি দেয়া যেতে পারেনা। প্রথম কারণ এই যে, তারা দেশের আইন লংঘন ক'রে

কোলকাতায় একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেছে। দ্বিতীয়তঃ তারা ব্যবসার চুক্তি ভংগ করে অসদুপায় অবলম্বন করেছে এবং ব্যবসা-কর ফাঁকি দিয়ে সরকারের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি সাধন করেছে। তৃতীয়তঃ একজন সরকারী তহবিল আত্মসাৎকারীকে আশ্রয় দিয়ে তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ করেছে।

তেসরা জুন সিরাজদ্দৌলা কাশিমবাজারস্থ ইংরেজদের কারখানা দখল করে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্যে চাপ দেন। কারখানা দখলের পর তিনি একটা উদারতা প্রদর্শন করেন যে, কারখানাটি তালাবদ্ধ করে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেন যাতে করে তা লুণ্ঠিত হতে না পারে। উইলিয়ম ওয়াট্‌স্ এবং ম্যাথু কলেট ছিলেন এ কারখানার পরিচালক এবং তাঁরাই উপরোক্ত মন্তব্য করেন— (হিলের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড)

কাশিমবাজার কারখানার সমুদয় কর্মচারীকে সিরাজ মুক্ত করে দেন। শুধুমাত্র ওয়াট্‌স্ এবং কলেটকে সাথে করে কোলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্বে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলকে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসার জন্যে বার বার পত্র লিখেন। কিন্তু তারা মোটেই কর্ণপাত করেনা। বরঞ্চ একটা সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্যে তারা সদাপ্রস্তুত থাকে। দাক্ষিণাত্য থেকে সামরিক সাহায্য লাভের পর তাদের সাহস অনেকখানি বেড়ে যায়। নবাবের কোলকাতা পৌঁছবার এক সপ্তাহ পূর্বে হুগলী নদীর নিম্নভাগে অবস্থিত থানা দুর্গ এবং হুগলী ও কোলকাতার মধ্যবর্তী সুখ সাগর দখলের জন্যে ড্রেক সৈন্য প্রেরণ করে। নবাব কর্তৃক প্রেরিত অগ্রবর্তী দল উভয়স্থানে ইংরেজদের আক্রমণ প্রতিহত করে। ১৬ই জুন ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ সিরাজ ফোর্ট উইলিয়ামের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন। দু'দিন ধরে যুদ্ধের পর ড্রেক তার মূল সেনাবাহিনীসহ ফলতায় পলায়ন করে। পলায়নের সুবিধার জন্যে হলওয়েলকে যুদ্ধে নিয়োজিত রাখা হয় এবং বলা হয় যে— পরদিন সেও যেন তার মুষ্ঠিমেয় সৈন্যসহ ফলতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু, হলওয়েল নবাবের সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। হাউস অব্ কমন্সের সিলেক্ট কমিটির সামনে উইলিয়ম টুক্ (William Tooke) যে সাক্ষ্য দান করে তাতে বলা হয় যে, আত্মসমর্পণকারী ইংরেজ সৈন্যদের প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করা হয়নি। (হিলের ইতিহাস ১ম খন্ড)। রাত্রি বেলায় প্রচুর মদ্যপানের পর কিছু সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করলে তাদেরকে ১৮´ x ১৪ মাপের একটি কক্ষে আবদ্ধ রাখা হয়। অবাধ্য ও দুর্বিনীত

সৈন্যদের আবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যেই কক্ষটি তাদেরই দ্বারা নির্মিত হয়েছিল; চল্লিশ থেকে ষাট জনকে এতে আবদ্ধ রাখা হয়। যুদ্ধে অত্যধিক পরিশ্রান্ত হওয়ার কারণে জন বিশেক সৈন্য প্রাণত্যাগ করে। এ ঘটনাকে অতিমাত্রায় অতিরঞ্জিত করে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান দেয়া হয়েছে। এ কাল্পনিক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে বিজয়ী শাসকগণ হলওয়েল মনুমেন্ট নামক একটি স্মৃতিস্তম্ভ কোলকাতায় ডাল্‌হাউসি স্কোয়ারে স্থাপন করে। এ স্তম্ভটি নবাব সিরাজদ্দৌলার কাল্পনিক কলংক-কালিমা বহন করে বিংশতি শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। উদ্দেশ্যমূলক ও নিছক বিদ্বেষাত্মক প্রচারণার উৎস এ স্তম্ভটি তীব্র প্রতিবাদের মুখে ১৯৩৭ সালের পূর্বেই ভেঙে দেয়া হয়।

যাহোক, হলওয়েল এবং অন্য তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য সকলের মুক্তি দেয়া হয়। ২৪শে জুন মানিক চাঁদকে কোলকাতার শাসনকার্যে নিয়োজিত করে সিরাজদ্দৌলা হলওয়েল ও তার তিনজন সাথীসহ মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন। ২৬শে জুন অবশিষ্ট ইংরেজ সৈন্যগণ কোলকাতা থেকে ফলতা গমন করে।

৩০শে জুন সিরাজদ্দৌলা ফোর্ট সেন্টজর্জের গভর্ণর জর্জ পিগ্‌ট্‌কে পত্র লিখেন। তার মর্ম ছিল এই যে, ইংরেজগণ যদি একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের উচ্চাভিলাষ পরিত্যাগ করে ব্যবসার শর্তাবলী মেনে চলতে থাকে, তাহলে তাদেরকে বাংলায় ব্যবসার পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে।

ফলতায় ইংরেজগণ

সিরাজদ্দৌলা আন্তরিকতার সাথে চেয়েছিলেন ইংরেজদের সংগে একটা ন্যায়সংগত মীমাংসায় উপনীত হতে। কিন্তু তাদের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলতায় বসে স্থানীয় হিন্দু প্রধানদের সাথে যে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করা হচ্ছিল তার থেকে তাদের মনোভাব ব্যক্ত হয়।

মাদ্রাজ থেকে যে সামরিক সাহায্য চাওয়া হয়েছিল, রজার ড্রেক তার প্রতীক্ষায় দিন গুণতে থাকে। এদিকে নবাবকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে ৬ই জুলাই একটা মীমাংসার জন্যে তারা কথাবার্তা শুরু করে। কিন্তু এর মধ্যে ছিলনা কোন আন্তরিকতা। মাদ্রাজ থেকে সামরিক সাহায্য এলেই তারা পুনরায় শক্তি পরীক্ষায় লেগে যাবে। এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রধানগণ ও বণিকশ্রেণী সকল প্রকারে ইংরেজদেরকে উৎসাহিত করতে থাকে। বিশেষ করে খাজা ওয়াজেদের প্রধান

সহকারী শিব বাবু নামক জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি সর্বদা ইংরেজদেরকে একথা বলতে থাকে যে, নবাব সিরাজদ্দৌলা আর তাদেরকে কিছুতে ব্যবসার সুযোগ সুবিধা দিবার পাত্র নন। কোলকাতায় পরাজয় বরণ করার পর কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া তাদের জন্যে কিছুতেই সম্মানজনক নয়। গোবিন্দরাম নামে অন্য একটি লোক সিরাজদ্দৌলার কোলকাতা অভিযানের সময় পথে বৃক্ষ উৎপাটন করে রেখে বাধার সৃষ্টি করেছিল। সে এখন ইংরেজদের পক্ষে গোপন তথ্য সরবরাহের কাজ শুরু করে। কোলকাতার শাসনভার যে মানিকচাঁদের উপর অর্পিত হয়েছিল, সে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফলতায় অবস্থিত ইংরেজদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে থাকে। সে নবাবের কাছে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য পেশ করতে থাকে যে ইংরেজরা একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসার জন্যে লালায়িত। অল্প সৈন্য নিয়ে কিছু করা যাবেনা চিন্তা করে মেজর কিল্‌প্যাট্রিক্‌ আপাততঃ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে এবং মাদ্রাজ থেকে বৃহত্তর সামরিক সাহায্য ও নৌবহর তলব করে। ১৭৫৬ সালের ১৫ই আগষ্ট কিল্‌প্যাট্রিক নবাবকে জানায় যে, তারা তাঁর অনুগ্রহপ্রার্থী। অপরদিকে ইংরেজদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য মানিক চাঁদ, জগতশেঠ ও অন্যান্য হিন্দু প্রধানদেরকে অনুরোধ করে পত্র লিখে।

মানিক চাঁদের মিথ্যা আশ্বাসবাণীতে নবাব বিভ্রান্ত হন এবং বলেন যে, ইংরেজরা যুদ্ধ করতে না চাইলে তাদেরকে ব্যবসায় সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। নবাবের বলতে গেলে নৌশক্তি বলে কিছুই ছিলনা। বিদেশী বণিকদেরকে বাংলার ভূখন্ড থেকে বিতাড়িত করে দিলেও, সমুদ্র উপকূল থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করার ক্ষমতা নবাবের ছিলনা। ইংরেজগণ এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ সিরাজদ্দৌলার সামনে নতুন এক বিপদ দেখা দেয়। পূর্ণিয়ার শওকত জং মোগল সম্রাটের নিকট থেকে এক ফরমান লাভ করতে সমর্থ হয়— যার বলে তাকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। ইংরেজগণ শওকত জং-এর পক্ষ অবলম্বন করে তার বিজয়ের আশা পোষণ করছিল। কিন্তু ৬ই আগষ্টের যুদ্ধে শওকত জং নিহত হওয়ায় তাদের সে আশা আপাততঃ ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

আগষ্টের মাঝামাঝি ড্রেক এবং কিল্‌প্যাট্রিক কর্তৃক কোলকাতার পতন সম্পর্কে লিখিত পত্রের জবাবে যথেষ্ট পরিমাণে সামরিক সাহায্য ইংলন্ড থেকে

মাদ্রাজ এসে পৌঁছে। সেপ্টেম্বরে কোম্পানীর দুটি জাহাজ চেষ্টারফিল্ড্‌ ও ওয়ালপোল মাদ্রাজ পৌঁছে যায়। অক্টোবরে ফোর্ট সেন্ট জর্জ কাউন্সিল রবার্ট ক্লাইভ্‌ এবং এডমিরাল ওয়াটসনের নেতৃত্বে একটি সামরিক অভিযান বাংলায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত করে। বাংলায় পৌঁছাবার পরপরই প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু করার জন্যে কর্ণেল ক্লাইভকে নির্দেশ দেয়া হয়। ফোর্ট সেন্ট্‌ জর্জ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ঢাকা, পূর্ণিয়া এবং কটকের ডিপুটি নবাবদেরকে ক্লাইভের সাথে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেয়া হয়। অপরদিকে ইংরেজদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে নবাবকেও পত্র দেয়া হয়। উক্ত কাউন্সিলের গভর্ণর জর্জ পিগ্‌টের পত্রে বলা হয় ঃ আমি একজন শক্তিশালী সর্দার পাঠাচ্ছি যার নাম ক্লাইভ। সৈন্য ও পদাতিক বাহিনীসহ সে যাচ্ছে এবং আমার স্থলে শাসন চালাবে। আমাদের যে ক্ষতি করা হয়েছে তার সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আপনি নিশ্চয় জেনে থাকবেন যে, আমরা যুদ্ধে সর্বত্রই জয়ী হয়েছি। (হিলের ইতিহাস, ১ম খন্ড)

এ পত্রের মর্ম পরিষ্কার যে, মীমাংসার আর কোন পথ রইলোনা। ১৫ই ডিসেম্বর ক্লাইভ্‌ ফলতায় পৌঁছে। মানিকচাঁদ কোম্পানীর প্রতি যে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও সাহায্য সহযোগিতা করে, তার জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেইদিনই ক্লাইভ তাকে পত্র লিখে। ক্লাইভের নিরাপদে পৌঁছার আনন্দ প্রকাশ করে মানিকচাঁদ পত্রের জবাব দান করে। সে আরও জানায় যে, সে কোম্পানীর যথাসাধ্য খেদমতে আত্মনিয়োগ করবে। উপরন্তু গোপন তথ্য আদান প্রদানের জন্যে সে রাধাকৃষ্ণ নামক এক ব্যক্তিকে ক্লাইভের নিকটে প্রেরণ করে। বাংলার বিরুদ্ধে বাংগালীর এর চেয়ে অধিকতর বিশ্বাসঘাতকতা আর কি হতে পারে?

পঞ্চম অধ্যায়

ইংরেজদের আক্রমণ ও নবাবের পরাজয়

উনত্রিশে ডিসেম্বর ক্লাইভের রণতরী হুগলী নদী দিয়ে অগ্রসর হয়ে বজবজ দখল করে। তার চার দিন আগে ক্লাইভ মানিকচাঁদের মাধ্যমে নবাবকে যে পত্র লিখে তাতে বলা হয়, নবাব আমাদের যে ক্ষতি করেছেন, আমরা এসেছি তার ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্যে, আমরা ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আসিনি তাঁর কাছে। আমাদের দাবী আদায়ের জন্যে আমাদের সেনাবাহিনীই যথেষ্ট। মানিকচাঁদ পত্রখানি নবাবকে দিয়েছিল কিনা জানা যায়নি। হয়তো দেয়নি। দিলে নবাব নিশ্চয়ই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। মানিকচাঁদ সর্বদা নবাবকে বিভ্রান্ত রেখেছে। তার ফলে বিনা বাধায় ক্লাইভ ৩১শে ডিসেম্বর থানা ফোর্ট এবং ১লা জানুয়ারী, ১৭৫৭ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ পুনরুদ্ধার করে। মানিকচাঁদ ইচ্ছা করলে নবাবের বিরাট সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে ইংরেজদের আক্রমণ সহজেই প্রতিহত করতে পারতো। সে তার কোন চেষ্টাই করেনি। কারণ ইংরেজদের দ্বারা তার এবং তার জাতির অভিলাষ পূর্ণ হতে দেখে সে আনন্দলাভই করছিল। এমনকি এ সকল স্থান ইংরেজ–কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার সংবাদটুকু পর্যন্ত সে নবাবকে দেয়া প্রয়োজন বোধ করেনি।

ইরেজদের হাতে বলতে গেলে, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ তুলে দিয়ে সে হুগলী গমন করে এবং হুগলী ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে পরিবেশ সৃষ্টি করতে থাকে। ক্লাইভ হুগলীতে তার নামে লিখিত পত্রে অনুরোধ জানায় যে, পূর্বের মতো সে যেন এখানেও বন্ধুত্বের পরিচয় দেয়। দু'দিন পর হুগলী আক্রমণ করে ক্লাইভ সহজেই তা হস্তগত করে। ইংরেজ কর্তৃক এতসব গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি অধিকৃত হওয়ার পর মানিকচাঁদ নবাবকে জানায় যে, ইংরেজদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। হুগলী অধিকারের পর ইংরেজ সৈন্যগণ সমগ্র শহরে লুটতরাজ অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বিরাট সন্ত্রাস সৃষ্টি করে।

হুগলীর পতন ও ধ্বংসলীলার সংবাদ পাওয়া মাত্র সিরাজদ্দৌলা বিরাট বাহিনীসহ ২০শে জানুয়ারী হুগলীর উপকণ্ঠে হাজির হন। ইংরেজগণ তখন তড়িৎগতিতে হুগলী থেকে পলায়ন করে কোলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

নবাব সিরাজদ্দৌলা একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্যে তাদেরকে বার বার অনুরোধ জানান। অনেক আলাপ আলোচনার পর ৯ই ফেব্রুয়ারী নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতিহাসে তা আলীনগরের সন্ধি বলে খ্যাত। এ সন্ধি অনুযায়ী ১৭১৭ সালের ফরমান মুতাবেক সকল গ্রাম ইংরেজদেরকে ফেরত দিতে হবে। তাদের পণ্যদ্রব্যাদি করমুক্ত হবে এবং তারা কোলকাতা অধিকতর সুরক্ষিত করতে পারবে। উপরন্তু সেখানে তারা একটা নিজস্ব টাকশাল নির্মাণ করতে পারবে।

সিরাজদ্দৌলাকে এ ধরনের অসম্মানজনক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। তার প্রথম কারণ হলো মানিক চাঁদের মতো তাঁর অতি নির্ভরযোগ্য লোকদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা। দ্বিতীয়তঃ আহমদ শাহ আবদালীর ভারত আক্রমণ এবং বাংলা অভিযানের সম্ভাবনা।

অপরদিকে ধূর্ত ক্লাইভের নিকটে এ সন্ধি ছিল একটা সাময়িক প্রয়োজন মাত্র। ইংরেজরা একই সাথে প্রয়োজনবোধ করেছিল নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার এবং ফরাসীদেরকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করার। এতদুদ্দেশ্যে ক্লাইভ ওয়াট্‌স্ এবং উমিচাঁদকে সিরাজদ্দৌলার কাছে পাঠিয়ে দেয় এ কথা বলার জন্যে যে, তারা ফরাসী অধিকৃত শহর চন্দরনগর অধিকার করতে চায় এবং তার জন্যে নবাবকে সাহায্য করতে হবে। এ ছিল তাদের এক বিরাট রণকৌশল (Strategy)। নবাব ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি তাঁর রাজ্যমধ্যে সর্বদা বিদেশী বণিকদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে আসছিলেন। এ নীতি কি করে ভংগ করতে পারেন? কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, ইংরেজদের সাহায্য না করলে তারা এটাকে তাদের প্রতি শত্রুতা এবং ফরাসীদের প্রতি মিত্রতা পোষণের অভিযোগ করবে। শেষ পর্যন্ত তিনি নিরপেক্ষ নীতিতেই অবিচল থাকার সিদ্ধান্ত করেন। তদনুযায়ী তিনি সেনাপতি নন্দকুমারকে নির্দেশ দেন যে, ইংরেজরা যদি চন্দরনগর আক্রমণ করে তাহলে ফরাসীদের সাহায্য করতে হবে। অনুরূপভাবে ফরাসীরা যদি ইংরেজদেরকে আক্রমণ করে তাহলে ইংরেজদেরকে সাহায্য করতে হবে। ক্লাইভ দশ–বারো হাজার টাকা উৎকোচ দিয়ে নন্দকুমারকে হাত করে। সে একই পন্থায় নবাবের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানকেও বশ করে। এভাবে ক্লাইভ চারদিকে উৎকোচ ও বিশ্বাসঘাতকতার এমন এক জাল বিস্তার করে যে, সিরাজদ্দৌলা কোন বিষয়েই দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে পারেন না। উপরন্তু হিন্দু শেঠ

ও বেনিয়াগণ এবং তাঁর নিমকহারাম কর্মচারীগণ, যারা মনে প্রাণে মুসলিম শাসনের অবসান কামনা করে আসছিল, সিরাজদ্দৌলাকে হরহামেশা কুপরামর্শই দিতে থাকে। তারা বলে যে, ইংরেজদেরকে কিছুতেই রুষ্ট করা চলবে না। ওদিকে আহমদ শাহ আবদালীর বিহার সীমান্তে উপনীত হওয়ার মিথ্যা সংবাদ দিয়ে বাংলা–বিহার রক্ষার উদ্দেশ্যে বিরাট সেনাবাহিনী সেদিকে প্রেরণ করার কুপরামর্শ দেয়। এভাবে ইংরেজদের অগ্রগতির পথ সুগম করে দেয়া হয়।

ইতিমধ্যে ৫ই মার্চ ইংলন্ড থেকে সৈন্যসামন্তসহ একটি নতুন জাহাজ 'কাম্বারল্যান্ড' কোলকাতা এসে পৌঁছায়। ৮ই মার্চ ক্লাইভ চন্দরনগর অবরোধ করে। নবাব রায়দুর্লভ রাম এবং মীর জাফরের অধীনে একটি সেনাবাহিনী চন্দরনগর অভিমুখে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাদের পৌঁছাবার পূর্বেই ফরাসীগণ আত্মসমর্পণ করে বসে। তারা চন্দরনগর ছেড়ে যেতে এবং বাংলায় অবস্থিত তাদের সকল কারখানা এড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন এবং নবাবের হাতে তুলে দিয়ে যেতে রাজী হয়। অতঃপর বাংলার ভূখন্ড থেকে ফরাসীদের মূলোচ্ছেদ করার জন্যে ক্লাইভ নবাবের কাছে দাবী জানায়। উপরন্তু পাটনা পর্যন্ত ফরাসীদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর দু'হাজার সৈন্য স্থলপথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে নবাবের অনুমতি প্রার্থনা করে। নবাব এ অন্যায় অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। এতে ফরাসীদের সাহায্য করা হয়েছে বলে নবাবের প্রতি অভিযোগ আরোপ করা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল কমিটি ২৩শে এপ্রিল নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। তারা আরও ভিত্তিহীন অভিযোগ করে যে, নবাব আলীনগরের চুক্তি ভংগ করেছেন।

নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে ক্লাইভ পাকাপোক্ত ষড়যন্ত্র করে, সিরাজেরই তথাকথিত আপন লোক রায়দুর্লভ রাম, উমিচাঁদ ও জগৎশেঠ ভ্রাতৃবৃন্দের সাথে। তাদেরই পরামর্শে নবাবের বখ্‌শী (বেতনদাতা কর্মচারী) মীর জাফরকে নবাবের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করা হয়। ইংরেজ ও মীর জাফরের মধ্যেও সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। শুধু উমিচাঁদ একটু অসুবিধার সৃষ্টি করে। সে নবাবের যাবতীয় ধন–সম্পদের শতকরা পাঁচ ভাগ দাবী করে বসে। অন্যথায় সকল ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়ার হুমকি দেয়। ক্লাইভ উমিচাঁদকে খুশী করার জন্যে ওয়াটসনের জাল স্বাক্ষরসহ এক দলিল তৈরী করে। মীর জাফরের সংগে সম্পাদিত চুক্তিতে সে আলীনগরের চুক্তির সকল শর্ত পুরাপুরি পালন

করতে বাধ্য থাকবে বলে স্বীকৃত হয়। উপরন্তু সে স্বীকৃত হয় ক্ষতিপূরণ বাবদ কোম্পানীকে দিতে হবে এক কোটি টাকা, ইউরোপীয়ানদেরকে পঞ্চাশ লক্ষ, হিন্দু প্রধানদেরকে বিশ লক্ষ এবং আরমেনিয়ানদেরকে সাত লক্ষ টাকা। কোলকাতা এবং তার দক্ষিণে সমুদয় এলাকা চিরদিনের জন্যে কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে হবে।

সুচতুর ক্লাইভ নবাবের সন্দেহ নিরসনের জন্যে চন্দরনগর থেকে সৈন্য অপসারণ করে। মীর জাফর পরিকল্পিত বিপ্লব ত্বরান্বিত করার জন্যে ক্লাইভকে অতিরিক্ত বায়ান্ন লক্ষ টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিতে সম্মত হয়।

আহমদ শাহ আবদালীর ভারত ত্যাগের পর সিরাজদ্দৌলা মীর জাফরকে একটি সেনাবাহিনীসহ পলাশী প্রান্তরে ইংরেজদের প্রতিহত করার আদেশ করেন যদি তারা ফরাসীদের অনুসরণে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়। ক্লাইভ সিরাজদ্দৌলাকে জানায় যে, যেহেতু আলীনগর চুক্তি পালনে ব্যর্থ হয়েছেন, সেহেতু ব্যাপারটির পর্যালোচনার জন্যে মীর জাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ রাম, মীর মদন এবং মোহনলালকে দায়িত্ব দেয়া হোক। কিন্তু ওদিকে সংগে সংগে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ অভিমুখে তার সৈন্য প্রেরণ করে। সিরাজ পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ সৈন্যদের সম্মুখীন হন। নবাবের সৈন্য পরিচালনার ভার ছিল মীর জাফর, রায়দুর্লভ রাম প্রভৃতির উপর। তারা চরম মুহূর্তে সৈন্য পরিচালনা থেকে বিরত থাকে। ফলে ক্লাইভ যুদ্ধ না করেও জয়লাভ করে। হতভাগ্য সিরাজ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেন, কিন্তু পথিমধ্যে মীর জাফরপুত্র মীরন তাকে হত্যা করে। এভাবে পলাশীর বেদনাদায়ক রাজনৈতিক নাটকের যবনিকাপাত হয়।

পলাশী যুদ্ধের পটভূমির বিশদ বিবরণ থেকে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

এক. বাংলার জমিদার প্রধান, ধনিক বণিক ও বেনিয়া গোষ্ঠী দেশের স্বাধীনতার বিনিময়ে হলেও মুসলিম শাসনের অবসানকল্পে ইংরেজদের সংগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

দুই. ইংরেজগণ হিন্দুপ্রধানদের মনোভাব বুঝতে পেরে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্যে হিন্দুদেরকে পুরাপুরি ব্যবহার করে।

তিন. নবাবের সকল দায়িত্বপূর্ণ পদে যারা অধিষ্ঠিত ছিল তারা সকলেই ছিল হিন্দু এবং তাদের উপরেই তাঁকে পুরাপুরি নির্ভর করতে হতো। কিন্তু যাদের

উপরে তিনি নির্ভর করতেন তারাই তাঁর পতনের জন্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

চার. পলাশীর যুদ্ধকে যুদ্ধ বলা যায় না। এ ছিল যুদ্ধের প্রহসন। ইংরেজদের চেয়ে নবাবের সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেক গুণ বেশী। নবাবের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করলে ইংরেজ সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো এবং ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো। অথবা সিরাজদ্দৌলা যদি স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করতেন, তাহলেও তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হতো না।

পাঁচ. ইংরেজদের আচরণ ছিল আগাগোড়া শঠতাপূর্ণ এবং হিন্দুদের সাহায্যে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, মিথ্যা ও দুর্নীতির মাধ্যমে এক বিরাট ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করে তারা সিরাজদ্দৌলাকে ফাঁদে আবদ্ধ করে।

ছয়. যাদেরকে সিরাজ দেশপ্রেমিক ও তাঁর শুভাকাংখী মনে করেছিলেন— তারা যে দেশের স্বাধীনতা বিক্রয় করে তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করবে, একথা বুঝতে না পারা তাঁর মারাত্মক ভুল হয়েছে। অথবা বুঝতে পেরেও তাঁর করার কিছুই ছিল না। তাঁর এবং তাঁর পূর্ববর্তী শাসকদের দ্বারা দুধ-কলা দিয়ে পোষিত, বর্ধিত ও পালিত কালসর্প অবশেষে তাঁকেই দংশন করে জীবনের লীলা সাংগ করলো।

পলাশীর মর্মন্তুদ নাটকের পর

পলাশী প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় শুধুমাত্র এক ব্যক্তির পরাজয় নয়। বাংলা-বিহার তথা গোটা ভারত উপমহাদেশের পরাজয়। এ পরাজয় দ্বার উন্মোচন করে দেয় ভারতের উপরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের। শুধু তাই নয়। এ পরাজয় সিরাজদ্দৌলার নয়, বাংলা বিহারের নয়, ভারতেরও নয়, এ পরাজয় এশিয়ার ইউরোপের কাছে, প্রাচ্যের প্রতীচ্যের কাছে। পরবর্তী ধারাবাহিক ঘটনাপুঞ্জ এ কথারই সাক্ষ্য দান করে। নিদেনপক্ষে ভারত উপমহাদেশের উপরে ব্রিটিশ আধিপত্য ও প্রভুত্ব চলেছিল একশ' নব্বই বছর ধরে।

পলাশীর এ বেদনাদায়ক রাজনৈতিক নাটকের পরিচালক কে বা কারা ছিল, বাংলা-বিহার তথা ভারত উপমহাদেশের গলায় দু'শ' বছরের জন্যে পরাধীনতার শৃংখল কে বা কারা পরিয়ে দিয়েছিল, ইতিহাস তাদেরকে খুঁজে বের করতে ভোলেনি। অতীব ঘৃণিত ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, উৎকোচের মাধ্যমে মস্তক ক্রয় এবং কাল্পনিক অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিশোধ গ্রহণের হিংস্র নীতি অবলম্বনে,

যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র পরিচালনা না করেই, ক্লাইভ ও তার গোত্র-গোষ্ঠী সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত ও নিহত করে এ দেশে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হয়েছিল।

সিরাজদ্দৌলার পতনের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করা হ'য়েছে। ১৭৫৭ সালের পর যাদের বিজয় নিনাদ প্রায় দু'শ' বছর পর্যন্ত ভারত তথা এশিয়ার বিশাল ভূখন্ডে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল এবং এ বিজয় লাভে সহায়ক শক্তি হিসেবে যাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল, তাদেরই মনোপূত ও মনগড়া ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলাকেই দায়ী করার হাস্যকর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সত্যিকার ইতিহাস কি তাই?

বিরাট মোগল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে পড়েছিল— ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বাধীন আধা স্বাধীন শাসক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। মারাঠাশক্তি উত্তর ও মধ্য ভারতকে গ্রাস করার পরিকল্পনা নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু আহমদ শাহ আবদালী পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) তাদের শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। বাদশাহ আকবর ভারতের দুর্ধর্ষ মুসলিম সামরিক শক্তির বিনাশ সাধন করেছিলেন। বিকল্প কোন সামরিক শক্তি গঠিত হ'তে পারেনি। নৌশক্তি বলতে মুসলমানদের কিছুই ছিলনা বল্লেও চলে। ইংরেজ বণিকগণ এদেশে এসেছিল দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে। ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণ, নৌবহর-স্থাপন, স্বদেশ থেকে সৈন্যবাহিনী আমদানী প্রভৃতির দ্বারা ক্রমশঃ শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছিল। তাদের এ উদ্দেশ্য সাধনে সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল— বাংলার দেশপ্রেমিক (?) বাংগালী হিন্দু ধনিক বণিক শ্রেণী।

বাংলায় মুর্শিদকুলী খাঁর সময় থেকে সকল প্রশাসনক্ষেত্র থেকে মুসলমানদেরকে অপসারিত করে তথায় বাংলার হিন্দুদের জন্যে স্থান করে দেয়া হয়েছিল। এ ছিল অতীব স্বদেশপ্রীতি ও একদেশদর্শী উদারতার ফল। যদিও পরবর্তীকালে তার মাশুল দিতে হয়েছে কড়ায় গন্ডায়। আলীবর্দীর সময় থেকে তারাই হ'য়ে পড়ে রাজ্যের সর্বেসর্বা। বাংলার মসনদ লাভ ছিল তাদেরই কৃপার উপরে একান্ত নির্ভরশীল। তারা ছিল বাংলার রাজস্রষ্টা (King-Makers)।

সিরাজদ্দৌলা নবাব আলীবর্দীর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত হওয়ার সময় জগৎশেঠ ভ্রাতৃবৃন্দ, মানিক চাঁদ, দুর্লভ রাম প্রভৃতি এমন শক্তিশালী ছিল যে, তাদের

বিরাগভাজন হয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকা সিরাজের পক্ষে ছিল অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু এসব শক্তিশালী রাজকর্মচারীবৃন্দ রাজকোষ দ্বারা লালিত-পালিত হওয়া সত্ত্বেও প্রভুর প্রতি কণামাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মনোভাব পোষণ করেনি। তারা সর্বদা সিরাজকে কুপরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরঞ্চ ভিতরে ভিতরে কোম্পানীর সাথে একাত্মতাই পোষণ করেছে। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সিরাজের পতনের মাধ্যমে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে এদেশে ইংরেজ শাসন পত্তন করতে।

সিরাজদ্দৌলা শুধু একজন দেশপ্রেমিকই ছিলেন না। তিনি একজন অত্যন্ত সাহসী বীরপুরুষও ছিলেন। ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই তিনি যেরূপ ক্ষিপ্রতার সাথে ঘেসেটি বেগম ও শওকত জং-এর বিদ্রোহ দমন করেন, তাতে তাঁর সৎসাহস ও বিচক্ষণতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকবার ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষেও তাঁর বিজয় সূচিত হয়। আলম চাঁদ, জগৎশেঠ প্রভৃতি হিন্দু প্রধানগণ যদি চরম বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা পালন না করতো, তাহলে বাংলার ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো। মীর জাফরের ভূমিকাও কম নিন্দনীয় নয়। কিন্তু পলাশী নাটকের সবচেয়ে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত ব্যক্তি করা হয়েছে তাকে। কোলকাতা ফোর্ট উইলিয়মের যুদ্ধে ইংরেজদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার পর নবাব সিরাজদ্দৌলা কোলকাতা শাসনের ভার অর্পণ করেন মানিক চাঁদের উপর। মানিক চাঁদ ইংরেজদেরকে কোলকাতা ও হুগলীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত হয় রায় দুর্লভ রাম, উমিচাঁদ ও জগৎশেঠ ভ্রাতৃবৃন্দের পরামর্শে। এ কাজের জন্যে মীর জাফরকে বেছে নেয়া হয় শিখণ্ডী হিসাবে অথবা 'শো বয়' হিসাবে। এদেরই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পড়েছিল মীর জাফর। মীর জাফর যে দোষী ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ হীন ষড়যন্ত্রে তার অংশ কতটুকুই বা ছিল? বড়োজোর এক আনা। কিন্তু তার দুর্ভাগ্যের পরিহাসই বলতে হবে যে, ইতিহাসে তার চেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি আর কেউ নেই। তাই সকল সময়ে বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তির নামের পূর্বে 'মীর জাফর' শব্দটি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।

দেশপ্রেমিক সিরাজদ্দৌলা বাংলা বিহারের স্বাধীনতা বিদেশী শক্তির হস্তে বিক্রয় না করার জন্যে মীর জাফরসহ হিন্দু প্রধানগণের কাছে বার বার আকুল আবেদন জানান। কিন্তু তাঁর সকল নিবেদন আবেদন অরণ্যে-রোদনে পরিণত হয়।

বিশ্বাসঘাতকের দল তাদের বহুদিনের পুঞ্জিভূত আক্রোশের প্রতিশোধ গ্রহণ করে দেশের স্বাধীনতার বিনিময়ে। এতেও তাদের প্রতিহিংসা পুরাপুরি চরিতার্থ হয়নি। সিরাজদ্দৌলাকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করেই তারা তাদের প্রতিহিংসার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত করে।

সিরাজদ্দৌলাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে অপসারিত করে অন্য কাউকে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত করা— ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা চেয়েছিল এদেশে তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে। মীর জাফরকে তারা কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ গদিতে প্রতিষ্ঠিত করে। মীর জাফর তাদের ক্রমবর্ধমান অন্যায় দাবী মিটাতে সক্ষম হয়নি বলে তাকেও অবশেষে সরে দাঁড়াতে হয়। হিন্দু প্রধানদের নিকটে শুধু সিরাজদ্দৌলাই অপ্রিয় ছিলেন না। যদি তাই হতো, তাহলে তাঁর স্থলে তাদেরই মনোনীত ব্যক্তি মীর জাফর এবং তারপর তাদেরই মনোনীত মীর কাসিম তাদের অপ্রিয় হতো না। তাদের একান্ত কামনার বস্তু ছিল মুসলিম শাসনের অবসান। তাই নিজের দেশের স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়ে মুসলিম শাসনের পরিবর্তে বিদেশী শাসনের শৃংখল স্বেচ্ছায় গলায় পরিধান করতে তারা ইতস্ততঃ করেনি। মীর জাফরের পর মীর কাসিম আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করতে এবং তার সংগে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু তিনিও ইংরেজদের অদম্য ক্ষুধার খোরাক যোগাতে পারেননি বলে বাংলার রাজনৈতিক অংগন থেকে তাঁকেও বিদায় নিতে হয়। (হিল, যদুনাথ সরকার; ম্যালিসন, ডঃ মোহর আলী)

বাংলা বিহার তথা ভারতে বৃটিশ রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দু'শ' বছরে এ দেশের জনগণের ভাগ্যে যা হবার তাই হয়েছে। অবশ্য কিছু বৈষয়িক মংগল সাধিত হলেও পরাধীনতার অভিশাপ, লাঞ্ছনা-অপমান জাতিকে জর্জরিত করেছে। সিরাজদ্দৌলার পতনের অব্যবহিত পরে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ করে মুসলমানদের উপরে যে শোষণ নিষ্পেষণ চলেছিল তার নজির ইতিহাসে বিরল। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দারিদ্র, দেশকে গ্রাস করে ফেলে। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে।

সিরাজদ্দৌলার পতনের পর বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

পলাশী ও বকসারের যুদ্ধের পর বাংলার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর নামমাত্র মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী মঞ্জুর করার পর এ অঞ্চলের উপরে তাদের আইনগত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলার যে চিত্র ফুটে উঠে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও নৈরাশ্যজনক। পলাশী যুদ্ধের পর মীর জাফর প্রভৃতি নামমাত্র নবাব থাকলেও সামরিক শক্তির নিয়ন্তা ছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। ১৭৬৫ সালের পর দেশের অর্থনীতিও সম্পূর্ণ তাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সর্বাপেক্ষা ও সর্বদিক দিয়ে।

সিরাজদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে উমিচাঁদ-মীর জাফরের সাথে কোম্পানীর যে ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি সম্পাদিত হয়, তার অর্থনৈতিক দাবী পূরণ করতে গিয়ে বাংলার রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কোম্পানীকে ভূয়া ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হয়একশ' লক্ষ টাকা। ইউরোপীয়দেরকে পঞ্চাশ লক্ষ, হিন্দু প্রধানকে বিশ লক্ষ এবং আরমেনীয়দেরকে সাত লক্ষ টাকা। বিপ্লব ত্বরান্বিত করার জন্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পূর্বেই ক্লাইভকে দিতে হয় বায়ান্ন লক্ষ টাকা (Fall of Sirajuddowla- Dr. Mohar Ali)।

মীর জাফরের ভূয়া নবাব হিসাবে বাংলার মসনদে আরোহণ করার পর কোম্পানীর দাবী উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। মীর জাফর, তাদেরকে প্রীত ও সন্তুষ্ট রাখতে বাধ্য হয়। রাজস্ব বিভাগ কোম্পানীর পরিচালনাধীন হওয়ার পর কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে হিন্দু ও ইংরেজ আদায়কারীগণ অতিমাত্রায় শোষণ নিষ্পেষণের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় ক'রে কোম্পানীর রাজকোষ পূর্ণ করতে থাকে। ইতিপূর্বে প্রজাদের নিকট থেকে আদায়কৃত সকল অর্থ দেশের জনগণের মধ্যে তাদেরই জন্যে ব্যয়িত হতো। তখন থেকে ইংলন্ডের ব্যাংকে ও ব্যবসা কেন্দ্রগুলিতে স্থানান্তরিত হতে থাকে।

১৭৭৬ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের বেলায় কোন প্রকার অনুকম্পা প্রদর্শিত হয়নি। দুর্ভিক্ষ যখন চরম

আকার ধারণ করে, তখন পূর্বের বৎসরের তুলনায় ছয় লক্ষ টাকা অধিক রাজস্ব আদায় করা হয়, বাংলা ও বিহার থেকে পরবর্তী বছর অতিরিক্ত চৌদ্দ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। মানব সন্তানেরা যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল, তখন তাদের রক্ত শোষণ করে পৈশাচিক উল্লাসে নৃত্য করছিল ইংরেজ ও তাদের রাজস্ব আদায়কারীগণ। এসব রাজস্ব আদায়কারী ছিল কোলকাতার হিন্দু বেনিয়াগণ, সুদী মহাজন ও ব্যবসায়ীগণ। মানবতার প্রতি এর চেয়ে অধিক নির্মমতা ও পৈশাচিকতা আর কি হতে পারে? (Baden Powel- Land system etc.— British Policy & the Muslims in Bengal— A. R. Mallick)।

আর এক ঘৃণিত পন্থায় এদেশের অর্থসম্পদ লুণ্ঠন করা হতো। কোম্পানী এবং তাদের কর্মচারীগণ যাকে খুশী তাকে নবাবের পদে অধিষ্ঠিত করতে পারতো এবং যাকে খুশী তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতো। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত মাত্র আট-ন' বছরে এ ব্যাপারে কোম্পানী ও তার দেশী-বিদেশী কর্মচারীদের পকেটে যায় কমপক্ষে ৬২,৬১,১৬৫ পাউন্ড। প্রত্যেক নবাব কোম্পানীকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দানের পরও বহু মূল্যবান উপঢৌকনাদি দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতো।

আবদুল মওদুদ বলেন ঃ

পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে ষড়যন্ত্রকারী দল কী মহামূল্য দিয়ে ব্রিটিশ রাজদন্ড এ দেশবাসীর জন্য ক্রয় করেছিল, তার সঠিক খতিয়ান আজও নির্ণীত হয়নি। হওয়া সম্ভব নয়। কারণ— কেবল লিখিত বিবরণ থেকে তার কিছুটা পরিমাণ জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। কিন্তু হিসাবের বাইরে যে বিপুল অর্থ সাগর পারে চালান হয়ে গেছে, কিভাবে তার পরিমাপ করা যাবে?

ব্রিটিশ আমলে বাংলার অর্থনীতি মানেই হলো— সুপরিকল্পিত শোষণের মর্মভেদী ইতিহাস। ঐতিহাসিকরা মোটামোটি হিসাব করে বলেছেন, ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত মাত্র তেইশ বছরে বাংলা থেকে ইংলন্ডে চালান গেছে প্রায় তিন কোটি আশি লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ সমকালীন মূল্যের ষাট কোটি টাকা। কিন্তু ১৯০০ সালের মূল্যমানের তিনশো কোটি টাকা। (I.O. Miller, quoted by Misra, p. 15)।

মুর্শিদাবাদের খাযাঞ্চিখানা থেকে পাওয়া গেল পনর লক্ষ পাউন্ডের টাকা, অবশ্য বহুমূল্য মণিমাণিক্য দিয়ে। ক্ষতিপূরণ হিসেবে ব্রিটিশ স্থলসেনা ও নৌসেনা পেলো চার লক্ষ পাউন্ড; সিলেক্ট কমিটির ছয়জন সদস্য পেলেন নয় লক্ষ পাউন্ড; কাউন্সিল মেম্বররা পেলেন প্রত্যেকে পঞ্চাশ থেকে আশি হাজার পাউণ্ড; আর খোদ ক্লাইভ পেলেন দু'লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউণ্ড, তাছাড়া ত্রিশ হাজার পাউন্ড বার্ষিক আয়ের জমিদারীসহ বাদশাহ প্রদত্ত উপাধি 'সাবাত জং'। অবশ্য পলাশী বিজয়ী ক্লাইভের ভাষায় 'তিনি এতো সংযম দেখিয়ে নিজেই আশ্চর্য'। মীর কাসিম দিয়েছেন নগদ দু'লক্ষ পাউন্ড কাউন্সিলের সাহায্যের জন্যে। মীর জাফর নন্দন নজমদ্দৌলা দিয়েছেন এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাউন্ড। এছাড়া সাধারণ সৈনিক, কুঠিয়াল ইংরেজ কত লক্ষ মুদ্রা আত্মসাৎ করেছে, বলা দুঃসাধ্য। বিখ্যাত জরিপবিদ জেম্‌স্ রেনেল ১৭৬৪ সালে বাইশ বছর বয়সে বার্ষিক হাজার পাউন্ডে নিযুক্ত হন, এবং ১৭৭৭ সালে বিলাত ফিরে যান ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার পাউন্ড আত্মসাৎ করে। এ থেকেই অনুমেয়, কোম্পানীর কর্মচারীরা কী পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করতেন। তারা এ দেশে কোম্পানী রাজ্যের প্রতিভূ হিসেবে এবং চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর হোমে প্রত্যাগত হয়ে এরূপ রাজসিক হালে বাস করতেন যে, তাঁরা 'ইন্ডিয়ান নেবাব্‌স' রূপে আখ্যাত হতেন। ... ক্লাইভ নিজেই স্বীকার করেছেন, "আমি কেবল স্বীকার করতে পারি, এমন অরাজকতা বিশৃংখলা, উৎকোচ গ্রহণ, দুর্নীতি ও বলপূর্বক ধনাপহরণের পাশব চিত্র বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও দৃষ্ট হয়নি।" অথচ নির্লজ্জ ক্লাইভই এ শোষণ যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, আবদুল মওদুদ, পৃঃ ৬০-৬২)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলিম সমাজের দুর্দশা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বাংলার স্বাধীনতা বিনষ্ট হওয়ার পর মুসলিম সমাজের যে সীমাহীন দুর্দশা হয়েছিল, তা নিম্নের আলোচনায় সুস্পষ্ট হবে।

পলাশী যুদ্ধের পূর্বে সামরিক ও বেসামরিক চাকুরীক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। কোম্পানী ক্ষমতা হস্তগত করার পর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের প্রথম ধাপেই মুসলিম সেনাবাহিনী ভেঙে দেয়া হয়। তার ফলে কিছু উচ্চশ্রেণীর কর্মচারীই বেকার হয়ে পড়েনি, বরঞ্চ হাজার হাজার নিম্নবেতনভুক কর্মচারীও কর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। ফলে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে বেকারত্ব ও দারিদ্রের মুখে ঠেলে দেয়া হয়।

দ্বিতীয়তঃ দেশের গোটা রাজস্ব বিভাগকে ইংলন্ডের পদ্ধতিতে পুনর্গঠিত করার ফলে বহুসংখ্যক মুসলমান কর্মচ্যুত হয়। সরকারের ভূমি রাজস্ব নীতি অনুযায়ী বহু মুসলমান জমিদার তাদের জমিদারী থেকে উচ্ছেদ হয়। ১৭৯৩ সালে গ্রাম্য পুলিশ প্রথা রহিতকরণের ফলেও হাজার হাজার মুসলমান বেকার হয়ে পড়ে। এভাবে এ দেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উচ্চশ্রেণীর মুসলমান শুধু সরকারী চাকুরী থেকেই বঞ্চিত হয়নি, জীবিকার্জনের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়।

নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের পেশা ছিল সাধারণতঃ কৃষি ও তাঁতশিল্প। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ থেকে মানচেস্টারের মিলজাত বস্ত্রাদি প্রচুর পরিমাণে আমদানীর ফলে, বাংলার তাঁতশিল্প ধ্বংস হয় এবং লক্ষ লক্ষ তাঁতীও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। তারপর শুধু কৃষির উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করা তাদের জন্যে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

কোম্পানী এ দেশে আগমনের পর থেকেই কোলকাতার হিন্দু বেনিয়াগণ তাদের অধীনে চাকুরী-বাকুরী করে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে পড়ে। তাদেরকে বলা হতো 'গোমস্তা'। পলাশী যুদ্ধের পর নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এদের হয়েছিল পোয়াবারো। কোম্পানীর একচেটিয়া লবণ ব্যবসায় এবং আভ্যন্তরীণ অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যে এসব গোমস্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে প্রভূত

অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু এতদ্দেশীয় ব্যবসা ধ্বংস করে জনগণকে চরম, দুর্দশাগ্রস্ত ক'রে ফেলে। কোম্পানীর দেশী-বিদেশী কর্মচারীগণ ইংলন্ড থেকে আমদানীকৃত দ্রব্যাদি অত্যধিক উচ্চমূল্যে খরিদ করতে এবং দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় করতে জনসাধারণকে বাধ্য করে। তাদের উৎপীড়ন-নির্যাতনের বিবরণ দিতে হলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। কোম্পানীর অত্যাচার-উৎপীড়নে পূর্ণ সহায়তা করে বাংলার হিন্দু কর্মচারীগণ। ১৭৮৬ সালে কালীচরণ নামে জনৈক গোমস্তার জুলুম-নিষ্পেষণে ত্রিপুরা অঞ্চলকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার অপরাধে তাকে সেখান থেকে অপসারিত ক'রে চট্টগ্রামে রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান বা ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়। এক বৎসরে সে চট্টগ্রামের জমিদারের নিকট থেকে অন্যায়ভাবে ত্রিশ হাজার টাকা আদায় করে। লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকটে বিষয়টি উপস্থাপিত করলে, চট্টগ্রামের রাজস্ব কন্ট্রোলার মিঃ বার্ড বলেন, কালীচরণকে চাকুরী থেকে অপসারিত ক'রে তার স্থলে তার গোমস্তা নিত্যানন্দকে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু কোলকাতার অতি প্রভাবশালী গোমস্তা জয় নারায়ণ গোসাই-এর হস্তক্ষেপের ফলে বিষয়টির এখানেই যবনিকাপাত হয় এবং কালীচরণ তার পদে সসম্মানে বহাল থাকে।

এ একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, কোম্পানীর হিন্দু কর্মচারীগণ গ্রামবাংলার ধ্বংস সাধনে কোন্ সর্বনাশা ভূমিকা পালন করেছিল। জনৈক ইংরেজ মন্তব্য করেন : ইংরেজ ও তাদের আইন-কানুন যে একটিমাত্র শ্রেণীকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করেছিল তা হলো, তাদের অধীনে নিযুক্ত এতদ্দেশীয় গোমস্তা-দালাল প্রতিনিধিগণ। এসব লোক পংগপালের মতো যেভাবে দ্রুতগতিতে গ্রামবাংলাকে গ্রাস করতে থাকে তাতে করে তারা ভারতের অস্তিত্বের মূলেই আঘাত করছিল।—(Muinuddin Ahmad Khan, Muslim Struggle for Freedom in Bengal, pp. 8)।

ইংরেজদের পলিসি ছিল, যাদের সাহায্যে তারা এ দেশের স্বাধীনতা হরণ ক'রে এখানে রাজনৈতিক প্রভুত্ব লাভ করেছে, তাদেরকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে মুসলমানদেরকে একেবারে উৎখাত করা, যাতে ক'রে ভবিষ্যতে তারা আর কখনো স্বাধীনতা ফিরে পাবার কোন শক্তি অর্জন করতে না পারে। হ্যাস্টিংসের ভূমি ইজারাদান নীতি ও কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হিন্দুরা মুসলমান জমিদারদের স্থান দখল করে। নগদ সর্বোচ্চ মূল্যদাতার

নিকটে ভূমি ইজারাদানের নীতি কার্যকর হওয়ার কারণে প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদারগণ হঠাৎ সর্বোচ্চ মূল্য নগদ পরিশোধ করতে অপারগ হয়। পক্ষান্তরে হিন্দু বেনিয়া শ্রেণী, সুদী মহাজন, ব্যাংকার ও হিন্দু ধনিক-বণিক শ্রেণী এ সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। প্রাচীন জমিদারীর অধিকাংশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এসব ধনিক-বণিকদের কাছে অচিরেই হস্তান্তরিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান জমিদারদের অধীনে নিযুক্ত হিন্দু নায়েব-ম্যানেজার প্রভৃতির স্বীকৃতি দান। ১৮৪৪ সালের Calcutta Review-তে যে তথ্য প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয় এক ডজন জমিদারীর মধ্যে, যাদের জমিদারীর পরিধি ছিল একটি ক'রে জেলার সমান, মাত্র দু'টি পূর্বতন জমিদারদের দখলে রয়ে যায় এবং অবশিষ্ট হস্তগত হয় প্রাচীন জমিদারদের নিম্নকর্মচারীর বংশধরদের। এভাবে বাংলার সর্বত্র এক নতুন জমিদার শ্রেণীর পত্তন হয়, যারা হয়ে পড়েছিল নতুন বিদেশী প্রভুদের একান্ত অনুগত ও বিশ্বাসভাজন।

হান্টার তাঁর The Indian Mussalmans গ্রন্থে বলেন : যেসব হিন্দু কর আদায়কারীগণ ঐ সময় পর্যন্ত নিম্নপদের চাকুরীতে নিযুক্ত ছিল, নয়া ব্যবস্থার বদৌলতে তারা জমিদার শ্রেণীতে উন্নীত হয়। নয়া ব্যবস্থা তাদেরকে জমির উপর মালিকানা অধিকার এবং সম্পদ আহরণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। অথচ মুসলমানেরা নিজেদের শাসনামলে এ সুযোগ সুবিধাগুলো একচেটিয়াভাবে ভোগ করেছে। —(Hunter, The Indian Mussalmans;অনুবাদ আনিসুজ্জামান, পৃঃ ১৪১)।

মুসলিম শাসনামলে আইন ছিল যে, জমিদারগণ সমাজবিরোধী, দুষ্কৃতিকারী ও দস্যু-তস্করের প্রতি কড়া নজর রাখবে। ধরা পড়লে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিসহ তাদেরকে সরকারের নিকটে সমর্পণ করবে। ১৭৭২ সালে কোম্পানী এ আইন রহিত করে। ফলে, নতুন জমিদারগণ দস্যু-তস্করকে ধরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে তাদের প্রতিপালন করে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির অংশীদার হতে থাকে। এটা অনুমান করতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, এসব দস্যু-তস্কর কারা ছিল, এবং কারা ছিল গ্রামবাংলার লুণ্ঠিত হতভাগ্যের দল। ১৯৪৪ সালে Calcutta Review-তে প্রকাশিত তথ্যে বলা হয় যে, এসব নতুন জমিদারগণ দস্যু-তস্করদেরকে প্রতিপালন করতো ধন অর্জনের উদ্দেশ্যে। ১৭৯৯ সালে প্রকাশিত ঢাকা-

জালালপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টেও এসব দুষ্কৃতি সত্য বলে স্বীকার করা হয়।
—(Muinuddin Ahmad Khan— Muslim Struggle for Freedom in India— pp. 10)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মুসলমান জমিদারদের উৎখাত ক'রে শুধুমাত্র এক নতুন জমিদার শ্রেণীরই পত্তন করেনি, নতুনভাবে জমির খাজনা নির্ধারণেরও পূর্ণ অধিকার তাদেরকে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে তারা চরম স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দেয়। এসব জমিদার সরকারী রাজস্বের আকারে অতি উচ্চহারে ঠিকাদার তথা পত্তনীদারদের নিকটে তাদের জমিদারীর তারার্পণ করতো। তারা আবার চড়া খাজনার বিনিময়ে নিম্নপত্তনীদারদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করতো। অতএব সরকারের ঘরে যে রাজস্ব যেতো, তার চতুর্গুণ— দশগুণ প্রজাদের নিকটে জোর-জবরদস্তি করে আদায় করতো। বলতে গেলে, এ নতুন জমিদার শ্রেণী রায়তদের জীবন-মরণের মালিক-মোখতার হয়ে পড়েছিল।

ফরিদপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট অফিস থেকে এমন কিছু সরকারী নথিপত্র পাওয়া যায়, যার থেকে এ তথ্য প্রকাশিত হয় যে, অন্ততঃপক্ষে তেইশ প্রকার 'অন্যায় ও অবৈধ' আবওয়াব রায়তদের নিকট থেকে আদায় করা হতো। বুকানন্ বলেন, "রায়তদেরকে বাড়ী থেকে ধরে এনে কয়েকদিন পর্যন্ত আবদ্ধ রেখে মারপিট করে খাজনা আদায় করা তো এক সাধারণ ব্যাপার ছিল। উপরন্তু নিরক্ষর প্রজাদের নিকট থেকে জাল রসিদ দিয়ে জমিদারের কর্মচারীগণ খাজনা আদায় করে আত্মসাৎ করতো।" (M. Martin— The History, Antiquities, Topography & Statistics of Eastern India, London-1838, Vol. II).

হিন্দু জমিদারদের অমানুষিক অত্যাচার কাহিনী, তিতুমীরের জমিদার বিরোধী আন্দোলন যথাস্থানে আলোচিত হবে।

সামগ্রিকভাবে বাংলার মুসলিম সমাজের অবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কেমন ছিল, তার একটা নিখুঁত চিত্র অংকন করতে হলে জানতে হবে এ সমাজের তিনটি প্রধান উপাদান বা অংগ অংশে কোন্ অবস্থা বিরাজ করছিল। সমাজের সে তিনটি অংগ অংশ হলো—নবাব, উচ্চশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়।

১। নবাব

পলাশী যুদ্ধের পর বাংলার নবাব হয়ে পড়েছিলেন কোম্পানীর হাতের পুতুল। চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদেরকে একচেটিয়া অধিকার দেয়া হয়। উপরন্তু কোম্পানী ও তাদের সাদা-কালো কর্মচারীদেরকে মোটা উপঢৌকনাদি দিতে হতো। মীর জাফর যেসব উপঢৌকনাদি দিয়েছিল, কোম্পানীর ১৭৭২ সালের সিলেক্ট কমিটির হিসাব অনুযায়ী তার মূল্য ছিল বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড। ১৭৬৫ সালের পর নবাবকে বার্ষিক ভাতা দেয়া হয় ৫৩,৮৬,০০০ টাকা। ১৭৭০ সালে তা হ্রাস করে করা হয় বত্রিশ লক্ষ এবং ১৭৭২ সালে মাত্র ষোল লক্ষ টাকা। পূর্বে নবাবগণ তাঁদের অধীনে বহু মুসলমানকে চাকুরীতে নিয়োজিত করতেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারসমূহকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য, জায়গীর প্রভৃতি দান করতেন। তা সব বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁরা চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিছু সংখ্যক বাংলাদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান তাঁদের ভাগ্যান্বেষণের জন্যে এবং অবশিষ্ট দারিদ্রে নিষ্পেষিত হতে থাকেন।

২। সম্ভ্রান্ত বা উচ্চশ্রেণীর মুসলমান

সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ বিজয়ীর বেশে অথবা দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী হিসাবে বিভিন্ন সময়ে এ দেশে আগমন করেন। অতঃপর এ দেশকে তাঁরা মনেপ্রাণে ভালোবেসে এটাকেই তাঁদের চিরদিনের আবাসভূমিরূপে গ্রহণ করেন। বিজয়ী হিসাবে স্বভাবতঃই তাঁরা সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার রাখতেন। হান্টার বলেন, একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার তিনটি প্রধান সূত্র থেকে সম্পদ আহরণ করতো— সামরিক বিভাগের নেতৃত্ব, রাজস্ব আদায় এবং বিচার বিভাগ ও প্রশাসন ক্ষেত্রে চাকুরী।

প্রথম সূত্রটি, বলতে গেলে, ছিল তাদের একেবারে একচেটিয়া। মীর জাফর স্বয়ং আশি হাজার সৈন্য চাকুরী থেকে অপসারিত করে। নজমুদ্দৌলা তার আপন মর্যাদা রক্ষার্থে যে পরিমাণসংখ্যক সৈন্যের প্রয়োজন হতো তাই রাখতে পারতো। ফলে, বাংলা বিহারের কয়েক লক্ষ মুসলমান বেকারত্ব ও দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হতে থাকে।

হান্টার বলেন, জীবিকার্জনের সূত্রগুলির প্রথমটি হচ্ছে, সেনাবাহিনী। সেখানে মুসলমানদের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ হ'য়ে যায়। কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান আর আমাদের সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করতে পারে না। যদিও কদাচিৎ আমাদের সামরিক প্রয়োজনের জন্যে তাদেরকে কোন স্থান দেয়া হতো, তার দ্বারা তার অর্থোপার্জনের কোন সুযোগই থাকতো না।

তাদের অর্থ উপার্জনের দ্বিতীয় সূত্র ছিল—রাজস্ব আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ পদ। কিন্তু উপরে বর্ণিত হ'য়েছে কিভাবে নিম্নপদস্থ হিন্দু রাজস্ব আদায়কারীগণ কোম্পানীর অনুগ্রহে এক লাফে মুসলমানদের জমিদারীর মালিক হ'য়ে বসে।

লর্ড মেট্‌কাফ্ ১৮২০ সালে মন্তব্য করেন ঃ দেশের জমি-জমা প্রকৃত মালিকের নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে একশ্রেণীর বাবুদের নিকটে হস্তান্তরিত করা হয়—যারা উৎকোচ ও চরম দুর্নীতির মাধ্যমে ধনশালী হয়ে পড়েছিল। এ এমন এক ভয়াবহ নির্যাতনমূলক নীতির ভিত্তিতে করা হয় যার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। —(E. Thompson : The life of Charls Lord Metcalfe; A.R. Mallick : British Policy and the Muslims of Bengal).

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেই রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত মুসলমান কর্মচারী ও ভূমির প্রকৃত মালিকের স্থান অধিকার করে বসে ইংরেজ ও হিন্দুগণ।

আবহমান কাল থেকে ভারতের মুসলমান শাসকগণ জনগণের শিক্ষা বিস্তারকল্পে মুসলিম মনীষীদেরকে জায়গীর, তমঘা, আয়মা, মদদে-মায়াশ প্রভৃতি নামে লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি দান করতেন। বুকাননের মতে একমাত্র বিহার ও পাটনা জেলায় এরূপ প্রকারের লাখেরাজ ভূমি দান করা হয়েছিল বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে। ইংরেজ আমলে নানান অজুহাতে এসব লাখেরাজদারকে তাদের মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বর্ধমানের স্পেশাল ডিপুটি কলেক্টর মিঃ টেইলার একদিনে ৪২৯ জন লাখেরাজদারের বিরুদ্ধে তাদের অনুপস্থিতিতে রায় দান করেন।

ইংরেজ সরকারের Tribunals of Resumption-এর অধীনে লাখেরাজ সম্পত্তি সরকারের পুনর্দখলে নেয়া হয়। চট্টগ্রাম বোর্ড অব রেভেনিউ-এর জনৈক অফিসার নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন ঃ সরকারের নিয়তের প্রতি লাখেরাজদারগণ সন্দিগ্ধ হ'য়ে পড়লে তাতে বিস্ময়ের কিছুই থাকবে না। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

১৪৮৬৩টি মামলার মধ্যে সব কয়টিতেই লাখেরাজদারদের অনুপস্থিতিতে সরকারের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ তিক্ত অভিজ্ঞতার পর Tribunals of Resumption-এর প্রতি তাদের আস্থাহীন হবারই কথা (Comment by Smith on Harvey's Report of 19th June 1840; A.R. Mallick : British Policy and the Muslims of Bengal).

মুসলমান লাখেরাজদারদের ন্যায্য ভূমির মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করার জন্যে নানাবিধ হীনপন্থা অবলম্বন করা হতো এবং ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে এ ব্যাপারে এক বিদ্বেষদুষ্ট মানসিকতা বিরাজ করতো। লাখেরাজদারদের সনদ রেজেস্ট্রী না করার কারণে বহু লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করা হয়। জেলার কালেক্টরগণ ইচ্ছা করেই সময় মতো সনদ রেজেস্ট্রী করতে গড়িমসি করতো। তার জন্যে চেষ্টা করেও লাখেরাজদারগণ সনদ রেজেস্ট্রী করাতে পারতেন না।

চট্টগ্রামে লাখেরাজদারদের কোর্টে হাজির হবার জন্যে কোন নোটিশই দেয়া হতো না। অনেকক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে, মামলায় ডিক্রী জারী হবার বহু পূর্বেই সম্পত্তি অন্যত্র পত্তন করা হয়েছে। ১৮২৮ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সমগ্র বাংলা বিহারে লাখেরাজদারদের মিথ্যা তথ্য সংগ্রহের জন্যে চর, ভূয়া সাক্ষী ও রিজাম্পশন অফিসার পংগপালের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলমানদেরকে মামলায় জড়িত করে। এসব মামলায় সরকার ছাড়াও তৃতীয় একটি পক্ষ বিরাট লাভবান হয়। যারা মিথ্যা সাক্ষ্যদান করে এবং যারা সরকারী কর্মচারীদের কাছে কাল্পনিক তথ্য সরবরাহ করে—তারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করে। পক্ষান্তরে, মুসলিম উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হ'য়ে যায়।

পন্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু বলেন ঃ

ইংরেজরা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে বহু 'মুয়াফী' অর্থাৎ লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল। তাদের অনেক ছিল ব্যক্তিগত, কিন্তু অধিকাংশই ছিল শিক্ষায়তনগুলির ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে ওয়াকফ্‌কৃত। প্রায় সকল প্রাইমারী স্কুল, মকতব এবং বহু উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান এসব 'মুয়াফীর' আয় নির্ভর ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিলাতে তাদের অংশীদারগণকে মুনাফা

দেয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি টাকা তোলার প্রয়োজনবোধ করে। কারণ কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ এজন্যে খুব চাপ দিচ্ছিল। তখন এক সুপরিকল্পিত উপায়ে 'মুয়াফী'র ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নীতি গৃহীত হয়। এসব ভূ-সম্পত্তির সপক্ষে কঠিন সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করার হুকুম জারী করা হয়।

কিন্তু পুরানো সনদগুলি ও সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র ইতিমধ্যে হয় কোথাও হারিয়ে গেছে, নয় পোকায় খেয়ে ফেলেছে। অতএব প্রায় সকল 'মুয়াফী' বা লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো। বহু বনেদী ভূম্যাধিকারী স্বত্বচ্যুত হলেন। বহু স্কুল কলেজের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে বহু জমি সরকারের খাস দখলে আসে আর বহু বনেদী বংশ উৎখাত হয়ে যায়। এ পর্যন্ত যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত 'মুয়াফী'র আয় নির্ভর ছিল, সেগুলি বন্ধ হ'য়ে গেল। বহু সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা বিভাগীয় কর্মচারী বেকার হ'য়ে পড়লেন। —(Pandit Jawaherlal Nehru : The Discovery of India, pp.376-77)

উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মুসলমানদের জীবিকার্জনের তৃতীয় অবলম্বন ছিল সরকারের অধীনে চাকুরী—বিচার ও প্রশাসনিক বিভাগগুলিতে। কোম্পানী দেওয়ানী লাভের পরও প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবত তাঁরা চাকুরীতে বহাল ছিলেন। কারণ তখন পর্যন্ত সরকারী ভাষা ছিল ফারসী। কিন্তু হঠাৎ আকস্মিকভাবে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকে সরকারী ভাষা করা হয়। মুসলমানগণ তার জন্যে পূর্ব থেকে মোটেইপ্রস্তুত ছিলেন না। ১৮৩২ সালে সিলেক্ট কমিটির সামনে ক্যাপ্টেন টি ম্যাকাম প্রস্তাব পেশ করেন যে, ক্রমশঃ ইংরেজী ভাষার প্রচলন করা হোক এবং মুসলমান কর্মচারীদেরকে অন্ততঃ পাঁচ/ছ'বছরের অবকাশ দিয়ে নোটিশ দেয়া হোক। হল্ট্ ম্যাকেঞ্জীও অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বলেন, জেলাগুলিতে ক্রমশঃ এবং পর পর ইংরেজীর প্রচলন করা হোক। কিন্তু সহসা সর্বত্র এ পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে হাজার হাজার মুসলমান কর্মচারী চাকুরী থেকে অপসারিত হন যাদের জীবিকা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতো একমাত্র চাকুরীর উপর। ১৮২৯ সালে সবরকম শিক্ষার বাহন হিসাবে স্কুল-কলেজে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেয়া শুরু হয়। ১৮৩৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে (তৎকালীন আর্থিক বৎসরের প্রথম দিন) সহসা সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজীর প্রবর্তন হয়।

হান্টার সাহেবও এসব সত্য স্বীকার করে বিদ্রূপ করে বলেছেন ঃ

"এখন কেবলমাত্র জেলখানায় দু'একটা অধঃস্তন চাকুরী ছাড়া আর কোথাও ভারতের এই সাবেক প্রভুরা ঠাঁই পাচ্ছে না। বিভিন্ন অফিসে কেরানীর চাকুরীতে, আদালতের দায়িত্বশীল পদে, এমনকি পুলিশ সার্ভিসের উর্ধতন পদগুলিতে সরকারী স্কুলের উৎসাহী হিন্দু যুবকদেরকে নিযুক্ত করা হচ্ছে।"

এ পরিবর্তনের ফলে হিন্দু সম্প্রদায় পূর্ণ সুফল ভোগ করে। বিভিন্ন কলেজ থেকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে তারা সর্বত্র সরকারী চাকুরীতে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক অংগনে পট পরিবর্তনের ফলে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারসমূহ জীবিকার্জনের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে দারিদ্র্য, অনাহার ও ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ঃ কৃষক ও তাঁতী

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষককুলের যে চরম দুর্দশা হ'য়েছিল তার কিঞ্চিত আভাস উপরে দেয়া হয়েছে। একথারও উল্লেখ করা হয়েছে যে, জমিদার এবং প্রকৃত কৃষকদের মধ্যে আরও দুটি স্তর বিরাজ করতো। যথা পত্তনীদার ও উপপত্তনীদার। জমিদারের প্রাপ্য খাজনার কয়েকগুণ বেশী এ দুই শ্রেণীর মাধ্যমে রায়তদের কাছ থেকে আদায় করা হতো এবং তাতে করে রায়ত বা কৃষকদের শোষণ-নিষ্পেষণের কোন সীমা থাকতো না। জমিদার-পত্তনীদারদের উৎপীড়নে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়তো। বাধ্য হয়ে তাদেরকে হিন্দু মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হতো। শতকরা ৩৭ টাকা থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত হারে সুদে তাদেরকে টাকা কর্জ করতে হতো। উপরন্তু তাদের গরু/মহিষ মহাজনের কাছে বন্ধক রাখতে হতো। অভাবের দরুন মহাজনের কাছে অগ্রিম কোন শস্য গ্রহণ করতে হলে তার দ্বিগুণ পরিশোধ করতে হতো। আবার উৎপন্ন ফসল যেহেতু মহাজনের বাড়ীতেই তুলতে হতো, এখানেও তাদেরকে প্রতারিত করা হতো। মোটকথা হতভাগ্য কৃষকদের জীবন নিয়ে এসব জমিদার মহাজনরা ছিনিমিনি খেলে আনন্দ উপভোগ করতো।

কৃষকদের এহেন দুঃখ-দুর্দশার কোন প্রতিকারের উপায়ও ছিল না। কারণ তা ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। উপরন্তু জমিদার ও তাদের দালালগণ উৎকোচ ও

নানাবিধ দুর্নীতির মাধ্যমে মামলার খরচ কয়েকগুণে বাড়িয়ে দিত। পরিণাম ফল এই হতো যে, জমিদার মহাজন তাদেরকে ভিটেমাটি ও জমিজমা থেকে উচ্ছেদ করে পথের ভিখারীতে পরিণত করতো।

কৃষক সম্প্রদায় ধান ও অন্যান্য শস্যাদি উৎপন্নের সাথে সাথে নীলচাষও করতো। এই নীলচাষের প্রচলন এদেশে বহু আগে থেকেই ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারত থেকে নীল রং সর্বপ্রথম ইউরোপে রপ্তানী হয়। ব্রিটিশ তাদের আমেরিকান ও পশ্চিম ভারতীয় উপনিবেশগুলিতে নীলচাষের ব্যবস্থা করে। এগুলি তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবার পর বাংলা প্রধান নীল সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়। ১৮০৫ সালে বাংলায় নীলচাষের পরিমাণ ছিল ৬৪,৮০৩ মণ এবং ১৮৪৩ সালে তার পরিমাণ হ'য়ে পড়ে দ্বিগুণ। বাংলা, বিহার এবং বিশেষ করে ঢাকা, ফরিদপুর, রাজশাহী, পাবনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশের তত্ত্বাবধানে ব্যাপক আকারে নীলচাষ করা হয়। কিন্তু বিদেশী শাসকগণ নীলের এমন নিম্নমূল্য বেঁধে দেয় যে, চাষীদের বিঘাপ্রতি সাত টাকা ক'রে লোকসান হয় যা ছিল বিঘাপ্রতি খাজনার সাতগুণ। তথাপি চাষীদেরকে নীলচাষে বাধ্য করা হতো। বাংলার নীলচাষীদের উপরে শাসকদের অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়নের মর্মন্তুদ ও লোমহর্ষক কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। ক্ষমতা মদমত্ত শাসক ও তাদের দালালদের মানবতাবোধ সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। নতুবা তাদের নিষ্পেষণের দরুন কৃষক সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মর্মন্তুদ হাহাকারে বাংলার আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হতো না।

দরিদ্র ও দুঃস্থ কৃষকগণ বেঁচে থাকার জন্যে নীলচাষের মাধ্যমে কিছু অর্থ উপার্জনের আশা করতো। তাদের দারিদ্র্য ও অসহায়তার সুযোগে ইংরেজ নীলকরগণ কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হ'তে তাদেরকে বাধ্য করতো। তাদের হালের গরু-মহিষ ধরে নিয়ে বেঁধে রাখতো এবং মারের চোটে কৃষকদেরকে নীলকরদের ইচ্ছানুযায়ী চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করতো। অনেক সময় অনিচ্ছুক কৃষকদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিত। এতেও সম্মত করতে না পারলে জাল চুক্তিনামার বলে তাদের জমাজমি জবরদখল ক'রে নীলকরগণ তাদের কর্মচারীদের দ্বারা সেসব জমিতে নীলচাষ করাতো। কখনো কখনো অত্যাচারী জমিদার তার প্রজাকে শাস্তি দেবার জন্যে তার কাছ থেকে

জমি কেড়ে নিয়ে নীলকরদেরকে দিয়ে দিত। একবার অ্যাশলী ইডেন নীল কমিশনের সামনে ১৮৬০ সালে সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, বিভিন্ন ফৌজদারী রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, উনপঞ্চাশটি ঘটনা এমন ঘটেছে, যেখানে নীলকরগণ দাংগা, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ডাকাতি, লুটতরাজ এবং বলপূর্বক অপহরণ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে জড়িত থাকে। তার বহু বৎসর পূর্বে জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট একজন খৃষ্টান মিশনারীর সামনে মন্তব্য করেন যে, মানুষের রক্তে রঞ্জিত হওয়া ব্যতীত একবাক্স নীলও ইংলন্ডে প্রেরিত হয় না। (১৮৬১ সালের নীল কমিশন রিপোর্ট এবং ক্যালকাটা খৃষ্টান অবজার্ভার, নভেম্বর, ১৮৫৫ সাল)।

নীল চাষীদের দুঃখ-দুর্দশার কোন প্রতিকারের উপায় ছিল না। চৌকিদার-দফাদারের সামনে চাষীদের উপর নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করা হলেও চৌকিদারদের ঘূণাক্ষরেও সেকথা প্রকাশ করার সাধ্য ছিল না। একবার নিষ্ঠুর নীলকরগণ একটি গ্রামে অগ্নিসংযোগ করলে তা নির্বাপিত করার জন্যে এক ব্যক্তি চীৎকার ক'রে লোকজন জড়ো করে। তার জন্যে তাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে আহত অবস্থায় একটি অন্ধকার কামরায় চার মাস আটক রাখা হয়। ওদিকে আবার নীলকরগণ পুলিশকে মোটা ঘুষ দিয়ে বশ করে রাখতো। (নীল কমিশন রিপোর্ট ১৮৬১)।

হতভাগ্য অসহায় কৃষকগণ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট থেকে কোন প্রকারের প্রতিকার ও ন্যায় বিচারের আশা করতে পারতো না। উক্ত নীল কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সাদা চামড়ার ম্যাজিস্ট্রেটগণ আপন দেশবাসীদের পক্ষই অবলম্বন করতো। ফৌজদারী আইন-কানুন এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে, ইংরেজ প্রজাকে শাস্তি দেয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। একজন দরিদ্র প্রজা সুদূর প্রত্যন্ত এলাকায় তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে ফেলে কোলকাতায় গিয়ে মামলা দায়ের করার সাহস রাখতো না। কারণ তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের জানমাল ইয্যৎ-আবরু নীলকরদের দ্বারা বিনষ্ট হতো। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে অধিক পরিমাণে নীলচাষ করা হতো। ফলে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান নীলকরদের চরম নির্যাতন-নিপীড়নের সার্বক্ষণিক শিকারে পরিণত ছিল।

তাঁতী

কৃষক শ্রেণীর মতো এদেশে তাঁতী শ্রেণীও চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়। বাংলা-বিহারের লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁতশিল্প দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করতো। ঊনবিংশতি শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই লাভজনক ব্যবসা হিসাবে তাঁত শিল্পের মৃত্যু ঘটেছিল। তথাপি উপায়ান্তর না থাকায় যেসব মুসলমান তখন পর্যন্ত তাঁতশিল্প আঁকড়ে ধরে ছিল, ১৮৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বিহার প্রদেশ ও বাংলার কয়েকটি জেলায় ছিল ৭,৭১,২৩৭। নদিয়া, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের তাঁতীগণ ছিল এ সংখ্যার বাইরে। অতএব কোম্পানী আমলের প্রথমদিকে সমগ্র বাংলা ও বিহারে মুসলমান তাঁতীর সংখ্যা অন্ততঃপক্ষে উপরোক্ত সংখ্যার যে দশগুণ ছিল তা বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে। এসব তাঁতী ব্যবসায়ীদের কিভাবে সর্বনাশ করা হয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে আগমনের পূর্বে এদেশের তাঁতশিল্প চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল। প্রতিটি জেলায় বিশিষ্ট ধরনের অতি উৎকৃষ্ট তাঁতবস্ত্র নির্মিত হতো। চাহিদা মেটাবার জন্যে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস আমদানী করা হতো। এসব তাঁতশিল্প থেকে মোটা ও মিহি উভয় প্রকারের বস্ত্র তৈরী হতো। ভারত ছিল মোটা বস্ত্রের বাজার এবং সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করা হতো। মুসলমান শাসকদের সাহায্য সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকার রেশমজাত অতিসূক্ষ্ম 'মসলিন' বস্ত্র দু'শতাব্দী ব্যাপী ইউরোপীয় বাজারে বিরাট আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। মোটা বস্ত্র হোক, অথবা অতিসূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র উভয় বস্ত্রই ছিল মুসলমান তাঁতশিল্পীদের বিরাট অবদান। উইলিয়াম বোল্ট নামক জনৈক ইংরেজ বণিক, কোম্পানী কর্তৃক তাঁতীদের উপর অকথ্য নির্যাতনের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার। ইংরেজ এবং তাদের অধীনস্থ হিন্দু বেনিয়া ও গোমস্তাগণ আপন খুশী খেয়াল মতো কাপড়ের দর বেঁধে দিয়ে সে দরে নির্দিষ্ট পরিমাণের বস্ত্র সরবরাহ করতে তাঁতীদেরকে বাধ্য করতো। নীলকরদের মতো তাঁতীদের স্বার্থ-বিরোধী চুক্তিতে স্বাক্ষর করতেও তাদেরকে বাধ্য করা হতো। নির্দিষ্ট কোয়ালিটির বস্ত্র নির্দিষ্ট পরিমাণে তাদেরই বেঁধে দেয়া দরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরবরাহ করতে তাঁতীদেরকে বাধ্য করা হতো—ওসব চুক্তি বলে। তাদের

বেঁধে দেয়া দর আবার বাজার দর থেকে শতকরা পনেরো থেকে চল্লিশ ভাগ কম হতো। কোম্পানী ও তার অত্যাচারী দালালদের মনস্তুষ্টি সাধন করতে না পারলে তাঁতীদেরকে বেত্রাঘাত করা হতো। এ যেন জ্যান্ত চামড়া খুলে মানুষের মাংস ভক্ষণ করা। আদিম যুগে অরণ্য নিবাসী অসভ্য বর্বর মানুষ প্রয়োজনবোধে নর-নারীর মাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতো বলে শুনা যায়। কিন্তু তাদের চেয়ে এসব তথাকথিত সভ্য ইংরেজ ও তাদের দালালগণ কোন্ দিক দিয়ে উৎকৃষ্টতর ছিল?

পরবর্তীকালে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ বাংলার বস্ত্রশিল্পে চরম আঘাত হানে। তারা বাংলা থেকে তৈরী বস্ত্র ইংলন্ডে আমদানী না করে কাঁচামাল হিসেবে কার্পাস ও রেশম আমদানী করতে থাকে। অতঃপর তারা সুপারিশ করে যে, রেশমী বস্ত্রের কারিকরগণকে নিজেদের তাঁতে কাজ করার পরিবর্তে কোম্পানীর নিজস্ব কলকারখানায় কাজ করতে বাধ্য করা হোক। পরিণামে এ শিল্পপ্রধান দেশটি ইংলন্ডের বস্ত্র নির্মাতাদের কাঁচামালের বাজারে পরিণত হয়। ১৭৮৯ সালের পর থেকে ঢাকার সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্রের রপ্তানী হ্রাস পেতে থাকে। ১৭৯৯ সালে শুধুমাত্র ঢাকা থেকে বস্ত্র রপ্তানী হয়েছিল ১২ লক্ষ টাকার। সেকালের বার লক্ষকে এখনকার টাকার মূল্যমানে অনায়াসে বার কোটি বলা যেতে পারে। ১৮১৩ সালে রপ্তানী হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকায়। ১৮১৭ সালে ঢাকার উৎপন্ন বস্ত্রের রপ্তানী একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

মোটকথা বাংলা বিহারের বস্ত্রশিল্প ধ্বংস করে উপার্জনহীন তাঁতী সম্প্রদায়ের রক্তমাংসে গড়ে উঠে মানচেস্টারের বস্ত্রশিল্প। ক্রমে রপ্তানীকারী দেশ আমদানীকৃত মালের বাজারে পরিণত হয়। ১৭৮৬ থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত এদেশে বার্ষিক বস্ত্র আমদানী হতো বার লক্ষ পাউন্ড মূল্যের। ১৮০৯ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় এক কোটি চৌরাশি লক্ষ পাউন্ড মূল্যের। ব্রিটিশের নীতিই ছিল ধীরে ধীরে এদেশের তাঁতী সম্প্রদায়কে নির্মূল করা, যারা ছিল প্রায়ই মুসলমান। (আবদুল মওদূদ : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ)।

তাঁতীদের দুঃখ-দুর্দশার করুণ চিত্র এঁকেছেন পন্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু তাঁর The Discovery of India গ্রন্থে। তিনি বলেন, এসব তাঁতীদের পুরানো পেশা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। নতুন কোন পেশার দ্বার উন্মুক্ত ছিল না। উন্মুক্ত ছিল শুধু মৃত্যুর দ্বার। মৃত্যুবরণ করলো লক্ষ লক্ষ। লর্ড বেন্টিংকে ১৮৩৪ সালের

রিপোর্টে বলেন, তাদের দুঃখ-দুর্দশার তুলনা নেই বাণিজ্যের ইতিহাসে। ভারতের পথঘাট পূর্ণ হয়েছে তাঁতীদের অস্থিতে। —(Pandit Nehru : The Discovery of India, p. 352)।

মোটকথা, পলাশীর যুদ্ধে এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেয়ার পর থেকে একশত বছরের সঠিক ইতিহাস ও বিভিন্ন তথ্যাবলী থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, এ সময়কালের ইতিহাস বাংলার মুসলমানদের শোষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতন-নিষ্পেষণ, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা ও হত্যাযজ্ঞের ইতিহাস। আর এ কাজে ইন্ধন যুগিয়েছে, সর্বপ্রকারে সাহায্য সহযোগিতা করেছে কোম্পানী সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট দেশীয় 'বাবুদের' দল। দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মূল্যও তারা লাভ করে পূর্ণমাত্রায়। আর তা হলো এই যে, দেশের সমুদয় জমিদারী, জোতদারী প্রকৃত মালিকের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এসব 'বাবুদের' দেয়া হয়েছে চিরকালের জন্যে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগের জন্যে। আর এরা অগাধ ধন-ঐশ্বর্যের মালিক হ'য়ে পড়ে উৎকোচ ও দুর্নীতির মাধ্যমে। —(E. Thompson : The life of Charles Lord Metcalfe; A. R. Mallick : British Policy & the Muslims of Bengal).

শোষণ-নিষ্পেষণের মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত হলো এই যে, 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' বাংলার লোক মরেছে তিনভাগের একভাগ, চরম অবনতি ঘটেছে চাষবাসের। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস হিসাব কষে ও কড়া চাপে নির্ধারিত রাজস্বেরও বেশী টাকা আদায় করেছেন মুমূর্ষু কৃষকদের কাছ থেকে; রাজস্বের শতকরা একভাগও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনসাধারণের দুঃখ মোচনের জন্যে খরচ করেননি। বরঞ্চ বাখরগঞ্জ জেলার ৩৩,৯১৩ মণ চাউল বিক্রয় ক'রে ৬৭,৫৯৩ টাকা মুনাফা লুটেছেন। ঢাকার ৪০,০০০ মণ চাউল বাঁকীপুরের সেনানিবাসে গুদামজাত করেছেন, বলেছেন আবদুল মওদুদ তাঁর 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ' গ্রন্থে (পৃঃ ৬৩)।

আবদুল মওদুদ আরও বলেন, যে তাজমহলকে স্থপতিরা পৃথিবীর বুকে স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করেন, যার নির্মাণকর্মে ২৩ কোটি ডলার ব্যয়িত হয়েছিল এবং যার পরিকল্পনা মানস সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিজয়ীর মানসকেও ম্লান করে লজ্জা দেয়, সেই তাজমহলটিকে ভেঙে তার মাল-মসলা আত্মসাৎ করার জন্যে ভারতে অন্যতম পরম দয়ালু ও কল্যাণসাধক বড়লাট

হিসাবে নন্দিত লর্ড বেন্টিংক একবার একজন হিন্দু কন্ট্রাক্টরকে মাত্র দেড় লক্ষ ডলারে বিক্রয় করারও চুক্তি করেছিলেন। (The Round the World Traveller, Loreng : p. 379)। ওয়ারেন হেস্টিংস দেওয়ান-ই-খাসের হাম্মামখানাটি উপড়ে নিয়ে বিলাতে চতুর্থ জর্জকে উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং লর্ড বেন্টিংক প্রাসাদটির অন্যান্য অংশ বিক্রয় করে ভারতের রাজস্ব বৃদ্ধি করেছিলেন (India : Chirol—p. 54: The Story of Civilization, Our Oriental Heritage by Will Durant, pp. 609-10)।

এমনি, মহামূল্য লুণ্ঠিত 'কোহিনূর' এখনো ইংলন্ডের শাহীমহলের শোভা বর্ধন করছে। এহেন লুণ্ঠনকার্যের দ্বারা শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা-ভব্যতায় গর্বিত ইংরেজদের চরম হীন প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

এডমন্ড বার্ক সত্যিই নির্মম উক্তি করেছেন ঃ আমাদের আজ যদি ভারত ছাড়তে হয়, তাহলে ওরাংওটাং বা বাঘের চেয়ে কোন ভালো জানোয়ারের অধিকারে যে এদেশ ছিল তার প্রমাণ করবার কিছুই থাকবে না। (আবদুল মওদুদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, পৃঃ ৬৪)।

কোম্পানীর শাসন আমল সমাপ্তির পূর্বক্ষণে জন ব্রাইট বলেছিলেন, "ভারতের নিরীহ জনগণের উপর এক শ' বছরের ইতিহাস হলো অকথ্য অপরাধসমূহের ইতিহাস (Oxford History of India : p. 680).

হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক ঃ ধর্ম ও সংস্কৃতি

মুসলমানরা, মধ্যযুগের প্রারম্ভকাল থেকে আরব, তুরস্ক, ইরান-তুরান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশে আগমন করে। অতঃপর এ দেশকে তারা ভালোবেসেছে মনে-প্রাণে, তাদের চিরন্তন আবাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছে এ দেশকে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ দেশের হিন্দুর সাথে পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক নির্মম সত্য এই যে, হাজার বছরেরও বেশী কাল হিন্দু-মুসলমান একত্রে পাশাপাশি বাস করে, একই আকাশের নীচে একই আবহাওয়ায় পালিত বর্ধিত হয়েও এ দু'টি জাতি যে শুধু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়নি, তাই নয়, বরঞ্চ তাদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্কও গড়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য এ সুদীর্ঘকালের মধ্যে তারা উভয়ে কখনো কখনো মিলেমিশে কাজ-কর্ম করেনি, একে অপরের সুখ-দুঃখের

অংশীদার হয়নি, তা নয়। তবে তা বিশেষ স্থান, কাল ও ক্ষেত্র বিশেষে—জাতি হিসাবে নয়, প্রতিবেশী হিসাবে। সেও আবার সাময়িকভাবে। তাদের মধ্যে সৌহার্দ ও একাত্মতার স্থায়ী শিকড় বদ্ধমূল হতে পারেনি কখনো।

এই যে পাশাপাশি বসবাস করেও উভয়ের মধ্যে দূরত্ব অক্ষুণ্ন রইলো এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন ঃ

এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজবিধান সম্পূর্ণ বিপরীত ··· হিন্দুরা বাংলা সাহিত্যের প্রেরণা পায় সংস্কৃত থেকে আর মুসলমানরা পায় আরবী-ফারসী থেকে। মুসলমানদের ধর্মের গোঁড়ামি যেমন হিন্দুদেরকে তাদের প্রতি বিমুখ করেছিল, হিন্দুদের সামাজিক গোঁড়ামিও মুসলমানদেরকে তাদের প্রতি সেরূপ বিরূপ করেছিল। ··· হিন্দুরা যাতে মুসলমান সমাজের দিকে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখাতে না পারে, তার জন্যে হিন্দু সমাজের নেতাগণ কঠোর বিধানের ব্যবস্থা করেছিলেন। (রমেশ চন্দ্র মজুমদার ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস মধ্যযুগ, পৃঃ ২৪১-৪৩ ও ৩৩৪-৫০)।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যবধান, তা দূরীভূত হয়ে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে না উঠার কারণ বর্ণনা করেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেন ঃ

"সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় বয় না। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত বলে কল্পনা করেন, তাঁদের মধ্যে নাড়ীর মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্য যদি অবরুদ্ধ থাকে, তাহলে তাঁদের মিলন কখনই প্রাণের মিলন হবে না। —[রবীন্দ্র রচনাবলী (শতবার্ষিকী সংস্করণ), ১৩'শ খন্ড- পৃঃ ৩০৮]

অতএব দেখা যাচ্ছে এই যে পার্থক্য এবং দূরত্ব এ শুধু বাহ্যিক ও কৃত্রিম নয়। এর গভীর মূলে রয়েছে উভয়ের পৃথক পৃথক ও বিপরীতমুখী ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতি। ভারতের এককালীন বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা H. V. Hodson ভারতের হিন্দু-মুসলমান দু'টি জাতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেন ঃ

"··· এখানে বিরাট দু'টি সম্প্রদায় আছে যারা বসবাস করে একই দেশে, বলতে গেলে একই গ্রামে, একই সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে এবং একই সরকারের অধীনে। মূল জাতির দিক দিয়ে আলাদাও নয়। কারণ অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান তাদের প্রতিবেশী হিন্দুর উর্ধতন পূর্ব পুরুষদেরই

বংশসম্ভূত। তথাপি পৃথক ও স্বতন্ত্র। শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতি-পদ্ধতির দিক দিয়েই স্বতন্ত্র নয়, বরঞ্চ জীবনের সামগ্রিক বিধান ও মানসিক দৃষ্টিভংগীর দিক দিয়েও স্বতন্ত্র। প্রত্যেক দল বা সম্প্রদায় স্থায়ী বংশভিত্তিক। না তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহের প্রচলন আছে, আর না মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।" —(H. V. Hodson The Great Divide, p. 10)।

বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান আবহমানকাল থেকে তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখে চলেছে। ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন ঃ

"মুসলমানেরা মধ্যযুগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত স্থানবিশেষে ১৩০০ হইতে ৭০০ বৎসর হিন্দুর সংগে পাশাপাশি বাস করিয়াও ঠিক পূর্বের মতো আছে। ··· অষ্টম শতাব্দীর আরম্ভে মুসলমানেরা যখন সিন্দুদেশ জয় করিয়া ভারতে প্রথম বসতি স্থাপন করে, তখনও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদগুলি ছিল, সহস্র বর্ষের পরেও এক ভাষার পার্থক্য ছাড়া ঠিক সেইরূপই ছিল। ··· বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে আমাদের দেশে একটি মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে, মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে উভয়েই স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে। এবং এমন একটি নতুন সংস্কৃতি গঠিত হইয়াছে যাহা হিন্দু সংস্কৃতি নহে, ইসলামীয় সংস্কৃতি নহে— ভারতীয় সংস্কৃতি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি এবং শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নায়কগণ ইহার ঠিক বিপরীত মতই পোষণ করিতেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য এই বিপরীত মতেরই সমর্থন করে। ··· ১২০০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম যাহা ছিল, আর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুধর্ম ও সমাজ যাহা হইয়াছিল, এই দুয়ের তুলনা করিলেই সত্যতা প্রমাণিত হইবে। —(রমেশ চন্দ্র মজুমদার ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস মধ্যযুগ, পৃঃ ২৪২-৪৩ ও ৩৩৪-৫০)।

মুসলমান ভারতে আসার পর হতে সহস্রাধিক বৎসর হিন্দুদের সাথে বসবাস করার পর উভয়ে মিলে এক জাতি গঠনের পরিবর্তে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য অধিকতর সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় হয়েছে। কে, এম, পান্নিকর তাঁর Survey of India History গ্রন্থে মন্তব্য করেন ঃ "ভারতে একটি ধর্ম হিসাবে ইসলাম প্রবর্তনের প্রধান সামাজিক পরিণামফল দাঁড়ালো এই যে, সমাজ দেহকে খাড়াভাবে দু'ভাগে

বিভক্ত করা হলো। তের শতকের পূর্বে হিন্দু সমাজে যেসব বিভাগ দেখা দিয়াছিল, সেগুলির প্রকৃতি ছিল কিছুটা আনুভূতিক। তখন বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম সমাজদেহে তেমন সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতা ঘটাতে পারেনি। হিন্দুধর্মের পক্ষে এসব উপধর্মগুলিকে হজম করা সম্ভব ছিল এবং কালেতদ্রে এরা হিন্দুধর্মের পরিসীমার মধ্যে আপন আপন আঞ্চলিক আবাস গড়ে নিয়েছিল। পক্ষান্তরে ইসলাম ভারতীয় সমাজকে আগাগোড়া স্পষ্ট দু'ভাগে বিভক্ত করে। এবং আজকের দিনের ভাষায় আমাদের নিকট যা দুই জাতিত্ব বলে পরিচিত হয়েছে, তা সেই প্রথম দিনেই জন্মগ্রহণ করে। এরপর থেকে একই ভিত্তির উপর দু'টি সমান্তরাল সমাজ খাড়াভাবে বিভক্ত অবস্থায় বিরাজ করতে থাকে। জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দু'টি সমাজ পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়ে গেল এবং পৃথকভাবেই আত্মপ্রকাশ করলো। উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সামাজিক সম্পর্ক–সম্বন্ধ বা জীবনের ক্ষেত্রে আদান–প্রদান রইলো না। অবশ্য হিন্দুত্ব থেকে ইসলামে ধর্মান্তরকরণ অবিরাম চলতে থাকলো। কিন্তু সংগে সংগে নতুন মতবাদ ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং নতুন প্রতিরোধমূলক নিরাপত্তার মনোভাব সৃষ্টি হলো। ফলে হিন্দু সমাজদেহ ক্রমশঃ অধিকতর শক্তিশালী হয়ে দেখা দিল।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর শিক্ষাপ্রাপ্ত পন্ডিতপ্রবর ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলী যে নির্মম সত্যউক্তি করেছেন, তা পাঠকবর্গকে পরিবেশন করা যেতে পারে। তিনি বলেন ঃ

"বড় দর্শন নির্মাতা আর্য মনীষীগণের ঐতিহ্যগর্বিত পুত্র–পৌত্রেরা মুসলমান আগমনের পর শত শত বৎসর ধরে আপন আপন চতুষ্পাঠীতে দর্শনচর্চা করলেন, কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামের মাদ্রাসায় শত শত বৎসর ধরে যে আরবীতে প্লাতো থেকে আরম্ভ করে নিয়–প্লাতনিজম তথা কিন্দী, ফারাবী, বু–আলী সিনা, আলগাজ্জালী, আবু রুশদ্ ইত্যাদি মনীষীগণের দর্শনচর্চা হলো, তার কোন সন্ধানই পেলেন না। এবং মুসলমান মওলানাও কম গাফলতি করলেন না— তিনি একবারের তরেও সন্ধান করলেন না, পাশের চতুষ্পাঠীতে কিসের চর্চা হচ্ছে। . . . শ্রীচৈতন্য নাকি ইসলামের সংগে পরিচিত ছিলেন . . . কিন্তু চৈতন্যদেব উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সম্মেলন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কার এবং তাকে ধ্বংসের পথ থেকে নব–যৌবনের পথে নিয়ে যাওয়ার। · · · মুসলমান যে

জ্ঞান–বিজ্ঞান, ধর্ম–দর্শন এনেছিলেন এবং পরবর্তী যুগে বিশেষ করে মোগল আমলে আকবর থেকে আওরংজেব পর্যন্ত মংগোল জর্জরিত ইরান–তুরান থেকে যেসব সহস্র সহস্র কবি–পন্ডিত–ধর্মজ্ঞ–দার্শনিক এ দেশে এসে মোগল রাজসভায় আপন আপন কবিত্ব–পান্ডিত্য উজাড় করে দিলেন, তার থেকে এ দেশের হিন্দু ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত দার্শনিকেরা কণামাত্র লাভবান হননি · · · হিন্দু পন্ডিতের সংগে তাঁদের কোনও যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি।" —(বড়বাবু, সৈয়দ মুজতবা আলী)।

ইসলামী তৌহিদের চিত্তচাঞ্চল্যকর বিপ্লবী বাণী, স্রষ্টা সমীপে সর্বস্ব নিবেদন, ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও প্রেম, তার সাম্যের বাণী ও সুবিচার, তার গণতান্ত্রিক আদর্শ মানুষের মনে যে আবেদন–পুলক সৃষ্টি করে তা ছিল অপ্রতিরোধ্য। ফলে দলে দলে হিন্দুগণ ইসলামের সুশীতল ছায়ায়, আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। তারপর হিন্দুধর্মের কাজ হলো আত্মরক্ষার। ইসলামের বাণীর মুখে আত্মরক্ষা তেমন সহজও ছিলনা। তাই ভারতের এখানে সেখানে ধর্ম সমন্বয় ও ঐক্যের বাণী প্রচারিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে যুগে যুগে—রামানন্দ, একলব্য, দাদু, নানক কবীর প্রভৃতি সাধক–প্রচারকদের আবির্ভাবে। ইসলামের অদ্বৈতবাদকে ভিত্তি করে তারা হিন্দুধর্মের সংস্কার করতে চেয়েছেন ইসলাম থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। অথবা ইসলাম ধর্মে হিন্দুত্বের প্রভাব ও অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মতো ইসলামকে সর্বগ্রাসী হিন্দুত্বের মুখে ঠেলে দেয়ার প্রচেষ্টা করেছেন মাত্র।

এ সম্পর্কে আবদুল মওদুদ বলেন ঃ

"এ আন্দোলনগুলি অবশ্য বিশ শতকের রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রচুর সুযোগ–সুবিধায় আসে এবং 'জাতীয়তাবাদী' নামাংকিত করে হিন্দু রাজনীতিকেরাই এক ভারতীয় সংস্কৃতির ধুঁয়া তোলে, তাছাড়া অনতিকাল মধ্যে এগুলো ইসলাম ও দন্ডধর মুসলিম শক্তিকে বাধা দেবার ও সম্ভব হলে বিতাড়িত করবার সক্রিয় প্রয়াসে লিপ্ত হয়ে উঠে। তখন তাদের রাজনীতিক ভূমিকা ও রাষ্ট্রীক প্রয়োজন এসব সমন্বয় সাধনার বুলি স্পষ্ট হয়ে উঠে। (আবদুল মওদুদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ২৫)।

আবদুল মওদুদ, আহমদ শরীফ প্রণীত 'মুসলিম পদ সাহিত্য' (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭)–এর বরাত দিয়ে বলেন ঃ

"শিখ বা বৈষ্ণব আন্দোলনে যে এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—তার বহু প্রমাণ আছে। রাষ্ট্রীক প্রয়োজনে বাদশাহ আকবর থেকে গান্ধীর কাল পর্যন্ত সমন্বয় সাধনের পথ অব্যাহত ছিল। এ পথে গান্ধীর 'রামধুন' সংগীত ও নজরুলের কয়েকটি কবিতাকে শেষ প্রয়াস বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।"

অতঃপর তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছিল সর্বগ্রাসলোভী ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্বের অভিনব প্রয়াস—এ পথেই অজগরের মতো ইসলামকে লীন করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। রাষ্ট্রীক প্রয়োজনে এ ধর্মসমন্বয় ও সংস্কৃতির ঐক্যের মহামন্ত্র অতীতে উদ্গীত হয়েছিল এবং এখনও হয়ে থাকে। (আবদুল মওদুদ–ঐ–পৃঃ২৫)।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এ সত্যটি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, নিছক রাজনৈতিক কারণে সম্রাট আকবর থেকে আরম্ভ করে বিংশতি শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত হিন্দু–মুসলমানের সমন্বয়ে জগাখিচুড়ি তৈরী করে এক ভারতীয় জাতি ও সংস্কৃতি অথবা এক বাঙালী জাতি ও সংস্কৃতি বলে চালাবার যে হাস্যকর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, তা জাল ও অচল মুদ্রার মতো সত্যনিষ্ঠদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কারণ তা ছিল অস্বাভাবিক, অবান্তর ও অসম্ভব।

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ জাতি হিন্দু ও মুসলমান দু'টি স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির ধারক বাহক—এ দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, দু'টি স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাসী একই দেশে মিলেমিশে, শান্তিতে ও নির্বিবাদে বসবাস করতে পারলোনা কেন। পৃথক ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাদের সদ্ভাব, সৌহার্দ ও মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি কেন? এর জন্যে দায়ী কে? তারা কি উভয়ে—না কোন একটি দল? এর সঠিক জবাব ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হবেনা নিশ্চয়।

হিন্দু–মুসলমানের বিরোধ ও সংঘর্ষের মূল কারণ যে প্রধানতঃ রাজনৈতিক তাতে সন্দেহ নেই। এ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে ধর্মের নামে স্বজাতিকে ডাক দেয়া হয়েছে, প্রতিপক্ষকে ধর্ম বিনষ্টকারী পরস্বাপহরণকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রতিপক্ষকে বিদেশী–হানাদার, নরহন্তা, নারী

ধর্ষণকারী, প্রতিমা ও মন্দির ধ্বংসকারী বলে চিত্রিত করে স্বজাতির মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ উপমহাদেশে হিন্দুশাসনের পরিবর্তে যে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা হিন্দুজাতি মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। অষ্টম শতকের পর থেকে পরবর্তী কয়েক শতক পর্যন্ত মুসলিম সামরিক শক্তির, বলতে গেলে যৌবন–জোয়ার জলতরংগ দেশদেশান্তর ব্যাপী প্লাবন এনে দিচ্ছিল। এ অপ্রতিহত শক্তির মুখে ভারতীয় রাজনৈতিক শক্তি টিকে থাকতে পারেনি বলে মুসলিম শাসন প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাই বলে এ দেশের বিজিত হিন্দুগণ হৃত রাজ্যের জন্য দুঃখ–অপমানে–লজ্জায় মুসলিম শাসন অন্তর দিয়ে মেনেও নিতে পারেনি। তাদের অন্তরাত্মা বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। বহু শতকের পুঞ্জিভূত বিক্ষোভ ও প্রতিহিংসার বহ্নির বিস্ফোরণ ঘটেছিল মধ্যভারতে রাজপুত, মারাঠা, শিখদের বিদ্রোহের মাধ্যমে এবং তা সার্থক হয়েছিল ১৭৫৭ সালে সিরাজদৌলার পতনে। তারপর থেকে উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত দেড় শতাব্দী যাবত মুসলমানদের জীবনে নেমে এসেছিল চরম দুর্দিন। হিন্দু ও ইংরেজদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে তাদেরকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে উৎখাত করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ও কৌশল অবলম্বন করা হয়। এ সময়কালে হিন্দুজাতি ইংরেজদের ভূয়সী প্রশংসা ও বিগত মুসলিম শাসন ও শাসকদের বিরুদ্ধে অকথ্য কুৎসা রটনা করেছে। বাংলা সাহিত্য ও কবিতা ইসলাম ও মুসলমানদের কাল্পনিক কুৎসা রটনায় ভরপুর হয়ে আছে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রংগলাল বন্দোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র এবং সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ছোটো–বড়ো সকল হিন্দু কবি সাহিত্যিকগণ ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন ইসলাম ও মুসলমানদের চরিত্রে কলংক আরোপ করাকে। অনেকের ধারণা মুসলমানদের চরিত্র বিকৃতকরণের ব্যাপারে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সকলের পিছনে, কিন্তু তথাপি তাঁর কলমও কম বিষোদগার করেনি।

ভারত উপমহাদেশে হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য কম চেষ্টা–সাধনা হয়নি। এ ধরনের মিলনের প্রচেষ্টা যখন চলছিল সে সময়ে শরৎবাবুর লিখনী মুসলমানদের খোঁচা দিতে ভুল করলো না, তিনি তাঁর "দিন কয়েকের ভ্রমণ কাহিনী" শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে বলেন—

"...শুনিতে পাইলাম হিন্দু-মোসলেম ইউনিটি একদিন জাতীয় মহাসভার মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। সবাই বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বলিতে লাগিল— যাক বাঁচা গেল, চিন্তা আর নাই। নেতারা হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন, এবার শুধু কাজ, শুধু দেশোদ্ধার। প্রতিনিধিরা ছুটি পাইয়া মুখে দলে দলে টাঙ্গা, একা এবং মোটর তাড়া করিয়া প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভ সকল দেখিতে ছুটিলেন। সে ত আর এক আধটা নয়, অনেক। সংগে গাইড, হাতে কাগজ-পেন্সিল—কোন্ কোন্ মসজিদ কয়টা হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া তৈয়ার হইয়াছে, কোন্ ভগ্নস্তূপের কতখানি হিন্দু ও কতখানি মোসলেম, কোন্ বিগ্রহের কে কবে নাক এবং কান কাটিয়াছে ইত্যাদির বহু তথ্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রান্ত দেহে দিনের শেষে গাছতলায় বসিয়া পড়িয়া অনেকেরই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিতে লাগিল- 'উঃ হিন্দু-মোসলেম ইউনিটি!" —(বিজলী ২৫ আশ্বিন, ১৩৩০)।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আরও বলেন,

—ইংরেজের আর যাহাই দোষ থাক,—যে মন্দিরের প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই তাহারও চূড়া ভাঙে না, যে বিগ্রহের সে পূজা করে না, তাহারও নাক কান কাটিয়া দেয় না। অতএব যে কোন দেবায়তনের মাথার দিকে চাহিলেই বুঝা যায় ইহার বয়স কত। স্বামীজী দেখাইয়া দিলেন—'ওটি অমুক জিউর মন্দির—সম্রাট আওরাংজেব ধ্বংস করিয়াছেন, ওটি অমুক জিউর মন্দির—অমুক বাদশাহ ভূমিসাৎ করিয়াছেন, ওটি অমুক দেবায়তন ভাঙিয়া মসজিদ তৈয়ার হইয়াছে। ওখানে আর কেন যাইবে, আসল বিগ্রহ নাই, নতুন গড়াইয়া রাখা হইয়াছে (ইংরেজ কর্তৃক), ইত্যাদির পুণ্যময় কাহিনীতে চিত্ত একবারে মধুময় করিয়া আমরা অনেক রাত্রে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

—(বিজলী, ২৩ কার্তিক, ১৩৩০ সাল)

একই কলমের দ্বারা ইংরেজদের প্রশংসাসহ পুষ্পবর্ষণ করা হচ্ছে এবং অতীতের মুসলমান শাসকদের মুন্ডপাত করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, হিন্দুমন্দির ভাঙার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হিন্দুদের ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে ক্ষিপ্ত করে তোলা হচ্ছে। তাহলে বলতে হবে হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রচেষ্টা প্রহসন মাত্র, তার মধ্যে ঐকান্তিকতার লেশমাত্র নেই।

কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ইংরেজ প্রভুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় গেয়ে উঠলেন—

"না থাকিলে এ ইংরাজ
ভারত অরণ্য আজ- কে শেখাতো, কে দেখাতো
কে বা পথে লয়ে যেতো
যে পথ অনেক দিন করেছ বর্জন।"

—(শতাব্দী পরিক্রমা, ডঃ হাসান জামান সম্পাদিত, পৃঃ ২৮৪)

উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে হিন্দু জমিদার ও কোম্পানী শাসনের দ্বারা বাংলার মুসলমান নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও জর্জরিত হচ্ছিল এবং তার প্রতিবাদে বাংলায় ফারায়েজী আন্দোলন ও সাইয়েদ তিতুমীরের আন্দোলন প্রচন্ড আকার ধারণ করে। পরবর্তীকালে সাইয়েদ আহমদ শহীদের জিহাদী আন্দোলন সারা ভারতে এক আলোড়নের সৃষ্ট করে। অতঃপর ভারতের প্রথম আযাদী আন্দোলন শুরু হয় ১৮৫৭ সালে। এ সমস্ত আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার ফলে ভারতীয় মুসলমান ইংরেজদের কোপানলে পড়ে কোন্ অসহনীয় জীবন যাপন করছিল, তা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। জেল, ফাঁসী, দ্বীপান্তর, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ এবং ইংরেজ কর্তৃক অন্যান্য নানাবিধ অমানুষিক-পৈশাচিক অত্যাচারে মুসলিম সমাজদেহ যখন জর্জরিত, সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখনীর নির্মম আঘাত শুরু করেন মুসলিম জাতির জর্জরিত দেহের উপর। তিনি তাঁর আনন্দমঠ, রাজসিংহ , দুর্গেশনন্দিনী, দেবী চৌধুরী প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গার করেছেন, তাতে পাঠকের শরীর রোমাঞ্চিত হবারই কথা। তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং তাঁর বর্ণনামতে মুসলমান কর্তৃক 'হিন্দু মন্দির ধ্বংস', 'হিন্দু নারী ধর্ষণ' প্রভৃতি উক্তির দ্বারা হিন্দুজাতির প্রতিহিংসা বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করার সার্থক চেষ্টা করা হয়েছে। ১৮৯৮ সালে মুসলিম এডুকেশান সোসাইটি অধিবেশনে নবাব নবাব আলী চৌধুরীর উদ্যোগে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারণার তীব্র প্রতিবাদ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত করে হিন্দু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে দেয়া হয়। কোন পত্রিকায় তা ছাপা হয়নি, শুধুমাত্র 'ভারতী' পত্রিকায় বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করা হয়। —(Bengali Muslim Public Opinion

as reflected in the Bengali Press-1901-30: Mustafa Nural Islam, pp. 141-42).

সাহিত্যের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম বিদ্বেষ প্রচারণার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

"রাজপুত্রী বলিলেন—আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটিতে রাখিতেছি সবাই উহার মুখে এক একটি বাঁ পায়ের নাতি মার। কার নাতিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি।" —[রাজসিংহ (১ম খন্ড) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ চিত্রদলন]।

"ঔরঙ্গজেবের দুই ভগিনী–জাহানারা ও রওশনারা। জাহানারা শাহজাহাঁর বাদশাহীর প্রধান সহায়।··· তিনি পিতার বিশেষ হিতৈষিণী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে এ সকল গুণবিশিষ্টা ছিলেন, ততোধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয় পরায়ণা ছিলেন। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগতির পাত্র ছিল। সেই সকল লোকের মধ্যে ইউরোপীয় পর্যটকেরা এমন এক ব্যক্তির নাম করেন যে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করিতে পারিলাম না।" –(রাজসিংহ, ২য় খন্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ জেবউন্নিসা)।

"ঔরঙ্গজেবের তিন কন্যা। ··· জ্যেষ্ঠা জেব–উন্নিসা বিবাহ করিলেন না। পিতৃস্বসাদিগের ন্যায় বসন্তের ভ্রমরের মত পুষ্পে–পুষ্পে মধু পান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।" —(রাজসিংহ, ২য় খন্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ জেব–উন্নিসা)।

সতীসাধ্বী পুণ্যবতী মুসলিম রমণীদের চরিত্রে কতখানি কলংক আরোপ করা হয়েছে তা ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই স্বীকার করবেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'লেখনী কলুষিত করিতে পারিলাম না' —বলে খেদ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একজন লোকের নিছক মুসলিম বিদ্বেষের কারণে, বিবেক ও রুচি কতখানি বিকৃত ও ব্যাধিগ্রস্ত হলে কোন অন্তঃপুরবাসিনী পর্দানশীল সতীসাধ্বী দ্বীনদার খোদাভীরু মুসলিম রমণীর চরিত্র তিনি এমনভাবে কলংকিত করতে পারেন, তা পাঠকের বুঝতে বাকী থাকার কথা নয়।

পুণ্যবতী জেব–উন্নিসার চরিত্র অধিকতর জঘন্যভাবে চিত্রিত করতে বঙ্কিম কণামাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। না করবারই কথা। মুসলমানের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষে বিবেক ও রুচিবোধ হারিয়ে তিনি নানা প্রলাপ বকেছেন। 'রাজসিংহ' উপন্যাসটির আগাগোড়া বাদশাহ্ আওরংজেব-আলমগীর ও তাঁর বিদূষী কন্যা জেব–উন্নিসার

চরিত্র জঘন্যরূপে বিকৃত করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মনের সাধ মিটিয়েছেন।

'দুর্গেশনন্দিনী' গ্রন্থে জগৎসিংহের সাথে আয়েশা নাম্নী এক কল্পিতা মুসলিম মহিলার অবৈধ প্রণয় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। স্যার যদুনাথ সরকার 'দুর্গেশনন্দিনী' সম্পর্কে বলেন ঃ "বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে সত্য ইতিহাস কতটুকু আছে? মানসিংহ, জগৎসিংহ, কুৎলু খাঁ, খাজা ইসা, উসমান—ইহারা সকলেই ঐতিহাসিক পুরুষ ··· ইহা ভিন্ন 'দুর্গেশনন্দিনী'র আর সব কথা কাল্পনিক।·· ·· আয়েশা, তিলোত্তমা, বিমলা সকলেই কাল্পনিক।·· এগুলি আসিয়াছে ঐতিহাসিক নামজাদা একজন ঘোর কাল্পনিক সাহেবের লেখা হইতে, তিনি কাপ্তান আলেকজান্ডার ডাও (Alexander Dow)। এই সাহেবটি ফিরিশ্‌তা রচিত হিন্দুস্থানের ইতিহাস ইংরাজীতে প্রায়শঃ অনুবাদ করিয়া দিতেছেন বলিয়া এবং নিজ গ্রন্থের নামপত্রে ফিরিশ্‌তার নাম সংযোগ করিয়া দিয়া অপর্যাপ্ত মেকী কথা চালাইয়াছেন, যাহা ফিরিশ্‌তাতো লেখেন নাই, এমনকি, কোনও পারসিক লেখকের পক্ষে সেরূপ সম্ভব ছিল না।" —[বঙ্কিম রচনাবলী, ষষ্ঠ প্রকাশ, ১৩৮২ (উপন্যাস প্রসংগ) পৃঃ ২৯–৩০]।

একথা সত্য যে, মুসলমানদের ইতিহাস ও চরিত্র বিকৃতকরণে ইংরেজ এবং হিন্দু উভয়েই বাকপটুতা প্রদর্শন করেছেন। তবে এ ব্যাপারে কে কতখানি অগ্রগামী তা বলা কঠিন।

'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বলছেন ঃ

"দেখ যত দেশ আছে মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন দুর্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটি খায়? বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল–কুকুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি–বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি–বউয়ের পেটে ছেলে রাখিয়া সোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে।··· আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণ পর্যন্ত যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?" —('আনন্দমঠ', প্রথম খন্ড, দশম পরিচ্ছেদ)।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর মন্ত্রশিষ্যগণ তাঁদের সাহিত্যে, কবিতায়, প্রবন্ধে মুসলমানদের নামের পূর্বে 'নেড়ে', 'পাতি নেড়ে', ম্লেচ্ছ' প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার

না করে লেখনী ধারণ করা পাপ মনে করতেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে জগৎসিংহ ও কল্পিত আয়েশাকে পরস্পর প্রণয়াবদ্ধরূপে দেখানো হয়েছে। তবুও আয়েশাকে যবনী বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করা হয়েছে। দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ সমাপ্তিতে বলা হয়েছে, 'আয়েশা যবনী হইয়াও তিলোত্তমা আর জগৎসিংহের অধিক স্নেহবশত সহচরীবর্গের সহিত দুর্গান্তঃপুরবাসিনী হইলেন।"

আল্লাহ, কোরআন শরীফ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে উপহাস করে 'আনন্দমঠে'র চতুর্থ খন্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—

মুসলমানেরা বলিতে লাগিল, "আল্লা-আকবর! এতনা রোজের পর কোরআন শরীফ বেবাক কি ঝুটা হলো? মোরা যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ করি, তা এই তেলককাটা হিঁদুর দল ফতে করতে নারলাম?"

বিপিন চন্দ্র পাল 'আনন্দমঠ' সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ

"আনন্দমঠে তিনি দেশমাতৃকাকে মহাবিষ্ণুর বা নারায়ণের অংশে স্থাপন করিয়া আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বদেশ সেবাব্রতকে সাধারণ মানবপ্রীতি এবং বিশ্বমানবের সেবার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন। মহাবিষ্ণুকে বা নারায়ণকে বা বিশ্বমানবকে ছাড়িয়া দেশমাতৃকার পূজা হয় না। এ কথাটা আনন্দমঠের একটা অতি প্রধান কথা।" —(নবযুগের বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১০৯)

রমেশচন্দ্র দত্ত 'ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা'র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শীর্ষক প্রবন্ধে (১১শ' সংস্করণ, ষষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ১১০) বলেন ঃ

"আনন্দমঠের' সারকথা হলো ব্রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশ শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করে উৎপীড়নমূলক মুসলিম শাসনের অবসান ঘটানো। ··· শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক, ভারতে একটি হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আদর্শে 'আনন্দমঠ' উদ্দীপ্ত।"

মোটকথা, বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' লিখে একদিকে মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে তাঁর স্বজাতিকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছেন এবং 'বন্দেমাতরম' সংগীতের মাধ্যমে ধর্মের নামে—দেবী দেশমাতৃকার নামে হিন্দুজাতির মধ্যে পুনর্জাগরণের প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। এ পুনর্জাগরণ সম্ভব মুসলিম দলনে এবং ব্রিটিশ শাসনকে এদেশে স্বাগতঃ জানিয়ে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করে—এ ভাবধারা আনন্দমঠের ছত্রে ছত্রে প্রবাহিত।'আনন্দমঠের' বন্দেমাতরম' মন্ত্রের সার্থক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বংগভংগ রদ আন্দোলনে।

বংগভংগ ও বংগভংগ বিরোধী আন্দোলন যথাস্থানে আলোচিত হবে। তবে এখানে 'বন্দেমাতরমের' ভাবাদর্শে যে সন্ত্রাসবাদ জন্মলাভ করেছিল তার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়ে রাখি।

আবদুল মওদূদ বলেন ঃ

সন্ত্রাসবাদ বাংলার মাটিতে আসন খুঁজে পায়নি উনিশ শতকে এবং ভদ্রলোকদের সহানুভূতিও লাভ করেনি। ১৯০৩ সালের পূর্বে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লন্ডন থেকে কোলকাতায় প্রত্যাগমন করে উত্তেজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, কিন্তু কোন সহানুভূতি পাননি।

··· বিফল হ'য়ে তিনি বরোদায় বড়দাদা অরবিন্দ ঘোষের নিকট গমন করেন। অরবিন্দও ইংলন্ডে উচ্চশিক্ষিত। তিনি তখন গায়কোয়াড় কলেজের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বারীন্দ্র বরোদায় বসে অনুধাবন করেন, রাজনীতিকে ধর্মের সঙ্গে একাঙ্গীভূত না করলে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে কাজ হবে না। এ জন্যে তিনি গীতাপাঠের সঙ্গে রাজনীতির পাঠ দেবার উদ্দেশ্যে 'অনুশীলন সমিতি'র পরিকল্পনা করেন ও উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে থাকেন।

"সুযোগ মিললো ১৯০৪ সালে। তখন বাংলা বিভাগ পরিকল্পনা জোরদার হয়েছে এবং 'ভদ্রলোক' হিন্দু সম্প্রদায়-সর্বনাশের আভাসে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। বারীন্দ্র কোলকাতায় এলেন ১৯০৪ সালে, অরবিন্দ এসে যোগ দিলেন ১৯০৫ সালে। বাংলা বিভাগ কার্যকর হলো, বাঙালী হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। 'বংগমাতার' অংগচ্ছেদ বলে বিভাগটার ধর্মীয় রূপ দেয়া হলো এবং সমগ্র হিন্দু বাংলা আন্দোলনে মেতে উঠলো।" —(আবদুল মওদূদঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ২০২)।

'আনন্দমঠের' বন্দেমাতরম মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেই বাংলার মাটিতে সন্ত্রাসবাদ জন্মলাভ করে। অরবিন্দ ঘোষের স্বীকৃতিই তার প্রমাণ। ১৯০৭ সালের ১৬ই এপ্রিল বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লিখেন। তার থেকে কিঞ্চিত উদ্ধৃতি নিম্নে দেয়া হলো ঃ

"The earlier Bankim was only a poet and stylist—the later Bankim was a saint and a nation-builder".

অর্থাৎ, 'প্রথম দিককার বঙ্কিম একজন কবি ও শিল্পী—শেষ দিককার বঙ্কিম—ঋষি ও জাতি গঠনকারী।'

তিনি আরও বলেন—

"It was thirty two years ago that Bankim wrote his great song . . . The Mantra had been given and in a Single Day a whole people had been converted to the religion of patriotism. The mother had revealed herself . . . A great nation which has had that vision can never again be placed under the foot of the conqueror".

অর্থাৎ "বত্রিশ বছর আগে বঙ্কিম তাঁর বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম' সংগীত রচনা করেছিলেন। মন্ত্র ফুঁকে দেয়া হলো, আর একদিনেই গোটা জাতি দেশমাতৃকার ধর্মে দীক্ষিত হ'য়ে গেল। দেশমাতা আত্মপ্রকাশ করলেন · · · সেই স্বপ্নসাধ পোষণ করতো যে এক বিরাট জাতি, সে আর বিজেতার পদতলে লুণ্ঠিত হবে না।" —শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল–(বঙ্কিম রচনাবলী গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিম পরিচিতি লেখক), পৃঃ ২৫–২৬।।

বঙ্কিম সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের প্রতি বিষোদ্‌গীরণের বিরুদ্ধে বিংশতি শতকের প্রথম পাদে মুসলিম পত্র–পত্রিকায় তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। বরঞ্চ হিন্দুদের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসবাদ ও হিংস্রতা ক্রমশঃ বেড়েই চলছিল। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'ইসলাম প্রচার–এর বাংলা ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১৯০৭ খৃঃ) নিম্নের চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয় ঃ

"ইংরেজ এবং মুসলমানদের উৎখাত করার সংকল্প নিয়ে সর্বশ্রেণীর হিন্দুদেরকে— উচ্চশিক্ষিত থেকে স্কুলের ছাত্র পর্যন্ত—লাঠিখেলা ও কুস্তি শিক্ষার জন্যে দলে দলে ভর্তি করা হচ্ছে। তাদের ভয়াবহ গতিবিধি সারা বাংলায় বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছে। এসব ঠগেরা কুমিল্লায় একজন মুসলমানকে হত্যা করেছে, জামালপুরে দু'জনকে জবাই করেছে এবং হিন্দু ও মুসলমান ফকীর–সন্যাসীর ছদ্মবেশে সারা বাংলায় আতংক ছড়াচ্ছে। মৌলভীর ছদ্মবেশে তারা হিন্দুদের লুণ্ঠন করার, হিন্দু বিধবাদের বিবাহ করার, এবং হিন্দু নারী ধর্ষণের জন্যে মুসলমানদেরকে প্ররোচিত করছে এই বলে যে, এ ব্যাপারে সরকার এবং ঢাকার নবাবের কাছ থেকে নিশ্চিত সাহায্য পাওয়া যাবে।

'ইসলাম প্রচারকের' সেই সংখ্যায় আরও সংবাদ পরিবেশিত হয় যে, পাঞ্জাবে হিন্দুদের সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা এবং বিশেষ করে আর্যসমাজী কংগ্রেসী টাউটদের

তৎপরতার বিরুদ্ধে মুসলিম সমিতিগুলোর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছেন যে, এসব হিন্দু সন্ত্রাসবাদ ও অরাজকতার সাথে মুসলমানদের কোনই সংস্রব সম্বন্ধ নেই।

এ অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু 'সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ'। এ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মূল উৎস ছিল বঙ্কিম সাহিত্য। বঙ্কিম সাহিত্যে মুসলমানদেরকে 'যবন', 'ম্লেচ্ছ', 'নেড়ে', 'পাতি নেড়ে' প্রভৃতি ইতর ভাষায় আখ্যায়িত করে এ যবন ও ম্লেচ্ছ নিধন হিন্দুজাতির ব্রত ও পুণ্যকর্ম হিসাবে দেখানো হয়েছে। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র এ যবন নিধনে তাদেরকে প্রেরণা যোগায়। কিন্তু বিংশতি শতাব্দীর প্রথম পাদে একদিকে যখন হিন্দু–মুসলিম মিলনের গান হচ্ছিল সারা দেশে, তখন হিন্দু–মুসলিমের যুক্ত বৈঠক ও সভাসমিতিতে অনিবার্যরূপে গাওয়া হতো 'বন্দেমাতরম' সংগীত। মুসলমানদের বহু আপত্তি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁরা নিবৃত্ত হননি।

মাসিক পত্রিকা 'শরিয়তে ইসলাম' বাংলা ১৩৩৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১৯২৮ খৃঃ) হিন্দু–মুসলমানের যৌথ সভায় 'বন্দেমাতরম' সংগীত বন্ধ করার দাবী জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। The Mussalman-এর সম্পাদক মৌলভী মজিবর রহমান কংগ্রেসের জাতীয় কমিটির নিকটে সভাসমিতিতে 'বন্দেমাতরম' নিষিদ্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু এতেও কোনই ফল হয়নি।

হিন্দু–মুসলিম সংঘর্ষের আর একটি কারণ হলো মসজিদের সামনে হিন্দুদের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার এবং হিন্দু জমিদারীর অধীনে ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় মুসলমানদের গো–কোরবানীতে বাধা দান। এ নিয়ে বহু বাদ–প্রতিবাদেও কোন লাভ হয়নি।

মুসলিম ভারতের উপরে চরম আঘাত হানে আর্য সমাজীদের 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' আন্দোলন। এ আন্দোলনের অন্যতম নেতা লালা হরদয়াল কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতিতে বলা হয়, যা ১৯২৫ সালের ২৫শে জুলাই Times of India-তে প্রকাশিত হয় ঃ

"হয় মুসলমানদেরকে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে হবে, নতুবা জীবন ও মানসম্মানসহ ভারত পরিত্যাগ করতে হবে।" আর্য সমাজের স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রধান শিষ্য সত্যদেব একই সময়ে ঘোষণা করেন ঃ

"আমরা শক্তি অর্জন করার পর মুসলমানদের নিকটে এ শর্তগুলি পেশ করব, 'কোরআনকে আর ঐশী গ্রন্থ হিসাবে মানা চলবে না, মুহাম্মদকে খোদার নবী বলে স্বীকার করা চলবে না, মুসলমানী অনুষ্ঠান পর্বাদি পরিত্যাগ করে হিন্দু পর্ব পালন করতে হবে। মুসলমানী নাম পরিত্যাগ করে রামবীন, কৃষ্ণবান, ইত্যাদি নাম রাখতে হবে। আরবী ভাষায় উপাসনার পরিবর্তে হিন্দী ভাষায় উপাসনা করতে হবে।" A History of the Freedom Movement পৃঃ ২৬২ থেকে গৃহীত। —(Mustafa Nurul Islam : Bengali Muslim Public Opinion as reflected in the Bengali Press 1901-1930, p. 125)।

রাজনৈতিক হাংগামার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল বোম্বাইয়ে যখন হিন্দুনেতা বালগঙ্গাধর তিলক দুটি হিন্দু ধর্মীয় উৎসবকে প্রাধান্য দিয়ে হিন্দু জনমত ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত করতে থাকেন। এ দুটি উৎসবের একটি হলো 'গণেশের' পূজা আর দ্বিতীয়টি 'শিবাজী' উৎসব। স্কুল কলেজের যুবকদের সামরিক শিক্ষা দিয়ে, এ দুটি উৎসবকে কেন্দ্র করে, হিন্দু ক্ষাত্র শক্তিকে জাগ্রত করা হয়। তিলক শিবাজী উৎসবে পৌরহিত্যকালে ভগবদ্‌গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে ঘোষণা করেন যে, আত্মকারণে না হলে, জাতি বা দেশমাতার কারণে গুরু ও আত্মীয় হত্যায় কোন পাপ হয় না। তাঁর শিক্ষায় স্কুল কলেজের ছাত্র শিক্ষক উদ্দীপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে গুপ্ত সমিতি গঠন করতে থাকে হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্যে।

বংগবংগের পর ১৯০৬ সালে এ আন্দোলন হঠাৎ জোরদার হয়ে উঠে এবং সারা ভারতব্যাপী 'শিবাজী উৎসব' পালন করে হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হতে থাকে। এ উৎসবে সকল প্রখ্যাত হিন্দু সমাজনেতা, রাজনীতিবিদ, কবি সাহিত্যিক সানন্দে যোগদান করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী উৎসব' লিখে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে প্রত্যক্ষ যোগদান করেন। তিনি 'শুভশঙ্খনাদে জয়তু শিবাজী' উচ্চারণ করে এ 'ধ্যানমন্ত্রে' দীক্ষা গ্রহণ করেন ঃ

ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন—
দরিদ্রের বল।
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল।

(Indian Sedition Committee Report, 1918, p. 2; B.B. Misra : the Indian Middle class : Their growth, আবদুল মওদুদ ঃ মধ্যবিত্ত

সমাজের বিকাশ দ্রষ্টব্য)।

বাংলা তথা সারা ভারতে রাজনীতি ও হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন একাকার হয়ে গেল। ধর্মীয় উন্মত্ততা রাজনীতির আবহাওয়াকে করলো বিষাক্ত ও কলুষিত এবং ফলে চারদিকে শুরু হলো হিন্দু–মুসলিম বিরোধ ও সংঘর্ষ। একে অপরের রক্তে হাত রঞ্জিত করতে লাগলো।

খেলাফত আন্দোলন চলাকালে সাময়িকভাবে হলেও হিন্দু–মুসলিম সম্পর্কের উন্নতি সাধিত হয়েছিল। কিন্তু এ সময়ে হিন্দুজাতি একরকম বলতে গেলে 'মুসলিম আতংকের' ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল। এ ব্যাধি ছড়াচ্ছিলেন প্রধানতঃ বিপিনচন্দ্র পাল, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, লালা লাজপৎ রায় এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। এ চার ব্যক্তি ছিলেন 'শুদ্ধি সংগঠন' আন্দোলনের উদ্যোক্তা, এবং কংগ্রেসের জাতীয় রাজনীতিতে হিন্দুত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় এঁদের অবদান ছিল সর্বাধিক। উপরন্তু এঁরা সারা ভারতে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দীভাষা প্রবর্তনেরও জোরদার ওকালতি করেন।

রিয়াজুদ্দীন আহমদ ও মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত কোলকাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সুলতানে' ১৯২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'রবীবাবুর আতংক' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে আক্ষেপ করে বলা হয় ঃ

"রবীন্দ্র ঠাকুর পর্যন্ত এ ব্যাধিতে আক্রান্ত বলে আমরা দুঃখিত। তাঁকে এরূপ বলতে শুনা গেছে, 'ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম শাসন কায়েম হবে। সেজন্যে হিন্দুদের মারাত্মক ভুল হবে—খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেয়া। মহাত্মা গান্ধীকে মুসলমানেরা পুতুলে পরিণত করেছে। তুরস্ক ও খেলাফতের সাথে হিন্দুস্বার্থের কোনই সংস্রব নেই।"

উপসংহারে 'সুলতান' বলেন, "অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে আমরা একজন কবি, খ্যাতনামা কবি, বিশ্ববিখ্যাত কবি হিসাবে মানি . . . কিন্তু তিনি রাজনীতিক নন . . . ভারতে মুসলিম শাসনের কল্পিত আতংকে তিনি আতংকিত।" —(Mustafa Nurul Islam : Bengali Muslim Public Opinion as reflected in the Bengali press 1901-1930, pp. 147-48)।

বলতে গেলে, খেলাফত আন্দোলনে কংগ্রেসের যোগদানে ঐকান্তিকতা ছিলনা মোটেই, মুসলমানেরা মনে করেছিল এবার হয়তো হিন্দু–মুসলমানের বিরোধের অবসান ঘটবে। কিন্তু তা হয়নি।

এস কে মজুমদার তাঁর 'জিন্নাহ ও গান্ধী' গ্রন্থে বলেন :

"খেলাফত আন্দোলনকালে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য কোন জোরদার বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুসলমানদের কাছে এটা ছিল একটা ধর্মীয় আন্দোলন, ভারত স্বাধীন করার কোন চিন্তা এতে ছিলনা। পক্ষান্তরে গান্ধী এটাকে গ্রহণ করেছিলেন নিজ উদ্দেশ্য হাসিলের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে। গান্ধীজী বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি খেলাফত আমাদের দু'জনের নিকটে কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল— মওলানা মুহাম্মদ আলীর নিকট এটা তাঁর ধর্ম। আর আমার নিকট হচ্ছে, খেলাফতের জন্যে জীবন বিসর্জন দিয়ে গো-নিরাপত্তা নিশ্চিত ও নির্ভয় করছি। অর্থাৎ আমার ধর্মকে মুসলমানের ছুরিকা থেকে রক্ষা করছি।'

'ধর্ম' বলতে এখানে গান্ধীজী যে 'গোধর্মই বুঝিয়েছেন, তা না বললেও চলে। মুসলমানের ছুরিকা থেকে 'গোধর্ম' বা গোজাতিকে রক্ষা করার অর্থ হলো ভারতভূমিতে মুসলমানের গো-কোরবানী চিরতরে বন্ধ করা।

১৮৭০ সাল থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানে যত দাংগা হয়েছে তার খতিয়ান বিবেচনা করলে জানা যাবে যে এসবের প্রত্যক্ষ কারণ (Immediate cause) হচ্ছে এই যে, প্রথম চার বছর হিন্দুর দুর্গাপূজা আর মুসলমানের কোরবানী একই সময়ে, বলতে গেলে, একই দিনে হতো। কথা যদি এই হতো যে, ঠিক আছে, উভয়ে উভয়ের উৎসব পালন করুক— হিন্দুরা দুর্গাপূজা করুক, মুসলমান কোরবানী করুক। কিন্তু তা নয়। মুসলমানরা গো কোরবানী করতেই পারবে না। আর হিন্দু দুর্গাপূজা ত করবেই। বরঞ্চ বিসর্জনের দিনে মসজিদের সামনে দিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বাজনা বাজিয়ে মিছিল করে যাবে। ফলে দাংগা হাংগামা ত অনিবার্য। গায়ে পড়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, দাংগা-হাংগামা বাধিয়ে মুসলমানকে খুনী আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রায় দেয়া হবে- "বাবা, এখন জানমাল ও মান-সম্মান নিয়ে যে দেশ থেকে এসেছিলে, সেখানে চলে যাও।" এসব পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হচ্ছিল, এ কথা মনে করার সংগত কারণও আছে। পরবর্তীকালে আর্য সমাজীরা এবং হিন্দু মহাসভার নেতাগণ এ কথাই বারবার বলেছেন। বঙ্কিম 'আনন্দমঠে' বন্দেমাতরম মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন 'যবন-ম্লেচ্ছ' নিধনযজ্ঞের আর এদের কথা হলো, 'হত্যাযজ্ঞের পরে যারা তোমরা বেঁচে আছ, ভারত ত্যাগ কর।'

পরিকল্পিত দাংগা-হাংগামায় হিন্দুপক্ষ সমর্থনের বড়ো সাধ ইংরেজদেরও ছিল। কারণ ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মুসলমান ছিল তাদের চোখের বালি। ১৮৮৩ সালে জন্ ব্রাইট লন্ডনে ইন্ডিয়ান কমিটি নামে একটি সমিতি গঠন করেন এবং পঞ্চাশ জন ইংরেজ এম পিকে এর সভ্য করেন। ১৮৮৫ সালে অ্যালেন হিউম ভারতীয় কংগ্রেস গঠন করেন। হিউম বাংলা প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। তিনজন ইংরেজ এই কংগ্রেসের সভাপতি হন এবং তাঁরাই ইংলন্ডে কংগ্রেসের প্রচারকার্য চালিয়ে কংগ্রেসকে একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইংলন্ডবাসীর কাছে পরিচিত করেন। ১৮৮৮ সালে চার্লস ব্রাড্‌ল কংগ্রেসের সার্বক্ষণিক বেতনভুক কর্মচারী নিযুক্ত হন। লন্ডনে কংগ্রেসের প্রচারকার্যে নিয়োজিত হন উইলিয়ম ডিগ্‌বী। কংগ্রেসের প্রচারকার্যে ১৮৮৯ সালে ব্যয়িত হয় ২৫০০ পাউন্ড। ডিগ্‌বী প্রচার করতেন, কংগ্রেস ভারতের সব জাতি, সম্প্রদায় ও শ্রেণীর একমাত্র মুখপাত্র। এমনকি মুসলমানেরও।

হিন্দু-মুসলিম দাংগায় ভারতভূমি যখন রক্তরঞ্জিত হচ্ছিল, সে সময়ে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার না কোন ব্যক্তি, আর না কোন প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু ব্রিটেনের ইন্ডিয়া কমিটি কংগ্রেসকেই সমর্থন করে বলতো,—"ভারতে সাম্প্রদায়িক প্রীতি অক্ষুণ্ন আছে।"

ব্রিটেনের ১৯০৫ সালের নির্বাচনে ভারতফেরত বেশ কিছুসংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত আইসিএস অফিসার হাউস অব কমন্সের সদস্য হন। তাঁরা ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টারী কমিটি গঠন করেন। স্যার হেনরী কটন ছিলেন তার একজন সদস্য। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয়দের আশা আকাংখা তুলে ধরার দায়িত্ব পালনে গৌরব বোধ করেন তিনি। তিনি প্রচার করতেন, "জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতীয় এক জাতীয়তায় গৌরব বোধ করে।" লাহোর, কার্ণাল প্রভৃতি স্থানে যখন প্রচন্ড সাম্প্রদায়িক দাংগা চলছিল এবং বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা লুঠতরাজ দ্বারা বিভীষিকা সৃষ্টি করছিল, তখন হেন্‌রী কটন বলতেন, "মুসলমানদের স্বার্থ হিন্দু সংবাদপত্র ছাড়া অন্য কোথাও সমর্থিত হয় না।" বংগভংগ রদের ব্যাপারে হিন্দুদের দোসর ইংরেজ সাহেবদের আচরণ কি ছিল তা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

উপরে বলা হয়েছে যে, খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বংগভংগের পর বাংলা তথা সারা ভারতে

৯—

হিন্দুজাতির মানসিকতা যেভাবে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে, তারপর— খেলাফত আন্দোলনে তার উপরে যে একটা কৃত্রিম প্রলেপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এ সময়ের সবচেয়ে মর্মন্তুদ ও লোমহর্ষক ঘটনা হলো মুসলিম মোপলা সম্প্রদায়ের উপর অমানুষিক ও পৈশাচিক নির্যাতন নিষ্পেষণের।

এ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী সংবাদ ভারতের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। হিন্দু পত্র-পত্রিকা ও নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে হিন্দু মহাসভা ও আর্য সমাজের নেতাগণ প্রকৃত ঘটনাকে অতিমাত্রায় অতিরঞ্জিত করে হিন্দুভারতকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তোলেন। ফলে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাংগা-হাংগামার সূত্রপাত হয়। ১৯২২ সালে অমৃতসর থেকে 'দাস্তানে জুলুম' নামে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সাহারানপুর থেকে 'মালাবার কি খুনী দাস্তান' নামে আর একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এ পুস্তিকা দু'টির অধিকাংশ সংবাদ অতিরঞ্জিত, কল্পিত ও অনির্ভরযোগ্য সূত্রে গৃহীত।

প্রথম পুস্তিকায় যেসব তথ্য প্রকাশিত হয় তার সারাংশ হচ্ছে :

মালাবারের সশস্ত্র মোপ্‌লা সম্প্রদায় হত্যা, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ, বলপূর্বক হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণ প্রভৃতি কাজে লিপ্ত রয়েছে। বলা হয়েছে যে, একজন পুরুষ হিন্দুকে প্রথমতঃ তারা গোসল করিয়ে দেয়। তারপর মুসলমানী কায়দায় তার চুল কেটে দেয়া হয়, অতঃপর মুসলমানী কালেমা পড়তে বাধ্য করা হয়। মেয়েদেরকে মোপ্‌লাদের পোষাক পরিয়ে দেয়ার পর কান ছিদ্র করে ইয়ারিং পরিয়ে দেয়া হয়।

দ্বিতীয় পুস্তিকায় বলা হয় যে, মালাবারের মুসলমানরা হিন্দুদেরকে খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করতে এবং মুসলমান হতে বাধ্য করছে। সম্মত না হলে তাকে ঘরে আবদ্ধ করে তার মুখে গরুর গোশ্‌ত গুঁজে দেয়া হয়। তার আপনজন ও আত্মীয় স্বজনকে তার চোখের সামনে মারধর করা হয়। এতেও মুসলমান হতে রাজী না হলে, তাকে হত্যা করে খন্ড বিখন্ড করে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়। মন্দির ধ্বংস করা হচ্ছে, প্রতিমা চূর্ণ বিচূর্ণ করা হচ্ছে। হিন্দু সন্যাসীদেরকে গরুর কাঁচা চামড়া পরিধান করতে বাধ্য করা হচ্ছে। —(A. Hamid Muslim Separatismin India, pp. 158-159) : (দাস্তানে জুলুম— সেক্রেটারী, মালাবার হিন্দু সহায়ক সভা, অমৃতশহর, ১৯২২)।

হিন্দুজাতির কাছে এই বলে উদাত্ত আহবান জানানো হতোঃ

"হিন্দুজাতি জাগ্রত হও। তোমাদের নিদ্রা তোমাদের মৃত্যু ডেকে আনবে। আত্মরক্ষার জন্যে বদ্ধপরিকর হও। তোমাদের দুর্বলতা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে। লাঞ্ছিত জীবন যাপন অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়। 'তোমাদের ভাইয়ের দুঃখ দুর্দশা তোমাদের নিজেদেরই।" —(A. Hamid Muslim Separatism in India, p. 159, দাস্তানে জুলুম, ঐ)।

প্রকৃত ঘটনা জানার জন্যে কেন্দ্রীয় খেলাফত সংগঠনের পক্ষ থেকে গঠিত একটি কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এ কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে যে রিপোর্ট পেশ করে তার সারাংশ নিম্নরূপ :

সরকারী ঘোষণায় যে মালাবারের ঘটনাবলীকে 'সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' বলে আখ্যায়িত করা হয়, তা সঠিক নয়। অবস্থা স্বাভাবিক এবং বিদ্রোহের চিহ্নমাত্র নেই। ভারতের অন্যান্য স্থানের মুসলমানের ন্যায় মোপলাগণও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ আন্দোলন দমন করতে বদ্ধপরিকর। পুলিশের দৌরাত্ম ও বাড়াবাড়ি তাদেরকে কিছুটা বিদ্রোহী করে তোলে। ঘটনার সূত্রপাত এভাবে হয় যে, স্থানীয় খেলাফত কমিটির সেক্রেটারীকে ধরে এনে একটি গাছের সাথে বেঁধে ফেলা হয়। তার স্ত্রীকে সেখানে এনে তার চোখের সামনে তার চামড়া খুলে ফেলা হয়। তারপর ট্রাফিক আইন ভংগ করার তুচ্ছ অপরাধে মোপলাদের জনৈক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে একজন পুলিশ কনস্টেবল মুখে থাপ্পড় দেয়। অন্য একজন খেলাফত কর্মীকে অন্যায়ভাবে অস্ত্র নির্মাণ অপরাধে জড়িত করা হয়। অবশেষে পুলিশ মোপ্‌লাদের গৃহে বলপূর্বক ঢুকে পড়ে তাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে এবং গৃহের মালিকদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার করে। এতেও ক্ষান্ত না হয়ে পুলিশ তাদের উপর বেপরোয়া গুলীবর্ষণ করে। মোপ্‌লা সম্প্রদায় অসীম সাহসী ও যোদ্ধা ছিল। ফলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে তারা জয়ী হয়। ক্ষিপ্ত মোপ্‌লারা অতঃপর টেলিগ্রাফ তার ও রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ পর্যন্ত হিন্দুদের সাথে তাদের পূর্ণ সদ্ভাব বজায় ছিল। কারণ খেলাফত কর্মী হলেও তারা ছিল কংগ্রেসী। তারা হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচার করে বেড়ায় এবং হিন্দু মহল্লা ও তাদের ধনসম্পদ পাহারা দেয়। —(A. Hamid Muslim Separatism in India, p. 159-160: কাশ্‌ফে হাকীকতে মালাবার-বাদাউন,১৯২৩)।

দু'সপ্তাহ পর বহুসংখ্যক পুলিশ ও সৈন্য বাহিনী ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। 'বিদ্রোহী' মোপ্লাদের সংবাদ সরবরাহ করার জন্যে অধিকাংশ হিন্দু গুপ্তচরের কাজ শুরু করে। এর ফলে মোপ্লাগণ হিন্দুদের প্রতি রুষ্ট হ'য়ে পড়ে। পুলিশ হিন্দুদেরকে মোপ্লাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। আর্য–সমাজী কর্মীগণও তাদেরকে সাহায্য করে। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী মিলিতভাবে মোপলাদের প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। সামরিক শাসনের অধীনে অমানুষিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তাদেরকে কাটাতে হয়। শত শত মোপ্লা বাস্তুহারা ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। শত শত লোক কারাবরণ করেন এবং দুইশত জনকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হয় —(A. Hamid : do. p. 160 : কাশ্‌ফে হাকীকতে মালাবার)।

Indian Annual Register-এ বর্ণিত হয়েছে যে, পুলিশ ও সরকারী প্রশাসন বিভাগকে পরাজিত করে মোপ্লাগণ খেলাফত কায়েম করে এবং শাসকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। হিন্দুদের পাইকারীভাবে ধর্মান্তরকরণের সংবাদ ভিত্তিহীন। মোপ্লাগণ বনে জঙ্গলে আত্মগোপন ক'রে গেরিলা তৎপরতা চালায়।

উক্ত রেজিষ্টারে একটি তুলনাহীন বর্বরতার উল্লেখ করা হয়। তা হচ্ছে এই যে, একশত বন্দী মোপলাদেরকে একটি রেলের মালগাড়ীতে ভর্তি করে, দরজা বন্ধ করে দিয়ে, অন্যত্র পাঠানো হয়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবার পর দরজা খোলা হলে দেখা যায় ৬৬ জন মৃত্যুবরণ করেছে এবং অবশিষ্ট মুমূর্ষু অবস্থায়। উক্ত রেজিষ্টার মন্তব্য করে ঃ এ সময়ের মালাবার ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়ের কত যে অমানুষিক লোমহর্ষক ঘটনা অজ্ঞাত আছে, তা একমাত্র ভবিষ্যতই প্রকাশ করতে পারে —(A. Hamid, Muslim Separatism in India, p.160: Indian Annual Register 1922, p. 266)।

এ ঘটনাগুলি সারা ভারতের হিন্দু–মুসলমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুসলিম ভারত মর্মাহত হয়ে পড়ে এবং মোপ্লাদের সাহায্যের জন্যে আবেদন জানায়। চতুর্দিক থেকে অপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে হিন্দু সংবাদপত্র ও নেতৃবৃন্দ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে হিন্দুদেরকে উত্তেজিত করতে থাকেন।

সারাদেশে নতুন করে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রথম শুরু হয় মুলতানে ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহররম উৎসবকে কেন্দ্র করে। ১৯২৩

সালে তার পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং প্রচন্ড সংঘর্ষ ঘটে সাহারানপুরে। এখানে নিহতের সংখ্যা তিনশতের অধিক বলা হয়েছে। পরবর্তী বৎসরে আঠারোটি দাঙ্গা–হাঙ্গামায় ৮৬ জন নিহত এবং ৭৭৬ জন আহত হয়। চরম সংঘর্ষ ঘটে কোহাটে। জনৈক হিন্দুকর্তৃক ইসলাম বিরোধী কবিতা প্রকাশনাই এর মূল কারণ। দু'দিন ধরে যে দাঙ্গা চলে, তাতে ৩৬ জন নিহত এবং ১৪৫ জন আহত হয়, দোকান–পাট লুণ্ঠিত হয়, এবং প্রায় সত্তর হাজার টাকার ধনসম্পদ বিনষ্ট করা হয়। পর বৎসর ১৯২৫ সালে অবস্থা কিছুটা শান্ত হলেও ১৯২৬ সালে আবার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। এ বৎসর সারাদেশে মোট ৩৬টি দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। যার ফলে দু'হাজার লোক নিহত হয়। এ বৎসর দাঙ্গার সূত্রপাত হয় কোলকাতা শহর থেকে মসজিদের সামনে হিন্দুদের বাদ্যবাজনাকে কেন্দ্র করে। পরিস্থিতি আয়ত্তাধীন হবার পূর্বে দু'শ দোকান লুণ্ঠিত হয়, বারটি পবিত্র গৃহ ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ১৫০টি অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংঘটিত হয় এবং হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে চৌদ্দশ'

১৯২৭ সালে সারাদেশে একত্রিশটি দাঙ্গা সংঘটিত হয়ে পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এবার হতাহতের সংখ্যা এক হাজার ছয় শ'। নিহতের সংখ্যা এক শ' ছত্রিশ।

১৯২৮ সালে অবস্থা কিছুটা প্রশমিত হয়। কিন্তু ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাসের মধ্যে বোম্বাই শহরে দাঙ্গা সংঘটিত হয় যার ফলে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় এগার শ'। বিগত কোলকাতা দাঙ্গার ন্যায় এখানেও দোকান–পাট লুণ্ঠিত হয়। ১৯৩১ সালে কানপুরে প্রচন্ড দাঙ্গা–হাঙ্গামা শুরু হয় এবং তিন দিন পর্যন্ত হত্যা, লুঠতরাজ, ও অগ্নিসংযোগ চলতে থাকে। জনৈক হিন্দু হত্যাকারীর সম্মানে বলপূর্বক দোকানপাট বন্ধ করতে গিয়ে হিন্দু–মুসলিম সংঘর্ষ শুরু হয় এবং প্রচন্ড আকার ধারণ করে। এ দাঙ্গায় চার–পাঁচ শ' লোক নিহত হয়, বহুসংখ্যক মসজিদ মন্দির ধ্বংস করা হয় এবং বহু ঘর–বাড়ী অগ্নিদগ্ধ হয়। —(A. Hamid : Muslim Separatism in India, p.162; Cumming : Political India, p. 114-17)।

হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষ থেকে এসব সংঘর্ষের বিবরণ গান্ধীজীর নিকটে বিবৃত করা হলে তিনি মুসলমানদের ঘাড়েই দোষ চাপান। গান্ধীজী মন্তব্য করেন ঃ আমার মনে কোনই সন্দেহ নেই যে, অধিকাংশ কলহে হিন্দুদের স্থান দ্বিতীয়

পর্যায়ে পড়ে। আমার এ মন্তব্য আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ যে, মুসলমানরা স্বভাবতঃই ষণ্ডা প্রকৃতির এবং হিন্দুরা স্বাভাবিকভাবেই ভীরু। আর, যেখানেই ভীরু লোক বিরাজ করে সেখানে সর্বদাই থাকবে, ষণ্ডাদল।

(The Indian Quarterly Register, p. 647; A. Hamid : Separatism in India, p. 105).

মিঃ গান্ধী হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য ও কলহ দমনে সহায়ক হলেন না। বরঞ্চ তাঁর উপরোক্ত মন্তব্য মুসলমানদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং এটা হিন্দু দাঙ্গাকারীদের একটা শক্তিশালী সনদ হয়ে পড়ে।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথে হিন্দু মুসলিম অনৈক্য অথবা কলহ-কোন্দল যে অন্তরায় একথা বুঝতে পেরে মিঃ গান্ধী যে বিব্রত হয়ে পড়েননি, তা নয়। তবে হিন্দু মুসলিম মিলনের সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধানকল্পে তাঁর কোন চেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়নি।

তিনি একবার বলেন যে, একমাত্র চুক্তি বা প্যাক্টের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিমের স্থায়ী মীমাংসা হতে পারে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি বলেন, "প্যাক্টের দ্বারা ঐক্য হতে পারে। কিন্তু তার দ্বারা এক হওয়া যায় না। প্যাক্ট যদি এক হওয়ার ভিত্তি হয়, তাহলে তা হবে একেবারে অর্থহীন, বরঞ্চ তার চেয়েও খারাপ। প্যাক্টের স্বভাবই হলো বিচ্ছিন্নতাবাদ। প্যাক্ট একে অপরকে নিকটে টানবার বাসনা জাগ্রত করে না, এর দ্বারা ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি হয় না, আর তা দলগুলিকে মূল লক্ষ্য অর্জনে একত্রে বাঁধতেও পারে না। একে অপরকে নিকটে টানার পরিবর্তে চুক্তির অধীন দলগুলি একে অপরের কাছ থেকে যতটা সম্ভব আদায় করবার চেষ্টা করে।. . . সকলের অভিন্ন স্বার্থোদ্ধারের জন্যে ত্যাগ স্বীকারের পরিবর্তে চুক্তির অধীন দলগুলি সর্বদা লক্ষ্য করে যে, এক দলের ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা অন্য দলের মঙ্গল সাধিত যেন না হয়।. . . হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অন্তরের মিল ব্যতীত "স্বরাজ" শুধুমাত্র স্বপ্নই রয়ে যাবে।"

কিন্তু পরক্ষণেই আবার তিনি বলেন, " 'স্বরাজ' সমস্যা অপেক্ষা গো-সমস্যা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, . . . যতোক্ষণ পর্যন্ত না আমরা গোরক্ষা করতে সক্ষম হবো, আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে পারব না।" গান্ধীর এসব উক্তি এটাই প্রমাণ করে যে, ভারতীয় স্বাধীনতা হিন্দুত্বের সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলেরই অপর নাম। লাহোরে একটি ঐক্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি পাঞ্জাবে মুসলিম

সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আতংক প্রকাশ করেন। অদূর ভবিষ্যতে পাঞ্জাব একটি রণদক্ষ জাতির আবাসভূমি হয়ে পড়লে উপমহাদেশের শান্তি বিনষ্ট হবে বলেও তিনি আশংকা প্রকাশ করেন। —(মুহাম্মদ আমীন যুবেরী, সিয়াসতে মিল্লিয়া, পৃঃ ১৭৫-৮৪)।

দাঙ্গা-হাঙ্গামায় হিন্দু ও মুসলিম সমাজদেহ যখন রক্তাক্ত তখন তিনি তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবকে উভয়ের কল্যাণমূলক স্বার্থে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তৎপরিবর্তে তিনি রাজনীতি থেকে দূরে সরে পড়ে আহমদাবাদের নিকটবর্তী সবরমতী আশ্রমে নির্জনবাস শুরু করেন এবং ভারতীয় রাজনীতির নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে দিন কাটাতে থাকেন। তবে একেবারে চুপচাপ বসে না থেকে খাদি ও স্বহস্তে নির্মিত বস্ত্রের মহত্ব, ছাগ-দুগ্ধের উপকারিতা, টিকা-ইনজেকশনের অপকারিতা, সোয়াবিনের খাদ্যপ্রাণ প্রভৃতি সম্পর্কে প্রবন্ধাদি লিখেন, হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি মুখ বন্ধ করে থাকেন। (মুহাম্মদ আমীন যুবেরী ঃ সিয়াসতে মিল্লিয়া, পৃঃ ১৭০)।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে ভারতের হিন্দুজাতির প্রকৃত মুখোশ খুলে গেল ১৯৩৭ সালের পর, যখন ১৯৩৫ সালের ইন্ডিয়া এ্যক্টের অধীন ভারতের প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে মন্ত্রীত্ব গঠিত হলো, মুসলমান চারটি প্রদেশে এবং হিন্দু সাতটি প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গঠনের দায়িত্ব লাভ করে। ভারতীয় কংগ্রেস এতদিন ভারতে ও বহির্জগতে এ দাবীতে সোচ্চার ছিল যে, কংগ্রেস— ভারতের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনক্ষমতা একমাত্র কংগ্রেসের উপরেই অর্পণ করতে হবে। পক্ষান্তরে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ এ আশংকা প্রকাশ করে আসছে যে, কংগ্রেসের হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে ভারতীয় মুসলমানদের সকল স্বার্থ দলিত-মথিত হবে এবং মুসলিম জাতিকে তাদের ধর্ম, ঐতিহ্য ও তাহ্জিব তামাদ্দুন বিসর্জন দিয়ে হিন্দুর গোলামে পরিণত হতে হবে।

১৯৩৭ সালের পর কংগ্রেসের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং মুসলমানদের আশংকা সত্যে পরিণত হয়। কংগ্রেস মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মন্ত্রীসভা গঠন করে।

নির্বাচনের পূর্বে এরূপ আশা করা গিয়েছিল যে, মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে, বিশেষ করে ইউ পি এবং বোম্বাই–এ মুসলিম লীগ সদস্যদেরকে নিয়ে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হবে। গভর্ণরদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, মন্ত্রীসভা যেহেতু একটি সমষ্টিগত দায়িত্ব, সেজন্যে শক্তিশালী সংখ্যালঘু দল থেকে যতজন সম্ভব লোক মন্ত্রীসভায় শামিল করা উচিত। ইউ পিতে মুসলমান ছিল মোট লোকসংখ্যার ছয় ভাগের একভাগ। সেখানে তাদের তুলনায় তাদের প্রভাব ও ঐক্য ছিল অনেক বেশী এবং এ কারণে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এরূপ একটি অলিখিত বুঝাপড়া হয়েছিল যে, অন্ততঃ দু'জন মন্ত্রী মুসলিম লীগ থেকে নেয়া হবে। কিন্তু ইউ পি এবং বোম্বাই–এ মুসলিম লীগের কোন সদস্যকে মন্ত্রীসভায় স্থান দেয়া হয়নি। কংগ্রেস এখানেই মারাত্মক ভুল করে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয় যে, একমাত্র কংগ্রেসই সারা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে। মুসলমানদের নিকটে এটা ছিল হিন্দু শাসনের কাছে নতিস্বীকার করা। ফলে 'ইসলাম বিপন্ন' ধ্বনি উত্থিত হয় এবং 'কংগ্রেসরাজ' ব্রিটিশরাজ থেকে অনেক খারাপ বলে বিবেচিত হয়। পন্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু ও মিঃ জিন্নাহর মধ্যে ১৯৩৮ সালের প্রথম দিকে যে পত্র বিনিময় হয় তাতে নেহরুর দাবী হলো ধর্মনিরপেক্ষ যুক্ত ভারতের এবং মিঃ জিন্নাহর দাবী হলো লীগকে কংগ্রেসেরই সমমর্যাদাশীল বলে মেনে নেয়ার। কোন ফরমূলা বা সমঝোতার ভিত্তিতে এর মীমাংসা সম্ভব হলো না —(H.V. Hodson : The Great Divide, p. 63, pp. 66-67)।

ভারতে কংগ্রেস শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচার করা হবে, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে, ইত্যাদি ধরনের কংগ্রেসের বড়ো বড়ো বুলি ১৯৩৭ সালের পর মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসের আড়াই বৎসরের শাসন 'হিন্দু রামরাজ' বলে কুখ্যাতি লাভ করে এবং মুসলমানদের প্রতি অন্যায় অবিচার, তাদের ধর্ম–তাহজিব–তামাদ্দুন বিলুপ্তির প্রচেষ্টা প্রভৃতির দ্বারা কংগ্রেস সারা ভারতের মুসলমানদের আস্থা একেবারে হারিয়ে ফেলে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে পাটনায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে, সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতির সকল আশা ভরসা 'কংগ্রেস ফ্যাসিবাদের' দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। ভারতের সর্বত্র মুসলমানদের পক্ষ

থেকে অত্যাচারী কংগ্রেস শাসনের অবসান দাবী করে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হতে থাকে।

কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের প্রতি কৃত অন্যায় অবিচারের তদন্তের জন্যে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেন তা, 'পীরপুর রিপোর্ট' নামে খ্যাত। 'বিহারের মুসলমানদের অভাব–অভিযোগ'–শীর্ষক একটি রিপোর্ট পেশ করেন বিহার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কর্তৃক গঠিত কমিটি। একে 'শরীফ রিপোর্ট' বলে অভিহিত করা হয়। 'পীরপুর রিপোর্টের' পর ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে 'শরীফ রিপোর্ট' পেশ করা হয়। অতঃপর ডিসেম্বর মাসে বাংলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক 'কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশা' নামে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। হিন্দু পত্র–পত্রিকা রিপোর্টগুলিতে বর্ণিত অভিযোগগুলি অস্বীকার করে এবং বিহার সরকার 'পীরপুর রিপোর্ট'ও প্রত্যাখ্যান করেন।

H.V. Hodson : তার The Great Divide গ্রন্থে বলেন ঃ

"ভারতের ইতিহাসের এ এক সুবিদিত ঘটনা যে, যখন থেকে এ দেশে হিন্দু–মুসলমান পাশাপাশি বাস করা শুরু করেছে, তখন থেকেই কিছুটা ধর্মীয় উত্তেজনা বিরাজ করে আসছে। যেমন ধরুন গো–পূজা, নামাজের আজানে বাধা প্রদান, মসজিদ অপবিত্রকরণ, নারী ধর্ষণ, নারী হরণ প্রভৃতি ব্যক্তিগত আক্রমণ। অপরদিকে, রাজনৈতিক ও শাসন সংক্রান্ত নতুন নতুন অভিযোগ বিরাজ করছে, বিশেষ করে যেসব বর্ণিত হয়েছে যুক্তিপূর্ণ 'পীরপুর রিপোর্টে'। হিন্দীর সপক্ষে উর্দুকে কোণঠাসা করে রাখা হচ্ছে; পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট পক্ষপাতিত্ব করছেন; সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদেরকে তাদের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, কংগ্রেস মন্ত্রীসভা থেকে তারা কোন প্রকার ন্যায়পরতা আশা করে না; কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক অনুরূপ পাল্টা সরকার চলতে দেয়া হচ্ছে; কংগ্রেস শাসন অর্থাৎ হিন্দু শাসন; যেমন সর্বত্র কংগ্রেস পতাকা উড়ানো হচ্ছে, ইসলাম বিরোধী 'বন্দেমাতরম' সংগীত জাতীয় সংগীত হিসাবে গীত হচ্ছে এবং 'ওয়ার্ধা স্কীম' অনুযায়ী গ্রাম্য শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করা হচ্ছে। এ হচ্ছে মিঃ গান্ধীর কল্পনাপ্রসূত আদর্শ যার ভিত্তি হচ্ছে অহিংসা, সূতা প্রস্তুতকরণ ও বয়ন শিল্প এবং ধর্ম থেকে নিবৃত্তি। এর বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিদ্রোহ করতে হয়। কারণ তাদের প্রাথমিক শিক্ষা ছিল সকল সময়ে কোরআন ভিত্তিক।" —(H.V. Hodson : The Great Divide, pp. 73-74)।

মিঃ হড্সন আরও বলেন ঃ

"কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলির ব্রিটিশ গভর্ণরগণ সাধারণতঃ এ ধরনের মত পোষণ করতেন যে, তাঁদের মন্ত্রীগণ যদিও বা অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার দিক দিয়ে দল নিরপেক্ষ থাকবার চেষ্টা করেন, কিন্তু জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসীদের ক্ষমতা প্রবণতা তাদেরকে ঔদ্ধত্য ও উত্তেজনাকর আচরণে লিপ্ত করে। . . . মোট কথা, ভবিষ্যতে সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন্দ্র দ্বারা তা পরিচালিত হবে। আর এর পশ্চাতে এমন একটি সংগঠন থাকবে যে কখনো বিরোধিতা বরদাশ্‌ত্ করবে না এবং কাউকে তাদের ক্ষমতার অংশীদার করতেও স্বীকৃত হবে না। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, ১৯৩৭ থেকে ও ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আড়াই বছরের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দ্বিজাতিত্ব–মতবাদ প্রচার ও পাকিস্তান আন্দোলনের কারণ।" —(H.V. Hodson : The Great Divide, pp. 74-

ভারতের হিন্দু–মুসলিম সংঘর্ষ ও বিরোধ সমাধানকল্পে কবি ইকবাল ১৯৩৭ সালের ২১শে জুন আঙিনা ভাগ করার পরামর্শ দেন। ৭ই জুলাই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলিম ছাত্র সমাজকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

ওই সর্বনাশটাকে ধর্মের দামেতে করো দামী
ঈশ্বরের করো অপমান
আঙিনা করিয়া ভাগ দুই পাশে তুমি আর আমি
পূজা করি কোন্ শয়তানে?

তারপর দশ বছর অতীত হয়েছে অধিকতর বিরোধ ও সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে। আড়াই বছরের কুখ্যাত কংগ্রেস শাসনের ইংগিত উপরে করা হয়েছে। ১৯৩৯ সালের ১৭ই অক্টোবর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতি যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য সহযোগিতার আহবান জানিয়ে ভারতের বড়োলাট লর্ড লিনলিথ্‌গো এক বিবৃতি প্রদান করেন। মুসলমানদের বিক্ষোভের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে নয়, বড়োলাটের বিবৃতির সাথে একমত হতে না পেরে কংগ্রেস হাই কম্যান্ড প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলিকে এস্তেফাদানের নির্দেশ দেয়। তাঁরা নীরবে এ নির্দেশ পালন করেন এবং সাতটি প্রদেশ থেকে কংগ্রেস কুশাসনের অবসান ঘটে। এর জন্যে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলমানগণ সারাদেশে 'নাজাত দিবস' পালন করেন।

মুসলিম লীগের উদ্যোগে সারাদেশে 'নাজাত দিবস' পালন ন্যায়সংগত হোক বা না হোক, কিন্তু একটি জিনিস দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ দেশে শাসনক্ষেত্রে হিন্দু–মুসলমান ঐক্য ও মিলন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। অতএব আল্লামা ইকবালের পরামর্শ অনুযায়ী আঙিনা ভাগ করা ব্যতীত স্থায়ী সমাধানের আর অন্য কোন পথ রইলো না। কিন্তু আঙিনা ভাগ ত সহজে হবার বস্তু নয়। কারণ একপক্ষ আঙিনা ভাগ করতে মোটেই রাজী নয়। তাই এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে অধিকতর সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। অবশেষে আঙিনা ভাগ হলো দশটি রক্তাক্ত বছরের পর। অর্থাৎ ভারতের আঙিনা ভাগ করে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলো। কিন্তু ভারতের আঙিনায় যেসব মুসলমান রয়ে গেল, আঙিনা ভাগ করতে চাওয়ার অপরাধে তাদেরকে চড়া মাশুল দিতে হয়েছে বহু বছর ধরে।

সপ্তম অধ্যায়

মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাদীক্ষা

মুসলমানগণ চিরদিনই বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের প্রতি অসীম গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। কারণ এ ছিল তাদের নবীর নির্দেশ। যতোই ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য হোক না কেন, এবং প্রয়োজন হলে দেশ থেকে দেশান্তরে গিয়েও বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জন করতে হবে—এ ছিল ইসলামের নবী মুহাম্মদ মুস্তাফার (সা) সুস্পষ্ট নির্দেশ। মুসলিম জাতি অতীতে এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। তারাই এক সময় জ্ঞানের মশাল প্রজ্জ্বলিত করে তমসাচ্ছন্ন ইউরোপকে শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করেছে। এ এক ঐতিহাসিক সত্য। জ্ঞানী ব্যক্তিকে মুসলিম জগতের সর্বত্রই বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। একজন মুসলিম পিতা তার সন্তানকে শিক্ষাদীক্ষা দানের সাধ্যমতো চেষ্টা করে থাকে এবং এটাকে সে মনে করে তার ধর্মীয় কর্তব্য ও অনুশাসন।

ভারতীয় মুসলমানদের অতীত ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় যে, যখন কোন সন্তানের বয়স চার বৎসর চার মাস ও চার দিন পূর্ণ হতো, তখন তার বিদ্যাশিক্ষার সূচনা করা হতো। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের কিছু অংশ শিশুকে পাঠ করে শুনানো হতো এবং শিশু তা পুনরাবৃত্তি করতো। এ ছিল প্রতিটি মুসলিম পরিবারের অপরিহার্য প্রথা। (A.R. Mallick Br. Policy & the Muslims in Bengal, p. 149; M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & Eng. Education ; p. 1; L.F. Smith's Appendix to Chahar Darvesh, p. 253)।

মিঃ স্মিথ্ এ অনুষ্ঠান ১৮০১ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্বচক্ষে দেখেছেন যা তিনি তাঁর 'চাহার দরবেশ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

ভারতের মুসলিম শাসকগণ বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জনকে নানানভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং এর জন্যে প্রভূত অর্থ বরাদ্দ করেছেন। রাজ দরবারে জ্ঞানীগুণী ও পন্ডিতগণ বিশেষভাবে সমাদৃত হতেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্যে রাজ্যের বিভিন্নস্থানে প্রভূত পরিমাণে লাখেরাজ ভূসম্পদ দান করা হতো। এমন কোন মসজিদ অথবা

ইমামবাড়া ছিল না যেখানে আরবী ও ফার্সী ভাষায় অধ্যাপকগণ অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন না।

যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বেশী, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে মক্তব খোলা হতো এবং মুসলিম শিশুগণ সেখানে আরবী, ফার্সী ও ইসলামী শিক্ষা লাভ করতো। বিশেষ করে বাংলার সুলতানগণ বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অধিকতর অনুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষা প্রসারের জন্যে তাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম জমিদার, লাখেরাজদার, আয়মাদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মুসলিম প্রধানগণ তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় মক্তব, মাদরাসা কায়েম করতেন এবং এসবের ব্যয়ভার বহনের জন্যে প্রভূত ধনসম্পদ ও জমিজমা দান করতেন।

বাংলার প্রথম সুলতান মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজী ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী এবং তিনি দিল্লীসম্রাট কুতুবউদ্দীন আইবেকের অনুকরণে দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, কলেজ এবং দরগাহ্ (কোরআন হাদীসের শিক্ষাকেন্দ্র) স্থাপন করেন। (S.M. Jaffar : Education in Muslim India. 1935. p. 66; N. N. Law : Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule, pp. 19. 22)।

প্রথম গিয়াসউদ্দীন (১২১২-২৭ খৃঃ) বাংলার মসনদে আরোহণ করার পর পরই বাংলার রাজধানী লাখনৌতি বা লক্ষণাবতীতে একটি অতীব সুন্দর মসজিদ, একটি কলেজ এবং একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীন (১৩৬৭-১৩৭৩) নিজে একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন। তিনি ওমরপুর গ্রামের নিকটবর্তী দরসবাড়ীতে একটি কলেজ স্থাপন করেন। (M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 4)। হোসেন শাহ্, নসরৎ শাহ প্রমুখ সুলতানগণের আমলেও শিক্ষার বিরাট উন্নতি সাধিত হয়েছে।

মুর্শিদকুলী খান অতি বিদ্বান ও সুসাহিত্যিক ছিলেন এবং জ্ঞানী ও গুণীদের সর্বদা সমাদর করতেন। তিনি প্রায় দু'হাজার আলেম ও বিদ্বানমন্ডলীর ভরণপোষণ করতেন। তাঁরা সর্বদা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা ও ক্রিয়া অনুষ্ঠানাদিতে নিয়োজিত থাকতেন। গোলাম হোসেন তাঁর ইতিহাসে বর্ণনা করেছেন যে, মুর্শিদকুলী খাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বীরভূমের

আসাদুল্লাহ্ নামক জনৈক জমিদার তাঁর আয়ের অর্ধাংশ জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভরণপোষণ এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন। গোলাম হোসেন আরও বলেন, আলীবর্দী খাঁ ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে শিক্ষিত বিদ্বানমন্ডলীকে মুর্শিদাবাদে বসবাসের উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে মোটা ভাতার ব্যবস্থা করেন। তাঁরা সাথে করে নিয়ে আসেন এত বেশী সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থাদি যে, একমাত্র জনৈক মীর মুহাম্মদ আলীর লাইব্রেরীতেই ছিল দু'হাজার বা ততোধিক গ্রন্থাদি। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 5; Ghulam Husain : Seiyere-Mutakherin Vol II, p. 63, 69, 70 & 165)।

মুসলিম শাসন আমলে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার জন্যে যেসব অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মক্তব, মাদ্রাসা, কলেজ প্রভৃতি ছিল, তার সঠিক বিবরণ পাওয়া বড়োই দুষ্কর। মুসলিম শাসনের অবসানের পর সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। ছিটে ফোঁটা যা বিদ্যমান ছিল তার কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায় বুকানন হ্যামিল্টন ও ডব্লিউ অ্যাডাম কর্তৃক প্রণীত শিক্ষা সম্পর্কিত রিপোর্টে যা তাঁরা প্রণয়ন করেন যথাক্রমে ১৮০৭ থেকে ১৮১৪ সালের মধ্যে এবং ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সালের মধ্যে। W. Adam বলেন, রাজশাহী জেলার কসবা বাঘাতে বিয়াল্লিশটি গ্রাম দান করা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনসেবামূলক কাজের জন্যে। (Adam, Second Report, p. 37)। কসবা বাঘার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব ছাত্র পড়াশুনা করতো তাদের যাবতীয় খরচপত্রাদি, যথা বাসস্থান, আহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, বইপুস্তক, খাতা-পেন্সিল, কালি-কলম, প্রসাধন প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহন করা হতো। —(A.R. Mallik : Br. Policy & the Muslims in Bengal, p. 150)।

কোরআন এবং হাদীস থেকে বিদ্যাশিক্ষার প্রেরণা লাভ করে সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ দরিদ্র ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করতেন। ধনবান সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে এ প্রথাও বিদ্যমান ছিল যে, তাঁরা উপযুক্ত গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে তাঁদের সন্তানাদির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। দরিদ্র ছাত্রগণও বিনাপয়সায় তাদের নিকটে শিক্ষা লাভ করতে পারতো। পান্ডুয়াতে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, মুসলিম ভূস্বামীগণ তাঁদের নিজেদের খরচে প্রতিবেশী দরিদ্র ছাত্রদের বিদ্যাশিক্ষার

জন্যে শিক্ষক নিযুক্ত করতেন। এমন কোন বিত্তশালী ভূস্বামী অথবা গ্রামপ্রধান ছিলেন না, যিনি উক্ত উদ্দেশ্যের জন্যে কোন শিক্ষক নিযুক্ত করেননি। —Adam, First Report, p. 55; M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims and English Education, p. 6)।

কোরআন হাদীস ও ইসলামী শিক্ষাদান পুণ্যকাজ বলে বিবেচনা করা হতো এবং প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সমুদয় ব্যয়ভার এক এক ব্যক্তি বহন করতেন, সরাসরিভাবে অথবা দান, ওয়াকফ্ বা ট্রাস্টের মাধ্যমে। শিক্ষকদের বেতন তাঁরা দিতেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তার গৃহাদি প্রভৃতির যাবতীয় খরচপত্র তাঁরা বহন করতেন। সেকালে পাঠ্যবই ছিল না বলে অবৈতনিক শিক্ষা দেয়া হতো। শিক্ষকগণ প্রায় স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করতেন—মসজিদের ইমাম হিসাবে অথবা কোন ছোট খাটো সরকারী চাকুরীর মাধ্যমে। তার ফলে বিনা বেতনে তাঁরা ছাত্রদেরকে শিক্ষা দান করতেন। এভাবে মুসলমান দের বহু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যেসবের ব্যয়ভার বহন করতেন—বিত্তশালী ও দানশীল ব্যক্তিগণ। শিক্ষকমন্ডলী ও এসব মহানুভব দানশীল ব্যক্তিদের এ দৃষ্টিভংগী বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যেতো যে, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য জীবিকার্জন ছিল না। বরঞ্চ তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে জাতির ধর্মীয় ও নৈতিক মান উন্নয়ন করা। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education pp. 7,8)।

W. Adam-এর রিপোর্টে এ কথাও সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, সেকালে অতি সুলভে এমনকি, বলতে গেলে বিনে পয়সায় শিক্ষালাভ করা যেতো। প্রতিটি মসজিদ ছিল মুসলিম জনগণের কেন্দ্রীয় আকর্ষণস্থল এবং মসজিদে মসজিদে যেসব মাদ্রাসা ছিল, সেখানে যেকোন ছেলে বিনে পয়সায় লেখাপড়া শিখতে পারতো। যেহেতু ছাপানো কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না, সে জন্যে বই পুস্তক কেনার কোন খরচই ছিল না। কালি-কলম নিজের ঘরে তৈরী করা যেতো। অবশ্য উচ্চশিক্ষার জন্যে কিছু বেতন দিতে হতো। কিন্তু তাও ছিল অতি সামান্য। ইংরেজদের আগমনের পর খৃষ্টান মিশনারী স্কুলসমূহে ইংরাজী শিক্ষা দেয়া হতো। সেখানে কেউ বিনা বেতনে পড়াশুনা করতে পারতো না। কেউ খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলে—তার সন্তানাদির বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ দেয়া হতো। মুসলমানদের এই যে বিনে পয়সায় অথবা অতি অল্প খরচে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ

ছিল—তার একমাত্র কারণ হলো মুসলমান শাসকগণ এবং বিত্তশালী মুসলমানগণ বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে অকাতরে ধনসম্পদ জমিজমা প্রভৃতি দান করতেন। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 11)।

ইংরেজদের আগমনের পর

যে কোন জাতির শিক্ষাদীক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পেছনে থাকে আর্থিক আনুকূল্য ও সাহায্য সহযোগিতা। বলা বাহুল্য, পলাশীর ময়দানে বাংলার মুসলিম শাসন বিলুপ্ত হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' ভেঙে পড়ে, গোটা দেশ দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দশা কবলিত হয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে মুসলমানদের জাতীয় জীবনে নেমে আসে ধ্বংসের তয়াবহতা। কোম্পানী শাসনের প্রথম দিকেই বাংলার মুসলমানগণ বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোন দায়িত্ব ব্যতিরেকেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার (Power without responsibility) জন্যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যে 'দেওয়ানীর' সনদ লাভ করে, তার সীমাহীন অত্যাচার উৎপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হতে থাকে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর তাদের জীবিকার্জনের সকল পথ বন্ধ হতে থাকে যার ফলে সামাজিক কাঠামো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধও ছিন্ন হয়ে যায়। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education p. 14)।

মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে, মুসলমানগণ তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যতোটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ততোটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের শিক্ষাদীক্ষা। উপরে বর্ণিত হয়েছে, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নির্ভর করতো সরকারী সাহায্য এবং মুসলিম প্রধানগণের দান, ওয়াকফ্ সম্পত্তি, ট্রাষ্ট প্রভৃতির উপর। শিক্ষার প্রচার ও প্রসারকে মুসলমানগণ মনে করতো অত্যন্ত পুণ্যময় ধর্মীয় কাজ এবং এর জন্যে তারা অকাতরে দান করতো প্রভূত অর্থ সম্পদ ও জমিজমা। বহুস্থানে ধর্মীয় ট্রাষ্ট বা সংস্থার মাধ্যমে বিনা বেতনে ও বিনা খরচায়—ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের

সন্তান বিদ্যাশিক্ষা করতে পারতো। রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর মুসলমানদের এহেন শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মুসলমানগণ সরকারের ছোটো বড়ো সকল চাকুরী থেকে অপসারিত হয়, মুসলমান সামরিক প্রধানগণ অন্যদেশে চলে যান অথবা জীবিকা অন্বেষণের জন্যে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় গমন করেন—যেখানে আধুনিক অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষা পৌঁছুতে পারেনি। মুসলমানদের উচ্চপদস্থ চাকুরীগুলি একটি একটি করে ইংরেজ ও হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়—যার ফলে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিলুপ্ত হয় এবং নতুন হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। অতএব এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, একটি মুসলিম সরকার, উচ্চপদস্থ সরকারী মুসলিম কর্মচারী ও মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাবে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে বিনষ্ট হবারই কথা এবং তা হয়েছিল।

মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষা ত দূরের কথা, সত্য কথা বলতে কি, ইংরেজ শাসনের পর এক শতাব্দী যাবত, মুসলমান জাতির অস্তিত্বই ছিল প্রকৃতপক্ষে বিপন্ন। যেখানে তাদের শুধু বেঁচে থাকার প্রশ্ন, সেখানে তারা তাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদীক্ষার চিন্তা করবে কি করে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার হিন্দু ধনিক-বণিক, বেনিয়া শ্রেণী, ব্যাংকার প্রভৃতির সাথে এক গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায়। বলা বাহুল্য, এতে উভয়ের স্বার্থ সমানভাবে জড়িত ছিল। একদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা অভিলাষী কোম্পানীর ক্ষমতা লাভ, অপরদিকে মুসলিম শাসনের অবসান কামনাকারী হিন্দুদের কোম্পানীর নিকট থেকে বৈষয়িক, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ। কোম্পানী ক্ষমতাসীন হওয়ার পর হিন্দুগণ তাদের নিকট-সম্পর্কে আসে। তাদের অধীনে চাকুরী-বাকুরী এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্যে তারা প্রয়োজন বোধ ক'রে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করে।

কোলকাতা একটি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল এবং সেখানকার অধিবাসী বলতে গেলে প্রায় ছিল হিন্দু। হিন্দু বণিক, ব্যাংকার, বেনিয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই কোলকাতা নগরীকে কেন্দ্র করেই তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কোম্পানীর অধীনে চাকুরী বাকুরী ও ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্যে তারা মনে করেছিল 'English is money'—ইংরাজী ভাষার অপর নাম

১০—

অর্থ এবং এজন্যে তারা যতোটুকুই ইংরাজী ভাষা রপ্ত করতে পারুক না কেন, তার জন্যে প্রবল আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্যাঙের ছাতার মতো যেখানে সেখানে, কোলকাতা ও তার আশে পাশে ইংরাজী স্কুল গড়ে উঠে এবং হিন্দুরা এসব স্কুল থেকে কাজ চালাবার মতো ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করে।

অপরদিকে মুসলমানদের অবস্থা কি ছিল তারও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। W. W. Hunter তাঁর গ্রন্থে বলেন, "শত শত প্রাচীন মুসলিম পরিবারধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। ফলে লাখেরাজ ভূসম্পত্তির দ্বারা মুসলমানদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছিল তাও চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।" —(W. W. Hunter : The Indian Mussalmans, Bangladesh Edition 1975, p. 167)।

সাধারণ মুসলমান ত দূরের কথা, ইংরেজদের আগমনের পর তারা মুসলিম সমাজের প্রতি যে বর্বর ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করেছে, যার ফলে নবাবের বংশধরদের কোন্ মর্মন্তুদ পরিণতি হয়েছিল তার একটি করুণ চিত্র এঁকেছেন খোদ হান্টার সাহেব তাঁর গ্রন্থে—

"প্রতিটি জেলায় সাবেক নবাবদের কোন না কোন বংশধর ছাদবিহীন ভগ্ন প্রাসাদে অথবা শেওলা-শৈবালে পূর্ণ জরাজীর্ণ পুকুর পাড়ে অন্তর্জ্বালায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে। এরূপ পরিবারের অনেকের সাথেই আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। এদের ধ্বংসপ্রাপ্ত দালান কোঠায় তাদের বয়স্ক ছেলেমেয়ে, নাতি-নাত্নী, ভাইপো-ভাইঝি গিজ্ গিজ্ করছে এবং এসব ক্ষুধার্ত বংশধরদের কারো কোন সুযোগ নেই জীবনে কিছু করার। তারা জীর্ণ বারান্দায় অথবা ফুটো ছাদযুক্ত বৈঠকখানায় বসে বসে মৃত্যুর প্রহর গুণছে আর নিমজ্জিত হচ্ছে ঋণের গভীর গহ্বরে। অবশেষে প্রতিবেশী হিন্দু মহাজন তাদের সাথে ঝগড়া বাধিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করছে যে, হঠাৎ তাদেরকে তাদের যথাসর্বস্ব ঋণের দায়ে বন্ধক দিতে হচ্ছে। এভাবে ঋণ তাদেরকে গ্রাস করে ফেলছে এবং প্রাচীন মুসলিম পরিবারগুলির অস্তিত্ব দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যাচ্ছে।" —(W. W. Hunter : The Indian Mussalmans, Dhaka Edition, 1975, p. 138)।

ইংরেজদের আগমনের পর তৎকালীন ভারতের গোটা মুসলিম জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলার মুসলমানগণ।

হান্টার বলেন—

"এ প্রদেশের ঘটনাবলীর সাথেই আমি বিশেষভাবে পরিচিত। তার ফলে আমি যতদূর জানি, তাতে করে ইংরেজ আমলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এখানকার মুসলমান অধিবাসীগণ।" —(W. W. Hunter : The Indian Mussalmans, pp. 140-141)।

সে সময়ে বাংলা বলতে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যাকে বুঝাতো। তৎকালে উড়িষ্যার মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ই, ডব্লিউ সলোনী, সি এস্ এর নিকটে প্রেরিত একটি আবেদনপত্রে তাদের করুণ অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। আবেদনপত্রে বলা হয়েছে :—

"মহামান্য দয়াবতী মহারাণীর অনুগত প্রজা হিসাবে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার সকল চাকুরীতে আমাদের সমান অধিকার আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, উড়িষ্যার মুসলমানদেরকে ক্রমশঃ দাবিয়ে রাখা হচ্ছে এবং মাথা তুলে দাঁড়াবার কোন আশাই তাদের নেই। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করলেও জীবিকার্জনের পথ রুদ্ধ বলে আমরা দরিদ্র হয়ে পড়েছি এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে আমাদের অবস্থা হয়েছে পানি থেকে ডাঙায় উঠানো মাছের ন্যায়। মুসলমানদের এই করুণ দুর্দশা আপনার সামনে তুলে ধরছি এই বিশ্বাসে যে, আপনি উড়িষ্যা বিভাগে মহারাণীর প্রতিনিধি এবং আশা করি আপনি বর্ণ ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর প্রতি সুবিচার করবেন। সরকারী চাকুরী থেকে বঞ্চিত হয়ে আমরা কপর্দকহীন হয়ে পড়েছি। আমাদের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে পড়েছে যে, আমরা দুনিয়ার যেকোন প্রত্যন্ত এলাকায় যেতে রাজী আছি—তা হিমালয়ের বরফাচ্ছাদিত চূড়াই হোক অথবা সাইবেরিয়ার জনবিরল প্রান্তরই হোক—যদি আমরা এ আশ্বাস পাই যে, এভাবে দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণের ফলে প্রতি হপ্তায় মাত্র দশ শিলিং বেতনে কোন সরকারী চাকুরী আমাদের মিলবে।" —(W.W. Hunter : The Indian Mussalmans, pp. 158-159)।

মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের যাঁরা বিভিন্ন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ইংরেজদের আগমনের পর চাকুরী থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধুমাত্র এসব পরিবারই দারিদ্র্য কবলিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তাই নয়, বরঞ্চ, বাংলার সাধারণ মুসলিম পরিবারগুলির অবস্থাও তদনুরূপ হয়েছিল। বাংলার কৃষক ও তাঁতী সমাজও চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিল।

কোম্পানী শাসনের প্রথম দিকে মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত ছিল না।
'দায়িত্ব ব্যতিরেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত' (Power without responsibility)
দেওয়ানীর অত্যাচার উৎপীড়নে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়।
দেওয়ানী লাভের পূর্বে জমির খাজনা অতটা কঠোরতার সাথে আদায় করা হতো
না—যতোটা এখন হচ্ছে। তারপর, পূর্বে রাষ্ট্রীয় আয় যেভাবেই হোক এদেশের
মধ্যেই ব্যয় করা হতো যার ফলে এদেশের অধিবাসী কোন না কোন প্রকারে
উপকৃত হতো। ভারতীয় কবির ভাষায়, রাজা কর্তৃক আদায়কৃত কর ভূমির
আর্দ্রতার ন্যায়। সে আর্দ্রতা রৌদ্রতাপে শুষ্ক হয়ে পুনরায় উর্বরতা দানকারী
বৃষ্টিধারা হয়ে ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু বর্তমানে ভারতভূমি থেকে যে
আর্দ্রতা উত্তোলিত হচ্ছে তা তদ্রূপ বৃষ্টিধারার আকারে অবতরণ করছে অন্য দেশে,
ভারতভূমিতে নয়। (R.C. Dutt : Economic Hist. of India, p. 11, 12)।
ইংরেজ আগমনের পর মোট আয়ের একতৃতীয়াংশ পাঠানো হচ্ছিল ইংলন্ডে। রাজ
কোষাগার আর 'বায়তুলমাল' রইলো না যার থেকে জনগণ বিপদকালে সাহায্য
পেতে পারতো। রাজস্বও দ্বিগুণ বর্ধিত করা হয়েছিল। বাংলার তথাকথিত শেষ
নবাব তাঁর শেষ বৎসরে (১৭৬৪) ৮,১৭,৫৫৩ পাউন্ড রাজস্ব আদায় করেন।
পরবর্তীকালে, মাত্র ত্রিশ বৎসর পর, ইংরেজরা আদায় করে ২৬,৮০,০০০
পাউন্ড। (R.C. Dutt. Economic History of India, p. 9; M. Fazlur
Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 14)।
পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বৎসরে এবং পরে কৃষক সমাজ যে চরম ধ্বংসের
সম্মুখীন হয়েছিল তা কারো অজানা নেই। একদিকে ক্রমাগত দেশের ধনদৌলত
ক্রমবর্ধমান আকারে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছিল, অপরদিকে চিরস্থায়ী
বন্দোবস্তের ফলে কৃষকদের প্রতি নতুন জমিদারদের অমানুষিক অত্যাচার
চলছিল। ফলে তারা ভাগ্যোন্নয়ন কিছুতেই করতে পারেনি এবং অদ্যাবধি তারা
ক্রীতদাসের ন্যায় জমিদারদেরই স্বার্থে কৃষিকাজ করে চলেছে। —(M. Fazlur
Rahman : The Bengali Muslims & Eng. Education, p. 20; R.C.
Dutt. p. 27)।

পাশাপাশি হিন্দু সমাজের ভাগ্য কতখানি সুপ্রসন্ন হয়েছিল, তারও কিঞ্চিৎ
আলোচনা করা যাক। ব্যবসা বাণিজ্যের ন্যায় ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তারা ছিল
অত্যন্ত ভাগ্যবান। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানদের প্রায়
সব জমিদারী হিন্দুদের দখলে চলে যায়। কিন্তু কোন হিন্দুর কোন জমিদারী

হাতছাড়া হয়নি। অবশ্যি প্রাচীন হিন্দু জমিদারী কোন কোন ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে বটে, কিন্তু সেসবের ব্যবস্থাপনা নতুন প্রিয়পাত্র হিন্দুদের এবং ভূঁইফোড়দের উপর অর্পণ করা হয়। প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থলে এক নতুন ধনাঢ্য শ্রেণী গজিয়ে উঠে। হিন্দু সমাজের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের এ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পক্ষান্তরে মুসলমানদের বেলায় তা ছিল শূন্যের কোঠায়। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 25)।

চাকুরী বাকুরী, জমিদারী, জায়গীরদারী, কুটীর শিল্প প্রভৃতি থেকে মুসলমানদেরকে উৎখাত করে ক্রমবর্ধমান হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী পত্তন করা হলো। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের বাংলার ইতিহাসই হলো এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইতিহাস। আর এ শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল ব্যবসায়ী হিন্দু শ্রেণী থেকে। অতএব তারা যে সরকারের পুরাপুরি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 118)।

এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্মলাভ সহজ করে দিয়েছিল হিন্দু জাতির বর্ণপ্রথা। কারণ এ বর্ণপ্রথাই তাদের একটি বিশেষ শ্রেণীকে ব্যবসাবাণিজ্যের দ্বারা জীবিকার্জনের জন্যে পৃথক করে দিয়েছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে শামিল হয়ে যাচ্ছিল এবং এরা ছিল নতুন শিক্ষা অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত। তারা কোম্পানীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল বলে এবং ব্যবসার দালাল ও সরকারের নিম্নপদস্থ চাকুরীতে নিয়োজিত ছিল বলে, নতুন শাসকদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। দেশের প্রশাসন সম্পর্কে প্রাথমিক কর্মচারী ও মিশনারীগণ যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখেছিলেন তা পাঠ করলে জানা যায় যে, সরকার বার বার এই হিন্দু ভদ্রলোকদের (মধ্যবিত্ত শ্রেণী) উল্লেখ করতো এবং তাদের মনোরঞ্জন ও অবস্থার উন্নতির জন্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। এ ব্যাপারে সরকার অন্য কতগুলি কারণেও প্রভাবান্বিত হয়েছিল। প্রথম কারণ এই যে, তারা মুসলিম শাসনকে মনে করতো বৈদেশিক আধিপত্যবাদ যার অধীনে এদেশের লোক অর্থাৎ হিন্দুগণ উৎপীড়িত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যে সময়ে অবস্থার উন্নতিকল্পে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছিল, তখন দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানগণ শহর ছেড়ে জীবন ধারণের জন্যে প্রত্যন্ত এলাকায় গমন করেছিল। ফলে তারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি।

তৃতীয়তঃ মুসলমানদের ব্যাপারে সরকার এক চরম অবাধ নীতি (Laissez faire policy) গ্রহণ করেছিল, কারণ যাদের কাছ থেকে তারা ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়, তাদের প্রতি একটা স্বাভাবিক অবিশ্বাস-অনাস্থা তাদের ছিল। পক্ষান্তরে বাংলার হিন্দুগণ এবং ইংরেজদের দখলকৃত অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দুগণ সরকারের দৃষ্টি এমনভাবে আকর্ষণ করেছিল যাতে করে তারা তাদের মনোরঞ্জনের দিকেই মনোযোগ দেয়। উপরন্তু খৃষ্টান মিশনারীগণ খৃষ্টীয় মতবাদ ও প্রচার-প্রচারণার প্রতি মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদেরকে অধিক সংবেদনশীল পেয়েছিল এবং ফলে তারা হিন্দুদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের অতিমাত্রায় দৃষ্টি আকর্ষণের কাজ করেছিল। অতএব, হিন্দুরা তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের খাতিরে নিদেনপক্ষে ভাসাভাসা ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান লাভের জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়ে। এদিক দিয়ে মুসলমানদের কোন সুযোগই ছিল না। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো এই যে, মুসলমানদের মধ্যে কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্যমান ছিল না যারা তাদের দাবী উত্থাপন করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোন সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারতো। পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক গঠিত General Committee of Public Instruction সত্য সত্যই মন্তব্য করেছে যে, যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল তাদের 'জাতীয় ধনাঢ্য, শক্তিশালী এবং প্রকৃত অভিভাবক'—তা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না বলে শিক্ষাদীক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তারা গ্রহণ করতে পারেনি। —(M. Fazlur Rahman : The Bangali Muslims & English Education, pp. 25-27) : C.E.Trevelyan : On the Education of the people of India, pp. 4-8)।

খৃস্টান মিশনারী ও ইংরেজী শিক্ষার সূচনা

মুসলিম শাসন আমলে তাদের নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী সর্বত্র যে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল, তা কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো তা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইংরেজ শাসন আমলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ইংরাজী ভাষার প্রচলন করা হয়। এটা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ভালো করেই উপলব্ধি করেছিল হিন্দু শ্রেণী এবং সেজন্যে তারা ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্যে দ্রুত অগ্রসর হয়। মুসলমানরা মোটেই তা যে

উপলব্ধি করেনি, তা নয়। কিন্তু নতুন শিক্ষা তথা ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণে কি কি অন্তরায় ছিল এবং অনেক সময়ে এ-ব্যাপারে বহু চেষ্টা সাধনা করেও তারা কেন সফল হয়নি, সে সম্পর্কেই আমরা এখানে কিছু আলোচনা করতে চাই।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা তথা ভারতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদানের সম্পর্ক রয়েছে ব্রিটিশ মিশনারীদের যীশুর বাণী বা সুসমাচার প্রচারের সাথে। কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ১৬৫৯ সালে একটি বার্তায় সকল সম্ভাব্য উপায়ে যীশুর বাণী প্রচারের গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। মিশনারীদেরকে তাদের জাহাজে করে ভারত ভ্রমণের অনুমতি দেয়া হতো এবং এখানে এসে দরিদ্র ও অজ্ঞ লোকদের মধ্যে যীশুর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে এ দেশের মাতৃভাষা শিক্ষা করার জন্যে তাদেরকে উৎসাহিত করা হতো। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত ১৬৯৮ সালের সনদে এ কথার উপর জোর দেয়া হয় যে, কোম্পানী যেখানে বসবাস করবে সেখানকার মাতৃভাষা তাদেরকে শিখতে হবে যাতে করে তারা তাদেরকে গড়ে নিতে পারে। কারণ তারা হবে কোম্পানীর চাকর বা দাস অথবা প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মে তাদের প্রতিনিধি। —(M. Fazlur Rahman : Bengali Muslims & Eng. Education, p. 28; Sharp. p. 3. Parochial Annals of Bengal by H. B. Hyde; Court of Directors' letter to Fort St. George, 25 February, 1695; LAW: Promotion of Leaming in India by Early European Settlers, p. 19)।

বাংলার গভর্ণর জেনারেল স্যার জন শোর বলেন যে—ধর্মীয় কারণ অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণে এ দেশবাসীকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দান অধিকতর প্রয়োজন। . . . . যতোক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্রজাবৃন্দ আমাদের সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রাণবন্ত না হয়েছে, ততোক্ষণ আমাদের অধিকৃত রাজ্য বহিরাক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ আন্দোলন-উত্তেজনা থেকে নিরাপদ হবে না। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education. p. 34; Sharp : Review of Bukanan's Ireatise, Vol. I. p. 113)।

এখন একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, বাংলা ও ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যে তারা প্রয়োজনবোধ করে এ দেশবাসীর ভাষা শিক্ষা করার যাতে করে খৃষ্টীয় মতবাদ এ দেশবাসীর নিকটে তারা সহজেই প্রচার করতে পারে।

এ দেশে ইংরেজদের শিক্ষা বিস্তারের ধারা ছিল পর্যায়ক্রমিক। প্রথম পর্যায়ে খৃষ্টান মিশনারীগণ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার স্কুল স্থাপন করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য তাহ্জীব তামাদ্দুন শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ইংরাজী ভাষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করে।

মিশনারীগণ বৎসরের পর বৎসর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যায়। তারা হুগলী শ্রীরামপুরে একটি ছাপাখানা স্থাপন করে তার মাধ্যমে বাংলা ভাষার বহু পুস্তক প্রকাশ করে। তারা তাদের প্রচার অভিযানে কোন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় না, বরং উৎসাহ লাভ করে। এভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৮১৫ সালের মধ্যে তারা একমাত্র কোলকাতার আশেপাশেই ২০২টি স্কুল স্থাপন করে। এর বহু পূর্বে ১৭৯৪ সালে জনৈক ক্যারী ফ্রী বোর্ডিংসহ মালদাহ্তে একটি স্কুল স্থাপন করেন। তিনি বাংলায় এসে একটি নীলচাষ খামারে ওভারশিয়ারের কাজ শুরু করেন। তাঁর স্থাপিত উক্ত স্কুলে সংস্কৃত, ফার্সী ও বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। এতদ্‌সহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানদান ও খৃষ্টীয় মতবাদও শিক্ষাদান করা হয়। জনৈক মিঃ আর্চার ১৭৮০ সালে বালকদের জন্যে একটি স্কুল এবং অল্পদিন পর বালক-বালিকা উভয়ের জন্যে একটি স্কুল স্থাপন করেন। আর একটি স্থাপন করেন John Suranshe row । তবে ব্রাউন এবং উইলিয়াম ফানেল কর্তৃক স্থাপিত স্কুল দু'টি বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে। ব্রাউনের স্থাপিত স্কুলের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তা স্থাপিত হয়েছিল হিন্দু-যুবকদের জন্যে। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & Eng. Education. p. 30; Calcutta Review-1913; 'Old Calcutta': its Schoolmaster by K. N. Dhas pp. 338)।

খৃষ্টীয় মতবাদ প্রচারের জন্যে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় কতকগুলো সমিতি ইংলন্ডে স্থাপিত হয়। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো SPCK (Society for Promotion of Christian Knowledge), S. P. G. (Society for the Propagation of the Gospel), CMS (Church Missionary Society) প্রভৃতি। বাংলায় খৃষ্টীয় মতবাদ প্রচারে এদের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলার মিশনারীগণ তাদের স্ব স্ব সমিতিগুলোর নিকটে নিম্নোক্ত রিপোর্ট পেশ করে ঃ

"ব্যবসা-বাণিজ্য এক নতুন চিন্তাধারা ও কর্মশক্তির দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। যদি আমরা দক্ষতার সাথে অবৈতনিক শিক্ষাদান করতে পারি—তাহলে

শত শত লোক ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করার জন্যে ভীড় জমাবে। আশা করি তা আমরা এক সময়ে করতে সক্ষম হবো এবং এর দ্বারা যীশুখৃষ্টের বাণী প্রচারের এক আনন্দদায়ক পথ উন্মুক্ত হবে।" —(M. Fazlur Rahman. Bengali Muslims & Eng. Education, p. 35; Mussalmans-Vol. I, pp. 130-31)।

খৃষ্টান মিশনারীগণ বাংলা ও ইংরাজী স্কুল স্থাপনের নাম করে খৃষ্টীয় মতবাদ প্রচার করতে গিয়ে ইসলাম ও তার মহান নবীর বিরুদ্ধে প্রচারণা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। কর্ণওয়ালিশ প্রকাশ্য রাজপথে ও গ্রামে গ্রামে খৃষ্টধর্মের প্রচার নিষিদ্ধ করে দেন (Beveridge: Hist. of India. Vol. II. pp. 850-51)। তথাপি তারা এ কাজ চালাতে থাকে। সবশেষে মিন্টো তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ইসলাম ও নবী মুহাম্মদের (সা) প্রতি অশোভন ও অবান্তর উক্তি সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশের অপরাধে মিশনারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাবলম্বন করেন। —(M. Fazlur Rahman : Bengali Muslims & Eng. Education p. 36; Lethbridge-p. 59)।

উইলিয়াম ক্যারীর সভাপতিত্বে ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর (হুগলী) কলেজ স্থাপিত হয়। এ কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞানদান করা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে এদেশের লোককে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা। শ্রীরামপুর কলেজ সেকালে এশিয়ার মধ্যে একমাত্র ডিগ্রি কলেজ। —(Mc. Cully. p 41; M. Fazlur Rahman : Beng. Muslims & Eng. Education. pp. 39-40)।

শ্রীরামপুর কলেজের, যেমন আগে বলা হয়েছে, প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো ভারতে খৃষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার, তার জন্যে প্রয়োজন ছিল এদেশীয় খৃষ্টানদের সন্তানদেরকে উচ্চশিক্ষা দান করা এবং প্রচারক হিসেবে একটি দলকে প্রশিক্ষণ দেয়া যারা খৃষ্টীয় মতবাদ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজও চালাবে। এতদুদ্দেশ্যে অখৃষ্টানদের জন্যে এ কলেজের দ্বার অবারিত ছিল এবং প্রভাবশালী স্থানীয় লোকদের খৃষ্টীয় মতবাদ প্রচারে সাহায্য সহযোগিতার জন্যে অনুপ্রাণিত করা হতো। ১৮৩৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেখা গেল এ কলেজে সর্বমোট ১০১ জন ছাত্রের মধ্যে অখৃষ্টান ছাত্র রয়েছে মাত্র ৩৪ জন। এরা ছিল শ্রীরামপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বংশের সন্তান (Mc. Cully pp. 64, 65)।

দু'টি কারণে এতে কোন মুসলমান ছাত্র ছিল না। প্রথমতঃ এ কলেজের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টধর্মের প্রচার এবং দ্বিতীয়তঃ এতে এমন বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়া হতো যে বাংলা ভাষা মুসলমানদের জন্যে ছিল অবোধগম্য। কারণ, সে বাংলা ভাষা ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণ-জ্ঞান লব্ধ যা মুসলমানদের মোটেই জানা থাকবার কথা নয়। —(M. Fazlur Rahman : Bengali Muslims & English Education p. 40)।

মিশনারীগণ কর্তৃক স্থাপিত স্কুল কলেজগুলিতে এবং সরকার কর্তৃক স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে (১৮০০) হিন্দু শিক্ষকদের সহযোগিতায় সংস্কৃত ভাষার প্রণালীতে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে থাকে আর এ ধরনের বাংলা ভাষা মুসলমানদের কাছে অপরিচিত ছিল। যদিও নিম্ন বংগের মুসলমান বাংলা বলতো। কিন্তু তাদের বাংলা ছিল আরবী ফার্সী মিশ্রিত। D.H.H. Wilson ব্রিটিশ হাউস অব্ কমন্সের সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন যে, বাংলা ও হিন্দীর সংস্কৃতের সাথে নিকট সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর মতে Shakespeare's Hindustanee Dictionary-তে ৫০০ শব্দের মধ্যে ৩০৫টি সংস্কৃত শব্দ। বাংলা 'হিতোপদেশ' নামক কলেজের পাঠ্য পুস্তকে প্রথম ১৪৭টি শব্দের মধ্যে মাত্র ৫টি শব্দ এমন, যা সংস্কৃত নয়। [A.R. Mallick : Br. Policy and the Muslims in Bengal, p. 156: Sixth Report, Select Committee (HC). 1853, Minutes of Evidence, p. 9. উইলসন একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সংস্কৃত সম্পর্কে কিছু জ্ঞান না থাকলে কোন লোক বাংলা বুঝতে পারবে না।]

মাতৃভাষার স্কুলগুলিতে সংস্কৃত শব্দবহুল বাংলা পড়ানো হতো—এসব স্কুলের দ্বার মুসলমানদের জন্য রুদ্ধ ছিল। আবার বিহারে হিন্দী ভাষা দেবনাগরী বর্ণমালায় শিখানো হতো এবং সেটাও ছিল মুসলমানদের কাছে একেবারে অপরিচিত। —(Report of Bengal Provincial Committee, Education Commission, p. 215, Evidence of Abdul Latif in reply to Q1)।

উপরন্তু এসব স্কুলে বাংলা ভাষায় যেসব পাঠ্য-পুস্তক ছিল তা সবই হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত। বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বইগুলি পড়ানো হতো ঃ

গুরু দক্ষিণা, অমর সিংহ, চাণক্য, সরস্বতী বন্দনা, মানভঞ্জন, কলংক ভঞ্জন প্রভৃতি।

হিন্দু বই যথা, দান লীলা, দধি লীলা প্রভৃতি যা ছিল কৃষ্ণের বাল্যকালের প্রেমলীলা সম্পর্কে লিখিত। বিহারে এতদ্ব্যতীত পড়ানো হতো সুদাম চরিত, রাম যমুনা প্রভৃতি। —(A.R. Mallick : British Policy and the Muslims in Bengal, p. 156)।

এসব তথ্য থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদেরকে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত রাখার জন্যে খৃষ্টান মিশনারী, ইংরেজ শাসক এবং এতদ্দেশীয় দালালদের এ ছিল এক ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা। আলেকজান্ডার ডাফ্ (Alexander Duff) ইংরেজী শিক্ষার জন্যে কোলকাতায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে—যা ডাফের প্রচেষ্টায় একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল শুধুমাত্র নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের জন্যে এবং তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগিতায়। ইচ্ছাকৃতভাবেই এ স্কুলটি একটি হিন্দু মহল্লায় এবং এমন প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয় যেখানে একদা গড়ে উঠেছিল হিন্দু কলেজ। ডাফ্ কোন মুসলমান এলাকায় কোন স্কুল প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টাই করেননি।—(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 41: N. Chatterhee : Life of Mahatma Raja Rammohan Roy (Bengali), p. 394)।

আঠারো শ' সাত থেকে ১৮১৪ সালের মধ্যে ডঃ ফ্রান্সিস্ বুকানন্ বাংলা ও বিহারের জেলাগুলি সরকারের নির্দেশে সার্ভে করেন। ১৯৩৮ সালে তাঁর রিপোর্ট তিন খন্ডে আর, এস, মার্টিন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। লর্ড বেন্টিংকের আমলে ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সালের মধ্যে ডবলিউ অ্যাডাম বুকাননের কাগজপত্রের ভিত্তিতে তিনটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। তৃতীয় রিপোর্টটি ১৯৩৮ সালে প্রণীত হয়—সরজমিনে তাঁর নিজের পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের পর। তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষাক্ষেত্রের তুলনামূলক খতিয়ান পেশ করেন, তা নিম্নরূপ ঃ

		হিন্দু	মুসলমান
(ক)	দেশীয় প্রাথমিক স্কুল	১১	১৬
(খ)	" উচ্চ বিদ্যালয়	৩৮	০
(গ)	যেসব পরিবারে পিতামাতা অথবা বন্ধুবান্ধবের দ্বারা ছেয়ে-মেয়েদের শিক্ষা দেয়া হতো	১২৭৭	৩১১

উপরের খতিয়ান দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজশাহী জেলার নাটোর থানার দেয়া হয় যেখানে তৎকালে হিন্দুর জনসংখ্যা ছিল ৬,৫৬,৫৫৮ এবং মুসলমান ১২৯৬৪০১। এমন একটি মুসলিম অধ্যুষিত থানায় মুসলমানদের শিক্ষার অনুপাত ছিল এত নগণ্য যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত খতিয়ানে মোট শিক্ষকের সংখ্যা বলা হয়েছে, যার মধ্যে মুসলমান শিক্ষক ছিল মাত্র একজন।

মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে এহেন অবস্থার কারণ বর্ণনা করে বলেন যে, আর্থিক দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট জীবন যাপন করছিল। তিনি আরও বলেন যে, এ অবস্থায় তাদেরকে বিদ্যাশিক্ষার জন্যে উপদেশ দেয়ার অর্থ হলো, মই লাগিয়ে স্বর্গে আরোহণ করা যা সম্পূর্ণ এক অসম্ভব ও অবান্তর ব্যাপার। অ্যাডাম বলেন, সমগ্র রাজশাহী জেলার মধ্যে মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে একটিমাত্র বিদ্যালয় ছিল বিলমারিয়া থানার কসবাবাথাতে যা কয়েকশত বছরের পুরাতন এবং স্থাপিত হয়েছিল বাংলার মুসলমান সুলতান ও মহানুভব মুসলিম প্রধানদের পৃষ্ঠপোষকতায়।

W. Adam তাঁর তৃতীয় রিপোর্ট প্রণয়ন করেন (১৮৩৮) বাংলা-বিহারের ৫টি জেলা পরিদর্শনের পর। তার ভিত্তিতে তিনি যে খতিয়ান প্রণয়ন করেন তা নিম্নরূপ ঃ

খতিয়ান নং-১ ঃ আরবী-ফার্সী স্কুল, তাদের সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যা, হিন্দু ও মুসলমান।

জেলা	ফার্সী স্কুল	আরবী স্কুল	হিন্দু ছাত্র	মুসলিম ছাত্র	মোট
মুর্শিদাবাদ	১৭	২	৬২	৪৭	১০৯
বর্ধমান	৯৩	৮	৪৭৭	৪৯৪	৯৭১
বীরভূম	৭১	২	২৪৫	২৪৫	৪৯০
তিরহুৎ	২৩৪	৪	৪৪৫	১৫৩	৫৯৮
দক্ষিণ বিহার	২৭৯	১২	৮৬৭	৬১৯	১৪৮৬
মোট	৬৯৪	২৮	২০৯৬	১৫৫৮	৩৬৫৪

মজার ব্যাপার এই যে, আরবী-ফার্সী স্কুলে যোগদানকারী হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ৪ এর তিন অনুপাতে অধিক। তারপর সংস্কৃত স্কুলে যোগদানকারী হিন্দু

ছাত্রের সংখ্যা ধরলে তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৬৫১ এবং মুসলিম সংখ্যা ১৫৫৮।

খতিয়ান নং-২ঃ মাতৃভাষার স্কুল—তাদের সংখ্যা, ছাত্রসংখ্যা ও হিন্দু মুসলমান।

জেলা	বাংলা স্কুল	হিন্দী স্কুল	হিন্দু ছাত্র	মুসলিম ছাত্র	অন্যান্য	মোট
মুর্শিদাবাদ	৬২	৫	৯৯৮	৮২	০	১০৮০
বর্ধমান	৬৩০	০	১২৪০৮	৭৬৯	১৩	১৩১৯০
বীরভূম	৪০৭	৫	৬১২৫	২৩২	২৬	৬৩৮৩
তিরহুৎ	০	৮০	৫০২	৫	০	৫০৭
দক্ষিণ বিহার	০	২৮৬	২৯১৮	১৭২	০	৩০৯০
মোট	১০৯৯	৩৭৬	২২৯৫১	১২৬০	৩৯	২৪২৫০

উপরোক্ত খতিয়ান থেকে একথা জানা যায় যে, মুসলমানরা মাতৃভাষা শিক্ষায় হিন্দুদের থেকে অনেক পেছনে পড়ে থাকে। তার কারণও অতি সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ সংস্কৃতবহুল বাংলাভাষা তাদের জন্যে অবোধগম্য এবং দ্বিতীয়তঃ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গুলি ছিল পৌত্তলিকতাপূর্ণ প্রবন্ধাদি ও গল্পকাহিনীতে পরিপূর্ণ। তৃতীয়তঃ হিন্দী স্কুলের পরিবর্তে স্কুল না থাকায় মুসলমানরা শিক্ষায় পশ্চাৎপদ রয়ে যায়। ডবলিউ অ্যাডাম মুসলমানদের জন্যে উর্দু স্কুল খোলার জন্যে এবং মুসলমানদের উপযোগী বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্যে সুপারিশ করেন। কিন্তু সরকার এদিকে কোন দৃষ্টি দেননি।

(দ্রঃ A.R. Mallick : British Policy and Muslims in Bengal. pp. 161-65)।

খৃষ্টান মিশনারী সোসাইটির (C.M.S.) কোলকাতা শাখার উদ্যোগে বর্ধমানে ১৮১৯ সালে হিন্দুদের জন্যে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়। কোলকাতা শাখার প্রতিনিধি Mr. Shrew এবং Mr. Thompson নিয়মিত স্কুলটি পরিদর্শন করতে থাকেন। অবশেষে যখন ১৮২২ সালে স্কুলটিকে একটি গীর্জা প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত করা হয়, তখন ছাত্রদেরকে খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করা হবে

এ আশংকায় স্কুলটি নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ১৮৩২ সালে বিশপ কোরী (Corrie) কোলকাতার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা কলিংগতে একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। কিন্তু যখন তার পাশে একটি গীর্জা নির্মাণ করা হলো, তখন অধিক সংখ্যক মুসলিম ছাত্র স্কুল পরিত্যাগ করে। মিঃ টমসন তাঁর রিপোর্টে ছাত্রসংখ্যা হ্রাসের কারণ বর্ণনা করে বলেন (১৮৪১) যে, হিন্দুরা পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যেমন অনুরাগী, মুসলমানরা তেমন নয়। —(M. Fazlur Rahman: The Bengali Muslims & English Education, pp. 44-45; Long : Handbook of Bengal Mission, p. 125)।

মিঃ টমসন প্রকৃত কারণটি গোপন রেখে মুসলমানদের উপরেই দোষ চাপিয়েছেন। প্রকৃত কারণ এই যে, পাশ্চাত্যের ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পাশ্চাত্যের ধর্মের প্রশ্ন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। মিশনারী স্কুলে যেতে নিজেকে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত করা মুসলমানদের জন্যে যতোটা কষ্টকর ছিল, হিন্দুদের ততোটা ছিল না। খৃষ্টধর্মের প্রতি মুসলমানদের ছিল বীতশ্রদ্ধা এমনকি ঘৃণাও বলা যেতে পারে। কারণ মুসলমানগণ খৃষ্টধর্মকে নাকচ করে তাদের ধর্মবিশ্বাস গড়ে তুলেছে। পক্ষান্তরে হিন্দুদের এমন কোন পূর্বজ্ঞান ছিল না, সে জন্যে তারা সহজেই খৃষ্টধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হতো।

মিশনারীদের জানা ছিল যে, তাদের যোগাযোগের ফলে বেশী সংখ্যক হিন্দু খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। সে জন্যে তাদের সকল প্রচেষ্টা হিন্দুদের প্রতি নিয়োজিত ছিল। ১৮৫৮ সালে জনৈক মিশনারী তাঁর লিখিত একখানি পুস্তিকায় মন্তব্য করেন যে, মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে সত্যিকারভাবে কোন আন্তরিক প্রচেষ্টাই চালানো হয়নি। যেসব ইউরোপীয়ানদেরকে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের কাজে লাগানো হতো তাঁরা মুসলমানদের ভাষা, চরিত্র ও আচার-আচরণ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখতেন না। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 46; India Office Tract, 242)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম শাসনের অবসান এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ইংরেজদেরকে বলতে গেলে এদেশের সর্বেসর্বা বানিয়ে দেয়। ফলে কোলকাতাকে কেন্দ্র করে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য শতগুণে

বর্ধিত হতে থাকে। কোলকাতায় বিরাট বিরাট অট্টালিকা গড়ে উঠতে থাকে। যে হিন্দুদের সাহায্য সহযোগিতায় এ দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল, তারা কোম্পানীর অধীনে চাকুরী-বাকুরী করার, তাদের ব্যবসায় অংশীদার হওয়ার অথবা ব্যবসার দালাল হিসাবে কাজ করার জন্যে দলে দলে অগ্রসর হয়। তার জন্যে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার আশু প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করে। সেজন্যে ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ তাদের পক্ষ থেকেই গৃহীত হয়। হিন্দু ব্যবসায়ী ও ধনিক-বণিকগণ তাদের ইউরোপীয় বণিক বন্ধুদের সাহায্য-সহযোগিতায় বিভিন্ন স্থানে বেসরকারী পর্যায়ে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করে। অষ্টাদশ শতকের ন'য়ের দশকে কোলকাতার কলুটোলায় এ ধরনের একটি স্কুল স্থাপন করেন জনৈক নিত্যানন্দ সেন।

আর একটি কথা এখানে বিশেষ উল্লেখ্য। এ দেশে মিশনারীগণ বাংলা ভাষার স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে খৃষ্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়। এ ব্যাপারে তারা যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করতে থাকলে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তাদের কার্যকলাপের উপর কিছু বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়। কিন্তু Charter Act of 1813 তাদের প্রতি আরোপিত বাধা-নিষেধ রহিত করে। এ আইনের বলে ভারতে বিশপতন্ত্র (Episcopacy) প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়। ১৮১৪ সালে বিশপ মিডল্টন (Middleton) কোলকাতায় আসেন। তাঁর উৎসাহ উদ্যমে মিশনারীগণ পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করে। কোলকাতার বিশপ কলেজে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তাঁর অনুরোধে এ কলেজের জন্যে গভর্ণর জেনারেল বাষট্টি বিঘা জমি দান করেন। পরবর্তীকালে এর জন্যে অধিকতর সরকারী সাহায্য দান করা হয়। বিশপ মিডল্টন নিজে কলেজের গীর্জা স্থাপনের উদ্দেশ্যে পাঁচশত পাউন্ড এবং পাঁচশত পুস্তক কলেজ লাইব্রেরীতে দান করেন।

মিশনারীদের কাজে সাহায্য সহযোগিতার জন্যে ইউরোপীয় বণিকগণ এগিয়ে আসে এবং বাংলায় প্রকৃতপক্ষে ইংরাজী শিক্ষার গোড়াপত্তন তাদের দ্বারাই হয়। তাদেরই প্রচেষ্টায়, বিশেষ করে মিঃ ডেভিড হেয়ার এবং স্যার এডওয়ার্ড হাইড্ ইস্টের সাহায্য সহযোগিতায় হিন্দু যুবকদের শিক্ষার জন্যে ১৮১৭ সালে কোলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮১৬ সালের ২৭ আগষ্ট স্যার এড্ওয়ার্ডের বাসভবনে হিন্দুদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভায় এ প্রস্তাবিত কলেজের গঠনতন্ত্র ও নিয়মনীতি প্রণীত হয়। বলা হয় যে, সম্রান্ত

হিন্দু সন্তানদেরকে ইংরাজী ও ভারতীয় ভাষা এবং ইউরোপ এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া এ প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। (M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education. pp. 48-51; Quoted from the Rules approved by the Subscribes and general meeting held on 27 August, 1816, Calcutta Christian Observer, July 1832, p. 72)।

এ হিন্দু কলেজটি ১৮২৩ সালে একটি সরকারী কলেজে পরিণত হয়। এভাবে সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করে। সাধারণতঃ মুসলমানদের প্রতি এ অপবাদ আরোপ করা হয়ে থাকে যে, তারা ইংরাজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ছিল। এমনকি বাংলাভাষার প্রতিও তারা ছিল উদাসীন। উপরে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে শিক্ষার অংগন থেকে দূরে রাখার জন্যে কিভাবে বাংলাভাষাকে সংস্কৃতবহুল করা হয়েছিল। এটাই ছিল প্রকৃত কারণ যার জন্যে মুসলমানরা তৎকালীন বাংলাভাষার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেনি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমানরা কি সত্যি সত্যিই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করতে তাদের অস্বীকৃতি জানিয়েছিল? এমন ধারণা করলে তাদের প্রতি অবিচারই করা হবে। ইংরাজী স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করা ছিল অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ এবং মুসলমানরা ছিল দারিদ্র জর্জরিত। ধনাঢ্য হিন্দু ব্যবসায়ী মহাজনগণ তাদের ইংরেজ বন্ধুদের সাহায্য সহযোগিতায় নিজেরা প্রাইভেট ইংরাজী স্কুল স্থাপন করে, সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই, নিজেদের সন্তানাদির ইংরাজী শিক্ষার পথ প্রশস্ত করে নিয়েছিল। মুসলমানদের জন্যে এসব প্রচেষ্টা ছিল অসম্ভব ও অবাস্তব। একথা নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে যে, মুসলমানরা জন্মগতভাবে, জাতিগতভাবে এবং তাদের ধর্মের দিক দিয়ে যে কোন জাতি অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষানুরাগী ছিল। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে। ইংরাজী শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতিও তারা অনুরাগী ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা সরকারের কণামাত্র সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারেনি। মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৭৮০ সালে ওয়ারেন হ্যাস্টিংস কর্তৃক কোলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৭৮০ থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত চল্লিশ বৎসরের এ মাদ্রাসার ইতিহাস অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এ প্রতিষ্ঠানটিকে মুসলমানদের জন্যে ইংরাজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষাসহ একটি

উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে সরকার দাঁড় করাতে পারতেন। কিন্তু তা তাঁরা করেননি। কোলকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজী ক্লাস খোলার উপর্যুপরি দাবী সত্ত্বেও সরকার গড়িমসি করে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। হিন্দুদের উচ্চশিক্ষার জন্যে হিন্দু কলেজ ছাড়াও বহু ইংরাজী স্কুল হিন্দু, ইংরেজ, মিশনারী এবং কোলকাতা স্কুল সোসাইটির দ্বারা স্থাপিত হয়। কিন্তু কোথাও মুসলমানদের প্রবেশ করার কোন উপায় ছিল না। অ্যাডাম সাহেবের বর্ণনামতে কোলকাতা আপার সার্কুলার রোড এবং বড় বাজারে জনৈক খৃষ্টান এবং জনৈক হিন্দু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দু'টি স্কুল ছিল। তাঁরা স্কুলে শিক্ষকতাও করতেন। আর একটি শোভাবাজারে। এখানে তিনশত ছাত্র অধ্যয়নরত ছিল। এ স্কুলটিও একজন খৃষ্টান ও একজন হিন্দু পরিচালনা করতেন। এসব স্কুল যেহেতু বেসরকারী ছিল, সেজন্যে ছাত্রদের নিকট থেকে মোটা বেতন আদায় করা হতো। মুসলমানদের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল কিনা জানা যায়নি। তবে থাকলেও তারা অর্থাভাবে তাদের সন্তানকে সেখানে পাঠাতে পারতো না সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। Calcutta Review (1850) এ ধরনের আরও কতকগুলি স্কুলের উল্লেখ করেছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো Oriental Seminary। ১৮২৩ সালে স্কুলটি স্থাপিত হয়। ১৮৫০ সালে এর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৮৫। হিন্দু কলেজের পরেই ছিল এর স্থান। বলা হয় যে, জনৈক গৌর মোহন আদ্দী স্কুলটি তাঁর দেশবাসীর জন্যে স্থাপন করেন এবং এর অধ্যাপনা কার্যে জনৈক মিঃ টার্নবুল এবং জনৈক ব্যারিস্টার Herman Geoffery-কে নিযুক্ত করেন। খুব সম্ভবতঃ এখানেও মুসলমান ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল না। এসব ছাড়াও খৃষ্টানদের সন্তানদের জন্যে কিছু বিশেষ স্কুল স্থাপন করা হয় যেখানে হিন্দু ও মুসলমানদের প্রবেশাধিকার দেয়া হয়েছিল। এগুলি হলো —The Calcutta High School, The Parental Academic Institution, The Philanthropy Academy, The Verulam Academy প্রভৃতি। প্যারেন্টাল অ্যাকাডেমী এমন স্থানে অবস্থিত ছিল যেখানে সামর্থবান মুসলমানরা তাদের ছেলেদেরকে পাঠাতে পারতো। সম্ভ্রান্ত ও সামর্থবান মুসলমান তাদের সন্তানদেরকে সেন্ট পল্‌স্ স্কুলে এবং প্যারেন্টাল এ্যাকাডেমীতে পাঠাতো। এ দু'টিতে পাঠাবার কারণ এই ছিল যে, এখানে ছেলেরা ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা লাভ করতো এবং এ দু'টি মিশনারী ধরনের স্কুল ছিল না। এ দু'টি স্কুলে মুসলমানদের যোগদান করার কারণ বর্ণনা

করে মিঃ মুয়াত (Mouat 1952)* বলেন যে, যেহেতু কোলকাতা মাদ্রাসায় পড়াশুনা ভালো হতো না এবং আরও কিছু দোষ–ত্রুটি ছিল, যার জন্যে তাদেরকে অন্যত্র যেতে হয়েছে। (M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, pp. 57-58. Calcutta Review-1850, p. 457: Adam, op. cit. pp. 37, 41)।

মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে ১৭৮০ সালে যে কোলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়, তার প্রতি কোম্পানী এবং ব্রিটিশ সরকার এমন অবহেলা প্রদর্শন করেন যে, মনে হয়, শিক্ষার পরিবর্তে অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দেয়াই ছিল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন বোধ করছি।

বেশ কিছু সংখ্যক খ্যাতনামা মুসলিম শিক্ষাবিদের আবেদনে হ্যাষ্টিংস্ ১৭৮০ সালে মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে কোলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। সে সময় পর্যন্ত ফৌজদারী–দেওয়ানী আদালতগুলিতে এবং পুলিশ বিভাগে মুসলমানগণ বিভিন্ন দায়িত্বে ছিল এবং প্রশাসনক্ষেত্রে ফার্সী ভাষা প্রচলিত ছিল বলে আপাততঃ শাসনকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের জন্যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখা কোম্পানী সরকারেরও প্রয়োজন ছিল। মাদ্রাসা স্থাপনের পর জনৈক মুসলিম শিক্ষাবিদ মজদুদ্দীনের উপর মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। কিন্তু ১৭৮০ সাল থেকে ১৭৯১ পর্যন্ত মাদ্রাসার কোনই অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। মজদুদ্দীনের পরিচালনায় ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ে এবং অপসারিত করে জনৈক মুহাম্মদ ইসরাইলকে দায়িত্ব দেয়া হয়। মাদ্রাসা কমিটি পুনর্গঠিত হয়, নিম্নলিখিত পাঠ্যসূচী প্রণীত হয়ঃ

প্রকৃতি দর্শন (Natural Philosophy), ফেকাহ্ শাস্ত্র, আইন শাস্ত্র, জ্যোতিঃ শাস্ত্র, জ্যামিতি, গণিত, তর্ক শাস্ত্র, এবং ব্যাকরণ। কিন্তু ১৯১২ সাল পর্যন্ত অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। অতএব মাদ্রাসা কমিটির জনৈক প্রভাবশালী সদস্য ডাঃ এম, ল্যামস্ডেন (Lamsden) তাঁর রিপোর্টে একজন ইউরোপিয়ান অধ্যক্ষ নিয়োগের সুপারিশ করেন। সরকার সে সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেন, তবে Lamsden এবং Lt. Gallowny-কে মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে গঠনমূলক প্রস্তাব ও সুপারিশের অনুরোধ জানান। ১৮১৮ সালে কমিটি একজন ইউরোপিয়ান সেক্রেটারী নিয়োগের প্রস্তাব করেন। সরকার এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন কিন্তু আর্থিক

* F. J. Mouat, Secretary to the Committee of Education.

দায়িত্ব কমিটির উপরে অর্পণ করেন যাতে করে সরকারী রাজস্বের উপর কোন চাপ না পড়ে। দুঃখের বিষয় এই যে, Dr. M. Lamsden পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বইপুস্তক আরবী ও ফার্সীতে অনুবাদ, মাদ্রাসায় ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন ও মুসলমান ছাত্রদেরকে ইংরাজী শিক্ষাদানের জন্যে যে প্রস্তাব দেন, তা সরকার প্রত্যাখ্যান করেন অথবা বহু বৎসর যাবত গড়িমসি করতে থাকেন। (M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, pp. 68-70; A. R. Mallick : British Policy & the Muslims of Bengal, p. 176)।

কমিটির একজন দায়িত্বশীল সদস্য (Dr. M. Lamsden) যখন মাদ্রাসায় ইংরাজী ক্লাস খোলার প্রস্তাব দেন, তখন নিশ্চয়ই বুঝতে হবে যে, মুসলমান ছাত্র এবং অভিভাবকগণ ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিল। নতুবা তারা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করতো। একথা স্মর্তব্য যে, বেনারস সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী ক্লাস খোলার জন্যে ১৮১৫ সালে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। মাদ্রাসা কমিটি এ ব্যাপারে পেছনে পড়ে থাকেন। অপরদিকে ১৮১৬ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় এবং ইংরাজীতে শিক্ষাদান শুরু হয়। ১৮৫৪ সালে মুসলমানদের আবেদন নিবেদনে এ হিন্দু কলেজটি প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং এর দ্বার সকল ধর্ম ও গোত্রের ছাত্রদের জন্যে উন্মুক্ত করা হয়। (আবদুল মওদূদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৯৪; শতাব্দী পরিক্রমাঃ ডাঃ হাসান জামান, অধ্যাপক আবদুর রহীম, পৃঃ ২৩৯)।

যাহোক Lamsden-এর প্রস্তাবানুযায়ী ক্যাপ্টেন ইরভিন মাসিক তিনশত টাকা বেতনে কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়। ১৮২১ সালের আগষ্ট মাসে নতুন বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরীক্ষায় ফল হয় সন্তোষজনক। পরবর্তী দু'বৎসরের ফলও ভালো হয়। ১৮২৩ সালে মিঃ জন অ্যাডাম কর্তৃক জনশিক্ষার সাধারণ কমিটি (General Committee of Public Instruction) গঠিত হয়। কমিটি ১৮২৪ ও ১৮২৫ সালের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক বলে মন্তব্য করেন। ল্যামস্ডেন (Lamsden) পুনর্বার প্রস্তাব করেন যে, ছাত্রদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক আরবী ও ফার্সীতে অনুবাদ করা হোক। তিনি মাদ্রাসার প্রাথমিক শিক্ষাকে উন্নতমানের করার উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তুতিমূলক (Preparatory) স্কুল স্থাপনের আবশ্যকতার উপরে বিশেষ জোর দেন। কিন্তু ইউরোপীয়ানদের দ্বারা প্রভাবিত

মাদ্রাসা কমিটি ল্যামসডেনের সকল প্রস্তাব মেনে নেন। কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষা বিস্তারের দফাটি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অধিকাংশ সদস্য এ মত প্রকাশ করেন যে, ইংরাজী বা ইউরোপীয় শিক্ষা প্রচলন করলে যে উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল তা ব্যর্থ হবে। (Board's Collection. 909, p. 321, pp. 365-67, 909, p. 322; Lamsden to Madrasah Commitee, 30 May, 1823; Madrasah Committee to Governor-General, 3 July 1823)। ফলে কমিটির এ অস্বীকৃতি মুসলমান ছাত্রদের ইংরাজী শিক্ষার পথে চরম বাধার সৃষ্টি করে। অপরদিকে জনশিক্ষা কমিটি কোলকাতা সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী ক্লাস খোলার প্রস্তাবটি উৎসাহ সহকারে বিবেচনা করেছিলেন এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্যে হিন্দু কলেজটি হাতে নেন। Dr. H. H. Wilson-কে এ কলেজের সরকারী পরিদর্শক হিসাবে কমিটির সেক্রেটারী পদে নিয়োগ করেন। এর জন্যে প্রভূত পরিমাণে সরকারী অর্থও বরাদ্দ করা হয়। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায় ইংরাজী শিক্ষা চালু করার জন্যে বার বার দাবী জানানো সত্ত্বেও তার প্রতি সরকার কোন গুরুত্বই আরোপ করেন না। অথচ বেসরকারী হিন্দু কলেজের প্রতি সরকারের অনুকম্পা, সাহায্য সহানুভূতি ও দান উপচে পড়ছিল। এর থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, মুসলমানদের প্রতি এবং বিশেষ করে তাদের ইংরাজী শিক্ষার প্রতি সরকার কতখানি উদাসীন ছিলেন। এর থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানরা ইংরাজী শিক্ষা বর্জন করেছিল বলে তাদের প্রতি যে অভিযোগ করা হয়, তাও ভিত্তিহীন। একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্যে পক্ষপাতিত্বের অপরাধ ঢাকার জন্যেই মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ চাপানো হয়। হিন্দুদের মধ্যে খৃষ্টান মিশনারীদের কর্মতৎপরতা ও খৃষ্টধর্ম প্রচারের ইতিহাস, এমনকি হিন্দুদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজের ইতিহাস যাঁর ভালো করে জানা আছে, তিনি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, ইংরাজী শিক্ষার প্রতি হিন্দুদের ঘৃণা বা অনীহা যতোখানি ছিল, মুসলমানদের ততোখানি ছিল না। (M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, pp. 73-74)।

১৮২৫ সালের মাদ্রাসার বার্ষিক পরীক্ষার পর পরীক্ষকগণ, মিঃ মিল ও মিঃ টমসন পরীক্ষায় ছাত্রদের প্রশংসনীয় সাফল্য লক্ষ্য করে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার প্রস্তাব করেন। তাঁদের প্রস্তাবে উৎসাহিত হয়ে ল্যামস্‌ডেন মাদ্রাসায়

ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের চাপ দেন। তিনি কমিটির নিকটে তাঁর প্রেরিত প্রতিবেদনে বলেন যে, মুসলমান ছাত্র ও জনসাধারণের সংগে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সম্পর্কের ফলে তাঁর এ ধারণা জন্মেছে যে, ইংরাজী ভাষাকে যদি শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের বাহন হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এতে মুসলমানদের কোনই আপত্তি থাকবে না, বরঞ্চ তা সাগ্রহে গ্রহণ করবে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে যদি বাইবেল প্রচারের পথ সুগম করা হয়, অথবা যদি মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করা হয়, তাহলে আপত্তি উত্থাপিত হবারই কথা। (M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 74; Board's Collection, 909, pp. 713; Lamsden to General Committee, 19 February, 1825)। Lamsden আরও প্রস্তাব দেন যে, ইংরাজী শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্যে প্রত্যেক ছাত্রকে আট টাকার একটি করে বৃত্তি মঞ্জুর করা হোক। ম্যাকলে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

মাদ্রাসায় ইংরাজী ক্লাস খোলা না হলেও ছাত্রগণ ইংরাজী শিক্ষার জন্যে এতটা আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছিল যে, তারা যৎসামান্য পারিশ্রমিক দিয়ে শিক্ষকদের কাছে কিছু ইংরাজী শিখতে থাকে। তাতে করে তারা ভালো ইংরাজীও শিখতে পারছে না। ল্যামস্‌ডেন এবার কমিটির নিকটে একজন ইংরাজী ভাষার শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করেন। তাতেও কোন ফলোদয় হয় না। এভাবে মুসলমানদের দোষে নয়, বরং কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতমূলক আচরণ ও মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে তাঁদের আন্তরিকতার অভাবেই মাদ্রাসার ছাত্রগণ ইংরাজী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে।

এদিকে অত্যন্ত প্রভাবশালী শিক্ষাবিদ Dr. H. H. Wilson, হিন্দু কলেজের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে তিনি সে কলেজের উত্তরোত্তর উন্নতিকল্পে অধিকতর সরকারী সাহায্যের দাবী জানান। শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বশীল মিঃ হল্ট ম্যাকেঞ্জি একটি বিশেষ শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের বেসরকারী কলেজের জন্যে অর্থ বরাদ্দ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং একটি স্বতন্ত্র সরকারী কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু এর জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে বলে তা সরকার প্রত্যাখ্যান করেন। এ প্রত্যাখ্যান হিন্দু কলেজের জন্যে হলো একটি বিরাট আশীর্বাদ। এখন থেকে কমিটির গোটা সুনজর পড়লো এই হিন্দু কলেজের উপর এবং এটাকেই

ইংরাজী শিক্ষার একমাত্র পাদপীঠ হিসাবে স্থান দেয়া হলো। ১৮২৫ সালের এ কলেজ সম্পর্কিত রিপোর্টে জেনারেল কমিটি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ছাত্রসংখ্যা একশ' থেকে দু'শ' হয়েছে এবং যদি এত সংখ্যক ছাত্রকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ইংরাজী ভাষায় প্রশিক্ষণ দেয়া যায়, তাহলে কোলকাতা শহরের প্রধান ও অগ্রগণ্য অধিবাসীবৃন্দের (Principal Inhabitants of Calcutta) বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত গুণাবলীর বিকাশ ও উন্নতি সাধন নিঃসন্দেহে আশা করা যেতে পারে। এখানে কোলকাতা শহরে প্রধান ও অগ্রগণ্য অধিবাসী কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এ কথার দ্বারা একমাত্র কোলকাতার 'হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী'–কেই বুঝানো হচ্ছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কথাটির দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের প্রকৃত মনোভাবটি পরিষ্ফুট হয়ে গেছে।

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ শাসকদের শিক্ষা সম্পর্কিত পলিসি বা নীতি ছিল, পরিস্রাবণ নীতি (Policy of 'filtration') যার দ্বারা উচ্চশিক্ষা তথা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান–বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ–সুবিধা সীমিত করা হয়েছিল হিন্দুদের একটি নির্বাচিত শ্রেণীর মধ্যে যাদেরকে বলা হয়েছে Principal Inhabitants of Calcutta (কোলকাতার প্রধান ও অগ্রগণ্য অধিবাসীবৃন্দ) অর্থাৎ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তারা ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে দেশের মধ্যে এ শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী হবে। অর্থাৎ তাদের দ্বারা যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে তার শিক্ষকতা যেমন করবে হিন্দু, তেমনি তার শিক্ষার্থীও হবে হিন্দু। যা প্রকৃতপক্ষে হয়েছে। বলতে গেলে, প্রধানতঃ এ শিক্ষা আবার সীমিত ছিল—উচ্চশ্রেণীর হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যে। আবার এ পরিস্রাবণ নীতির ফলভোগ করেছে হিন্দু ব্যবসায়ী শ্রেণী। মুসলমান ত দূরের কথা, হিন্দু জাতির অন্যান্য শ্রেণীও এর থেকে বঞ্চিত হয়েছে। রেভারেন্ড লাল বিহারী দে মন্তব্য করেন, "ভারতে উচ্চশ্রেণীর পরিস্রাবক, কোন দিক দিয়েও পরিস্রাবক নয়। এ এমন এক মৃন্ময় পাত্র যার মুখ এমনভাবে বন্ধ যাতে করে বাইরের কোন আলো–বাতাসও ঢুকতে না পারে। একদিকে একজন ব্রাহ্মণ পেট ভরে তর্কশাস্ত্র, অধিবিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান আহার করছে, অপরদিকে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তসহ শুদ্র অযথাই লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কখন তার প্রভুর আহারের টেবিল থেকে এক টুকরো খাদ্য তার ভাগ্যে জুটবে।" (L. B. Dey in reply to Babu Kishori Chand Mitter of a meeting of British

Indian Association, 1868—Quoted by H. A. Stark : Vernacular Education in Bengal, p. 89)।

এই পরিস্রাবণ নীতি অনুযায়ী সরকার হিন্দু কলেজের প্রতি তাদের সর্বাধিক মনোযোগ প্রদান করেন। ছাত্রদেরকে ষোল টাকার আটটি বৃত্তি এবং মাসিক তিনশত টাকার সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। অতঃপর প্রাথমিক বইপুস্তকাদি ছাপানোর জন্যে ৪৯,৩৭৬ টাকা এবং ইংলন্ড থেকে পুস্তক সংগ্রহের ৫০০০/– টাকা দেয়া হয়।

এভাবে হিন্দু কলেজকে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করার সুযোগ দিয়ে উইলসন সংস্কৃত কলেজের দিকে মন দেন। এখানে ইংরাজী ক্লাস খোলার ঘোষণার সাথে সাথে ১৩৬ জ'ন ছাত্রের মধ্যে ৪০ জন ইংরাজী শিক্ষার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক জনৈক মিঃ টিটলারকে (Tytler) অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিয়োগ করা হয়। এসব করার পর, সরকার হয়তো লজ্জার মাথা খেয়ে, ১৮২৯ সালে কোলকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজী ক্লাস খোলার সিদ্ধান্ত করেন। প্রথম বৎসর এপ্রিল মাসে ইংরাজীতে ২৯ জন ছাত্র হয় এবং আগষ্ট মাসে হয় ৪২ জন। কিন্তু ১৮৩৬ সালে রিপোর্টে জানা গেল ছাত্রসংখ্যা ১৩৬ থেকে হ্রাস পেয়ে–১০২ হয়েছে। দারিদ্র্যই এর প্রধান কারণ বলে বর্ণনা করা হয়। কারণ মুসলমানগণ ইংরাজী শিক্ষার জন্যে নির্ধারিত ফিস্ দিতে অপারগ হয়। হান্টার সায়েব মন্তব্য করেন, "মাদ্রাসার অধিকাংশ ছাত্র প্রদেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগমন করে। তাদের দারিদ্র্যের কারণে তারা ইংরেজ ভদ্রলোকদের খানসামাদের বাসায় জায়গীর থেকে এবং সায়েবদের আর্থিক সাহায্যে পড়াশুনা করে। (M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, pp. 74-80; Hunter : The Indian Mussalmans, p. 203)।

মুসলমানদের ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা সম্পর্কে যে দীর্ঘ আলোচনা করা হলো তা দু'টি কারণে। একটি হলো ইংরেজ সরকারের মুসলমানদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ প্রমাণ করা। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মুসলমানরা ইংরাজী শিক্ষা বর্জন করেছিল–তাদের প্রতি আরোপিত এ অভিযোগ অমূলক প্রমাণ করা। আশা করি উপরের আলোচনায় এ বিষয় দু'টি সুস্পষ্ট হয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ আরও দু'একটি কথা বলে রাখি।

লর্ড মেকলে ১৮৩৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইন মেম্বর হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি ভারতের ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন ঃ

"বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে, সমাজে যারা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবেন। তাঁরা মাংসের গড়নে ও দেহের রঙে ভারতীয় হবেন বটে, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবেন খাঁটি ইংরেজ। (Woodrow : Macaulay's Minutes on Education in India, 1862 : আবদুল মওদূদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৯৭)।

মেকলে আরও বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমাদের শিক্ষানীতি কার্যকর হয় তাহলে আজ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী সমাজে কোন মূর্তিপূজকের অস্তিত্ব থাকবে না। (Trevelyan– Life and Letters of Lord Macaulay Vol. I, p. 455)

মেকলে সায়েব তাঁর প্রথম উক্তিতে ত্রিশ বৎসর পর যা দেখতে চেয়েছিলেন, তা যে শুরু হয়ে গেছে, ইংলন্ডে বসে হয়তো তা তিনি দেখতে পাননি। বৃটিশ পণ্যের চাহিদা কতখানি বেড়েছে তার তথ্য সংগ্রহ করা হয় ১৮৩২ সালে। এ তথ্য বিবরণীতে বলা হয় যে, কোলকাতা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বিলেতী বস্ত্রেরই চাহিদা বাড়েনি। বরঞ্চ বিলেতী মদেরও চাহিদা–কদর বেড়েছে। তাদের মধ্যে বিলেতী বিলাসদ্রব্যের আকর্ষণ বেড়েছে। তাদের বিলেতী আসবাসপত্র সজ্জিত বাড়ী আছে, জুড়িগাড়ী আছে এবং তারা মদ্যপানও করছে। নেটিভরা নিশ্চয়ই বেশী মদ খায়। কারণ ফিরিংগীপনায় (মেকলের ভাষায় রুচি, মতামত ও নীতিবোধের দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরেজ) তাদের অনীহা বা ঘৃণা বিদ্বেষ নেই এটাই প্রমাণ করতে চায়। তারা মদ, ব্রান্ডি, বিয়ার খায়। (Select Committee Report, House of Commons, 1831-32 : মওদূদ; পৃঃ ১০)।

শিক্ষা বিষয়ে সরকারের 'পরিস্রাবণ নীতি' ব্যাখ্যা করে টিভেলিয়ান সায়েব বলেন, "ব্যবসায়ী ধনী, শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রথমে লাভবান হবে; একদল নতুন শিক্ষকের আবির্ভাব হবে; দেশীয় ভাষায় পুস্তকাদি বেশী প্রকাশিত হবে। তখন এসবের দ্বারা আমরা শহর থেকে গ্রামে, অল্প থেকে বিশাল জনসাধারণের ঘরে ঘরে অগ্রসর হবো—প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। কমিটির বিবেচনায় দরিদ্রের কথাও চিন্তা করা হবে, তবে আমাদের সামর্থ সীমিত, অথচ লক্ষ লক্ষ

লোককে শিক্ষা দিতে হবে। এজন্যেই নির্বাচনের প্রয়োজন এবং প্রথমে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের দিকেই লক্ষ্য দেয়া হয়েছে। কারণ তারা শিক্ষিত হলে জনসাধারণের মধ্যেও সুযোগ ছড়িয়ে পড়বে।"

(আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, পৃঃ ৯৭–৯৮; Trevelyan : p. 48)।

টিভেলিয়ান সায়েবের মুখ দিয়ে ইংরেজ শাসকদের মনের কথাটি বের হয়ে পড়েছে। ধনিক-বণিক ও মধ্যবিত্ত হিন্দুশ্রেণীর সহযোগিতায় তারা মুসলমানদের কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যের ভেতর দিয়ে তাদের সাথে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মিতালি ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। তাদেরকে ষোলআনা তুষ্ট রেখেই তারা এদেশে শাসন ক্ষমতা অটুট রাখতে সক্ষম হবে। অতএব তাদের অনুকম্পা ষোল আনা যে এই একটি বিশেষ শ্রেণীর উপর বর্ষিত হবে, তাতে অবিচার হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। খৃষ্টান মিশনারীগণ এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে প্রচেষ্টা চালায়। তবে তাদের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল না মোটেই। শিক্ষার নাম করে মুসলমানদের কাছে তাদের 'সুসমাচারের' আহবান–আবেদন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় বলে মুসলমানদেরকে তারা সুনজরে দেখতে পারতো না। এ ব্যর্থতা শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ইসলাম ও তার মহানবীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের লিপ্ত করে। অতএব মিশনারী, ইংরেজ শাসক ও তাদের দোসর হিন্দু মধ্যেবিত্ত শ্রেণী –এ তিনের চক্রে মুসলমানদের ভাগ্য নিষ্পেষিত হয়, তারা শিক্ষার অঙ্গন ও জীবিকা থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং অন্য সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

এ দেশের লোকের শিক্ষা ও সুখ সুবিধার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তা বিলাত থেকে আনতে হতো না। এদেশের অর্থই এ দেশের লোকের জন্যে ব্যয় করা যেতো। এবং তা কখনো অনুগ্রহ অনুকম্পা বলেও বিবেচিত হতো না। এ ছিল এ দেশবাসীর অধিকার। কিন্তু এ অধিকার থেকে মুসলমানদেরকে করা হয়েছিল বঞ্চিত। সরকারী তহবিল থেকে মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে ব্যয় বরাদ্দ করা ত দূরের কথা, মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে প্রদত্ত দানকেও তাঁরা আত্মসাত করেছেন এবং অপাত্রে ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের দানের কথাই ধরা যাক। এ সম্পর্কে মুসলমানদের বক্তব্য পেশ না করে খাঁদরেল ইংরেজ ও খৃষ্টান হান্টার সায়েব কি বলেছেন তাই বিধৃত করা হচ্ছেঃ

"১৮০৬ সালে হুগলী জেলার একজন ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত মুসলমান মৃত্যুর সময় তার বিরাট জমিদারী সৎকার্যে ব্যয়ের জন্যে দান করে যান। পরে তাঁর দু'জন ট্রাস্টীর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। ১৮১০ সালে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে সম্পত্তি অপব্যবহারের অভিযোগ আনলে সংকট চরমে উঠে এবং জেলার ইংরেজ কালেক্টর আদালতের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সম্পত্তির দখল নিয়ে নেন। ১৮১৬ সাল পর্যন্ত মোকাদ্দমা চলতে তাকে এবং তখন উভয় ট্রাস্টীকে বরখাস্ত করে উক্ত জমিদারীর ব্যবস্থাপনা সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করেন। একজন ট্রাস্টীর দায়িত্ব সরকার নিজে গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় জনের স্থলে নতুন একজনকে মনোনীত করেন। পরের বছর নির্ধারিত রাজস্ব প্রদানের শর্তে সমস্ত সম্পত্তি ইজারা দেয়া হয়। মামলা চলাকালীন বকেয়া পাওনাসহ ইজারা বাবদ প্রাপ্ত মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৫,৭০০ স্টার্লিং পাউন্ড। (এ আয় থেকেই কলেজ বিল্ডিং এর মূল্য পরিশোধ করা হয়)। এ ছাড়াও জমিদারীর বার্ষিক আয় থেকে এ পর্যন্ত ১২০০০স্টার্লিং পাউন্ড অধিক উদ্বৃত্ত হয়।

"আগেই বলেছি, জমিদারীর আয় বিভিন্ন সৎ কাজে ব্যয় করার জন্যে ট্রাস্ট গঠিত হয়। উইলে যেসব সৎকাজে ব্যয় করার কথা বলা হয়, তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় ধর্মীয় প্রচার অনুষ্ঠান প্রতিপালন, হুগলী ইমামবাড়া বা বড়ো মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ, একটি গোরস্থান, কতিপয় বৃত্তি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ যোগান দেয়া ট্রাস্ট গঠনের উদ্দেশ্যের আওতায় পড়ে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতার ইচ্ছানুসারে সেটাকে মুসলমানদের রীতিমাফিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে হবে। মুসলিম দেশগুলিতে মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের জন্যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করাকে ধর্মীয় কাজ হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এই উইলের অর্থ কোন অ-মুসলিম কলেজের কাজে ব্যয় করা উইলকারীর ইচ্ছার ব্যতিক্রম বলে বিবেচিত হবে এবং সেটা ট্রাস্টীদের ক্ষমতার গুরুতর অপব্যবহার হিসাবেই গণ্য হবে।

"সুতরাং এই তহবিলের টাকা একটি ইংরাজী কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করায় মুসলমানরা কিরূপ ক্রোধের সাথে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের অভিযোগ আনতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কার্যতঃ হয়েছেও তাই। কেবলমাত্র ইসলাম-ধর্মীয় কাজে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সম্পত্তির টাকা দিয়ে সরকার এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে

তুলেছে যেখানে ইসলামের নীতিবিরোধী বিষয়সমূহ শিক্ষা দেয়া হয় এবং যে প্রতিষ্ঠান থেকে মুসলমানদেরকে কার্যতঃ বাদ দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ একজন ইংরেজ ভদ্রলোক যিনি ফার্সী বা আরবী ভাষার একটি বর্ণও জানেন না। মুসলমানরা ঘৃণা করে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেয়ার জন্যে এ অধ্যক্ষ কেবলমাত্র মুসলমানদের কাজে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত তহবিল থেকে বছরে ১৫০০ স্টার্লিং পাউন্ড বেতন পেয়ে থাকেন। অবশ্য এটা ঐ অধ্যক্ষের কোন অপরাধ নয়। এজন্যে অপরাধী হচ্ছেন সরকার যারা তাকে এ দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন। গত পঁয়ত্রিশ বছর যাবত সরকার ঐ বিরাট শিক্ষা তহবিলের অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে তছরুপ করে আসছেন। সরকার নিজের গুরুতর বিশ্বাস ভংগের অপরাধ ঢাকা দেয়ার ব্যর্থ প্রয়াস হিসাবে ইংরাজী কলেজটির সাথে একটি ছোট মুসলমান স্কুলকে (হুগলী মাদ্রাসা) সংশ্লিষ্ট করেন। কলেজ বিল্ডিং নির্মাণের জন্যে উক্ত তহবিলের টাকা তছরুপ করা ছাড়াও কলেজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তহবিল থেকে বার্ষিক ৫০০০ স্টার্লিং পাউন্ড ব্যয় করা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এই যে, তহবিলের ৫২৬০ স্টার্লিং পাউন্ড আয়ের মধ্যে মাত্র ২৫০ স্টার্লিং পাউন্ড উক্ত ক্ষুদ্র মুসলিম স্কুলের জন্যে ব্যয় হচ্ছে এবং ট্রাস্টের মৌল বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ হিসাবে এ ক্ষুদ্র মুসলিম স্কুলটিই শুধু টিকে আছে।

"এ তছরুপের অভিযোগ নিয়ে বাদানুবাদ করা খুব কষ্টকর ব্যাপার কারণ এ অভিযোগ খণ্ডন করা সম্ভবপর নয়। মুসলমানরা অভিযোগ করে বেড়াচ্ছে যে, মুসলমানদের এ বিরাট ধর্মীয় সম্পত্তির মালিকানা দখলের অসদুদ্দেশ্যে বিধর্মী ইংরেজ সরকার সম্পত্তির মুসলিম ট্রাস্টীদের অব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছেন এবং তারপর দাতার পবিত্র ধর্মীয় উদ্দেশ্যের বরখেলাপ করে সরকার মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন যার ফলে সরকারের কৃত অপরাধ অধিকতর গুরুতর হয়ে দেখা দিয়েছে। বলা হয়েছে যে, কয়েক বছর আগে আলোচ্য ইংরাজী কলেজের মোট তিনশ' ছাত্রের মধ্যে এক শতাংশও মুসলমান ছিল না। তারপর এই অবমাননাকর বৈষম্য হ্রাস পেলেও অবিচারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অসন্তোষ এখনও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছেন এমন এক সিভিলিয়ান লিখেছেন—

"এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার নিজের কাজের দ্বারা যে ঘৃণা ও অবমাননা কুড়িয়েছেন তাকে অতিরঞ্জিত করে দেখা অসুবিধাজনক বলে আমি মনে করি। আমার মন্তব্যের ভাষা কঠোর মনে হতে পারে, কিন্তু আমি প্রমাণ করে দেখাতে পারি যে, ভারতে আমার আটাশ বছর বসবাসকালে আমি বিষয়টির সত্যাসত্য যাচাই করে দেখেছি (এ দেশে প্রথম আগমনের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি হুগলী সফর করি) এবং আমি বলতে পারি যে, তখন এদেশীয় বা ইউরোপীয় কারো কাছ থেকেই অন্য কিছু আমি শুনিনি। যথার্থ হোক বা না হোক মুসলমানরা মনে করে যে, এ ব্যাপারে সরকার তাদের প্রতি অন্যায় ও সংকীর্ণমনা আচরণ করেছেন, এবং তাদের কাছে এটা একটা স্থায়ী তিক্ত অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়েছে।"

(W. W. Hunter : The Indian Mussalmans, বাংলা অনুবাদ এম আনিসুজ্জামান, পৃঃ ১৬৩–১৬৫)।

এ ছিল দু'জন ইংরেজ সায়েবের স্পষ্টোক্তি যাঁরা ব্রিটিশ সরকারের অতীব দায়িত্বশীল কর্মচারী হিসাবে এদেশে এসেছিলেন। মুসলমানদের প্রতি চরম অবিচার দেখে তাঁদের অন্তরাত্মা হয়তো ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। তারই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিল তাঁদের লেখায়। কিন্তু এতেও কি অবিবেচক ও অত্যাচারী সরকারের টনক নড়েছিল? তাঁরা এ দেশের এক শ্রেণীকে মনে করতেন তাঁদের দুশমন এবং আর এক শ্রেণীকে জানের দোস্ত। দুশমনের ন্যায্য হক আত্মসাৎ করে তাই দিয়ে মনতুষ্টি সাধন করেছেন দোস্তের। ব্রিটিশ শাসনের শেষ তক্ এ অবিচার অব্যাহত রয়েছে। গ্রন্থকার ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত উক্ত কলেজ সংলগ্ন ছোট্ট মুসলিম স্কুলে বাল্যজীবন কাটিয়েছে। হান্টার সায়েবের বর্ণিত অবস্থার তখনো কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। ধর্মীয় দানের এর চেয়ে বড়ো আত্মসাৎ ও অপব্যবহার আর কোথাও হয়েছে বলে মানব ইতিহাসে খুঁজে যে পাওয়া যাবে না তা নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে। মুসলমানদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, ব্রিটিশ এ দেশ থেকে চলে যাওয়ার পর উত্তরাধিকার সূত্রে উক্ত দানের সম্পত্তি ও তহবিল লাভ করেছেন তাদেরই সেকালের দোসর। অতএব অবস্থার পরিবর্তন অচিন্তনীয়।

ইংরেজ–শাসকগোষ্ঠী, খৃষ্টান মিশনারী ও বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী—এ ত্রিচক্রের গভীর ষড়যন্ত্রের ফলেই মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে

বঞ্চিত হয় এবং তার ফলে শিক্ষা দীক্ষা ও জীবিকার্জনের পথ তাদের রুদ্ধ হয়ে যায়। ১৮৩৭ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে সরকারী কাজকর্মে অফিস আদালতে ইংরাজী ভাষা চালু করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজরা কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে চুপে চুপে ইংরাজীকরণ নীতি চালু করে; তার জন্যে কোন পূর্ব ঘোষণা না করেই। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, জনসমষ্টিকে সচেতন না করে, নিজের সংকল্প কার্যকর করা। তাদের প্রিয়পাত্র শ্রেণীটির কিন্তু এ গোপন ষড়যন্ত্র জানা ছিল। তাই পয়লা এপ্রিল থেকে হঠাৎ ইংরাজী ভাষা হওয়ার সাথে সাথে তারা সকল সরকারী অফিসগুলিতে জেঁকে বসে গেল। এদিকে ইংরেজ মিশনারীদের কূট চালে আরবী ফার্সী শব্দাশ্রিত মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ ভাষা–অবদান উর্দুকেও স্থানচ্যুত করে সংস্কৃত শব্দবহুল হিন্দুস্থানী ভাষাও সৃষ্ট হয় এবং সরকার অনুমোদিত একমাত্র দেশীভাষা হিসাবে চাকুরী প্রাপ্তির সনদ হিসাবে স্বীকৃত হয়।

(আবদুল মওদুদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ··· পৃঃ ৯৮–৯৯)। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের জন্যে সকল চাকুরীর দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া।

এভাবে ইংরাজী শিক্ষার বোধন হয়েছিল প্রধানতঃ রাজনৈতিক গরজে এবং নগরবাসী একটিমাত্র শ্রেণীর মংগল বিধানে। বাস্তবপক্ষে ইংরাজী শিক্ষাই হলো এদেশীয়দের সরকারী অফিস আদালতে চাকুরী লাভের একমাত্র পাসপোর্ট। আর এজন্যে এ ভাষাটার শিক্ষা হয় দ্রুত, নিশ্চিত ও সর্বব্যাপক। কিন্তু এ শিক্ষানীতির সবচেয়ে মারাত্মক দিক হলো, মাত্র মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজেই তা সীমিত করা হয়েছিল, জনসাধারণ মর্মান্তিকভাবে উপেক্ষিত হলো। আবার ইংরাজী শিক্ষার সমস্ত সুযোগ সুবিধা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুরাই আত্মসাৎ করলো, অভিজাত হিন্দুরা এবং সমগ্র মুসলিম দূরে পড়ে রইলো। দেশকে ইংরেজীয়ানা করণের এই অনুপ্রবেশ–যুদ্ধে মেকলে পন্থীরাই জয়ী হয়েছিলেন। (আবদুল মওদুদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ . . . পৃঃ ৯৯–১০০; John Marshall : An Advanced History of India, pp. 818-19)।

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাঙ্গন ও চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের কি অবস্থা ছিল সে সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির জন্যে নিম্নে কিছু খতিয়ান সংযোজিত হলো।

১৮৫২ সালের ৩০শে এপ্রিলে সরকারী স্কুল কলেজে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
হিন্দু কলেজ	৪৭১	০	০	৪৭১
পাঠমালা	২১৬	০	০	২১৬
ব্রাহ্ম স্কুল	২৫৫	০	০	২৫৫
সংস্কৃত কলেজ	২৯৯	০	০	২৯৯
মাদ্রাসা	০	৪৩৩	০	৪৩৩
হুগলী কলেজ	৩৮৯	৬	২	৩৯৭
হুগলী ব্রাহ্ম স্কুল	১৬০	২	২	১৬৪
হুগলী মাদ্রাসা	১৮	১৪৫	০	১৬৩
হুগলী মক্তব	৯	৪৭	০	৫৬
সীতাপুর মাদ্রাসা	০	৪০	০	৪০
ঢাকা কলেজ	৩২৩	২৯	৩১	৩৮৩
কৃষ্ণনগর কলেজ	২০৫	৭	১	২১৩
চট্টগ্রাম কলেজ	৯৭	৮	২০	১২৫
কুমিল্লা কলেজ	৮১	৬	৪	৯১
সিলেট কলেজ	৮০	১১	১	৯২
বাউলিয়া কলেজ	৮৩	০	২	৮৫
মেদিনীপুর কলেজ	১১৭	৭	১	১২৫
যশোর কলেজ	৯৬	৭	০	১০৩
বর্ধমান কলেজ	৭১	৩	০	৭৪
বাঁকুড়া কলেজ	৭৪	০	০	৭৪
বারাসত কলেজ	১৭৪	০	০	১৭৪
হাওড়া কলেজ	১২৩	৬	০	১২৯
উত্তরপাড়া কলেজ	১৭৫	০	০	১৭৫
বারাকপুর কলেজ	৮৮	২	০	৯০
রসপাগলা কলেজ	১০	৩৭	০	৪৭
মোট	৩৮১৪	৭৯৬	৬৪	৪৬৭৪

(A. R. Mallick : British Policy & the Muslimsin Bengal. p. 280)

উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৮৫৬ সালের এপ্রিল মাসের ছাত্রসংখ্যা। ইতিমধ্যে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয়েছে এবং কোলকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজী শিক্ষার জন্যে অ্যাংলো পার্সীয়ান বিভাগ (A.P.) খোলা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
প্রেসিডেন্সী কলেজ	১২৭	০	৫	১৩২
হিন্দু কলেজ	৪৬২	০	০	৪৬২
কলুটোলা স্কুল	৫৬৭	০	৪	৫৭১
মাদ্রাসা (আরবী)	০	৫৯	০	৫৯
মাদ্রাসা (এপি)	০	১১১	০	১১১
কলিংগ স্কুল	১২৪	১৫	৪	১৪৩
সংস্কৃত কলেজ	৩৩৯	০	০	৩৩৯
পাঠশালা	৩৪৫	০	০	৩৪৫
মেডিক্যাল কলেজ	১৪৮	৯৬	৩৪	২৭৮
হুগলী কলেজ	৪৫৫	৭	৬	৪৬৮
হুগলী মাদ্রাসা	৪	১৭৫	০	১৭৯
হুগলী ব্রাহ্ম স্কুল	১৬৯	৮	০	১৭৭
ঢাকা কলেজ	৩৯০	২৪	৪১	৪৫৫
কৃষ্ণনগর কলেজ	২৪০	৭	০	২৪৭
বহরমপুর কলেজ	২২৭	১০	৫	২৪২
হাওড়া স্কুল	২২৯	৩	৪	২৩৬
উত্তরপাড়া স্কুল	২০৩	০	০	২০৩
বীরভূম স্কুল	১০৪	১০	০	১১৪
মেদিনীপুর স্কুল	১৪৫	১০	০	১৫৫
বাঁকুড়া স্কুল	১৪৬	১	০	১৪৭
বাউলিয়া স্কুল	১২৯	৫	০	১৩৪
রসপাগলা স্কুল	৪০	৬৩	.০	১০৩
বারাসত স্কুল	১৯২	৩	০	১৯৫
বারাকপুর স্কুল	১১৬	২	০	১১৮
যশোর স্কুল	১৩৪	৫	২	১৪১
পাটনা স্কুল	১৪৪	৪	০	১৪৮

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
ফরিদপুর স্কুল	১০২	৪	০	১০৬
বরিশাল স্কুল	২০৯	২২	৩	২৩৪
কুমিল্লা স্কুল	৯৩	১৬	৭	১১৬
নোয়াখালী স্কুল	৬৬	১	৪	৭১
চট্টগ্রাম স্কুল	১৬৬	৪২	১৪	২২২
বগুড়া স্কুল	৮৫	৬	০	৯১
দিনাজপুর স্কুল	১১৪	৮	৪	১২৬
ময়মনসিংহ স্কুল	১৬৭	৯	৮	১৮৪
সিলেট স্কুল	১৫৭	৫	২	১৬৪
মোট	৬৩৩৮	৭৩১	১৪৭	২২১৬

(A. R. Mallick : British Policy & the Muslims in Bengal, p. 281)

বাংলায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চাকুরীক্ষেত্রে এপ্রিল ১৮৭১ সালে মুসলমানদের স্থান কোথায় ছিল তার একটি খতিয়ান সংযোজিত করেন হান্টার সায়েব তাঁর গ্রন্থে। তা নিম্নরূপ ঃ

	ইউরোপীয়ান	হিন্দু	মুসলমান	মোট
চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস (মহারানী কর্তৃক ইংলন্ড থেকে নিয়োগপত্র প্রাপ্ত)	২৬০	০	০	২৬০
রেগুলেশন বহির্ভূত জেলাসমূহে বিচার বিভাগীয় অফিসার	৪৭	০	০	৪৭
এক্সট্রা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার	২৬	৭	০	৩৩
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর	৫৩	১১৩	৩০	১৯৬
ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেসর	১১	৪৩	৬	৬০
রেজিস্ট্রেশন বিভাগ	৩৩	২৫	২	৬০
স্মল কজেজ কোর্টের জজ ও সাব-অর্ডিনেট জজ	১৪	২৫	৮	৪৭
মুন্সেফ	০	১৭৮	৩৭	২১৬
পুলিশ বিভাগ, সকল গ্রেডের গেজেটেড অফিসার	১০৬	৩	০	১০৯
গণপূর্ত বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং এষ্টাবলিশমেন্ট	১৫৪	১৯	০	১৭৩
গণপূর্ত বিভাগ, সাব-অর্ডিনেট এষ্টাবলিশমেন্ট	৭২	১২৫	৪	২০১
গণপূর্ত বিভাগ, একাউন্ট এষ্টাবলিশমেন্ট	২২	৫৪	০	৭৬
মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, মেডিক্যাল কলেজে, জেলখানায়, দাতব্য চিকিৎসালয়ে, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও রোগ প্রতিষেধক বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারী এবং জেলা মেডিক্যাল অফিসার ইত্যাদি	৮৯	৬৫	৪	১৫৮
জনশিক্ষা বিভাগ	৩৮	১৪	১	৫৩
শুল্ক, নৌ চলাচল জরিপ, আফিম নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগ	৪১২	১০	০	৪২২
মোট	১৩৩৮	৬৮১	৯২	২১১১

W.W. Hunter : The Indian Mussalmans, Bangladesh Edition 1975, p. 152)।

উপরোক্ত খতিয়ানটি সংযোজিত করার পর হান্টার সায়েব নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন ঃ

একশ' বছর পূর্বে সকল সরকারী পদ মুসলমানদের ছিল একচেটিয়া। কদাচিৎ শাসকগণ কিছু অনুগ্রহ বিতরণ করলে হিন্দুরাও গ্রহণ করে কৃতার্থ হতো; এবং টুকটাক দু'একটা অথবা কেরানীগিরিতে দু'চারটা ইউরোপীয়ানকে দেখা যেতো। কিন্তু উপরের হিসাবে দেখানো হয়েছে যে, পরবর্তীকালে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের হার দাঁড়িয়েছে সাত ভাগের একভাগেরও কম। আর হিন্দুদের সংখ্যা ইউরোপীয়ানদের তুলনায় অর্ধেকেরও বেশী। আর মুসলমানদের সংখ্যা ইউরোপীয়ানদের এক চতুর্থাংশেরও কম। একশ' বছর পূর্বে সরকারী চাকুরীতে যাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল, এখন তাদের আনুপাতিক হার মোট সংখ্যার তেইশভাগের এক ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। এও আবার গেজেটেড চাকুরীর বেলায় যেখানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বন্টনের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। প্রেসিডেন্সী শহরের অপেক্ষাকৃত সাধারণ চাকুরীতে মুসলমানদের নিয়োগ

প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ক'দিন আগে দেখা গেল যে, কোন একটা বিভাগে এমন একজন কর্মচারীও নেই যে মুসলমানের ভাষা জানে এবং কোলকাতার বুকে কদাচিৎ এমন একটা সরকারী অফিস চোখে পড়ে যেখানে চাপরাশী ও পিয়নের উপরের পদে একটিও মুসলমান চাকুরীতে বহাল আছে।

এ সবের কারণ কি এই যে, মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরা অধিকতর যোগ্য এবং সুবিচার পাবার অধিকার শুধু তারাই রাখে? অথবা ব্যাপার কি এই যে, সরকারী কর্মক্ষেত্রে তারা আসতে চায় না এবং তাদের চাকুরীর জায়গাগুলি হিন্দুদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে? হিন্দুরা অবশ্যি উৎকৃষ্ট মেধার অধিকারী, তাই বলে সরকারী চাকুরীগুলি একচেটিয়া অধিকার ভোগ করার জন্যে যে ধরনের সার্বজনীন ও অসাধারণ মেধা দরকার, তা বর্তমানে তাদের মধ্যে নেই এবং তাদের অতীত ইতিহাসও একথার পরিপন্থী। আসল সত্য কথা এই যে, এদেশের শাসন ক্ষমতা যখন আমাদের হাতে আসে তখন পর্যন্ত মুসলমানরাই ছিল উচ্চতর জাতি। উচ্চতর শুধু মনোবল ও বাহুবলের দিক দিয়েই নয়, বরঞ্চ রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনার দক্ষতা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বাস্তব জ্ঞানের দিক দিয়েও তারা ছিল উন্নততর জাতি। এতদসত্ত্বেও সরকারী বেসরকারী কর্মক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে গেছে। (W.W. Hunter : The Indian Mussalmans, pp. 152-53)।

উপরোক্ত খতিয়ানে জনশিক্ষা বিভাগে মুসলমানদের যে অবস্থা দেখানো হয়েছে, তার থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের জীবিকার্জনের পথ বন্ধ করার জন্যে কিভাবে শিক্ষার অংগন থেকে তাদেরকে দূরে রাখা হয়েছিল। মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্যে সরকারের প্রতি বার বার দাবী জানানো হয়েছে। কিন্তু সবই অরণ্যেরোদন হয়েছে। মুসলমানরা ছিল দারিদ্র-নিষ্পেষিত। উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারে মুসলমানদের দানের টাকাও সদ্ব্যবহার করা হয়নি। বরঞ্চ তা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

সৈয়দ আমীর হোসেন নামক পাটনার একজন মুসলমান ১৮৭৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের স্থলে বাংলা বিধানসভার সভ্য নিযুক্ত হন। মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধিকল্পে তাঁরও উৎসাহের অন্ত ছিল না। ১৮৮০ সালে তিনি মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে তাদের শিক্ষা বিস্তৃতির জন্যে বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন—

মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার উন্নতি হচ্ছে না। সরকার এ বিষয়ে উদাসীন। ইংরেজী শিক্ষা না করায় ভারতের অন্যান্য জাতির সঙ্গে মুসলমানরা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না। অথচ মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষায় আগ্রহী. . . অনেক আরবী-ফার্সী শিক্ষিত ব্যক্তিকে দুঃখ করতে শোনা যায় তাঁরা ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পাননি। এজন্যে তাঁদের কোন জীবনোপায় নেই। মহসিন ফান্ডের টাকায় হুগলী, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে যে ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, তার দ্বারা কোন উপকার হয় না। অতএব হুগলী মাদ্রাসা তুলে দেয়া হোক। রাজশাহী ও চট্টগ্রামের মাদ্রাসার ব্যয় সংকোচ করা হোক। এভাবে মহসিন ফান্ডে যে ৯৩ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হবে, তার দ্বারা কোলকাতা মাদ্রাসার গৃহে স্বতন্ত্র ডিগ্রী কলেজ খোলা হোক। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী উচ্চশিক্ষা বৃদ্ধি পাবে। অথচ সরকারের পৃথক খরচ হবে না।

কিন্তু এমন সদযুক্তি সরকারের গ্রাহ্য হয়নি। তদানীন্তন গভর্ণর আমীর হোসেনের প্রস্তাবে কর্ণপাত করেননি। এই অজুহাত দেখিয়ে-"এখনও মুসলমানদের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমেনি, ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়েনি। সারা বাংলাদেশে গড়ে ৩২ জন মুসলমান ছেলে বছরে এন্ট্রান্স পাশ করে। তাদের মধ্যে বড়জোর ২০ জন কলেজে পড়ে। এতো কম সংখ্যক ছাত্র দিয়ে প্রেসিডেন্সীর মতো কলেজ খোলা যুক্তিযুক্ত হবেনা। কোলকাতার কলেজগুলিতে মুসলমান ছাত্রদের এক তৃতীয়াংশ বেতন দিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করলেই যথেষ্ট হবে।"

একদিকে বিদেশী রাজশক্তির বিরূপ মনোভাব হেতু নিপীড়ন, ঔদাসিন্য ও অবহেলা, অন্যদিকে সেই শক্তিরই অনুগ্রহপুষ্ট প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের হৃদয়হীন বঞ্চনা ও স্বার্থরক্ষার তাগিদে মুসলমানদেরকে শিক্ষা তথা জীবনোপায়ের সবক্ষেত্র হতে সুপরিকল্পিত বিতাড়ন—এই ছিল মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ।

(আবুদল মওদুদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ . . . পৃঃ৩৩২-৩৪)।

ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শুধুমাত্র মুসলমান ছেলেরাই ইংরেজী শিক্ষার জন্যে লালায়িত ছিল না। পর্দার অন্তরালে মুসলমান বালিকারাও এর জন্যে আগ্রহান্বিত ছিল। কিন্তু তাদের জন্যে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। ১৮৪৯ সালে কোলকাতার বেথুন স্কুল (পরে বেথুন কলেজে রূপান্তরিত) স্থাপিত হলেও

সেখানে মুসলমান বালিকার প্রবেশাধিকার ছিল না।

আবদুল মওদুদ তাঁর গ্রন্থে ১৩০৯ সালের ২৩শে মাঘে প্রকাশিত 'মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্রের' বরাত দিয়ে বলেন–

'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ 'মুসলমান স্ত্রী সমাজে ইংরেজী শিক্ষা' –এরূপ লিখেছিলেন ঃ

আমরা কখনও স্বপ্নে ভাবি নাই ১৯০১ সালের আদমশুমারী আমাদের নিকট ৪০০ (চারশত) মুসলমান স্ত্রীলোকের ইংরেজী শিক্ষার কথা প্রচার করিবে। একথা প্রচারিত হওয়ার পর আমাদের কর্তব্য কি? যদি অন্তপুরে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন সম্ভব, তবে স্কুল স্থাপন করিয়া বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে আপত্তি কি? কলিকাতার বেথুন স্কুলে মুসলমান বালিকার প্রবেশাধিকার নাই। বেথুন স্কুল ছাড়া অন্যান্য স্কুলে পড়িতে পারে। বিশেষ করে আমাদেব বালিকা মাদ্রাসাগুলিতে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হয়। (আবদুল মওদুদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজে বিকাশ. . .পৃঃ ৩৩৫)।

কিন্তু মুসলমানদের সকল আবেদন নিবেদন, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী সবকিছুই অরণ্যে রোদনে পরিণত হয়েছে। তার ফলে হতভাগ্য মুসলিম সমাজ প্রায় শতাব্দীকাল যাবত শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল। বিংশতি শতাব্দীর প্রথম পাদে মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার জন্যে ১৯২৫ সালে কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ও তার কিছু পূর্বে মুসলিম বালিকাদের জন্যে শাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ভারত বিভাগের কিছুকাল পূর্বে কোলকাতায় মুসলমানদের জন্যে লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজ স্থাপিত হয়।

বাংলার মুসলমান ও বোধনকৃত নতুন বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষার এবং বিশেষ করে বাংলা গদ্যের জন্ম ও ক্রমবিকাশের উপরে বাংলা ভাষার পন্ডিতগণ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং এর উপরে বিরাট বিরাট গ্রন্থও রচিত হয়েছে। সে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস থেকে বাংলা ভাষার আলোচনা বাদ দিলে ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে। সেজন্যে সংক্ষেপে হলেও এ বিষয়ে মূলকথা কিছু বলে রাখা দরকার। বাংলাভাষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় ১৭৭৮ সালের পূর্বে এর রূপ ও আকৃতি ছিল একরূপ এবং পরে এ ভাষা ধারণ করে আর এক রূপ।

এদেশে ইংরেজদের আগমনের পূর্বে বাংলাভাষার যে রূপ ছিল তার মধ্যে ছিল অজস্র আরবী–ফার্সী শব্দের মিশ্রণ। এ ছিল তৎকালীন সর্ববংগীয় মাতৃভাষা। এ সাহিত্যের বিকাশ ছিল প্রধানতঃ পদ্যে। গদ্য সাহিত্যের ততোটা প্রচলন ছিল না। থাকলেও তার উন্নতিকল্পে কোন প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। এই যে আরবী–ফার্সী শব্দবহুল বাংলা ভাষা এ শুধু এ দেশের মুসলমানের ভাষা ছিল না। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ সকলেরই ছিল এ ভাষা। চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, সরকার সমীপে আবেদন নিবেদনে হিন্দু–মুসলমান উভয়েই এ ভাষা ব্যবহার করতো। প্রাচীন রেকর্ড থেকে গৃহীত জনৈক হিন্দু কর্তৃক একখানি পত্রের উদ্ধৃতি দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা হচ্ছে—

শ্রীরাম। গরীব নেওয়াজ সেলামত। আমার জমিদারী পরগণে কাকজোল তাহার দুইগ্রাম শিকিস্তি হইয়াছে সেই দুই গ্রাম পয়স্তি হইয়াছে—চাকালেএকবেলপুরের শ্রী হরে কৃষ্ট রায় চৌধুরী আজ জবরদস্তি দখল করিয়া ভোগ করিতেছে। আমি মালগুজারীর সরবরাহতে মারা পড়িতেছি—উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিও এক চোপদার সরেজমিনেতে পঁহুচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া আদালত করিয়া হক দেলাইয়া দেন। ইতি ১১৮৫ তারিখ ১১ শ্রাবণ। ফিদবী জগতাধিব রায়। (চিঠিখানির ইংরেজী তারিখ হবে ১৭৭৮ সালের ২৬শে জুলাই)।

এ চিঠিখানির উল্লেখ করে সমকালীন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর সজনীকান্ত এরূপ মন্তব্য করেন ঃ

এক হিসেবে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে যে ভাষার প্রমাণিক আত্মপ্রকাশ দেখিতেছি তাহা দেশে মুসলমান প্রভাবের ফল। পরবর্তীকালে হেনরী–পিটার ফ্রস্টার ও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ৬২)।

সজনীকান্ত আরও বলেন ঃ কিন্তু ইংরেজের আগমন না ঘটিলে আজিও আমাদিগকে 'গরীব নেওয়াজ সেলামত' বলিয়া শুরু করিয়া 'ফিদবী' বলিয়া শেষ করিতে হইতো। তাহা মংগলের হইত কি অমংগলের হইত, আজ সে বিচার করিয়া লাভ নাই। . . ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই আরবী পারসী নিসূদন যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সময় সদর–মফস্বল আদালতসমূহে আরবী পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজীর প্রবর্তনে এই যজ্ঞের

পূর্ণাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আরবী পারসীকে অশুদ্ধ ধরিয়া শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি অভিধান রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সাহেবরা সুবিধা পাইলেই আরবী ও পারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন। ফলে দশ পনের বৎসরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণই পরিবর্তিত হইয়াছিল। (বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস–পৃঃ ৩২)।

উপরে বর্ণিত উইলিয়াম কেরী সায়েবদের আরবী–ফার্সীর বিরুদ্ধে ওকালতির কারণ ছিল। আবদুল মওদূদ যথার্থ বলেছেন— প্রাচ্য খন্ডে ইউরোপের বিজয়াভিযান হয়েছিল সুপরিকল্পিত তিনটি উপায়ে ঃ পণ্যবাহী বণিকরূপে, তার পিছনে অস্ত্র নিয়ে পণ্য নিরাপত্তার অজুহাতে এবং তাদের পিছনে মিশনারী নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির তালিম দেয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে। (আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ. . .পৃঃ ৩৬৩)।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির তালিম দেয়ার জন্যে তৃতীয় পর্যায়ে এসেছিল খৃষ্টান মিশনারীগণ। কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন দেশগুলিতে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্যে ইংলন্ডে কতকগুলি ধর্মীয় সংস্থা গঠিত হয়েছিল; তাদের মধ্যে উইলবারফোর্সের নেতৃত্বে ক্লাপহাম উপদলটি (Clapham Seer) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চার্লস্ গ্রান্ট ছিলেন এ উপদলটির সদস্য এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর। তিনি ভারত ভ্রমণের পর এ দেশের অধিবাসীদের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থার এক নৈরাশ্যজনক চিত্র তুলে ধরে বলেন, "তারা যে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে তার একমাত্র সমাধান হচ্ছে— তাদের মধ্যে খৃষ্টধর্মের আলোক প্রজ্জ্বলিত করা। হিন্দুরা অজ্ঞ বলে তারা ভুল করছে। তাদের ভ্রান্তি তাদের কাছে তুলে ধরা হয়নি। তারা যে উচ্ছৃংখলতা ও পাপাচারে লিপ্ত আছে, তা দূর করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে তাদের মধ্যে আমাদের আলোক ও জ্ঞান বিতরণ করা।"

(Grant's Observations, published in the printed parliamentary paper relating to the affairs of India Several Vol. viii (734). Appendix I. Published 1832, pp. 3-60; M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, pp. 30-32)।

খৃষ্টান মিশনারীগণ তাদের ধর্ম প্রচারের জন্যে প্রধানতঃ এ দেশের হিন্দুকে বেছে নিয়েছিল। এ কাজের জন্যে তাদের অনিবার্যরূপে প্রয়োজন হয়েছিল বাংলাভাষা শিখবার ও শিখাবার। হুগলী শ্রীরামপুরে এ উদ্দেশ্যে তারা একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করে। পূর্বে বলা হয়েছে—এযাবত বাংলায় যে বাংলা ভাষা রূপ লাভ করেছিল—তা ছিল মিশ্র বাংলা অর্থাৎ আরবী–ফার্সী শব্দ মিশ্রিত বাংলা। যদিও এ বাংলা হিন্দু মুসলমান উভয়ের কথ্যভাষা ছিল, তথাপি হিন্দু ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণ এ ভাষাকে ঘৃণা করতেন। মুসলমান জাতি তাদের কাছে 'ম্লেচ্ছ', 'যবন' ও ঘৃণিত জীব। তাদের আরবী–ফার্সী ভাষাও তাদের কাছে ছিল ঘৃণিত। সম্ভবতঃ গোঁড়া হিন্দু পন্ডিতগণ আরবী–ফার্সী শব্দের মধ্যে 'গোমাংসের' গন্ধ অনুভব করতেন। এ ভাষাকে তাঁরা প্রাকৃত বা লৌকিক আখ্যা দিয়ে অভিশাপ করলেন। ইতিপূর্বে মুসলমান সুলতানদের আমলে এ ভাষায় অনেক হিন্দুধর্ম–গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল। একালের পন্ডিতগণ ফতোয়া দিলেন ঃ

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিশ্চ,
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

—ভাষায় অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় অষ্টাদশ পুরাণ রামচরিত ইত্যাদি যে মানব শুনবে, তার ব্যবস্থা রৌরব নরকে।

(আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ. . . পৃঃ ৩৪৪)।

এ কথা খৃষ্টান মিশনারীগণও ভালোভাবে উপলব্ধি করেন যে, যে ভাষার প্রতি হিন্দু পন্ডিতগণ ঘৃণা পোষণ করেন, সে ভাষার শুদ্ধিকরণ ব্যতীত তার দ্বারা খৃষ্টধর্মে আকৃষ্ট করা কষ্টকর হবে। তাই তাঁরা এক ঢিলে দুই পাখী মারার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। ভাষাকে আরবী–ফার্সীর ছোঁয়াচ্ থেকে রক্ষা করে হিন্দুর গ্রহণযোগ্য করা, এবং মুসলমানদের বাংলা মাতৃভাষার নিসূদন যজ্ঞ বা ধ্বংসযজ্ঞ সম্পাদন করা যার উল্লেখ সজনীকান্ত করেছেন। এ মহান (?) উদ্দেশ্যে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড (Halhed) ১৭৭৮ সালে A Grammar of the Bengali Literature নামে বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন এবং শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত গ্রন্থ হিসাবে এইটিই ছিল প্রথম যাতে প্রথম বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হয়। এ ব্যাকরণের মাধ্যমে এতদিনের প্রচলিত বাংলা ভাষার পরিবর্তে এক নতুন বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়। যে ভাষা ছিল একেবারে আরবী–ফার্সী শব্দ বিবর্জিত এবং সংস্কৃত শব্দবহুল। ব্যাকরণটির ভূমিকায় হ্যালহেড

বলেন, "এ যুগে তাঁরাই মার্জিত ভাষায় কথা বলেন, যাঁরা ভারতীয় ক্রিয়াপদের সংগে অজস্র আরবী ফার্সী বিশেষ্যের মিশ্রণ ঘটান।" অতএব একথা নিঃসন্দেহ যে, আঠারো শতকের মার্জিত বাংলা কথ্যভাষা এবং গদ্য ভাষার কাঠামোতে ছিল অজস্র আরবী–ফার্সী শব্দের মিশ্রণ—যার দৃষ্টান্ত উপরে বর্ণিত জনৈক হিন্দু জগতাধিব রায়ের পত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি।

উল্লেখযোগ্য যে, কোম্পানীর ইংরেজ সিভিলিয়ানদেরকে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্যে ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। উইলিয়াম কেরী হন এ বিভাগের অধ্যক্ষ। তাঁর অধীনে আটজন পন্ডিত নিযুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার ও রামরাম বসুর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁদের সহায়তায় কেরী বাংলা গদ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করতে থাকেন। প্রথমে রচিত হয় 'কথোপকথন' ও পরে 'ইতিহাস মালা'। বলা বাহুল্য গ্রন্থ দুটির ভাষা ছিল সংস্কৃত স্টাইলের এবং বিষয়বস্তুও ছিল মুসলমানবর্জিত। প্রতাপ আদিত্য, রূপ সনাতন ও বীরবল ছিলেন ভারতীয় ইতিহাসের উপজীব্য চরিত্র। অতএব ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পন্ডিতদের সাধনায় ও হিন্দুত্বের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায়—ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় হয়েছিল ক্ষেত্র প্রশস্ত। একদিকে মিশনারীদের ছিল একটা অসভ্য জাতিকে অন্ধকার হতে আলোকে নিয়ে যাওয়ার দম্ভ। আর অন্যদিকে ছিল পন্ডিতদের সংস্কৃতের তনয়ারূপে বাংলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে হিন্দুদের মাহাত্ম্য প্রকাশের অসীম উদ্যম ও আগ্রহ। এ দুটি উদ্দেশ্যের ধারা সম্যকভাবেই প্রতিফলিত দেখা যায়—এই কেরীর সৈনাপত্যে পন্ডিতদের রচিত ওই সময়ের গ্রন্থগুলির ভাষা ও বিষয়বস্তুর মূল্যায়নকালে।

(বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, সজনীকান্ত দাস–পৃঃ ১১২; আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩৬৪)।

অতএব এসব তথ্যের ভিত্তিতে একথা আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, ইংরেজ ও হিন্দুর যোগসাজসে মুসলমানরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকেই বিতাড়িত হয়নি। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে তাদের যে মাতৃভাষাটি গড়ে উঠেছিল তাকেও নস্যাৎ করা হলো। সমাজের উচ্চস্থান থেকে নীচে নিক্ষেপ করা হলো। মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে অন্যকে দেয়া হলো এবং শেষ সম্বল মুখের ভাষাটিও ধ্বংস করা হলো 'নিসূদন যজ্ঞের' মধ্যমে।

শ্রদ্ধেয় আবদুল মওদূদ বলেন—"এই মিশ্ররীতির বাংলাভাষায় সাহিত্য গড়ে উঠার মুখেই বণিকের তুলাদন্ড হলো রাজদন্ডে রূপান্তরিত এবং বণিকের তল্পীবাহক মিশনারীরাও দিলেন সাহিত্যের ভাষার মোড় পরিবর্তন করে। . . . পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তকরা বাংলা ভাষার কাঠামোকেও নতুন ছাঁচে তৈরী করে দিলেন—বাবু সম্প্রদায়ের জন্যে। তার দরুন বাবু কালচারের আবাহন হলো যে ভাষায়, তা কেবল সংস্কৃত ঘেঁষা নয়, একেবারে সংস্কৃতসম। আর এটিও হয়েছে সুপরিকল্পিত সাধনায়—হিন্দু পন্ডিতরা উল্লসিত হলেন তার দরুন—সংস্কৃত ভাষা ও কৃষ্টির নব প্রবর্তনের সম্ভাবনায় এবং মিশনারীকুল তৎপর হয়েছিলেন মুসলমানদের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে তাকে সাহিত্য ও কালচারের দিক দিয়েও নিঃস্ব করে দিতে।"

(আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ পৃঃ ৩৫৮)।

ইংরেজ তথা মিশনারী–পূর্ব বাংলা ভাষাকে ভিত্তি করে মুসলমানদের যে এক নতুন বাংলাভাষা গড়ে উঠে, যার মধ্যে শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করছিল আরবী ও ফার্সী তাকে বলা যেতে পারে মুসলমানী বাংলা। স্বভাবতঃই তা মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিল না হিন্দুদের কাছে। ১৮৩৭ সালের পর হিন্দুবাংলা (আরবী–ফার্সী শব্দ বর্জিত সংস্কৃত শব্দবহুল বাংলা) প্রাদেশিক মাতৃভাষা হিসাবে সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি লাভের পর মুসলমানী বাংলার অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। অফিস–আদালত থেকে এতদিনের প্রচলিত ফার্সী ভাষা তার আপন মর্যাদা হারিয়ে ফেলে এবং নতুন বোধনকৃত বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে থাকে। নতুন বাংলা ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর এ ভাষা হিন্দু সংস্কৃতি ও জাতীয় আশা–আকাংখার বাহন হিসাবে মর্যাদা লাভ করে।

এ নতুন বাংলা ভাষাকে স্কুল কলেজে মাতৃভাষা হিসাবে বাধ্যতামূলক করা হয়। এমনকি যে কোলকাতা মাদ্রাসায় অনেক ছাত্র মুসলমানী বাংলাও জানতোনা, সেখানেও এই নতুন বাংলা পাঠ্য করা হয়। প্রফেসার উইলসন প্রমুখ ইউরোপীয় শিক্ষাবিদগণ সংস্কৃত ভাষার সপক্ষে এমন জোর ওকালতি শুরু করেন যে, সায়েবদের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করাটা একটা চরম বাতিকে পরিণত হয়। উইলসন একটি সহজ সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করে সায়েবদের সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করে দেন। ১৮২৮ সালে তিনি"বাংলাভাষায় ইউরোপীয় জ্ঞান–

বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতির' প্রেসিডেন্ট হন এবং General Committee of Public Instruction বা জনশিক্ষা সাধারণ কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন বাংলাভাষায় বহু পুস্তক রচনা করেন। এসব বইপুস্তক পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হয়। মুসলমানী বাংলা এবং নতুন বাংলার মধ্যে শুধু ভাষার দিক দিয়েই নয়– বিষয়বস্তু, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে এমনই আকাশ–পাতাল পার্থক্য ছিল যে, মুসলমানদের জন্যে নতুন ভাষা গ্রহণ অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়ে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

করুণা নিধন বিলাস, পদাংক দূত, বিশ্ব মংগল, গীতা গোবিন্দ—শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত,

চন্ডী, আনন্দ মংগল দুর্গা সম্পর্কিত,

মহিমা স্তব, গংগা ভক্তি—শিব গংগা সম্পর্কিত

চৈতন্য চরিতামৃত, রস মঞ্জরী, আদিরস, পদাবলী, রতিকাল, রতি বিলাস– প্রেমোদ্দীপক।

স্কুলে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গৃহীত ঃ

শিশু বোধক—বাংলার সর্বত্র এবং গ্রাম্য স্কুলগুলিতে ব্যাপকভাবে পড়ানো হয়। এর মধ্যে ছিল বহু সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ যা প্রধানতঃ হিন্দু দেব–দেবী সম্পর্কে লিখিত। এর প্রথম পাঠগুলি—সরস্বতী, গংগা প্রভৃতি সমীপে প্রার্থনা দিয়ে শুরু করা হয়েছে।

তারপর আসে আনন্দ মংগলের কথা। এটাও আগাগোড়া হিন্দুধর্ম ও তাদের দেব–দেবীদের স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ। এ ধরনের আরও বহু পাঠ্যপুস্তকের নাম পাওয়া যায়। (M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & Eng. Education, pp. 106-108)।

উল্লেখযোগ্য যে, সংস্কৃতসম হিন্দুবাংলার পূর্বে যে বাংলা ভাষা কয়েক শতাব্দী যাবত লালিত–পালিত ও পরিপুষ্ট হচ্ছিল তা প্রধানতঃ ছিল পদ্যসাহিত্য বা পুঁথিসাহিত্য। এ সাহিত্যকে আধুনিককালে পুঁথিসাহিত্য হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এ সাহিত্যের যারা চর্চা করেছেন, তাঁদের দুজন 'মালে মুহাম্মদ' ও 'মুহাম্মদ দানিশ' এ সাহিত্যের রীতিকে বলেছেন 'চলতি বাংলা' এবং 'রেজাউল্লাহ' (১৮৬১) বলেছেন 'ইসলামী বাংলা'। ১৮৫৫ সালে পাদরী লং তাঁর

গ্রন্থতালিকায় এ ভাষাকে বলেছেন 'মুসলমানী বাংলা' আর এ ভাষায় রচিত সাহিত্যের নামকরণ করেছেন 'মুসলমানী বাংলা সাহিত্য'।

(আবদুল মওদুদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ . . . সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩৫৫)।

এ সাহিত্যের প্রতি হান্টার সায়েবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি বলেন ঃ

আজ পর্যন্ত বদ্বীপ অঞ্চলের কৃষক সমাজ মুসলমান। নিম্নবংগে ইসলাম এতই বদ্ধমূল যে, এটি এক নিজস্ব ধর্মীয় সাহিত্য ও লৌকিক উপভাষার উদ্ভব ঘটিয়েছে। হিরাতের ফার্সী ভাষা থেকে উত্তর ভারতের উর্দু যতোখানি পৃথক, 'মুসলমানী বাংলা' নামে পরিচিত উপভাষাটি উর্দু হতে ততোখানি পৃথক।" (W. W. Hunter : The Indian Mussalmans, p. 146)।

এ সাহিত্যের যে নামই দেয়া হোক, তা ছিল না প্রাণহীন। কয়েক শতাব্দী যাবত তা লক্ষ লক্ষ মুসলমান নর–নারীর প্রাণে সাহিত্য তরংগ তুলেছে। তাদের চিন্তা–ভাবনা ও আশা–আকাংখাকে প্রভাবিত করেছে। শ্রী শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায় বলেন—

মুসলমান সাহিত্যের গল্পভান্ডারও নিতান্ত দরিদ্র ছিলনা। 'আরব্য উপন্যাস', 'হাতেম তাঈ', 'লায়লা মজনু', 'চাহার দরবেশ', 'গোলে বাকাওলী' প্রভৃতি আখ্যায়িকাগুলি নিশ্চয়ই বাঙালী পাঠকের সম্মুখে এক অচিন্তপূর্ব রহস্য ও সৌন্দর্যের জগত উন্মুক্ত করিয়াছিল। . . . উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শে আমাদের উপন্যাস সাহিত্য ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল তখন এই শ্রেণীর মুসলমানী গল্পের অনুবাদ আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার একটা প্রধান অংগ হইয়াছিল। উহারা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ ও রুচি আকর্ষণ করিতে না পারিলে আমাদের সাহিত্যিক উদ্যমের একটা মুখ্য অংশ কখনই উহাদের অনুবাদে নিয়োজিত হইতে পারিত না। অন্ততঃ এই সমস্ত গল্পের মধ্যে একটা চমকপ্রদ (Sensational), বর্ণবহুল (Romance), একটা নিয়ম–সংযমহীন সৌন্দর্য বিলাসের অপরিমিত প্রাচুর্য আছে, তাহাই আমাদের একশ্রেণীর ধর্মশাস্ত্রাস্বাদক্লিষ্ট, অবসাদগ্রস্ত রুচিকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করিয়াছিল। (বংগসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায়–৪র্থ সং, পৃঃ ১৮–১৯)।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িকতা

আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি এবং সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে যাঁদের অবদান রয়েছে, তাঁদের মধ্যে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ও রাজা রামমোহনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত দু'জন উইলিয়াম কেরী কর্তৃক নিযুক্ত পন্ডিতগণের অন্তর্ভুক্ত। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য' গ্রন্থ ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তার মধ্যে রাজাবলী (১৮০৮) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারপর আসে রামমোহনের নাম। তাঁর গদ্যসাহিত্য ছিল বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত। কিন্তু এঁদের সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বা মুসলিম বিদ্বেষ ছিল না। অবশ্যি মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলী' ছিল চন্দ্র বংশের ক্ষেত্রজ সন্তান বিচিত্রাবলী থেকে বাংলাদেশের কোম্পানী শাসন প্রতিষ্ঠার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার প্রথম প্রয়াস এবং মুসলমানী আমলটা অত্যন্ত অযত্নের সংগে বিদ্বেষদুষ্ট ভংগীতে লেখা।

পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের অংগনে দু'জন দিকপালের আবির্ভাব হয়। বাংলা পদ্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের এবং গদ্য সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের। বাংলা সাহিত্যে তাঁদের শ্রেষ্ঠ অবদান অনস্বীকার্য।

আবদুল মওদুদ বলেন—

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশক্ষেত্রে যখন মধ্যাহ্ন গগন বিরাজমান, তখন বাংলার রাজনৈতিক গগনেও মোড় ফিরে গেছে। তখন ইংরেজের সংগে হার্দিক সম্বন্ধে বিদারণ রেখা দেখা দিতে শুরু করেছে। ইংরেজের অনুগ্রহের ষোলআনা অংশটার এক পক্ষ প্রবল দাবী জানাচ্ছে আত্মসচেতন হয়ে। শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সমাজে বেকার সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এবং তার দরুন তাদের মনে নৈরাশ্যভাব দেখা দেয়ায় তারা হিন্দুজাতীয়তা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগমানসের সন্তান। তিনি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ-মনের প্রতিভূ হিসেবে এবং হিন্দু জাতীয়তা মন্ত্রের উদ্যোক্তা ঋষি হিসেবে বাংলার সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হলেন। এবং এভাবে তীব্র সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবহ্নি তিনি ছড়িয়ে দিলেন লেখনী মুখে, জগতের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় নজীর নেই। প্রগাঢ় পান্ডিত্য, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও গভীর বিশ্লেষণ শক্তির অধিকারী হয়েও সংকীর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের আদর্শের-উদ্দেশ্যের ক্রীড়নক হয়ে তিনি মানবতার যে অকল্যাণ ও অসম্মান করে গেছেন, তারও পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনা নেই। অস্ত্রের মুখে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, কালের প্রলেপে সে ক্ষতও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কিন্তু লেখনীর মুখে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তার নিঃশেষ নেই, নিরাময় নেই— যুগ থেকে যুগান্তরে সে ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে।

—(আবদুল মওদূদ : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩৬৯-৭০)।

সাহিত্যের মাধ্যমে বঙ্কিম মুসলিম সমাজ ও জাতির বিরুদ্ধে যে বিষবহ্নি প্রজ্বলিত করে গেছেন, দৃষ্টান্তসহ তার কিছু আলোচনা আমরা পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে করেছি। বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের চরম অবনতির জন্যে তাঁর সাহিত্যই প্রধানতঃ দায়ী।

বঙ্কিম তাঁর 'রাজসিংহ' ও 'আনন্দমঠে' মুসলমান বিদ্বেষের যে বিষবহ্নি উদগীরণ করেছেন সে বিষজ্বালায় এ বিরাট উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে যেটুকু সম্প্রীতির ফল্গুধারা ছিল, তা নিঃশেষে শুষ্ক ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ...এ উপমহাদেশে মুসলমানের অস্তিত্বও বঙ্কিমচন্দ্র অস্বীকার করে তাদের বিতাড়িত করে সদাশয় ব্রিটিশজাতির আবাহনে ও প্রতিষ্ঠায় তিনি বার বার মুখর হয়ে উঠেছেন। (ঐ... পৃঃ৩৭০)।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পূর্বে মুসলমানদের যে সাহিত্য সাধনা ছিল, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোন লেশমাত্র বিদ্যমান ছিল না। একথা হিন্দু সাহিত্যসেবীগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

মুসলমানদের কাব্য কাহিনীতে সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্মের পরিবর্তে আছে সুফী মতবাদের প্রভাব ও ছদ্মবেশী রূপকান্তিপ্রায়, ও ইহার ঘটনাবলীও প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিবিম্ব নহে। জীবনোদ্ভূত এক উচ্চতর আদর্শ কল্পনার সুকুমার ভাবরঞ্জিত ও অসাধারণত্বের স্পর্শদীপ্ত।

—(বংগ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায়, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৮-১৯)।

একথা উল্লেখ্য যে, সাহিত্যের অংগনে সাম্প্রদায়িকতার বীজ প্রথম বপন করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অঙ্গুরী বিনিময়ে' (১৮৫৭)। সম্ভবত তাঁর থেকে প্রেরণা লাভ করে বঙ্কিম সে বীজকে সাম্প্রদায়িকতার বিরাট বিষবৃক্ষে পরিণত করেন। বঙ্কিমের মৃত্যুর পরে বাংলা সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতার পংকিলতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। তাঁর পদাংক অনুসরণ করে পরবর্তীকালেও লেখনী চালনা করেছেন পন্ডিত-অপন্ডিত, সাহিত্যিক-অসাহিত্যিক বর্ণহিন্দু সম্পদায়।

বাংলা সাহিত্যকে যে দু'জন মনীষী–কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সুষমামন্ডিত ও কিরীটশোভিত করেছেন, তাদের লেখনীও সে পংকিলতার স্পর্শমুক্ত হতে পারেনি। শরৎচন্দ্রের সাম্প্রদায়িকতা বিষদুষ্ট লেখনীর উদ্ধৃতি আমরা উপরে দিয়েছি।

কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথকেও যখন এ আবর্তে অবগাহন করতে দেখি তখন ক্ষোভে ও লজ্জায় স্বতঃই বেদনার্তকণ্ঠে মুসলমান বলে উঠে জুলিয়াস সীজারের মতো ঃ Et tu Brute! তোমাকে ত রবীন্দ্রনাথ,এসবের উর্ধ্বে ভেবেছিলাম। এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ না করে রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পটি ও 'শিবাজী উৎসব' কবিতা পাঠ করে দেখতে পাঠক সমাজকে অনুরোধ করি।

(আবদুল মওদুদ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩৭১)।

অষ্টম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলমান

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা যখন সাফল্যের শীর্ষে, তখন তারই সমসাময়িক একজন মুসলমান বাংলাসাহিত্য গগনে উদিত হন। তিনি হলেন মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর সাহিত্য ছিল আলবৎ আধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্ধ্বে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্যের অংগনে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছিলেন, তখন মশাররফ হোসেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে শিল্পীসুলভ মনোভাব নিয়ে মুসলমানদের প্রতি উপদেশমূলক সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। চল্লিশ বছরেরও অধিক সময় তিনি সাহিত্য সাধনা করেন এবং উপন্যাস, জীবনী, ঐতিহাসিক কাহিনী, নাটক, রম্যরচনা, কবিতা ও গান তাঁর সাহিত্য সাধনার অন্তর্ভূক্ত ছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা 'বিষাদসিন্ধু'। বিষাদসিন্ধুর চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে গৃহীত হলেও এটাকে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলা যায় না। তথাপি মুসলমান সমাজে এটা ছিল সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের গগনে আর একটি জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে এবং তা হলো বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। বাংলা সাহিত্যের অংগনে আরও অনেক মুসলিম কবি–সাহিত্যিকের আগমন সমসাময়িককালে হয়েছে। যথা– কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুন্সী মেহেরুল্লাহ প্রমুখ। নিজেদের স্বতন্ত্র ধারায় সাহিত্য সৃষ্টি করে তাঁরা মুসলমান জাতিকে আত্মসচেতনায় ও স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্বুদ্ধ করেন। নজরুলের আগেও বাংলা সাহিত্যের আসরে বহু মুসলিম কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু তাঁদের ও নজরুলের সাহিত্য ধারায় ছিল সুস্পষ্ট পার্থক্য। অন্যান্যগণ সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেছেন, মনে হয়, ভীরু পদক্ষেপে, মনের দুর্বলতা সহকারে। বাংলা সাহিত্যকে হিন্দুর, সংস্কৃত–তনয়া মনে করে গা বাঁচিয়ে যেন তাতে ছোঁয়া না লাগে মুসলমানের আরবী–উর্দু–ফার্সীর শব্দাবলীর, এমনকি উপমায়, অলংকারে ও রচনারীতিতে মুসলমানী নিদর্শন–আলামতকে সতর্কতার সাথে বাঁচিয়ে চলেছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নজরুলের হঠাৎ আবির্ভাব যেমন সৃষ্টি

করলো বিস্ময়, তেমনি সূচনা করলো এক বৈপ্লবিক যুগের। যে মুসলমানের বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে বোধনকৃত করে বেদ-পুরাণ ও হিন্দু-জাতিত্বমুখী করা হয়েছিল, নজরুল তার গতিমুখ ফিরিয়ে করলেন মুসলমানের কেবলামুখী। মানুষের তাজা খুনে লালে-লাল করা যুদ্ধের ময়দানে তিনি প্রবেশ করেছিলেন যেমন বীরবিক্রমে, তেমনি যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসে তীব্র গতিতে ও বীরবিক্রমেপ্রবেশকরলেন—সাহিত্যের ময়দানে। তাঁর মনে কোনদিন স্থান পায়নি দ্বিধাসংকোচ, ভীরুতা ও কাপুরুষতা। তাই তিনি তাঁর বিজয় নিশান উড়াতে পেরেছিলেন সাহিত্যের ময়দানে। তিনি তৎকালীন মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের দ্বিধাসংকোচ ঘুঁচিয়ে দিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলমানসুলভ আযাদী এনে দিয়েছিলেন। তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে আরবী-ফার্সীর ঝংকার পুনরায় শুনা যেতে থাকে। তাঁর আরবী-ফার্সী শব্দাবলীর ব্যবহার পদ্ধতি এত সুনিপুণ, সুশৃংখল ও প্রাণবন্ত যে, ভাষা পেয়েছে তার স্বচ্ছন্দ গতি, ছন্দ হয়েছে সাবলিল এবং সুরের ঝংকার হয়েছে সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী। তিনি আধুনিক বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দ আমদানী করে ভাষাকে শুধু সৌন্দর্যমন্ডিতই করেননি, বাংলা ভাষায় মুসলমানদের স্বাতন্ত্র ও নিজস্ব অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলা ভাষায় মুসলিম সাহিত্যসেবীদের জন্যে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে দেন তিনি। কবি নজরুল ছিলেন কাব্য সাহিত্য জগতের এক অতি বিস্ময়। তাঁর এ প্রতিভা ছিল একান্ত খোদাপ্রদত্ত। তাঁর আবির্ভাব হয় ধূমকেতুর মতো এমন এক সময়ে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে তাঁর সম্মানজনক আসন করে নিয়েছেন। বিপ্লবী কবি নজরুল-প্রতিভার স্বীকৃতি তাঁকে দিতে হয়েছে এ আশিষের ভাষায়—

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু
দুর্দিনের ঐ দুর্গ শিরে-
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোকনা লেখা
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

নজরুলের কাব্য প্রতিভা যেমন তাঁকে সুউচ্চ আসনে সমাসীন করেছে সাহিত্য জগতের, তেমনি তাঁর বিপ্লবী কবিতা সুপ্ত মুসলিম মানসকে করেছে জাগ্রত, তাদের নতুন চলার পথে দিয়েছে অদম্য প্রেরণা ও প্রাণশক্তি। এতোদিন মুসলমানরা যে সাহিত্যক্ষেত্রে ছিল অপাংক্তেয় তাদের সে গ্লানি গেল কেটে। তাদের জড়তা গেল ভেঙে। জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো নতুন উৎসাহ উদ্যমে। নজরুল সুপ্ত মুসলিমকে এই বলে ডাক দিলেন—

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীন ইসলামী লাল মশাল,
ওরে বেখবর তুইও ওঠ জেগে, তুইও তোর প্রাণপ্রদীপ জ্বাল।

তাঁর এ আহবান ব্যর্থ যায়নি। শুধু সাহিত্যক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মুসলমানের নতুন কাফেলা শুরু করলো যাত্রা অবিরাম গতিতে।

উনবিংশ শতকে মুসলমান

মুসলমান চরম অগ্নি পরীক্ষার মুখে

ইংরাজী ১৮০০ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল এবং তার পরেও কয়েক দশক ছিল মুসলমানদের জন্যে অগ্নিযুগ। বাংলার মুসলমান এ সময়ে জাতি হিসাবে এক অগ্নি গহ্বরের প্রান্তে অবস্থান করছিল। তাদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর তাদের অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছিল চরম বিপর্যয়। বিদেশী শাসক ও তাদের এতদ্দেশীয় অনুগ্রহপুষ্ট সহযোগীদের নির্যাতন নিস্পেষণেও মুসলমান জাতি তাদের শাসন শোষণকে মেনে নিতে পারেনি। শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও খন্ডযুদ্ধের মাধ্যমে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বহবার এবং বহুস্থানে এই শতকের মধ্যে। ফকীর বিদ্রোহ, ফারায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের আন্দোলন, সাইয়েদ আহমদের জেহাদ আন্দোলন, ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ ও হিন্দু কর্তৃক মুসলমানদের প্রতি অমানুষিক ও পৈশাচিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিস্ফোরণ। এর এক একটির পৃথক পৃথক আলোচনাই এ অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু।

১৩—

ফকীর আন্দোলন

ফকীর আন্দোলনের যতোটুকু ইতিহাস জানতে পারা যায়, তার থেকে প্রমাণিত হয় যে, পলাশী যুদ্ধের পর এবং বিশেষ করে ১৭৬৪ সালে মীর কাসেমের পরাজয়ের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া 'দেওয়ানী' লাভ ক'রে যখন তাদের অত্যাচারমূলক শাসন দন্ড চালাতে শুরু করে তার পর থেকে 'ফকীর বিদ্রোহ' শুরু হয় এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮৩৩ অথবা ১৮৩৪ সালে। ফকীর বিদ্রোহের পশ্চাতে কোন মহান উদ্দেশ্য ছিল কিনা, এবং বিদ্রোহ পরিচালনার জন্যে কোন সুসংগঠিত ও সুশৃংখল বাহিনী ছিল কিনা, তা বলা মুস্কিল। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে যে ফকীর বিদ্রোহ হয়েছিল, তাদের মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল কিনা, তাও বলা কঠিন। তবে যে কারণে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তা হলো একাধারে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও তাদের অনুগ্রহপুষ্ট নতুন হিন্দু জমিদার, মহাজনদের অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন।

তাদের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সৃষ্ট ও আশ্রয়পুষ্ট শোষণকারী, জমিদারদের উচ্ছেদ করা ও তাদের অর্থাগার লুট করা। উত্তরবংগে এদের অভিযানের ফলে বহু জমিদার ইতিপূর্বেই (১৭৭৩) ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন স্থানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। (ময়মনসিংহে ফকীর অভিযান, খালেকদাদ চৌধুরী, ডঃ হাসান জামান সম্পাদিত 'শতাব্দী পরিক্রমা', পৃঃ ২৬)।

ফকীর আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মজনু শাহ, মাজু শাহ, টিপু পাগল ও গজনফর তুর্কশাহ। খালেকদাদ চৌধুরী তাঁর ময়মনসিংহে ফকীর অভিযান প্রবন্ধে মজনু শাহকে মাজু শাহের বড়ো ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে এতটুকু জানা যায় যে, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে তিনি একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করেন। ১৭৬৪ সালে মীর কাসেম আলীর পরাজয়ে . . . এ দেশে ইংরেজ অধিকার বদ্ধমূল হয়। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীতে ঐ একই সালে মজনুর (মজনু শাহ্) অনুচরদের হাতে ব্রিটিশ শক্তিকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। ('বিপ্লব আন্দোলনে দক্ষিণবংগের অবদান'—আজিজুর রহমান, হাসান জামান সম্পাদিত 'শতাব্দী পরিক্রমা', পৃঃ ১৮০)।

১৭৮৪ সালে মাজুশাহ ময়মনসিংহ, আলাপসিং, জাফরশাহী এবং শেরপুর পরগণার জমিদারদের সমস্ত ধনদৌলত লুন্ঠন করে। সেখানে সংবাদ রটে যে, মাজু

শাহের ভাই মজনু শাহ দুইশ' দুর্ধর্ষ ফকীরসহ জাফরশাহী পরগণায় আসছেন। তাঁর এই অভিযানের ভয়ে জমিদার এবং প্রজারা অন্যত্র পালিয়ে যায়। কিন্তু ঢাকার চীফ মিঃ ডে–র রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বেগমবাড়ীর সৈন্যবাহিনীই সেই অভিযান প্রতিরোধ করে। ফলে ফকীরেরা ফিরে যায়। মিঃ ডে–র রিপোর্টে আরও উল্লেখ আছে যে, জমিদারদের ধন সম্পদ লুন্ঠনের ব্যাপারটি সত্য নয়। খাজনা ফাঁকি দেয়ার জন্যে সুচতুর ও অসাধু জমিদারেরা এরূপ মিথ্যা সংবাদ রেভেনিউ কমিটির কাছে পাঠিয়েছিল। (শতাব্দী পরিক্রমা, পৃঃ ২৭)।

পুনরায় ফকীর অভিযান শুরু হয় দু'বছর পর ১৭৮৬ সালে। ময়মনসিংহকে ফকীরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে লেফ্‌টন্যান্ট ফিন্ডকে ঢাকা পাঠানো হয়। ময়মনসিংহের কলেক্টর রাউটনের সাহায্যের জন্যে আসাম গোয়ালপাড়া থেকে ক্যাপ্টেন ক্রেটনকে পাঠানো হয়। সুসজ্জিত ইংরেজ সৈন্যদের সাথে ফকীরদের যে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়, তাতে ফকীর বাহিনী পরাজিত হয়ে ছত্রভংগ হয়ে যায়। তারপর আর বহুদিন যাবত তাদের কোন তৎপরতার কথা জানা যায় না।

ফকীরদের অভিযান বন্ধ হওয়ার পর জমিদারগণ তাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের নাম করে প্রজাদের নিকট থেকে বর্ধিত আকারে রাজস্ব আদায় করতে থাকে এবং নতুন কর ধার্য করতে থাকে। তাতে প্রজাদের দুর্দশা চরমে পৌঁছে।

প্রজাদের নির্যাতনের অবসানকল্পে ১৮২৬ সালে টিপু পাগল নামক জনৈক প্রভাবশালী ফকীর কৃষক প্রজাদের নিয়ে এক শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেন। জমিদারেরা সকল ন্যায়নীতি ও ১৭৯৩ সালের রেগুলেশন নং–৮ অগ্রাহ্য করে প্রজাদের উপর নানাবিধ 'আবওয়াব' ধার্য করতে থাকে। এসব আবওয়াব ও নতুন নতুন উৎপীড়নমূলক কর জবরদস্তি করে আদায় করা হতো। তাছাড়া জমিদারেরা আবার প্রতিপত্তিশালী লোকদের কাছে তাদের জমিদারী অস্থায়ীভাবে উচ্চমূল্যে ইজারা দিত। ইজারাদারেরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উৎপীড়নের মাধ্যমে প্রজাদের কাছ থেকে উচ্চহারে খাজনা আদায় করতো। এসব উৎপীড়ন বন্ধের জন্যে টিপু প্রজাদেরকে সংগঠিত করেন।

এসব অভিযানকারী ফকীরদেরকে ইতিহাসে অনেকে লুন্ঠনকারী দস্যু বলে অভিহিত করেছেন। আসলে ব্যাপার তা নয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন জনগণের শ্রদ্ধেয় অলী–দরবেশ শ্রেণীর লোক।

সুসুজ পরগণার লেটারকান্দা গ্রামের এক প্রভাবশালী ফকীরের সন্তান ছিলেন টিপু পাগল। তিনি একজন কামেল দরবেশ ছিলেন বলে সকলে বিশ্বাস করতো। বহু অলৌকিক কাহিনী তাঁর সম্বন্ধে আজো প্রচলিত আছে এবং তাঁর মাজারে ওরস উপলক্ষে আজো বহু লোকের সমাগম হয় (খালেকদাদ চৌধুরী, শতাব্দী পরিক্রমা, পৃঃ ২৮–২৯)।

মানুষকে ধর্মকর্ম শিক্ষাদান করা এসব ফকীরের কাজ ছিল। কিন্তু জনসাধারণের চরম দুর্দশা দেখে তাঁদের অন্তরাত্মা কেঁদে উঠেছিল। তার ফলে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁরা মাঝে মাঝে অভিযান চালিয়েছেন।

এসব ফকীরের দল অসভ্য বর্বর ছিল—তাও নয়। তাঁরা ছিলেন শিক্ষিত ও রুচিবোধ সম্পন্ন। এমনকি টিপুর মাতার মধ্যেও ছিল অসাধারণ সাংগঠনিক যোগ্যতা। টিপু ও তাঁর বাহিনীকে প্রেরণা যোগাতেন টিপু জননী। ১৮২৫ সালে টিপুর নেতৃত্বে ফকীর দল জমিদারদের খাজনা বন্ধের আন্দোলন করে। জমিদারদের বরকন্দাজ বাহিনী ও ফকীরদের মধ্যে এক সংঘর্ষে বরকন্দাজ বাহিনী নির্মূল হয়ে যায়। জমিদারগণ কোম্পানীর শরণাপন্ন হয়। কোম্পানী টিপু ও তাঁর সহকারী গজনফর তুর্কশাহকে বন্দী করার জন্যে একটি সশস্ত্র সেনাবাহিনী পাঠায়। একটি সেনাদল পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় কিন্তু অপর একটি দল টিপুকে বন্দী করে। তুর্কশাহ তার দল নিয়ে কোম্পানীর সেই সেনাদলকে আক্রমণ করে টিপুকে মুক্ত করেন।

এ ঘটনার পর ম্যাজিস্টেট ডেম্পিয়ার একটি শক্তিশালী ও সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী নিয়ে শেরপুর আগমন করে। টিপু বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে টিপু তাঁর জননীসহ বন্দী হন।

পরবর্তীকালে ১৮৩৩ সালে টিপুর দু'জন শক্তিশালী সহকর্মীর নেতৃত্বে ফকীরদল পুনরায় সংঘবদ্ধ হয় এবং শেরপুর থানা আক্রমণ করে তা জ্বালিয়ে দেয়। তারপর ক্যাপ্টেন সীল ও লেফটন্যান্ট ইয়ংহাজবেন্ডের অধীনে একটি সেনাবাহিনী প্রেরিত হয় ফকীর বাহিনী দমন করার জন্যে। এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং এই সংঘর্ষে ফকীর বাহিনী পরাজিত ও ছত্রভংগ হয়ে যায়।

উপরে ফকীর বিদ্রোহের কিছু বিবরণ দেয়া হলো। তবে ফকীরদের সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা ইংরেজ লেখক ও ইতিহাসকারদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁদেরকে বেদুইন

বলেছেন, আর হান্টার সাহেব বলেছেন 'ডাকাত'। তাঁদের আক্রমণ অভিযানে কয়েক দশক পর্যন্ত নব প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশরাজ এখানে টলটলায়মান হয়ে পড়েছিল, সম্ভবতঃ সেই আক্রোশেই তাদের ইতিহাস বিকৃত করে রচনা করা হয়েছে। উপরে মজনু শাহ ও মাজু শাহ্‌কে দুই ভাই বলা হয়েছে। এর সত্যাসত্য যাচাই করার কোন ঐতিহাসিক তথ্য বা উপাদান আমাদের কাছে নেই। তবে কেউ কেউ বলেছেন মজনু শাহ্ ভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের মেওয়াত এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। কানপুরের চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত মাকানপুরে অবস্থিত শাহ্ মাদারের দরগায় মজনু শাহ্ বাস করতেন। সেখান থেকেই হাজার হাজার সশস্ত্র অনুচরসহ তিনি বাংলা বিহারের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ ও অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। তাঁর কার্যক্ষেত্র বিহারের পুর্ণিয়া অঞ্চল এবং বাংলার রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, রাজশাহী, মালদহ, পাবনা, ময়মনসিংহ ছিল বলে বলা হয়েছে।

১৭৭২ সালের প্রথমদিকে মজনু শাহ বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র অনুচরসহ উত্তর বংগে আবির্ভূত হন। তাঁর এ আবির্ভাবের কথা জানতে পারা যায় রাজশাহীর সুপারভাইজার কর্তৃক ১৭৭২ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে কোম্পানীর কাছে লিখিত এক পত্রে। তাতে বলা হয়, তিনশ' ফকীরের একটি দল আদায় করা খাজনার এক হাজার টাকা নিয়ে গেছে এবং আশংকা করা যাচ্ছে যে, তারা হয়তো পরগণা কাচারীই দখল করে বসবে। তলোয়ার, বর্শা, গাদাবন্দুক এবং হাউইবাজির হাতিয়ারে তারা সজ্জিত। কেউ কেউ বলে তাদের কাছে নাকি ঘূর্ণায়মান কামানও আছে। (স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আবু জাফর, পৃঃ ৩৩)।

১৭৭৬ সালে মজনু শাহ বগুড়া জেলার মহাস্থান আগমন করে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। সে সময় বগুড়া জেলার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মিঃ গ্লাডউইন। তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রাদেশিক কাউন্সিলের কাছে সৈন্য সাহায্য চেয়ে পাঠান। ১৭৮৬ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফকীর সর্দারকে (মজনু শাহ) ইংরেজদের বিরুদ্ধে পর পর দু'টো সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়। . . . উভয় ক্ষেত্রেই ফকীরদের পক্ষে যেমন কিছু লোক হতাহত হয়, ইংরেজদেরও অনুরূপভাবে কিছু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়। . . . ঐতিহাসিক তথ্য থেকে অনুমিত হয় যে, এরপর গঙ্গা পাড়ি দিয়ে মজনু শাহ দেশে চলে যান। আর কোন

দিন তাঁকে বাংলাদেশে দেখা যায়নি। আনুমানিক ১৭৮৭ সালে কানপুর জেলার মাখনপুর এলাকায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে সরকারী সূত্রে জানা যায়। তাঁর মৃতদেহ সেখান থেকে তাঁর জন্মভূমি মেওয়াতে নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয় (স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আবু জাফর, পৃঃ ৪০–৪১)।

মজনু শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র পরাগ আলী, পালিত পুত্র চেরাগ আলী, অন্তরঙ্গ ভক্ত মুসা শাহ, সোবহান শাহ, শমশের শাহ প্রমুখ শিষ্যগণ অষ্টাদশ শতকের শেষতক ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন।

নবম অধ্যায়

ফারায়েজী আন্দোলন

ইংরেজরা পলাশী ক্ষেত্রে যুদ্ধের অভিনয় করে কূট কলাকৌশলে সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে এবং ১৭৬৪ সালে মীর কাসেমকে পরাজিত করে বাংলা বিহার উড়িষ্যার শাসনদন্ড লাভ করেই ক্ষান্ত হলো না। বরঞ্চ মুসলমান জাতি নির্মূল করার নতুন ফন্দি ফিকির খুঁজতে লাগলো। তাদের অদম্য অর্থলিপ্সা প্রজাপীড়নে তাদেরকে উন্মত্ত করলো। মুসলমানদের আয়মা, লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হলো। মুসলমানদের হাত থেকে খাজনা আদায়ের ভার দেয়া হলো হিন্দুদের উপর। নতুন প্রভুকে তুষ্ট করার জন্যে তারা প্রজাদের উপরে শুরু করলো নির্মম শোষণ–পীড়ন। বিলাতী বস্ত্রের বাজার সৃষ্টির জন্যে তাঁতীদের নির্মূল করার (১৭৭০–১৮২৫) কাজ শুরু হলো। ১৭৬৬ সালে প্রতিমণ লবণের উপর দু'টাকা হারে কর ধার্য করে লবণ ব্যবসা ইউরোপীয়দের একচেটিয়া অধিকারে নেয়া হলো। এভাবে মুসলমানরা সকল অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হয়ে দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হতে লাগলো।

শুধু তাই নয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনেও মুসলমানরা বাধাগ্রস্ত হতে লাগলো। অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের এলাকায় গো–কুরবানী এবং আজান দেয়া নিষিদ্ধ হলো। হিন্দু জমিদারগণ মুসলমান প্রজাদের দাড়ির উপরে ট্যাক্স ধার্য করলো। তাদের পূজাপার্বণে মুসলমানদেরকে চাঁদা দিতে, পূজার যোগান ও বেগার দিতে বাধ্য করা হলো। মুসলমানদেরকে ধুতি পরতে ও দাড়ি কামিয়ে গোঁফ রাখতে বাধ্য করা হলো। মুসলমানদের ধর্ম, তাহজিব–তমদ্দুনকে ধ্বংস করে হিন্দুজাতির মধ্যে একাকার করে ফেলার এক সর্বনাশা পরিকল্পনা শুরু হলো। ধর্মপ্রাণ মুসলমান হয়ে উঠলো দিশেহারা। বাংলার মুসলমানদের এ চরম দুর্দিনের সময় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার বন্দর পরগণায় জন্মগ্রহণ করেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। আঠার বছর বয়সে তিনি হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। হজ্ব পালনের পর তিনি আঠার বছর সেখানেই অবস্থান করে ধর্ম, সমাজ বিজ্ঞান ও রাজনীতিতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা এবং ইসলামী

জীবনদর্শন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ সম্ভবতঃ তিনি এ সময়েই করেন। ইসলাম নিছক কতিপয় ক্রিয়া অনুষ্ঠানের সমষ্টিই নয়, বরঞ্চ এ হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামের পরিপূর্ণ অনুশাসন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পালন করে চলাও কিছুতেই সম্ভব নয় রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যতিরেকে। এ তত্ত্বজ্ঞানও তিনি লাভ করেন। অতঃপর ১৮২০ সালে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

মক্কায় অবস্থানকালে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের সাথেও তাঁর পরিচয় ঘটে এবং এ আন্দোলনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন।

দিল্লীতে শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভীর নেতৃত্বে ভারতভূমিতেও আবদুল ওহাব নজদীর অনুকরণে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়—ঐতিহাসিকগণ যার বিকৃত নাম দিয়েছেন 'ওহাবী আন্দোলন'। তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' বলে ঘোষণা করেন এবং 'দারুল হরব'কে 'দারুল ইসলাম' তথা একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার সক্রিয় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী, শাহ আবদুল আযীযের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ ইসমাইল ও জামাতা মাওলানা আবদুল হাই।

হাজী শরীয়তুল্লাহও এ দেশকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করেন এবং যতোদিন এ দেশ 'দারুল ইসলাম' না হয়েছে ততোদিন এখানে 'জুমা' ও ঈদের নামাজ সংগত নয় বলে ঘোষণা করেন। হিন্দুর পূজাপার্বণে কোন প্রকার আর্থিক অথবা দৈহিক সাহায্য-সহযোগিতা ইসলাম-বিরুদ্ধ (শিরক ও হারাম) বলে অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন, মুসলমানদেরকে ধুতি ছেড়ে তহবন্দ-পায়জামা পরিধান করতে হবে, দাড়ি রাখতে হবে এবং সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে তওবা করতে হবে। মোটকথা যাবতীয় পাপকাজ পরিত্যাগ করে নতুনভাবে ইসলামী জীবন যাপন করতে হবে।

শোষিত-বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত মুসলমান জনসাধারণ হাজী শরীয়তুল্লাহর আহবানে নতুন প্রাণসঞ্চরণ অনুভব করলো এবং দলে দলে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগলো। অল্প সময়ের মধ্যে দশ বারো হাজার মুসলমান তাঁর দলভুক্ত হলো। এটা হলো হিন্দু জমিদারদের পক্ষে এক মহাআতংকের ব্যাপার। এখন মুসলমান নিষ্পেষণ বন্ধ হয়ে যাবে এবং যেসব নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র মুসলমানদেরকে তারা তাদের দাসানুদাসে পরিণত করে ইসলাম ধর্ম থেকেও

দূরে নিক্ষেপ করেছে, তারাও তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। অতএব, তাদের উদ্বিগ্ন ও আতংকিত হয়ে উঠারই কথা। "The Zaminders were alarmed at the spread of the new creed which bound the Mussalman peasantry together as one man"— (Dr. James Wise; Journal of Asiatic Society of Bengal. Vol. LXIII, 1894 No, 1)।

হাজী শরীয়তুল্লাকে দমন করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ ও বদ্ধপরিকর হলো হিন্দু জমিদারগণ। তাঁদের দলে যোগদান করলো কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী আধা-মুসলমান যারা ছিল হিন্দু জমিদারদের দাসানুদাস। অদূরদর্শী মোল্লা-মৌলভী ও পীর, যারা মুসলমানদের মধ্যে শিরক বিদয়াত প্রভৃতি কুসংস্কারের নামে দু'পয়সা কামাই করছিল, তারাও ফারায়েজী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো।

একদিকে ব্রিটিশ এবং অপরদিকে অত্যাচারী হিন্দু জমিদার মহাজনদের উপর্যুপরি অত্যাচার-নিষ্পেষণে মুসলমানরা অনন্যোপায় হয়ে মাথানত করে সবকিছু সহ্য করে যাচ্ছিল। শরীয়তুল্লাহর আহবানে নিপীড়িত মুসলমানগণ দলে দলে তাঁর কাছে এসে জমায়েত হতে লাগলো এবং ব্রিটিশ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করলো। সম্ভবতঃ 'ফরয' শব্দ থেকে ফারায়েজী (ফারায়েযী) আন্দোলনের উৎপত্তি। মুসলমান সমাজ ইসলামের ফরয কাজগুলি ভুলতে বসেছিল এবং বহু অনৈসলামী আচার-অনুষ্ঠানকে মুসলমান সমাজে প্রচলিত করেছিল। যাবতীয় ইসলাম বিরোধী রীতিনীতি পরিত্যাগ করে নবী মুহাম্মদের (সা) প্রতিষ্ঠিত ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল আরবের মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী, সাইয়েদ আহমদ শহীদ, হাজী শরীয়তুল্লাহ, সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তীতুমীর প্রমুখ মনীষীদের আন্দোলনের মুখ্যউদ্দেশ্য।

হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলনে হিন্দুস্বার্থে চরম আঘাত লেগেছিল বলে তারা ইংরেজ শাসকদের সহায়তায় তাঁকে দমন করতে সকল শক্তি প্রয়োগ করলো। তৎকালীন হিন্দু সমাজের মনোভাব হাজী শরীয়তুল্লাহর প্রতি কতখানি বিদ্বেষাত্মক ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৩৭ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত একখানি পত্রে। পত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

ইদানিং জেলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুরপুর গ্রামে সরিতুল্লা নামক একজন বাদশাহী লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক বার হাজার

জোলা ও মুসলমান দলবদ্ধ করিয়া নতুন এক শরা জারি করিয়া নিজ মতাবলম্বী লোকদিগের মুখে দাড়ি, কাছা খোলা, কটিদেশে ধর্মের রজ্জুচ্ছেদ করিয়া তত্তত্ত্বর্দিগস্থ হিন্দুদিগের বাটি চড়াও হইয়া দেবদেবী পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইচ্ছে—এই জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মতলবগঞ্জ থানার রাজনগর নিবাসী দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোড়াগাছা গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাটিতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্বস্ব হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভষ্মরাশি করিলে একজন যবন মৃত হইয়া ঢাকায় দওরায় অর্পিত হইয়াছে। ... আর শ্রুত হওয়া গেল, সরিতুল্লার দলভুক্ত দুষ্ট যবনেরা ঐ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিণী চরণ মজুমদারের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাহার বাটিতে দেব-দেবী পূজায় আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার বাবু যবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুমতি বোধ করিয়া—ঐ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুজুরে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্বক কয়েকজন যবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। হে সম্পাদক মহাশয়, দুষ্ট যবনেরা মফঃস্বলে এ সকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচারগৃহে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুত হওয়া গেল, ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুজুরে যে সকল আমলা ও মোক্তার-কারেরা নিযুক্ত আছে, তাহারা সকলেই সরিতুল্লা যবনের মতাবলম্বী—তাহাদের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয়, তবে কেহ ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষী হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে সুতরাং ১২০০০ লোক দলবদ্ধ। ইহাতে ফরিয়াদীর সাক্ষীর ত্রুটি কি আছে... আমি বোধ করি, সরিতুল্লা যবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর উত্তর প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দুধর্ম লোপ পাইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লার চোটপাটের শত অংশের এক অংশ তিতুমীর করিয়াছিল না। ইতি সন ১২৪৩ সাল, তারিখ ২৪শে চৈত্র।" ("সংবাদপত্রে সেকালের কথা"-ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত—শতাব্দী পরিক্রমা, পৃঃ ১৯৪-৯৫)।

পত্রখানির প্রতিটি ছত্রে মুসলমানদের প্রতি হিন্দু সমাজের মানসিকতা পরিস্ফুট হয়েছে।

হাজী শরীয়তুল্লাহ সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে বাংলাদেশ থেকে বহু মুজাহিদ, যাকাত, ফেৎরা, লিল্লাহ থেকে সংগৃহীত বহু অর্থ এবং নানা প্রকার সাহায্য পশ্চিম ভারতের সিত্তানা কেন্দ্রে পাঠাতেন।

ঢাকা জেলার নয়াবাড়ী নামক স্থানে প্রথমে শরীয়তুল্লাহর নতুন কর্মক্ষেত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু হিন্দু জমিদারদের চরম বিরোধিতার ফলে তাঁকে আপন গ্রামে ফিরে গিয়ে তাঁর প্রচারকার্য শুরু করতে হয়। তাঁর আন্দোলন ঢাকা, বরিশাল, নদিয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় বিস্তার লাভ করে। নিরক্ষর, চাষী, তাঁতী ও অন্যান্য সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে নামাজ-রোজার প্রচলন, ধুতির পরিবর্তে তহবন্দ-টুপির ব্যবহার, মসজিদগুলির সংস্কার প্রভৃতি কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকে। হাজী শরীয়তুল্লাহ নিজে মাথায় প্রকান্ড পাগড়ী ও গায়ে জামার উপরে ছদরিয়া পরতেন—যে পোশাক সাধারণতঃ কোন মুসলমান ব্যবহার করতো না। ১৮৪০ সালে তিনি পরলোক গমন করার পর তাঁর যোগ্য পুত্র দুদু মিয়া তাঁর আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ মুহসীন ওরফে দুদু মিয়া ১৮১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩১ সালে তিনি হজ্ব পালনের জন্যে মক্কা গমন করে পাঁচ বৎসর অবস্থান করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পর পিতার কাজে সাহায্য করেন।

পিতার ন্যায় দুদু মিয়াও অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। জমিদারদের সংগে তাঁকে বার বার সংঘর্ষে আসতে হয়। ১৮৪২ সালে তিনি ফরিদপুরের জমিদার বাড়ী আক্রমণ করেন এবং মদন নারায়ণ ঘোষকে বন্দী ও পরে হত্যা করেন। পুলিশ তাঁকেসহ ১১৭জন ফারায়েজীকে গ্রেফতার করে। বিচারে ২২ জনের কারাদন্ড হয়। কিন্তু দুদু মিয়াকে প্রমাণের অভাবে খালাস দেয়া হয়। ১৮৪৬ সালে এনড্রিও এন্ডারসন এর গোমস্তা কালি প্রসাদ মনিবের আদেশে সাত আটশ' লোক নিয়ে দুদু মিয়ার বাড়ী চড়াও করে এবং প্রায় দেড় লক্ষ মূল্যের অলংকারাদিসহ বহু ধনসম্পদ লুন্ঠন করে নিয়ে যায়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়েও কোন ফল হয় না।

জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হয়ে কোন সুবিচার না পেয়ে দুদু মিয়া এবার নিজ হাতে শত্রুদের উচিত শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। ১৮৪৬ সালের নভেম্বর মাসে, তাঁর গৃহ লুণ্ঠিত হওয়ার একমাস পরে, তিনি

শত্রুদের অত্যাচার-উৎপীড়নে ইন্ধন সংযোগকারী নীলকর ডানলপের কারখানা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে দেন এবং গোমস্তা কালী প্রসাদকে হত্যা করেন। দুই বৎসর পর্যন্ত মামলা চলার পর দুদু মিয়া তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান।

জনসাধারণের মধ্যে দুদু মিয়ার অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে সরকার বিব্রত হয়ে পড়েন। ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলন চলাকালে দুদু মিয়া উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারেন এই অজুহাতে তাঁকে কারাগারে আটক করে রাখা হয়। প্রথমে আলীপুরে এবং পরে তাঁকে ফরিদপুর জেলে রাখা হয়। ১৮৫৯ সালে মুক্তিলাভ করে তিনি ঢাকায় আসেন এবং এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দুদু মিয়া পিতার আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করেছিলেন বটে। কিন্তু নীতির দিক দিয়ে তিনি পিতার আদর্শের কিছুটা পরিবর্তন করেছিলেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ যে ছয়টি বিষয়ের উপরে তাঁর আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তা হচ্ছে—

- মুসলমান শাসিত দেশ ব্যতীত অন্য কোথাও জুমা ও ঈদের নামায বৈধ নয়;
- মহররমের পর্ব ও অনুষ্ঠান পালন ইসলাম বিরুদ্ধ এবং পাপকার্য;
- 'পীর' ও 'মুরীদ' পরিভাষাদ্বয়ের স্থলে 'উস্তাদ' ও 'শাগরেদ' পরিভাষাদ্বয়ের ব্যবহার। কারণ 'মুরীদ' তার যথাসর্বস্ব 'পীরের' কাছে সমর্পণ করে যা ঠিক নয়। পক্ষান্তরে 'শাগরেদকে' তা করতে হয় না।
- এ আন্দোলনে যারাই যোগদান করবে তাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ, 'আশরাফ'-'আতরাফ'— কোন ভেদাভেদ থাকবে না। বরঞ্চ সকলের মধ্যে সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠিতহবে—'পীরি-মুরীদির' মধ্যে যার অভাব দেখা যায়।
- পীরপূজা ও কবরপূজা ইসলাম বিগর্হিত বলে এসবের তীব্র প্রতিবাদ জানান।
- তৎকালে পীরের হাতে হাত রেখে 'বয়আত' করার যে প্রথা প্রচলিত ছিল, তার পরিবর্তে 'ফারায়েজী' আন্দোলনে যোগদানকারী শুধুমাত্র সকল পাপ কাজ থেকে খাঁটি দিলে 'তওবা' করে পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন যাপন করার শপথ গ্রহণ করবে।
- ধাত্রীকর্তৃক নব প্রসূত সন্তানের নাড়িকর্তনকেও ইসলাম বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, এ কাজ পিতার, বেগানা ধাত্রীর নয়।

জেমস টেইলার বলেন যে, কোরআনকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই

ফারায়েজী আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং কোরআন যেসব অনুষ্ঠানাদি সমর্থন করে না তা সবই বর্জনীয়। মহররমের অনুষ্ঠান পালনই শুধু নিষিদ্ধ নয়, এ অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ দেখাও নিষিদ্ধ। (Dr. A. R. Mallick : British Policy & the Muslims in Bengal. p. 69)।

হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর আন্দোলনকে জোরদার করার জন্যে দুদু মিয়া সমগ্র পূর্ববাংলা কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক এলাকায় একজন করে খলিফা নিযুক্ত করেন যাদের কাজ ছিল আন্দোলনের দিকে মানুষকে আহবান করা, কর্মী সংগ্রহ করা ও সংগঠন পরিচালনার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করা। এভাবে যে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী হলো তার মাথায়, দুদু মিয়া, 'পীর' রূপে বিরাজমান হলেন যে পীরপ্রথাকে তাঁর পিতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXIII, pt. II, No. 1, 1894, p. 50; Encylopaedia of Islam, Vol. II. p-58)।

হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবদ্দশায় যে আন্দোলন পরিচালিত ছিল, তা ছিল মুখ্যতঃ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। অত্যাচারী জমিদারদের প্ররোচনায় দু'একটি সংঘর্ষ ব্যতীত কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে, তাঁর আন্দোলনের সংঘর্ষ হয়নি। কিন্তু দুদু মিয়ার সময়ে আন্দোলন অনেকটা রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। সকল জমিদার ও নীলকরগণ তাঁর আন্দোলনের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়। তাই দুদু মিয়ার সারা জীবন তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই কেটে গেছে। একদিকে গরীব প্রজাদের উপর জমিদার-নীলকরদের নানাপ্রকার উৎপীড়ন এবং তাদের দুঃখ মোচনে দুদু মিয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তাদেরকে দুদু মিয়ার নেতৃত্বে একতাবদ্ধ করে। দুদু মিয়ার সাংগঠনিক যোগ্যতাও ছিল অসাধারণ। বাংলার জমিদারগণ ছিল প্রায়ই হিন্দু এবং নীলকরগণ ছিল ইংরেজ খৃষ্টান ও তাদের গোমস্তা কর্মচারী ছিল সবই হিন্দু। এ কারণেও কৃষক প্রজাগণ জমিদার-নীলকরদের বিরুদ্ধে দুদু মিয়ার নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়েছিল। দুদু মিয়াকে সারা জীবন জমিদার-নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেই কেটে গেছে। নিত্য নতুন মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমায় তাঁকে জড়িত করা হয়। এসবের জন্যে তাঁকে শেষ পর্যন্ত দারিদ্র্য বরণ করতে হয়।

দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র যথাক্রমে গিয়াসউদ্দীন হায়দার ও নয়া মিয়া ফারায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। নয়া মিয়ার মৃত্যুর পর দুদু মিয়ার তৃতীয় পুত্র আলাদীন আহমদ আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি ১৯০৫ সালের বংগভংগ সমর্থনে নওয়াব সলিমুল্লাহর সাথে সহযোগিতা করেন। আলাদীনের পর তাঁর পুত্র বাদশাহ মিয়া আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯২২ সালে তিনি খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন এবং এ সময়ে সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। তারপর ফারায়েজী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। যে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন নিয়ে এ আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল এবং হাজী শরীয়তুল্লাহ যে জেহাদী প্রেরণা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন তা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে ক্রমশঃ অন্য ধারায় প্রবাহিত হয়। যে পীর-মুরীদি হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনকে খাঁটি ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন, অবশেষে এ আন্দোলন সেই পীর-মুরীদিতেই রূপান্তরিত হয়ে গেল। ফলে এ আন্দোলনের মতাবলম্বীদের কার্যকলাপ ও কর্মপদ্ধতি থেকে পূর্বের সে জেহাদী প্রেরণা ও সংগ্রামী মনোভাব বিদায় গ্রহণ করলো।

দশম অধ্যায়

শহীদ তিতুমীর

শহীদ তিতুমীর সমসাময়িক একজন অতীব মজলুম ব্যক্তি। তিনিও হাজী শরীয়তুল্লাহর মতো অধঃপতিত মুসলমান সমাজে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর এ নিছক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে হিন্দু জমিদারগণ শুধু প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করেনি, ইসলাম ধর্ম এবং মুসলমান জাতির প্রতি তাদের অন্ধ বিদ্বেষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অতীব পরিতাপের বিষয় সমসাময়িক ইতিহাসে তিতুমীরের চরিত্র অত্যন্ত বিকৃত করে দেখানো হয়েছে। তার কারণও অতি সুস্পষ্ট। বিদ্বেষপুষ্ট হিন্দুদের দ্বারা বর্ণিত বিবরণকে ভিত্তি করে ইংরেজ লেখকগণ তাঁর সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন, তা বিকৃত, কল্পনাপ্রসূত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিতুমীরের ন্যায় একজন নির্মল চরিত্রের খোদাপ্রেমিক মনীষীকে একজন দুশ্চরিত্র, দুর্বৃত্ত ও ডাকাত বলে অভিহিত করা হয়েছে। ডাঃ এ আর মল্লিক তাঁর British Policy & the Muslims in Bengal গ্রন্থের ৭৬ পৃষ্ঠায় Calcutta Review, Boards Collections, 54222, p-401, Colvin to Barwell, 8 March 1832 Para 6, Magistrate of Baraset to Commissioner of Circuit, 18 Div. 28 November, 1831, para 35 প্রভৃতির বরাত দিয়ে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেছেন। বলা হয়েছে যে, তিতুমীর কোন উল্লেখযোগ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি, তবে মুন্সী আমীর নামক জনৈক সম্রান্ত জোতদারের পরিবারে বিয়ে করেন। আরও বলা হয়েছে যে, তিতুমীর একজন দুশ্চরিত্র দুর্বৃত্ত বলে পরিচিত ছিলেন এবং নদিয়ার জনৈক হিন্দু জমিদারের অধীনে ভাড়াটিয়া গুন্ডা হিসাবে চাকুরী করেন। এ উক্তিগুলি সম্পূর্ণ সত্যের অপলাপ ব্যতীত কিছু নয়। এসব বিবরণ থেকে অথবা ইসলাম বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে হান্টার সাহেবও মন্তব্য করেন, "এ সময় কোলকাতায় ধর্মীয় নেতার যেসব শিষ্য-শাগরেদ ও অনুসারী ছিল, তাদের মধ্যে পেশাদার কুস্তিগীর ও গুন্ডা প্রকৃতির একটা লোক ছিল তিতুমিয়া নামে। এই ব্যক্তি এক সম্রান্ত কৃষকের পুত্র হিসাবে জীবন আরম্ভ করলেও জমিদারের ঘরে বিয়ে করে নিজের অবস্থার উন্নতি করেছিল। কিন্তু উগ্র

ও দুর্দান্ত চরিত্রের দরুন তার সে অবস্থা বহাল থাকেনি।" (W. W. Hunter : The Indian Mussalmans, B. D. First Edition, 1975, pp. 34-35)।

ইংরেজ খৃষ্টান হান্টার সাহেব মুসলিম জগতের চিরস্মরণীয় ও বরেণ্য মনীষী সাইয়েদ আহমদ শহীদ সম্পর্কেও জঘন্য উক্তি করেছেন। যথাস্থানে তার আলোচনা করা হবে। যতোটা নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি শহীদ তিতুমীর সম্পর্কে জানা গেছে, তারই ভিত্তিতেই তাঁর আন্দোলন ও কার্যতৎপরতার আলোচনা আমরা করব। তার ফলে আশা করি, এটাই প্রমাণিত হবে যে, তাঁর শিক্ষা, চরিত্র, খোদাপ্রেম, অসত্য ও অন্যায়–অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামী মনোভাবের সাথে উপরের কল্পিত বর্ণনার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই।

পলাশী যুদ্ধের পঁচিশ বছর পর এবং উনবিংশ শতকের পঞ্চম দশকের সমগ্র ভারতব্যাপী আযাদী সংগ্রামের (১৮৫৭) পঁচাত্তর বছর পূর্বে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মীর (সাইয়েদ) হাসান আলী এবং মাতার নাম আবেদা রোকাইয়া খাতুন। (শহীদ তিতুমীর, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ১)।

ইংরেজ ইতিহাস লেখকগণ অবজ্ঞাভরে এবং তিতুমীরকে ছোটো করে দেখাবার জন্যে তাঁকে এক অনুল্লেখযোগ্য কৃষক পরিবার সম্ভূত বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রখ্যাত সাইয়েদ বংশে জন্মলাভ করেন। প্রাচীনকালে যে সকল অলী–দরবেশ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করেন তাঁদের মধ্যে সাইয়েদ শাহ হাসান রাজী ও সাইয়েদ শাহ জালাল রাজীর নাম পুরাতন দলিল দস্তাবেজে পাওয়া যায়। দুই সহোদর ভাই সাইয়েদ শাহ আব্বাস আলী ও সাইয়েদ শাহ শাহাদত আলী যথাক্রমে সাইয়েদ শাহ জালাল রাজী ও সাইয়েদ শাহ হাসান রাজীর মুরীদ ও খলিফা ছিলেন। সাইয়েদ শাহাদত আলীর পুত্র সাইয়েদ শাহ হাশমত আলীর ত্রিংশ অধস্তন পুরুষে জন্মগ্রহণ করেন মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। (শহীদ তিতুমীর, আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৩–৪)।

তিতুমীর বিয়ে করেন তৎকালীন খ্যাতনামা দরবেশ শাহ সূফী মুহাম্মদ আসমতউল্লা সিদ্দিকীর পৌত্রী এবং শাহ সূফী মুহাম্মদ রহীমুল্লাহ সিদ্দিকীর কন্যা মায়মুনা খাতুন সিদ্দিকাকে। (ঐ ... পৃঃ১৬)।

আবু জাফর বলেন, মীর নিসার আলীর পিতার নাম মীর হাসান আলী এবং মাতার নাম আবেদা রোকাইয়া খাতুন। ... তিতুমীর বিয়ে করেন হযরত শাহ সূফী মুহাম্মদ রহীমুল্লা সিদ্দিকীর কন্যা মায়মুনা সিদ্দিকাকে। বিয়ের চৌদ্দ দিন পরে তাঁর ছোটো দাদা সাইয়েদ ওমর দারাজ রাজী প্রাণত্যাগ করেন। এর ছয় মাস পর তাঁর পিতা মীর হাসান আলীর মৃত্যু হয়। (স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আবু জাফর, পৃঃ ১১৭–১৮)। নিসার আলীর জন্মের আগেই তাঁর আপন দাদা সাইয়েদ শাহ কদমরসুল দেহত্যাগ করেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহ ওমর দারাজ রাজীর হাতেই মুরীদ হন নিসার আলীর পিতা মীর হাসান আলী।

এসব তথ্য থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর এক অতি উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর ও তাঁকে একজন উচ্ছৃংখল দুষ্টপ্রকৃতির যুবক এবং জনৈক হিন্দু জমিদারের গুন্ডাবাহিনীর বেতনভুক সদস্য বলে চিত্রিত করা হয়েছে। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও চরিত্রগঠন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনায় তাঁর সম্পর্কে উপরের মন্তব্য ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হবে।

তৎকালীন মুসলিম সমাজের সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নিসার আলীর বয়স যখন চার বছর চার মাস চার দিন, তখন তাঁর পিতামাতা পুত্রের হাতে তখ্‌তী দিয়ে তার বিদ্যাশিক্ষার সূচনা করেন। তারপর সেকালের শ্রেষ্ঠ উস্তাদ মুন্সী লালমিয়াকে নিসার আলীর আরবী, ফার্সী ও উর্দুভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্যে নিযুক্ত করা হয়। মাতৃভাষা বাংলাভাষা শিক্ষার প্রতিও তাঁর পিতামাতা উদাসীন ছিলেন না মোটেই। সেজন্যে পার্শ্ববর্তী শেরপুর গ্রামের পন্ডিত রামকমল ভট্টাচার্যকে বাংলা, ধারাপাত, অংক ইত্যাদি শিক্ষার জন্যে নিযুক্ত করা হয়। এ সময়ে বিহার শরীফ থেকে হাফেজ নিয়ামতুল্লা নামে জনৈক পারদর্শী শিক্ষাবিদ চাঁদপুর গ্রামে আগমন করলে, গ্রামের অভিভাবকগণ তাঁকে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। আঠার বছর বয়সে নিসার আলী শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং তিনি কোরআনের হাফেজ হন। উপরন্তু আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র, ফারায়েজ শাস্ত্র, হাদীস ও দর্শনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, তাসাওউফ, এবং আরবী–ফার্সী কাব্য ও সাহিত্যে বিশেষ পান্ডিত্য লাভ করেন। তিনি আরবী, ফার্সী ও বাংলা ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন।

যে যুগে তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন, বাংলার কিশোর ও যুবকরা তখন নিয়মিত শরীরচর্চা করতো। চাঁদপুর ও হায়দারপুর গ্রামের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা প্রাঙ্গণটি ছিল শরীরচর্চার আখড়া। হায়দারপুর নিবাসী শেখ মুহাম্মদ হানিফ শরীরচর্চা শিক্ষাদিতেন।এ শরীরচর্চার আখড়ায় শিক্ষা দেয়া হতো ডনকুস্তী, হাডুডু খেলা, লাঠি খেলা, ঢালশড়কী খেলা, তরবারী ভাঁজা, তীর গুলতী, বাঁশের বন্দুক চালনা প্রভৃতি। হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ শুধু আরবী-ফার্সী অথবা কোরআন হাদীসেরই উস্তাদ ছিলেন না, তিনি মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে নানাবিধ খেলার কসরতও শিক্ষা দিতে থাকেন। প্রত্যহ বৈঠকে ও সন্ধ্যারাত্রিতে তিনি শরীরচর্চার ও অস্ত্রচালনার নানা প্রকার কৌশল শিক্ষা দিতে থাকেন। এ আখড়ার সর্দার ছাত্র হলেন দু'জন— শেখ মুহাম্মদ হানিফ ও সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।

সম্ভবতঃ বিংশ শতকের প্রথম দশকেই তাঁর বিয়ে হয়। তার বছর দেড়েক পর তিনি উস্তাদ হাফিজ নিয়ামত উল্লাহর সাথে কোলকাতা এবং তালিবটোলায় (বর্তমান নাম তালতলা) হাফেজ মুহাম্মদ ইসরাইলের বাসায় অবস্থান করতে থাকেন। হাফেজ ইসরাইলও ছিলেন বিহার শরীফের অধিবাসী। তিনি তালতলা জামে মসজিদের পেশ ইমাম নিযুক্ত হন—এখানেই বিয়ে করে কোলকাতাবাসী হয়ে যান। তালিবটোলা বা তালতলার একটি অংশকে তখন মিসরীগঞ্জ বলা হতো। এখানে কুস্তী প্রতিযোগিতার একটি আখড়া বা কেন্দ্র ছিল যার সভাপতি ছিলেন জামালউদ্দীন আফেন্দী। সে যুগে পেশাদারী কুস্তী প্রতিযোগিতার প্রচলন হয়নি। ধনবান ব্যক্তিগণ শারীরিক শক্তি ও বীরত্ব অর্জনে প্রেরণা দানের জন্যে বিজয়ী ব্যক্তিকে পুরস্কার ও খেলাৎ দান করতেন এবং পরাজিত ব্যক্তিকে শুধু পুরস্কার দিতেন। কুস্তীগিরি করে ধনউপার্জন করতে হবে, এ ধরনের মনোভাব তখন পালোয়ানদের মনে স্থান পায় নি।

তিতুমিয়ার কোলকাতা অবস্থানকালে মিসরীগঞ্জ আখড়ায় কুস্তী প্রতিযোগিতা হতো এবং বিজয়ী পালোয়ানকে প্রচুর এনাম দেয়া হতো। এখানে কুস্তী প্রতিযোগিতায় তিতুমীর বেশ সুনাম অর্জন করেন। হাফিজ নিয়ামতউল্লাহ ও হাফিজ মুহাম্মদ ইসরাইল কুস্তী প্রতিযোগিতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

কুস্তীখেলার আর একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি হলেন মীর্জা গোলাম আম্বিয়া। তাঁর কিঞ্চিৎ পরিচয় দান এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। তিনি ছিলেন শাহী

খান্দানের লোক এবং ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি ছিলেন জমিদার এবং নিঃসন্তান ছিলেন বলে জমিদারীর যা আয় হতো তার অধিকাংশই সৎকাজে ব্যয় করতেন।

কোলকাতা শহরের ভারত বিভাগপূর্ব কালের মীর্জাপুর আমহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চলে তাঁর জমিদার বাড়ী অবস্থিত ছিল। তাঁর বাড়ীর নাম ছিল মীর্জা মঞ্জিল। তাঁর নামানুসারে মীর্জাপুর স্ট্রীট নামকরণ করা হয়। মীর্জা মঞ্জিলের দক্ষিণে ছিল মীর্জা তালাব ও মীর্জাবাগ। এই মীর্জাবাগ পরে মীর্জাপুর পার্ক নামে অভিহিত হয়। যেখানে তাঁর বৈঠকখানা অবস্থিত ছিল, সেটাকে পরে বৈঠকখানা রোড নাম দেওয়া হয়। মীর্জা সাহেব সর্বদা এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে মীর্জাপুর ও বৈঠকখানা রোডের জমি, মীর্জা তালাব, মীর্জাবাগ প্রভৃতি কোলকাতা মিউনিসিপালটিকে দান করে এবং বাড়ীঘর ও অন্যান্য বিষয়সম্পত্তি বিক্রী করে মক্কায় হিজরত করেন। যে মীর্জা তালাব ও মীর্জাবাগ ব্রিটিশ রাজত্বের প্রায় শেষ অবধি মীর্জাপুর পার্ক নামে অভিহিত ও সুপরিচিত ছিল, বিংশতি শতাব্দীর তিনের দশকে তার নাম দেয়া হয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। এ অধিকার ন্যায়তঃ মিউনিসিপালিটি ছিল না। মীর্জাপুর পার্কে বিশ-পঁচিশ হাজার বিক্ষুব্ধ মুসলমান সমবেত হয়ে এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

উক্ত মীর্জা গোলাম আম্বিয়ার সান্নিধ্যে আসার পর মীর নিসার আলীর একজন কামেল মুর্শিদের হাতে বয়আত করার প্রবল আগ্রহ জাগে। অতঃপর জাকী শাহ নামক জনৈক দরবেশ কোলকাতার তালিবটোলায় আগমন করলে নিসার আলী তাঁর দরবারে হাজির হয়ে মুরীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। শাহ সাহেব তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন, "বায়তুল্লাহ শরীফের জিয়ারত না করলে তুমি নিযুক্ত পীরের সন্ধান পাবে না।"

প্রকৃত মুর্শিদ প্রাপ্তির আশায় অবশেষে মীর নিসার আলী মক্কা গমন করেন এবং সেখানেই সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এখানেই মীর নিসার আলী তাঁর হাতে বয়আত করে মুরীদ হন।

হজ্জ্ব ও অন্যান্য ক্রিয়াদি সমাপনান্তে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী তাঁর খলিফা মওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাইল ও মওলানা ইসহাককে নিম্নরূপ নির্দেশ দেনঃ-

"তোমরা আপন আপন বাড়ী পৌছে দিন পনেরো বিশ্রাম নিবে। তারপর তোমরা বেরেলী পৌছুলে তোমাদের নিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান সফর করব। পাটনায় কয়েকদিন বিশ্রামের পর কোলকাতা যাব।

বাংলাদেশের খলিফাগণের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল নিম্নরূপ :-

আমি পাটনায় পৌছে মওলানা আবদুল বারী খাঁ (মওলানা আকরাম খাঁর পিতা), মওলানা মুহাম্মদ হোসেন, মওলানা হাজী শরীয়তুল্লাহ, মওলানা সাইয়েদ নিসার আলী (তিতুমীর), মওলানা সুফী খোদাদাদ সিদ্দিকী ও মওলানা কারামত আলীকে খবর দিব। আমার কোলকাতা পৌছার দিন তারিখ তোমরা তাদের কাছে জানতে পারবে। কোলকাতায় আমাদের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে তাতে আমাদের চূড়ান্ত কর্মসূচী গৃহীত হবে।

অতঃপর সকলে মক্কা থেকে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা কোলকাতার শামসুন্নিসা খানমের বাগানবাড়ীতে সমবেত হন। আলোচনার পর স্থিরীকৃত হয় যে পাটনা মুজাহিদগণের কেন্দ্রীয় রাজধানী হবে এবং প্রত্যেক প্রদেশে হবে প্রাদেশিক রাজধানী। প্রাদেশিক রাজধানী থেকে কেন্দ্রে জিহাদ পরিচালনার অর্থ প্রেরণ করা হবে।

এসব সিদ্ধান্তের পর মওলানা সাইয়েদ নিসার আলী (তিতুমীর) উক্ত বৈঠকে যে ভাষণ দান করেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন—

বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদেরকে খাঁটি মুসলমান না করা পর্যন্ত তাদেরকে জেহাদে পাঠানো বিপজ্জনক হবে। আমি তাদের মধ্যে ইসলামী দাওয়াত পৌছাবার দায়িত্ব নিচ্ছি। শুধু তাই নয়, আমি মনে করি, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও আমাদের সংগ্রামে যোগদান করতে পারে।... কারণ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ জাতির উপর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা সন্তুষ্ট নয়। আমরা যদি মুসলমানদেরকে পাকা মুসলমান বানিয়ে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি তাহলে ... কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে কেন্দ্রকে সাহায্য করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হবে না।

পরামর্শ সভায় অতঃপর স্থির হলো, বাংলা কেন্দ্রকে অপর সকল বিষয়ে গোপনে সাহায্য করবে। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে জেহাদে অংশগ্রহণ করবে না। তবে যাঁরা কেন্দ্রের সাথে যোগদান করার ইচ্ছা করবে, তাদেরকে বাধা দেয়া হবে না। (শহীদ তিতুমীর, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ২২-৩৭)।

তারপর সাইয়েদ নিসার আলী তাঁর কর্মতৎপরতা শুরু করেন যার বিস্তারিত আলোচনা আমরা নিম্নে করতে চাই। তাঁর শিক্ষাজীবন থেকে আরম্ভ করে কোলকাতার জীবন, পীরের সন্ধানে ভ্রমণ, হজ্জপালন, সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর শিষ্যত্ব লাভ প্রভৃতি কার্যক্রমের বিবরণ উপরে দেয়া হলো। তিনি যে কখনো কোন হিন্দু জমিদারের গুন্ডাবাহিনীতে ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল হিসাবে কাজ করেছেন, এ কথা একেবারে অমূলক ও ভিত্তিহীন। তাঁর মহান আদর্শ, চরিত্র ও মহত্বকে বিকৃত করে তাঁকে লোকচক্ষে হেয় ও ঘৃণিত করবার এ এক পরিকল্পিত অপপ্রয়াস।

তিতুমীর তাঁর উপরোক্ত ভাষণে বলেছিলেন, "বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান বড়োই দুর্বল হয়ে পড়েছে।" তাঁর আন্দোলন তৎপরতা আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা দরকার মুসলমানদের ঈমান কতখানি দুর্বল ছিল এবং কি পরিবেশে তিনি তাঁর ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন। বাংলার হিন্দুজাতি ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্র করে এবং আপন মাতৃভূমির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদেরকে শুধু রাজ্যচ্যুতই করেনি, জীবিকা অর্জনের সকল পথ রুদ্ধ করেছে এবং একজন মুসলমানের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বল ঈমানটুকুও নষ্ট করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। মুসলমানদেরকে নামে মাত্র মুসলমান রেখে ঈমান, ইসলামী জীবন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি থেকে দূরে নিক্ষেপ করে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু অপেক্ষাও এক নিকৃষ্ট জীবে পরিণত করে তাদেরকে দাসানুদাসে পরিণত করতে চেয়েছিল।

মুসলমান জাতি অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে কতখানি অধঃপতনে নেমে গিয়েছিল তার আলোচনা আমরা পূর্ববর্তী 'মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, শীর্ষক অধ্যায়ে করেছি। তিতুমীরের সময়ে সে অবস্থার কতখানি অবনতি ঘটেছিল, তারও কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি।

বাংলার নতুন হিন্দু জমিদারগণ হয়ে পড়েছিল ইংরেজদের বড়োই প্রিয়পাত্র। একদিকে তাদেরকে সকল দিক দিয়ে তুষ্ট রাখা এবং মুসলমানদিগকে দাবিয়ে রাখার উপরেই এ দেশে তাদের কায়েমী শাসন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের উপর হিন্দু জমিদারগণ ন্যায় অন্যায় আদেশ জারী করার সাহস পেতো।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদেরকে যেমন ব্রাহ্মণেরা ধর্মকর্মের স্বাধীনতা ও মন্দিরে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছিল, অনুরূপভাবে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা মুসলমানদের মধ্যেও একদল লোককে মুসলমান ব্রাহ্মণরূপে দাঁড় করিয়ে মুসলমান জনসাধারণকে ইসলামের আলোক থেকে বঞ্চিত করলো।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী তাঁর গ্রন্থে বলেন :—

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জমিদার ও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিরক্ষর মুসলমানদেরকে বুঝাইল : তোরা গরীব। কৃষিকার্য ও দিনমজুরী না করলে তোদের সংসার চলে না। এমতাবস্থায় তোদের প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক ও বার্ষিক নামাজ এবং রোজা, হজ্জ, জাকাত, জানাজা, প্রার্থনা, মৃতদেহ স্নান করানো প্রভৃতি ধর্মকর্ম করিবার সময় কোথায়? আর ঐ সকল কার্য করিয়া তোরা অর্থোপার্জন করিবার সময় পাইবি কখন এবং সংসার– যাত্রাই বা করিবি কি প্রকারে? সুতরাং তোরাও হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় একদল লোক ঠিক কর তারা তোদের হইয়া ঐ সকল ধর্মকার্যগুলি করিয়া দিবে, তোদেরও সময় নষ্ট হইবেনা।

দ্বীন ইসলামের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ও কৃষিমজুর শ্রেণীর মুসলমানেরা বাবুদিগের এই পরামর্শ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিল। ক্রমে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজেও এই ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িল। এই সঙ্গে আজাজিল শয়তান এবং নফস আম্মারা তাহাদিগকে প্ররোচনা দান করিল। তাহারা বাবুদিগের কথার জবাবে বলিল :

বাবু আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। এতদিন আমাদিগকে এই প্রকার হিতোপদেশ আর কেহ দেন নাই। আমরা নির্বোধ, কিছু বুঝি না। আপনি আমাদের জন্য যাহা বিবেচনা করেন তাহা করুন।

(শহীদ তিতুমীর, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৫–৬)।

বলাবাহুল্য, মুসলমানদের ব্রাহ্মণ সাজবার লোকেরও অভাব হলো না। প্রাচীনকালে মুসলমানদের শাহী দরবারে এক শ্রেণীর মুসলমানকে তাদের যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ ভালো ভালো উপাধিতে ভূষিত করা হতো, উপরন্তু তাদের ভরণপোষণের জন্যে আয়মা, লাখেরাজ ও বিভিন্ন প্রকারের ভূসম্পত্তি দান করা হতো। ইংরেজদের আগমনের পর তাদের এসব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। তারা হয়ে পড়ে নিঃস্ব—বিত্তহীন। শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিল না বলে তাদের জীবিকার পথও বন্ধ হয়ে গেল। বিদ্যা শিক্ষা করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না।

বলতে গেলে তারা সম্ভ্রান্ত ভিখারীর দলে পরিণত হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল কিছুসংখ্যক শেখ, সৈয়দ, মীর, কাজী প্রভৃতি নামধারী লোক। তারা ছিল প্রাচীন বুনিয়াদী ঘরের সন্তান। কিন্তু অভাবের তাড়নায় তাদেরকে এখন কৃষক, শ্রমিক মজুরদের দ্বারস্থ হতে হয়। তাদের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ তাদেরকে সহানুভূতির সুরে বলতে লাগলো :

চাষী মজুর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এখন আর আপনাদেরকে পূর্বের ন্যায় মানে না, মানতে চায় না। ভক্তিশ্রদ্ধাও করেনা। তাদের এরূপ ব্যবহারে আমরাও হৃদয়ে খুব বেদনা অনুভব করে থাকি। কি আর করা যাবে—কলিকাল।আমরা চাই যে তাদের ধর্ম কাজগুলি করে দেবার দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত করে আপনাদেরকে সাহায্য করব। আপনারা মুসলমান সমাজের আখন্জী, মোল্লা, উস্তাদজী, মুন্শী, কাজী প্রভৃতি পদ গ্রহণ করে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করুন। তাহলে আপনাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। তারাও আপনাদের অনুগত থাকবে। ধনহারা, মূর্খ, অর্ধমূর্খ, শরাফতীর দাবীদার শেখ, সৈয়দ, মীর ও কাজীর দল হিন্দু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য বাবুদিগের কথায় ভুল্লো। তারা আখন্জী, মোল্লা, উস্তাদজী ও মুন্শীর পদ গ্রহণ করে মুসলমান জাতির ব্রাহ্মণ সেজে বসলো। মুসলিম জনগোষ্ঠীর জাতীয় সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করল। হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণের আদর্শে মুসলমান সমাজেও ব্রাহ্মণের পদ সৃষ্ট হলো। সাধারণ মুসলমানরা আপাতঃ মধুর ভাবে বিভোর হয়ে ইসলাম ও ইসলামী শরিয়তের পথ থেকে বহুদূরে বিচ্যুত হয়ে পড়লো। হিন্দু ব্রাহ্মণজাতির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে তারা আত্মহত্যা করলো। (শহীদ তিতুমীর—আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৭ দ্রঃ)।

মুসলমানদের জাতীয় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিরান হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে হিন্দু পন্ডিতদের গ্রাম্য পাঠশালা স্থাপিত হয়েছে। সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদেরকে এসব পাঠশালার গুরুমশায়, কুমার, কামার, ধোপা, নাপিত, গণকঠাকুর প্রভৃতির সাথেই মিলামিশা করতে হতো। এরা সকলে মিলে মুসলমান ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিল।

মুসলমানদের মধ্যে যাদের সামর্থ ছিল তারা তাদের সন্তানদেরকে এসব পাঠশালায় প্রেরণ করতো। এখানে হিন্দু ছাত্রদের সাথে মুসলমান ছাত্রদেরকেও নানা দেবদেবীর স্তবস্তুতি, বিশেষ করে সরস্বতীর বন্দনা মুখস্থ করতে হতো।

পাঠ্যপুস্তকগুলি হিন্দুধর্মের মহিমা কীর্তন, দেবদেবীর বন্দনা ও স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ ছিল। মুসলমান ছাত্রের কচি-কোমল হৃদয়ে হিন্দুধর্মের ছাপ অংকিত হয়ে যেতো। স্কুলে পড়াশেষে নিম্নের ছড়া আবৃত্তি করে গুরু মশায়কে নমস্কার করে বাড়ী যেতে হতো—

সরস্বতী ভগবতী, মোরে দাও বর,
চল ভাই পড়ে সব, মোরা যাই ঘর।
ঝিকি মিকি ঝিকিরে সুবর্ণের চক,
পাত-দোত নিয়ে চল, জয় গুরুদেব।

তার পর রইলো নৈতিক দিক। ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্মমত প্রবর্তিত হওয়ার ফলে হিন্দুজাতির চরম নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা, ধর্মের নামে নেড়া-নেড়ী তথা মুন্ডিত কেশ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের যে জঘন্য যৌন অনাচারের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল তা শুধু হিন্দু সমাজের একটা বৃহত্তর অংশকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি, অশিক্ষিত সাধারণ মুসলমানদেরকেও এ অনাচারের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। বামাচারী তান্ত্রিকদের যৌন অনাচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের মধ্যেও একশ্রেণীর ভন্ড যৌনাচারীর আবির্ভাব ঘটে এবং তারা সাধারণ মুসলমানদেরকে ধর্মের নামে যৌন উচ্ছৃংখলতার (SEXUAL ANARCHY) পংকিল গর্তে নিমজ্জিত করে।. তদুপরি পীরপূজা ও কবরপূজার ব্যাপক প্রচলন মুসলমানদেরকে পৌত্তলিক হিন্দুসম্প্রদায়ের সমপর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।

তারপর মুসলমানদের নামকরণের ব্যাপারেও হিন্দুরা অন্যায় হস্তক্ষেপ করা থেকেও ক্ষান্ত হয়নি। বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার নামে তারা মুসলমানদেরকে বিপথে টেনে নিয়ে গেছে। হিন্দু ঠাকুর মশায়রা বলা শুরু করলো ঃ

তোমরা বাপু মুসলমান হলেও বাংলাদেশের মুসলমান। আরবদেশের মুসলমানের জন্যে যেমন আরবী নামের প্রয়োজন, বাংলাদেশের মুসলমানের জন্যে তেমনি বাংলা নামের প্রয়োজন। আবদুর রহমান, আবুল কাসেম, রহীমা খাতুন, আয়েশা, ফাতেমা নামের পরিবর্তে বাংলা ভাষায় নামের প্রয়োজন।

অতএব ঠাকুর মশায়ের ব্যবস্থা অনুসারে মুসলমানদের নাম রাখা হতে লাগলো গোপাল, নেপাল, গোবর্ধন, নবাই, কুশাই, পদ্মা, চিনি, চাঁপা, বাদল, পটল, মুক্তা প্রভৃতি। ছোটবেলা গ্রামাঞ্চলের বহু মুসলমানের এ ধরনের নামের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম।

অতঃপর ঠাকুর মশায়দের হিতোপদেশে বিভ্রান্ত হয়ে মুসলমানরা তহবন্দ ছেড়ে ধুতি পরিধান করা শুরু করলো, দাড়ি কামিয়ে গোঁফ রাখা ধরলো। বলতে গেলে মুসলমানকে মুসলমান বলে চিনবার কোন উপায়ই ছিল না।

মুসলমানদের এ চরম ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতনের সময় সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি তাঁর মহান কাজ পরিপূর্ণ করে যেতে পারেননি বটে, কিন্তু যে ধর্মীয় ও নৈতিক অনাচার এবং হিন্দু জমিদারদের অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তা পরবর্তীকালে মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় আজাদীর পথে আলোকবর্তিকার কাজ করেছে।

তিতুমীর কোলকাতায় সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর পরামর্শ সভা সমাপ্তের পর নিজ গ্রাম চাঁদপুরে ফিরে এসে কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণের পর তাঁর ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করেন।

তিতুমীরের দাওয়াতের মূলকথা ছিল ইসলামে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন এবং প্রত্যেকটি কাজেকর্মে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালন। হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার উৎপীড়নকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। তাই বলেন যে, কৃষক সম্প্রদায়ের হিন্দুদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সরফরাজপুর নামক গ্রামবাসীর অনুরোধে তিনি তথাকার শাহী আমলের ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রচারের জন্যে তাঁর একটি খানকাহ স্থাপন করেন। এখানে জুমার নামাজের পর তিনি সমবেত হিন্দু-মুসলমানকে আহবান করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন ঃ

ইসলাম শান্তির ধর্ম। যারা মুসলমান নয় তাদের সাথে, শুধু ধর্মের দিক দিয়ে পৃথক বলে, বিবাদ বিসম্বাদ করা আল্লাহ ও তাঁর রসূল কিছুতেই পছন্দ করেন না। তবে ইসলাম এ কথা বলে যে, যদি কোন প্রবল শক্তিশালী অমুসলমান কোন দুর্বল মুসলমানের উপর অন্যায় উৎপীড়ন করে, তাহলে মুসলমানরা সেই দুর্বলকে সাহায্য করতে বাধ্য।

তিনি আরও বলেন, মুসলমানদেরকে কথাবার্তায়, আচার-আচরণে প্রকৃত মুসলমান হতে হবে। তারা যদি অমুসলমানের আচার-আচরণ, চাল-চলন ও কাজকর্ম পছন্দ করে তাহলে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদেরকে

অমুসলমানদের সাথে স্থান দিবেন। তিতুমীর বলেন, ইসলামী শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মা'রফাৎ—এ চার মিলিয়ে মুসলমানদের পূর্ণাংগ জীবন এবং এর মধ্যেই রয়েছে তাদের ইহকাল পরকালের মুক্তি। এর প্রতি কেউ উপেক্ষা প্রদর্শন করলে আল্লাহ্ তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন। নামাজ পড়া, রোজা রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছাঁটা মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। যারা অমুসলমানদের আদর্শে এসব পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন।

এ ছিল তাঁর প্রাথমিক দাওয়াতের মূলকথা। তিনি অনর্গল হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বক্তৃতা করতে পারতেন এবং তাঁর বক্তৃতা ও প্রচারকার্য বিপথগামী ও সুপ্ত মুসলমানদের মধ্যে এক অভাবিতপূর্ব জাগরণ এনে দিল।

তিতুমীর যে কাজ শুরু করলেন তার মধ্যে অন্যায়ের কিছু ছিল না। বরঞ্চ মুসলমান হিসাবে এ ছিল তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু বর্ণহিন্দুগণ তা সহ্য করবে কেন? মুসলমান জাতিকে নির্মূল করার গভীর ষড়যন্ত্র তাদের নস্যাৎ হয়ে গেল, তারা অগ্নিশর্মা হয়ে পড়লো তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি। তাদেরকে নির্মূল করার জন্যে আর এক নতুন চক্রান্ত শুরু হলো।

সরফরাজপুরের ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের পুনঃসংস্কার, আবার জামায়াতে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা, নামাজান্তে সমবেত লোকদের সামনে তিতুমীরের জ্বালাময়ী ভাষণ— পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়কে সন্ত্রস্ত ও চঞ্চল করে তুল্লো। তিতুমীরের গতিবিধি ও প্রচার-প্রচারণার সংবাদাদি সংগ্রহের ভার জমিদারের অনুগত ও বিশ্বস্ত মুসলমান পাইক মতির উপর অর্পিত হলো। জমিদার মতিকে বল্লো—

তিতু ওহাবী ধর্মাবলম্বী। ওহাবীরা তোমাদের হযরত মুহাম্মদের ধর্মমতের পরম শত্রু। কিন্তু তারা এমন চালাক যে, কথার মধ্যে তাদেরকে ওহাবী বলে ধরা যাবে না। সুতরাং আমার মুসলমান প্রজাদেরকে বিপথগামী হতে দিতে পারি না। আজ থেকে তিতুর গতিবিধির দিকে নজর রাখবে এবং সব কথা আমাকে জানাবে।

অতঃপর কৃষ্ণদেব রায় গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় এবং গোবরডাঙার জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তিতুমীরের বিরুদ্ধে শান্তিভংগের নালিশ করার জন্যে কিছু প্রজাকে বাধ্য করল। তারপর জমিদারের আদেশে মতিউল্লাহ্ তার চাচা গোপাল, জ্ঞাতিভাই নেপাল ও

গোবর্ধনকে নিয়ে জমিদারের কাচারীতে উপস্থিত হয়ে নালিশ পেশ করলো। তার সারমর্ম নিম্নরূপ—

চাঁদপুর নিবাসী তিতুমীর তার ওহাবী ধর্ম প্রচারের জন্যে আমাদের সর্পরাজপুর (মুসলমানী নাম সরফরাজপুর) গ্রামে এসে আখড়া গেড়েছে এবং আমাদেরকে ওহাবী ধর্মমতে দীক্ষিত করার জন্যে নানারূপ জুলুম জবরদস্তি করছে। আমরা বংশানুক্রমে যেভাবে বাপদাদার ধর্ম পালন করে আসছি, তিতুমীর তাতে বাধা দান করছে। তিতুমীর ও তার দলের লোকেরা যাতে সর্পরাজপুরের জনগণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে না পারে, জোর করে আমাদের দাড়ি রাখতে, গোঁফ ছাঁটতে, গোহত্যা করতে, আরব দেশের নাম রাখতে বাধ্য করতে না পারে, হিন্দু-মুসলমানে দাংগা বাধাতে না পারে, হুজুরের দরবারে তার বিহিত ব্যবস্থার জন্যে আমাদের নালিশ। হুজুর আমাদের মনিব। হুজুর আমাদেরবাপ-মা।

গোপাল, নেপাল, গোবর্ধনের টিপসইযুক্ত উক্ত দরখাস্ত পাওয়ার পর জমিদার কৃষ্ণদেব রায় হুকুম জারী করলো—

১। যারা তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ওহাবী হবে, দাড়ি রাখবে, গোঁফ ছাঁটবে তাদেরকে ফি দাড়ির জন্যে আড়াই টাকা ও ফি গোঁফের জন্যে পাঁচ সিকা করে খাজনা দিতে হবে।

২। মসজিদ তৈরী করলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্যে পাঁচশ' টাকা এবং প্রতি পাকা মসজিদের জন্যে এক হাজার টাকা করে জমিদার সরকারে নজর দিতে হবে।

৩। বাপদাদা সন্তানদের যে নাম রাখবে তা পরিবর্তন করে ওহাবী মতে আরবী নাম রাখলে প্রত্যেক নামের জন্যে খারিজানা ফিস পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হবে।

৪। গোহত্যা করলে তার ডান হাত কেটে দেয়া হবে— যাতে আর কোনদিন গোহত্যা করতে না পারে।

৫। যে ওহাবী তিতুমীরকে বাড়ীতে স্থান দিবে তাকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

(শহীদ তিতুমীর—আবদুল গফুর সিদ্দিকী পৃঃ ৪৮, ৪৯; স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আবু জাফর পৃঃ ১১৯; Bengal Criminal

Judicial Consultations, 3 April 1832, No. 5 and No. 6)।

মুসলমান প্রজাদের উপরে উপরোক্ত ধরনের জরিমানা ও উৎপীড়নের ব্যাপারে তারাগুনিয়ার জমিদার রাম নারায়ণ, কুরগাছির জমিদারের নায়েব নাগরপুর নিবাসী গৌড় প্রসাদ চৌধুরী এবং পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নাম পাওয়া যায়— Bengal Criminal Judicial Consultancy, 3 April 1832, No. 5 রেকর্ডে। (Dr. A. R. Mallick, British Policy & the Muslims in Bengal, p. 76)।

বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে জমিদার রাম নারায়ণের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল যাতে জনৈক সাক্ষী একথা বলে যে— উক্ত জমিদার দাড়ি রাখার জন্যে তার পঁচিশ টাকা জরিমানা করে এবং দাড়ি উপড়ে ফেলার আদেশ দেয়। Bengal Criminal Judicial Consultations, No. 5; Dr. A. R. Mallick, Br. Policy & the Muslims in Bengal, p. 76)।

তিতুমীর কৃষ্ণদেব রায়কে একখানা পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, তিনি কোন অন্যায় কাজ করেননি, মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ করছেন। এ কাজে হস্তক্ষেপ করা কোনক্রমেই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। নামাজ পড়া, রোজা রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছাঁটা প্রভৃতি মুসলমানের জন্যে ধর্মীয় নির্দেশ। এ কাজে বাধা দান করা অপর ধর্মে হস্তক্ষেপেরই শামিল।

তিতুমীরের জনৈক পত্রবাহক কৃষ্ণদেব রায়ের হাতে পত্রখানা দেয়ার পর তার প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তাও পাঠক সমাজের জেনে রাখা প্রয়োজন আছে—তা এখানে উল্লেখ করছি।

পত্রখানা কে দিয়েছে জিজ্ঞাসা করলে পত্রবাহক চাঁদপুরের তিতুমীর সাহেবের নাম করে। তিতুমীরের নাম শুনতেই জমিদার মশায়ের গায়ে আগুন লাগে। রাগে গর গর করতে করতে সে বল্লো, কে সেই ওহাবী তিতু? আর তুই ব্যাটা কে?

নিকটে জনৈক মুচিরাম ভান্ডারী উপস্থিত ছিল। সে বল্লো, ওর নাম আমন মন্ডল। বাপের নাম কামন মন্ডল। ও হুজুরের প্রজা। আগে দাড়ি কামাতো, আর এখন দাড়ি রেখেছে বলে হুজুর চিনতে পারছেন না।

পত্রবাহক বল্লো, হুজুর আমার নাম আমিনুল্লাহ, বাপের নাম কামালউদ্দীন, লোকে আমাদেরকে আমন-কামন বলে ডাকে। আর দাড়ি রাখা আমাদের ধর্মের আদেশ। তাই পালন করেছি।

কৃষ্ণদেব রাগে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বল্লো, ব্যাটা দাড়ির খাজনা দিয়েছিস, নাম বদলের খাজনা দিয়েছিস? আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা। ব্যাটা আমার সাথে তর্ক করিস, এত বড়ো তোর স্পর্ধা? এই বলে মুচিরামের উপর আদেশ হলো তাকে গারদে বন্ধ করে উচিত শাস্তির। বলা বাহুল্য, অমানুষিক অত্যাচার ও প্রহারের ফলে তিতুমীরের ইসলামী আন্দোলনের প্রথম শহীদ হলো আমিনুল্লাহ। সংবাদটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। মুসলমানরা মর্মাহত হলো, কিন্তু সাক্ষী প্রমাণের অভাবে প্রবল শক্তিশালী জমিদারের বিরুদ্ধে কিছুই করতে না পেরে তারা নীরব রইলো।

কোলকাতায় জমিদারদের ষড়যন্ত্র সভা

তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের দমন করার উদ্দেশ্যে কোলকাতায় জনৈক লাটু বাবুর বাড়ীতে এ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগত হাজির হলেন : লাটু বাবু (কোলকাতা), গোবরডাঙার জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবরা-গোবিন্দপুরের দেবনাথ রায়, নূরনগরের জমিদারের ম্যানেজার, টাকীর জমিদারের সদর নায়েব, রানাঘাটের জমিদারের ম্যানেজার, পুঁড়ার কৃষ্ণদেব রায়, বশীরহাট থানার দারোগা রামরাম চক্রবর্তী, যদুর আটির দুর্গাচরণ চক্রবর্তী প্রভৃতি।

সভায় স্থিরীকৃত হলো যে, যেহেতু তিতুমীরকে দমন করতে না পারলে হিন্দুজাতির পতন অনিবার্য, সেজন্যে যে কোন প্রকারেই হোক তাকে শায়েস্তা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে সকল জমিদারগণ সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করবেন। ইংরেজ নীলকরদেরও সাহায্য গ্রহণ করা হবে বলে স্থির হলো। তাদেরকে বুঝানো হবে যে, তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম শুরু করেছেন। হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে এ কথা প্রচার করতে হবে যে তিতু গো-মাংস দ্বারা হিন্দুর দেবালয়াদি অপবিত্র করেছেন এবং হিন্দুর মুখে কাঁচা গো-মাংস গুঁজে দিয়ে জাতি নাশ করেছেন। বশীরহাটের দারোগা চক্রবর্তীকে এ ব্যাপারে সর্বপ্রকারে সাহায্য করার অনুরোধ জানানো হলো। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় দারোগাকে বল্লেন, আপনি ব্রাহ্মণ, আমরাও ব্রাহ্মণ। তাছাড়া আপনি আমাদের অনেকেরই আত্মীয়। আমাদের এ বিপদে আপনাকে সব দিক দিয়ে সাহায্য করতে হবে। দারোগা বল্লো, আমি আমার প্রাণ দিয়েও সাহায্য করব এবং তিতুমীরকে রাজদ্রোহী প্রমাণ করব।

কোলকাতার ষড়যন্ত্র সভার পর সরফরাজপুরের লোকদের নিকট থেকে দাড়ি-গোঁফের খাজনা এবং আরবী নামকরণের খারিজানা ফিস্ আদায়ের জন্যে কৃষ্ণদেব রায় লোক পাঠালো। কিন্তু তারা খাজনা দিতে অস্বীকৃতি জানালে জমিদারের কর্মচারী ফিরে এসে জমিদারকে এ বিষয়ে অবহিত করে। অতঃপর তিতুমীরকে ধরে আনার জন্যে বারোজন সশস্ত্র বরকন্দাজ পাঠানো হয়। কিন্তু তারা ধরে আনতে সাহস করেনি।

অতঃপর কৃষ্ণদেব নিম্নের ব্যক্তিগণকে পরামর্শের জন্যে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে ঃ

১। অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে গোবরডাঙায়,
২। খড়েশ্বর মুখোপাধ্যায়কে গোবরা-গোবিন্দপুরে,
৩। লাল বিহারী চট্টোপাধ্যায়কে সেরপুর নীলকুঠির মিঃ বেনজামিনের কাছে,
৪। বনমালী মুখোপাধ্যায়কে হুগলী নীলকুঠিতে,
৫। লোকনাথ চক্রবর্তীকে বশীরহাট থানায়।

উল্লেখযোগ্য যে, লোকনাথ চক্রবর্তী বশীরহাটের দারোগা রামরাম চক্রবর্তীর তল্পিপতি।

অতঃপর বিভিন্ন স্থান থেকে কৃষ্ণদেবের সাহায্যার্থে সহস্রাধিক লাঠিয়াল, সড়কীওয়ালা ও ঢাল-তলোয়ারধারী বীর যোদ্ধা কৃষ্ণদেবের বাড়ি পুঁড়ায় পৌঁছে গেল। পরদিন শুক্রবার সরফরাজপুরে তিতুমীর ও তাঁর লোকজনদেরকে আক্রমণ করার আদেশ হলো।

পরদিন শুক্রবার সর্বাগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে কৃষ্ণদেব রায় এবং তার পিছনে সশস্ত্র বাহিনী যখন সরফরাজপুর পৌঁছে, তখন জুমার খুৎবা শেষে মুসল্লীগণ নামাজে দাঁড়িয়েছে। কৃষ্ণদেবের সৈন্যেরা বিভিন্ন মুসলিম বিরোধী ধ্বনি সহকারে মসজিদ ঘিরে ফেলে আগুন লাগিয়ে দিল। অগ্নি বিস্তর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তিতুমীর এবং মুসল্লীগণ মসজিদের বাইরে এলে তাদেরকে আক্রমণ করা হলো। দু'জন সড়কীবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলো এবং বহু আহত হলো।

অতঃপর মুসলমানগণ কলিঙ্গার পুলিশ ফাঁড়িতে কৃষ্ণদেব রায় ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে খুনজখম মারপিট প্রভৃতির মামলা দায়ের করলো। পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ইজাহার গ্রহণ করলো বটে। কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হয়েই লাশ দাফন করার নির্দেশ দিল।

J. R. Colvin-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, জমিদারের কর্মচারীগণ সরফরাজপুরে দাড়ি-গোঁফ ইত্যাদির খাজনা আদায় করতে গেলে তাদেরকে মারপিট করা হয় এবং একজনকে আটক করা হয়। তারপর কৃষ্ণদেব রায় সশস্ত্র বাহিনীসহ তাদেরকে আক্রমণ করে এবং মসজিদ জ্বালিয়ে দেয়।

(Board's Collection 54222, p. 405-6, Colvin's Report—para 9; Dr. A. R. Mallick : British Policy & the Muslims in Bengal, p. 79)।

উক্ত ঘটনার আঠার দিন পর কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে এই বলে মামলা দায়ের করে যে, তারা তার লোকজনকে মারপিট করেছে এবং তাকে ফাঁসাবার জন্যে তারা নিজেরাই মসজিদ জ্বালিয়ে দিয়েছে। (Bengal Criminal Judicial Consultations, 3 April 1832, No. 6)।

কৃষ্ণদেব রায় তার ইজাহারে আরও অভিযোগ করে যে, 'নীলচাষদ্রোহী, জমিদারদ্রোহী ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীদ্রোহী তিতুমীর নামক ভীষণ প্রকৃতির এক ওহাবী মুসলমান এবং তার সহস্রাধিক শিষ্য পুঁড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব রায় মহাশয়ের দু'জন বরকন্দাজ ও একজন গোমস্তাকে অন্যায় ও বেআইনীভাবে কয়েদ করিয়া গুম্ করিয়াছে। বহু অনুসন্ধানেও আমরা তাহাদের পাইতেছিনা। আমাদের উক্ত পাইক ও গোমস্তা সরফরাজপুর মহলের প্রজাদের নিকট খাজনা আদায়ের জন্য মহলে গিয়াছিল। খাজনার টাকা লেনদেন ও ওয়াশীল সম্বন্ধে প্রজাদের সহিত বচসা হওয়ায় তিতুমীরের হুকুম মতে তাহার দলের লোকেরা আমাদের গোমস্তা পাইকদিগকে জবরদস্তি করিয়া কোথায় কয়েদ করিয়াছে তাহা জানা যাইতেছে না। তিতুমীর দস্তুরে প্রচার করিতেছে যে, সে এদেশের রাজা। সুতরাং খাজনা আর জমিদারকে দিতে হইবেনা।' (শহীদ তিতুমীর- আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৬০)।

কিভাবে মিথ্যা মামলা সাজাতে হয় তা রামরাম চক্রবর্তীর অন্ততঃপক্ষে ভালো করে জানা ছিল। কারণ সে তিতুমীরকে রাজদ্রোহী প্রমাণ করার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যাহোক, ঘটনার আঠার দিন পর জমিদারের ইজাহার যে বিশ্বাসযোগ্য নয়, তা না বল্লেও চলে। এ শুধু গা বাঁচাবার জন্যে করা হয়েছিল। তবু উভয় মামলার তদন্ত শুরু হয়।

মামলার প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে কলিঙ্গা ফাঁড়ির জমাদার। তার রিপোর্টে বলা হয় যে, উভয় পক্ষের অভিযোগ অত্যন্ত সংগীন। সে আরও বলে, আমি মুসলমানদের অভিযোগের বহু আলামত দেখেছি। জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নায়েব তিতুমীর ও তার দলের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা দায়ের করেছে সে সম্পর্কে তদন্ত করে জানা গেল যে, যেসব কর্মচারীর অপহরণের অভিযোগ করা হয়েছে তারা সকলেই নায়েবের সঙ্গেই আছে। নায়েবের জবাব এই যে, সে মফঃস্বলে যাওয়ার পর তিতুর লোকেরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। আমার মতে এ জটিল মামলা দুটির তদন্ত ও ফাইনাল রিপোর্টের ভার বশীরহাটের অভিজ্ঞ দারোগা রামরাম চক্রবর্তীর উপর অর্পণ করা হোক।

ওদিকে বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণদেব রায়কে কোর্টে তলব করে জামিন দেন এবং রামরাম চক্রবর্তীকে তদন্ত করে চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়ার আদেশদেন।

রামরাম চক্রবর্তী তদন্তের নাম করে সরফরাজপুর আগমন করে তিতুমীর ও গ্রামবাসীকে অকথ্যভাষায় গালাগালি ও মারপিট করে জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়ীতে কয়েকদিন জামাই আদরে কাটিয়ে যে রিপোর্ট দেয় তা নিম্নরূপ ঃ–

১। জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের গোমস্তা ও পাইকদেরকে তিতু ও তার লোকেরা বেআইনীভাবে কয়েদ করে রেখেছিল। পরে তারা কৌশলে পলায়ন করে আত্মগোপন করেছিল। পুলিশের আগমনের পর তারা আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং এ মামলা অচল ও বরখাস্তের যোগ্য।

২। তিতুমীর ও তার লাঠিয়ালেরা জমিদার কৃষদেব রায় ও তার পাইক বরকন্দাজদের বিরুদ্ধে খুনজখম, লুট, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির মিথ্যা অভিযোগএনেছে।

৩। তিতু ও তার লোকেরা নিজেরাই নামাজঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। অতএব এ মামলা চলতে পারে না।

দারোগার রিপোর্ট সম্পূর্ণ মনগড়া এবং তার বিদ্বেষাত্মক মনের অভিব্যক্তি মাত্র। মুসলমানদের শত দোষ থাক কিন্তু মসজিদ ভস্মিভূত করার মতো পাপ কাজ করতে সাহস তাদের কখনোই হবে না।

পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, অবৈধ খাজনা আদায়ের বিষয়টি হাকিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি যা ছিল দাংগার মূল কারণ। তার ফলে জমিদার শুধু মামলায় জয়লাভই করেনি, বরঞ্চ তার অবৈধ খাজনা আদায়ের কাজকে বৈধ

করে দেয়া হলো। বিভাগীয় কমিশনার বলেন, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট যে রায় দিলেন তার মধ্যে একদিকে জমিদারদের অবৈধ ও উৎপীড়নমূলক খাজনা বন্ধ করার উদ্দেশ্য ছিলনা, অপরদিকে প্রতিপক্ষের উত্তেজনাকর মনোভাব লাঘব করারও কিছু ছিল না। (Bengal Criminal Judicial Consultations, 3 April 1832, No. 3; Commissioner to Deputy Secretary; 28 Nov. 1831, para 3)।

ম্যাজিস্ট্রেটের এ অবিচারমূলক রায়ের ফলে জমিদার প্রতারণামূলক ও উৎপীড়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সাহসী হলো। ১৭৯৯ সালের ৭ নং রেগুলেশন অনুযায়ী বকেয়া খাজনার নাম করে প্রজাদেরকে ধরে এনে আটক করার ক্ষমতা লাভ করলো। এমনকি যারা জমিদারের প্রজা নয় অথচ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে তাদেরকে মিছিমিছি ৩৮ টাকা বকেয়া দেখিয়ে ধরে এনে আটক করা হলো এবং তাদেরকে নানাভাবে শারীরিক শাস্তি দেয়া হলো। অতঃপর বকেয়ার একাংশ আদায় করে বাকী অংশ দিবার প্রতিশ্রুতিতে তাদের কাছে মুচলেকা লিখে নেয়া হলো যাতে করে কোর্টের আশ্রয় নিতে না পারে। (Board's Collection, 54222, Enclosure No 4. the Colvin's Report; Also in Bengal Criminal Judicial Consultations, 3 April 1832 No. 6)।

১৮৩১ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর মামলার রায়ের নকলসহ মুসলমানরা কমিশনারের কোর্টে আপিল করার জন্যে কোলকাতা গেল। কিন্তু কমিশনারের অনুপস্থিতির দরুন তাদের আপিল দাখিল করা সম্ভব হলো না বলে ভগ্নহৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করলো।

সরফরাজপুর গ্রামের মসজিদ ধ্বংস হলো, বহু লোক হতাহত হলো, হাবিবুল্লাহ, হাফিজুল্লাহ, গোলাম নবী, রমজান আলী ও রহমান বখ্শের বাড়ীঘর ভস্মস্তূপে পরিণত করা হলো, বহু ধনসম্পদ ভস্মিভূত ও লুণ্ঠিত হলো, কিন্তু ইংরেজ সরকার তার কোনই প্রতিকার করলো না। সরফরাজপুর গ্রামবাসীর এবং বিশেষ করে সাইয়েদ নিসার আলীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল বলে সকলের পরামর্শে সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর উপরোক্ত পাঁচজন গৃহহারাসহ সরফরাজপুর থেকে ১৭ই অক্টোবরে নারকেলবাড়িয়া গ্রামে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থানান্তরিত হলেন। ২৯শে অক্টোবর (১৮৩১) কৃষ্ণদেব রায় সহস্রাধিক লাঠিয়াল ও

বিভিন্ন অস্ত্রধারী গুন্ডাবাহিনীসহ নারিকেলবাড়িয়া গ্রাম আক্রমণ করে বহু নর-নারীকে মারপিট ও জখম করে। ৩০শে অক্টোবর পুলিশ ফাঁড়িতে ইজাহার হলো। কিন্তু কোনই ফল হলো না। কোন প্রকার তদন্তের জন্যেও পুলিশ এলো না।

উপর্যুপরি জমিদার বাহিনীর আক্রমণে মুসলমানগণ দিশেহারা হয়ে পড়লো। তখন বাধ্য হয়ে তাদেরকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে হলো। ৬ই নভেম্বর পুনরায় কৃষ্ণদেব রায় তার বাহিনীসহ মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয় এবং উভয়পক্ষে বহু লোক হতাহত হয়। এরপর কৃষ্ণদেব রায় চারদিকে হিন্দু সমাজে প্রচার করে দেয় যে, মুসলমানরা অকারণে হিন্দুদের উপরে নির্যাতন চালাচ্ছে। তার এ ধরনের প্রচারণায় হিন্দুদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং গোবরডাঙ্গার নীলকর জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মোল্লাআটি নীলকুঠির ম্যানেজার মিঃ ডেভিসকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। ডেভিস প্রায় চার'শ হাবশী যোদ্ধা ও বিভিন্ন মারণাস্ত্রসহ নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণ করে। এবারও উভয় পক্ষে বহু হতাহত হয়। ডেভিস্ পলায়ন করে। মুসলমানরা তার বজরা ধ্বংস করে দেয়। উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় এক বিরাট বাহিনীসহ নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণ করে। প্রচন্ড যুদ্ধে দেবনাথ রায় সড়কীর আঘাতে নিহত হয়।

উপরোক্ত ঘটনার পর চতুনার জমিদার মনোহর রায় পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট যে পত্র লিখেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেন ঃ

নীলচাষের মোহ আপনাদেরকে পেয়ে বসেছে। তার ফলেই আজ আমরা দেবনাথ রায়ের ন্যায় একজন বীর পুরুষকে হারালাম। এখনো সময় আছে। আর বাড়াবাড়ি না করে তিতুমীরকে তার কাজ করতে দিন আর আপনারা আপনাদের কাজ করুন। তিতুমীর তার ধর্ম প্রচার করছে, তাতে আপনারা জোট পাকিয়ে বাধা দিচ্ছেন কেন? নীলচাষের মোহে আপনারা ইংরেজ নীলকরদের সাথে এবং পাদ্রীদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে দেশবাসী ও কৃষক সম্প্রদায়ের যে সর্বনাশ করছেন তা তারা ভুলবে কি করে? আপনারা যদি এভাবে দেশবাসীর উপর গায়ে পড়ে অত্যাচার চালাতে থাকেন তাহলে বাধ্য হয়ে আমি তিতুমীরের সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হবো। আমি পুনরায় বলছি নীলচাষের জন্যে আপনারা দেশবাসীর অভিশম্পাত কুড়াবেন না।

—শ্রীমনোহর রায় ভূষণ (শহীদ তিতুমীর, আবদুল গফুর সিদ্দিকী পৃঃ ৭৯)।

মনোহর রায়ের সদুপদেশ গ্রহণ করলে ইতিহাসের এতবড়ো একটা বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হতো না। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায়ের একদিকে সীমাহীন ধনলিপ্সা এবং অপরদিকে চরম বিদ্বেষ তাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলেছিল। তাই সে তার পৈশাচিক তৎপরতা থেকে ক্ষান্ত হতে পারেনি।

বশীরহাটের দারোগা রামরাম চক্রবর্তী তিতুমীর ও তার দলের লোকদের বিরুদ্ধে যেসব কাল্পনিক, বিকৃত ও উদ্দেশ্যমূলক রিপোর্ট সরকারের নিকটে পেশ করেছিল এবং হিন্দু জমিদারগণও যেসব পত্র কালেক্টর ও জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তিতুমীরের বিরুদ্ধে লিখেছিল, তার উপরে ভিত্তি করেই ম্যাজিস্ট্রেট তিতুমীরকে দমন করার জন্যে গভর্ণরকে অনুরোধ জানায়। গভর্ণর আবার উপরোক্ত রিপোর্টসহ নদিয়ার কালেক্টর ও আলীপুরের জজকে নারকেলবাড়িয়া গ্রামে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। এদিকে গভর্ণরের আদেশ পাওয়া মাত্র নদিয়ার কালেক্টর কৃষ্ণদেব রায়কে যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁর সাথে দেখা করতে বলেন। আলীপুরের জজ সে সময় নদিয়াতেই অবস্থান করছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় যথাসময়ে উপস্থিত হলে কালেক্টর ও জজ সাহেবের বজরার পথপ্রদর্শক হিসাবে নারিকেলবাড়িয়ার দিকে রওয়ানা হয়।

এদিকে স্বার্থান্বেষী মহল থেকে সংবাদ রটনা করা হলো যে শেরপুর নীলকুঠির ম্যানেজার মিঃ বেনজামিন বহু লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালাসহ নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণের জন্যে যাত্রা করেছে। এ সংবাদ পাওয়ার পর তাদেরকে বাধাদানের উদ্দেশ্যে গোলাম মাসুম তিতুমীর দলের লোকজনসহ সম্মুখে অগ্রসর হলো এবং বারঘরিয়া গ্রামের জঙ্গল ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে রইলো। বজরা এসে বারঘরিয়ার ঘাটে ভিড়লে পরে তিতুমীরের লোকেরা দেখতে পেলো যে, বজরায় দু'জন ইংরেজ এবং তাদের সাথে তাদের পরমশত্রু কৃষ্ণদেব রয়েছে। ইংরেজ দুজনকে তারা ডেভিস এবং বেনজামিন বলে ধারণা করে আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হলো। কৃষ্ণদেব বল্লো, হুজুর ঐ দেখুন। তিতুমীরের প্রধান সেনাপতি গোলাম মাসুম বজরা আক্রমণ করার জন্যে এতদূর পর্যন্ত এসেছে। সাহেব তখন গুলি চালাবার আদেশ দিলেন। অপরপক্ষও তীর সড়কি চালাতে শুরু করলো। উভয়পক্ষের কয়েকজন হতাহত হওয়ার পর কালেক্টর যুদ্ধ স্থগিত রেখে নদীর

মাঝখানে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

তিতুমীরের দলকে স্বার্থান্বেষী মহল মিথ্যা সংবাদ দিয়ে প্রতারিত করলো। তারা ডেভিস্ ও বেনজামিন মনে করে বজরা আক্রমণ করলো। স্বার্থান্বেষী মহল চেয়েছিল এভাবে তিতুমীরের দলের প্রতি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকারকে ক্ষিপ্ত করে তুলতে। তাদের উদ্দেশ্য সফল হলো। প্রকৃত ঘটনা অবগত হলে তারা এভাবে বজরা আক্রমণ করতে আসতোনা। বিশেষ করে কৃষ্ণদেব রায়কে, বজরায় দেখে তারা তাদেরকে শত্রুই মনে করেছিল।

মজার ব্যাপার এই যে, বারঘরিয়ার ঘাট থেকে তাড়াতাড়ি বজরায় উঠে নদীর মাঝখানে আত্মরক্ষার সময় কৃষ্ণদেব উঠতে পারেনি। ফলে তার ভাগ্যে যা হবার তা হলো। তবে মুসলমানরা তাকে হত্যা করেনি। নদীতে ডুবে তার অপমৃত্যু ঘটলো।

ইষ্ট ইন্ডিয়া সরকারের বিরুদ্ধে তিতুমীরের সংঘর্ষের কোন বাসনা ছিলনা। ঘটনাপ্রবাহ, কতকগুলি অমূলক গুজব এবং এক বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহল তিতুমীর ও সরকারের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়। কতিপয় পাদ্রী, দেশী বিদেশী নীলকর এবং হিন্দু জমিদারদের পক্ষ থেকে বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আলেকজান্ডারের কাছে তিতুমীরের বিরুদ্ধে অনবরত উত্তেজনাকর রিপোর্ট ও চিঠিপত্র আসতে থাকে। তার সাথে আসে বারঘরিয়ার উক্ত সংঘর্ষের রিপোর্ট। এর ফলে তিতুমীর ও তার দল সম্পর্কে মিঃ আলেকজান্ডারের যে ধারণা জন্মে তাতে তিতুমীরকে দমনের জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। সম্ভবতঃ রামরাম চক্রবর্তী সংঘর্ষে নিহত হওয়ার পর বশীরহাট থানায় নতুন দারোগা নিযুক্ত হয়। তার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয় যে, সে যেন কতিপয় সিপাই জমাদার নিয়ে নারিকেলবাড়িয়া গিয়ে তিতুমীরকে সাবধান করে দেয়। অতঃপর যা যা ঘটে তার রিপোর্ট যেন দেয়। দারোগা সম্ভবতঃ নারিকেলবাড়িয়া না গিয়ে থানায় বসেই রিপোর্ট দেয় যে, তিতুর লোকজনের আক্রমণে প্রাণ নিয়ে কোনমতে পালিয়ে এসেছে। ফলে আলেকজান্ডারকে কর্তৃপক্ষের কাছে তিতুমীর সম্পর্কে কড়া রিপোর্ট দিতে হয়।

১৮৩১ সালের ১৪ই নভেম্বর মিঃ আলেকজান্ডার একজন হাবিলদার, একজন জমাদার এবং পঞ্চাশজন বন্দুক ও তরবারিধারী সিপাহী নিয়ে নারিকেলবাড়িয়ার তিনক্রোশ দূরে বাদুড়িয়া পৌছেন। বশিরহাটের দারোগা

সিপাই-জমাদারসহ বাদুড়িয়ায় আলেকজান্ডারের সাথে মিলিত হয়। উভয়ের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল একশ' বিশজন। অতঃপর যে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয় তাতে উভয়পক্ষের লোক হতাহত হয়, গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে মুসলমানদের বীরত্ব দেখে আলেকজান্ডার বিস্মিত হন এবং দারোগা ও একজন জমাদার মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। বেগতিক দেখে আলেকজান্ডার প্রাণরক্ষার্থে পলায়ন করেন।

আলেকজান্ডারের রিপোর্ট ও তার প্রতিক্রিয়া

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আলেকজান্ডার বারাসত প্রত্যাবর্তন করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকটে তিতুমীরকে শায়েস্তা করার আবেদন জানিয়ে রিপোর্ট পেশ করেন। কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকার কর্ণেল ষ্টুয়ার্টকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করে তার অধীনে একশত ঘোড়-সওয়ার গোরা সৈন্য, তিনশত পদাতিক দেশীয় সৈন্য, দু'টি কামানসহ নারিকেলবাড়িয়া অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। ১৩ই নভেম্বর রাত্রে কোম্পানী সৈন্য নারিকেলবাড়িয়া পৌছে গ্রাম অবরোধ করে রাখলো।

শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তিতুমীর ও তাঁর লোকেরা তিতুমীরের হুজরাকে কেন্দ্র করে চারদিকে মোটা মোটা ও মজবুত বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঘিরে ফেলেছিলেন যা ইতিহাসে "তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা" বলে অভিহিত আছে।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বের কিছু ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট তিতুমীরের হুজরা ঘরের সম্মুখস্থ প্রধান প্রবেশদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেখলেন এক ব্যক্তি সাদা তহবন্দ, সাদা পিরহান ও সাদা পাগড়িতে অংগ শোভা বর্ধন করতঃ তসবিহ হাতে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন। ষ্টুয়ার্ট মুগ্ধ ও বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পথপ্রদর্শক রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ব্যক্তিই তিতুমীর? একে ত বিদ্রোহী বলে মনে হয় না?

রামচন্দ্র বল্লো, এই ব্যক্তিই বিদ্রোহী তিতুমীর। নিজেকে তিতু বাদশাহ বলে পরিচয় দেয়। আজ আপনাদের আগমনীতে ভংগী পরিবর্তন করে সাধু সেজেছে।

অতঃপর ষ্টুয়ার্ট রামচন্দ্রকে বল্লেন, তিতুকে বলুন আমি বড়োলাট লর্ড বেন্টিংক-এর পক্ষ থেকে সেনাপতি হিসাবে এসেছি। তিতুমীর যেন আত্মসমর্পণ করে। অথবা তিনি যা বলেন হুবহু আমাকে বলবেন।

রামচন্দ্র তিতুমীরকে বল্লো, আপনি কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এখন জপমালা ধারণ করেছেন, আসুন তরবারি ধারণ করে বাদশাহর যোগ্য পরিচয় দিন।

তিতুমীর বলেন, আমি কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি। হিন্দুদের ন্যায় আমরাও কোম্পানী সরকারের প্রজা। জমিদার নীলকরদের অত্যাচার দমনের জন্যে এবং মুসলমান নামধারীদেরকে প্রকৃত মুসলমান বানাবার জন্যে সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র।

তিতুমীরের জবাব শুনার পর রামচন্দ্র ষ্টুয়ার্টকে দোভাষী হিসাবে বল্লো, বিদ্রোহী তিতুমীর বলছে আত্মসমর্পণ করবে না, যুদ্ধ করবে। সে বলে যে, সে তোপ ও গোলাগুলির তোয়াক্কা করেনা। সে বলে যে, সে তার ক্ষমতা বলে সবাইকে টপ টপ করে গিলে খাবে। সেই এ দেশের বাদশাহ, কোম্পানী আবার কে? (শহীদ তিতুমীর : আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৯৫-৯৬)।

রামচন্দ্র দোভাষীর কাজ করতে গিয়ে কোন্ আগুন জ্বালিয়ে দিল, তা পাঠকমাত্রের বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়।

তারপর যে যুদ্ধ হলো, তার ফলাফল কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্য এবং তাদের ভারি কামানের গোলাগুলির সামনে লাঠি ও তীর সড়কি কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে। তথাপি সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর, গোলাম মাসুম ও তাদের দলীয় লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে অথবা প্রতিপক্ষের কাছে আনুগত্যের মস্তক অবনত না করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধীরস্থির হয়ে যেভাবে শত্রুর মুকাবিলা করে শাহাদতের অমৃত পান করেছেন তা একদিকে যেমন ইতিহাসের অক্ষয় কীর্তিরূপে চির বিরাজমান থাকবে, অপরদিকে অসত্য ও অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রামের প্রেরণা ও চেতনা জাগ্রত রাখবে ভবিষ্যতের মানবগোষ্ঠীর জন্যে।

উক্ত ঘটনার চল্লিশ বৎসর পরে Calcutta Review তে একটি বেনামী নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে তিতুমীরের সমসাময়িক কোম্পানী সরকারের এই বলে সমালোচনা করা হয় যে, তিতুমীরের রাজদ্রোহিতামূলক কর্মতৎপরতার প্রতি সরকার উদাসীন ছিলেন। এ নিবন্ধকারের মতে তিতুমীর রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের অভিলাষী ছিলেন। অতএব সরকারের পূর্বাহ্নে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল। তিনি আরও বলেন যে, তিতুমীর এবং তাঁর

মতাবলম্বীগণ কোম্পানী শাসনের অবসান দাবী করে এবং ইংরেজদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত মুসলমানদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার উত্তরাধিকারী বলে দাবী করে। হান্টারও এরূপ মন্তব্য করেন। (Calcutta Review No. Cl, p. 184 and 179; W. W. Hunter, Bangladesh First Edition 1975, p. 36)।

হান্টার সাহেব হিন্দু জমিদার, নীলকর ও কতিপয় পাদ্রীর অমূলক ও উদ্দেশ্যমূলক অভিযোগগুলিই অন্ধভাবে বিশ্বাস করে তার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। সাইয়েদ আহমদ শহীদ সম্পর্কেও হান্টার অত্যন্ত জঘন্য ও অশালীন মন্তব্য করেছেন। যথাস্থানে তা আলোচনা করা হবে।

বারাসতের অধীন নারিকেলবাড়িয়ার হাংগামার কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্যে J. R. Colvin কে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি প্রামাণ্যসূত্রে গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে যে রিপোর্ট পেশ করেন তা এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি নিশ্চয়তার সাথে বলেন যে, হাংগামাটি ছিল একটি সম্পূর্ণ স্থানীয় ব্যাপার এবং যে সমস্ত অধিবাসী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর সাথে জড়িত ছিল তারা কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলনা। দুই একজন ব্যতীত তারা সকলে ছিল বারাসতের উত্তরাঞ্চলের লোক। তারা ছিল সকলে প্রজা (রায়ত), তাঁতী ও সাধারণ শ্রেণীর মুসলমান। (Board's Collection, 54222, p. 400; Colvin to Barwell, 8 March 1832, para 4; A R Mallick : British Policy & the Muslims in Bengal, p. 87)।

কলভিনের উক্ত রিপোর্টের পরে সরকার বিষয়টির প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি।

ডক্টর এ আর মল্লিক Board's Collection এবং Bengal Criminal Judical Consultations-এর বরাত দিয়ে বলেন যে, কোম্পানীর সৈন্য পরিচালনা করেন মেজর স্কট্। তিতুমীরসহ প্রায় পঞ্চাশজন নিহত হন এবং ২৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। মৃতদেহগুলি জ্বালিয়ে ফেলা হয়। তিতুমীরের দলের লোকদের বাড়ীঘর লুণ্ঠন করা হয় এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেরকেও গ্রেফতার করা হয়। (Dr. A. R. Mallick : British Policy & the Musims in Bengal, p. 86)।

সর্বমোট ১৯৭ জনের বিচার হয়। তন্মধ্যে গোলাম মাসুমের প্রাণদন্ড, ১১ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ১২৮ জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড হয়।

বিচারকালে চারজনের মৃত্যু হয়। ৫৩ জন খালাস পায়।

তিতুমীরের জ্যেষ্ঠপুত্র সাইয়েদ গওহার আলীর দক্ষিণ বাহু গোলার আঘাতে উড়ে যায় বলে তাকে কারাদন্ড থেকে মুক্তি দেয়া হয়। অন্যপুত্র তোরাব আলী অল্পবয়স্ক ছিল বলে তার দু'বৎসর সশ্রম কারাদন্ড হয়। তৎকালীন সরকার পরে নিজেদের ভ্রম বুঝতে পেরে তিতুমীরের তিনপুত্রের জন্যে ভাতার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু হিন্দুদীগের চেষ্টায় পরে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। (শহীদ তিতুমীর, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ১০০)।

উপরের আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত ঘটনা সরকারের জানা থাকলে হয়তো ব্যাপার এতদূর গড়াতোনা। জমিদারদের মুসলিম বিদ্বেষ, মিথ্যা প্রচারণা, দরিদ্র প্রজাবৃন্দের উপর তাদের অসীম প্রভাব এবং তদুপরি দারোগা রামরাম চক্রবর্তীর একতরফা এবং একদেশদর্শী মনগড়া রিপোর্ট কর্তৃপক্ষকে প্রকৃত ঘটনা থেকে দূরে রেখেছে। অপরদিকে জমিদার নীলকরদের সীমাহীন অমানুষিক অন্যায় অত্যাচার এবং সরকারের নিকটে বিচার প্রার্থনা করে ব্যর্থ মনোরথ হওয়ায় প্রতিপক্ষকে চরমপন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল। এছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিলনা। কলভিনের রিপোর্টেও এ কথাই বলা হয়েছে। প্রজাবৃন্দের উপর যে কোন উপায়ে অত্যাচার, উৎপীড়ন করার সীমাহীন ক্ষমতা ছিল জমিদারদের। কলভিন এটাকেই হাংগামার মূল কারণ বলে বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন যে এমতাবস্থায়, যেখানে দোষী ব্যক্তি প্রভূত সম্পদের মালিক, সেখানে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। (A. R. Mallick : British Policy & the Muslims in Bengal, p. 88; Board's Collection, 54222, Colvin's Report, para 36)।

একাদশ অধ্যায়

সাইয়েদ আহমদ শহীদের জেহাদী আন্দোলন

সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর জেহাদী আন্দোলন ইতিহাসে ওহাবী আন্দোলন বলে বর্ণিত হয়েছে। কথাটি সম্পূর্ণ সত্যের খেলাপ ও পরিপন্থী। একে নির্ভয়ে বলা যেতে পারে ইতিহাসের এক অতি বিকৃত তথ্য পরিবেশন। বলতে গেলে ওহাবী আন্দোলন বলে কোন আন্দোলনের অস্তিত্বই পৃথিবীর কোথাও ছিলনা। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদী আরবে এক ইসলামী সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁর আন্দোলন ছিল একটি নিছক ইসলামী আন্দোলন। এই আন্দোলনকেই বলা হয়েছে ওহাবী আন্দোলন। এ নাম দিয়েছেন ইসলাম বৈরী ইউরোপীয়গণ। একে বলা হয়েছে WAHABISM অথবা WAHABI MOVEMENT. আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান ইসলামকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম। মুহাম্মদের (সা) দ্বারা প্রচারিত ইসলামকে 'ইসলাম' না বলে তাঁরা বলেছেন 'মুহামেডানিজম্' এবং মুসলমানকে 'মেহোমেডান' (MEHOMEDAN)। বর্তমান শতকের তিনের দশক পর্যন্ত মুসলমানকে সরকারী ভাষায় MEHOMEDAN বলা হতো। শেরে বাংলার প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় একটি সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে MEHOMEDAN শব্দ MUSSALMAN অথবা MUSLIM শব্দ দ্বারা পরিবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাবের ইসলামী আন্দোলনকে শুধুমাত্র ওহাবী আন্দোলনই বলা হয়নি, বরঞ্চ এর প্রতি মুসলমানদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্যে একে চরম ইসলাম বিরোধী বলে প্রচারণা চালানো হয়েছে। ওহাবী আন্দোলনকে ইসলাম বিরোধী ও 'ওহাবী' শব্দ একটা গালি হিসাবে ইতিহাসে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ প্রচারণার দ্বারা কিছু সংখ্যক মুসলমানও প্রভাবিত ও প্রতারিত হয়েছে। তাই কাউকে মুসলিম সমাজে হেয় ও ঘৃণিত প্রতিপন্ন করার জন্যে তাকে 'ওহাবী' বলে গালি দেয়া হয়। বিগত প্রায় তিন শতক যাবত একটা চরম ভুলের মধ্যে কিছু লোক নিমজ্জিত হ'য়ে আছেন। অতএব এর বিশেষ আলোচনা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব

আঠোরো শতকের গোড়ার দিকে আরবে যে একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম সংস্কারক বা মুজাহিদ জন্মগ্রহণ করেন তাঁর নাম ছিল মুহাম্মদ। পিতার নাম আবদুল ওয়াহ্হাব। আরবের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নামের সাথে পিতার নাম সংযুক্ত করা হয় বলে তাঁর পুরা নাম ছিল মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব। ওয়াহ্হাব আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম যার অর্থ পরম দাতা। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব চেয়েছিলেন ইসলামে সবরকম পৌত্তলিক অনুপ্রবেশের মূলোৎপাটন করে খাঁটি তওহীদ বাণীর মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং আরবের সবরকম রাষ্ট্রনৈতিক গোলযোগের অবসান ঘটিয়ে শুধু ইসলামী সাম্য ও মৈত্রীনীতির সূত্রে সমস্ত আরবভূমিকে একরাষ্ট্রে বেঁধে দিতে।

তিনি প্রথমজীবনে হজ্ব করতে গিয়ে মক্কা ও মদিনায় মুসলমানদের অনৈসলামিক আচার অনুষ্ঠান দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন। আরবের তখন এক বৃহৎ অংশ তুরস্ক সুলতানের শাসনাধীন ছিল। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তুর্কীরা বিশেষ করে তুর্কী শাসক শ্রেণী বহু ইউরোপীয় আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছিল। সেসব আরব দেশে এমনকি মক্কা-মদিনায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কবরকে কেন্দ্র করে বিরাট বিরাট সৌধ নির্মিত হয়েছিল এবং মুসলমানরা কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ইহলৌকিক উন্নতি ও পারলৌকিক মংগল কামনা করতো। কবরে বাতি দেয়া, ফুলের মালায় শোভিত করা, নজর-নেয়াজ পেশ করা, মানৎ করা—প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ চলতো। এগুলি ছিল পৌত্তলিকতারই অনুকরণ। মওলানা মাসুউদ আলম নদভী— তাঁর মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব নজদী নামক জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তৎকালে আরব দেশে এমন কিছু বৃক্ষ ছিল যেখানে মুসলমানরা পৌত্তলিকদের অনুকরণে একপ্রকার পূজা পার্বণ করতো। এমনকি হিন্দুদের শিবলিংগ পূজা অপেক্ষাও গর্হিত কাজ করতো। মোটকথা ইসলামের এক অতি বিকৃতরূপ দেখে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব এ সবের বিরুদ্ধে জোরদার আওয়াজ তোলেন। তিনি প্রথম তাঁর এ সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন দামেস্ক শহর থেকে। তুর্কী শাসকশ্রেণীর ইসলাম বিরোধী আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন সোচ্চার। ফলে শাসকশ্রেণীর কোপানলে পড়তে হয় তাঁকে এবং তিনি দামেস্ক থেকে বিতাড়িত হন। অবশেষে

বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ফিরে আপন জন্মভূমি নজদ্ প্রদেশের দারিয়াহ বা দেরাইয়াহ্ নামক স্থানে আসেন। দারিয়াহ্র সর্দার বা অধিপতি তাঁর সংস্কার আন্দোলন সমর্থন করেন এবং তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেন। অতঃপর দারিয়াহ্ অধিপতি মুহাম্মদ বিন সউদের সহায়তায় একাধারে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন এবং আরব লীগ গঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলন চলতে থাকে।

তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে একথা সত্য যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যতীত ইসলামের পূর্ণ বাস্তবায়নও সম্ভব নয় কিছুতেই। মুহাম্মদ বিন সউদের সাহায্য সহযোগিতায় যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাতে যোগদান করেছিল লক্ষ লক্ষ বেদুঈন। তাঁর ফলশ্রুতিস্বরূপ বার বার বিপর্যয়ের ভেতর দিয়েও অবশেষে গোটা আরব দেশ তাদের করতলগত হয়। সউদ বংশের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল সমগ্র আরবভূমিতে এবং তার জন্যেই এ দেশটির পরিচয় হিসাবে বলা হ'য়ে থাকে সউদী আরব। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের সার্থকতাই এই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের প্রত্যক্ষ ফল।

উপরে উক্ত হ'য়েছে দারিয়াহ্র অধিপতি মুহাম্মদ বিন সউদ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের কন্যাকে বিবাহ করেন। অল্পদিনের মধ্যে মরু অঞ্চলে বিশেষ করে নজদে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তাঁর জামাতা মুহাম্মদ বিন সউদের হাতে সমস্ত শাসনক্ষমতা অর্পণ করে শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে অর্থাৎ ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের সর্বময় কর্তা রয়ে যান। তারপর তুর্কী শাসকদের সাথে বার বার সংঘর্ষ হ'য়েছে। জয়-পরাজয় উভয়ের ভাগ্যেই ঘটেছে। সমগ্র নজদে তাঁদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অনেকের মতে, চতুর্থ খলীফার আমলের পর এই সর্বপ্রথম কোরআনকে ভিত্তি করে একটি দেশে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলে। অনেকের মতে, যেমন মসউদ-আলম নদ্ভী— মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব ছিলেন একজন সার্থক মুজাদ্দিদ যিনি তাঁর মুজাদ্দিদিয়াতের বা সংস্কার কাজের পরিপূর্ণ সাফল্য জীবদ্দশায় দেখে গেছেন।

এখন তাঁর সংস্কার আন্দোলনের মূলনীতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। আগেই বলা হ'য়েছে যে, তিনি ইসলামের বিপরীত কোন নতুন মতবাদ প্রচার করেননি, যার জন্য তাঁর মতবাদকে ওয়াহ্হাবী মতবাদরূপে আখ্যায়িত

করা যায়। আরব দেশে ওয়াহ্হাবী নামাংকিত কোন মযহাব বা তরীকার অস্তিত্ব নেই। এ সংজ্ঞাটির প্রচলন আরব দেশের বাইরে এবং এই মতানুসারীদের বিদেশী দুশমন, বিশেষ করে তুর্কী ও ইউরোপীয়ানদের দ্বারা ওয়াহ্হাবী কথাটির সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যেই প্রচলিত। কোন কোন ইউরোপীয় লেখক, যেমন নীবর (Neibuhr) মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবকে পয়গম্বর বলেছেন। এসব উদ্ভট চিন্তারও কোন যুক্তি নেই। প্রকৃত পক্ষে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব কোন মযহাবও সৃষ্টি করেননি। চার ইমামের অন্যতম ইমাম আহমদ বিন্ হাম্বলের মতানুসারী ছিলেন তিনি এবং তাঁর প্রযত্ন ছিল বিশ্বনবীর ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামের যে রূপ ছিল, সেই আদিম সহজ সরল ইসলামে প্রত্যাবর্তন করা। তাঁর আরও শিক্ষা ছিল, ধর্ম কোন শ্রেণী বিশেষের একাধিকার নয়। কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা দেয়াও কোন ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষের নয়, কোন যুগ বিশেষের মধ্যেই সীমিত নয়, প্রত্যেক আলেম ব্যক্তির অধিকার আছে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা দেয়ার। তাঁর শিক্ষা ও মতবাদ প্রধানতঃ ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর শিষ্যদের পুঁথিতে বিধৃত মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত। যদিও তিনি অনেক বিষয়ে তাদের সংগে একমত নন। —(ওহাবী আন্দোলন, আবদুল মওদুদ, পৃঃ ১১৬)।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের সংস্কার আন্দোলনের মূলনীতি সমূহ, যা তিনি তাঁর 'কিতাবুত্তাওহীদে' সন্নিবেশিত করেছেন, মোটামোটি নিম্নরূপঃ—

১। আল্লাহ্ ছাড়া এমন আর কোন সত্তা বা শক্তি নেই যার এবাদত বন্দেগী, দাসত্ব আনুগত্য, হুকুম শাসন পালন করা যেতে পারে।

২। অধিকাংশ মানুষই তাওহীদপন্থী নয়। তারা অলী দরবেশ প্রভৃতির নিকটে গিয়ে তাদের আশীষ প্রার্থনা করে। তাদের এসব আচার অনুষ্ঠান কোরআনে বর্ণিত মক্কার মুশ্‌রিকদের অনুরূপ।

৩। এবাদতকালে নবী, অলী, ফেরেশ্‌তাদের নাম নিয়ে প্রার্থনা করা শির্ক বা বহু দেবতার পূজা অর্চনার মতোই নিন্দনীয়।

৪। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো মধ্যবর্তিতার আশ্রয় গ্রহণ করা শির্ক মাত্র।

৫। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানৎ করাও শির্ক।

৬। কোরআন হাদীস এবং যুক্তির সহজ ও অবশ্যম্ভাবী নির্দেশ ব্যতীত অন্য জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কুফর।

৭। কদর বা তাক্‌দীরে বিশ্বাসের প্রতি সন্দেহ পোষণ নাস্তিকতা।

উপরন্তু যেসব বিদ্‌আৎ (দ্বীন ইসলামে এমন সব নতুনত্ব যা কোরআন হাদীস সম্মত নয়, অথবা স্বয়ং নবী কর্তৃক প্রবর্তিত নয়), শির্ক ও কুফরের প্রশ্রয় দেয় তিনি সেসবের মূলোচ্ছেদকরণে বিশেষ জোর দেন। তাঁর মৌল শিক্ষাই ছিল লাশরীক আল্লাহ্র প্রতি একান্ত ও অকুণ্ঠ নির্ভরশীলতা এবং স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে যাবতীয় মধ্যস্থতার অস্তিত্ব বা চিন্তার বিলোপ সাধন। যে মধ্যস্থতার নাম করে পীরবাদ বা মুসলমানী ব্রাহ্মণ্যবাদ কায়েম করে মুসলমানদেরকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হ'য়েছিল। পীর ও অলীদের প্রতি ও তাদের কবরে মুসলমানের পূজা, এমনকি হযরত মুহাম্মদের (সা) আধাঐশ্বরিক রূপকল্পনার বিলোপ সাধন তিনি করতে চেয়েছিলেন।(এ মতবাদের অনুসরণও মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন,

আহমদের ঐ মিমের পর্দা

রেখেছে তোমায় আড়াল করে।)

কবরে সৌধ নির্মাণ পৌত্তলিকতারই শেষ চিহ্ন মাত্র যে সম্পর্কে আল্লাহর নবী কঠোর ভাষায় সতর্কবাণী করে গেছেন। সেজন্যে সেসব ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়া হ'য়েছিল যাতে করে মুসলমানরা সেগুলিকে ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাতে অথবা সেখানে গিয়ে নিজের মংগল কামনা করতে না পারে।

তাঁর এ আন্দোলনের স্বাভাবিক ফল এই ছিল যে, দুইশ্রেণীর মুসলমান অত্যন্ত খড়গহস্ত হ'য়ে পড়ে। এক—কবরের পার্শে দাঁড়িয়ে যারা ইহলৌকিক উন্নতি ও পারলৌকিক মংগলকামনা করতো এবং কবরের হেফাজত তথা খেদমতের নামে দর্শনপ্রার্থীদের নিকট থেকে টাকা পয়সা আদায় করে জীবিকা অর্জন করতো। দুই— তুর্কী শাসকগণ। কারণ মক্কা ও মদীনার উপর থেকে তাদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হ'য়েছিল। তুর্কীর সুলতান ছিলেন তখন মুসলিম বিশ্বের স্বমনোনীত খলীফা। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ, বলতে গেলে দুটি মাত্র তীর্থস্থান মক্কা ও মদীনা তাদের হস্তচ্যুত হ'য়ে পড়ায় খেলাফতের দাবী অর্থহীন হ'য়ে পড়ে। বাহ্ বলে মক্কা মদীনা পুনরুদ্ধার করা সহজ ছিলনা বলে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকারের অমূলক ও মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে বিশ্বের মুসলমানদেরকে ক্ষিপ্ত করে তোলা হলো। তুর্কী শাসকদের চরিত্র

যতোই ইসলাম বিরুদ্ধ হোক না কেন, মুসলমানদের খলীফার পক্ষ থেকে যখন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী হলো তখন মুসলমানরা তাই অকপটে বিশ্বাস করলো। এ অপপ্রচারের ফলে ১৮০৩ থেকে ১৮০৬ সাল পর্যন্ত বাইরের দেশগুলি থেকে মক্কায় হাজীদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের মতো মুসলমানদের নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন বাংলা ভারতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ, হাজী শরীয়তুল্লাহ্, তিতুমীর, প্রভৃতি মনীষীগণ। ব্রিটিশ সরকার এবার তাঁদের স্বার্থে এসব মনীষীকে ওয়াহ্হাবী বলে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে মাতলেন। এর চেয়ে সত্যের অপলাপ ও নির্মম পরিহাস আর কি হতে পারে?

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ বলেনঃ—

একবার যদি মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিধর্মী বিদ্বেষ জাগরিত হয় তাহা হইলে এশিয়া ও আফ্রিকায় তাহাদের সাম্রাজ্য তাসের ঘরের ন্যায় ভাঙিয়া পড়িবে আশংকা করিয়া সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ইসলামের জন্য মায়াকান্না শুরু করিয়া দেন। তাই দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যখনই কোন মুসলমান দেশপ্রেমিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন তখনই ইংরেজরা তাহাকে 'ওহাবী' আখ্যা দিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে তাঁহার বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ প্রদান ও বিকল্পে নির্যাতনের ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদের বশংবদ আলেমদের নিকট হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে ফতোয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন, তুর্কীদের বেতনভুক শেরিফের আজ্ঞাবহ কর্মচারীর নিকট হইতে নিজেদের জন্য সার্টিফিকেট আনাইয়াছেন। এমনকি, খাস আরব দেশ হইতেও প্রচারক আনিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য নিজেদের রচিত অলীক কাহিনী তাহার মুখে প্রচার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণকে দিয়া তাহারা প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের সাহায্যে প্রতি জেলায় 'আনজুমনে ইসলামিয়া', 'হেজবুল্লাহ সমিতি' ও 'আনজুমনে এশায়াতে ইসলাম' প্রভৃতি কায়েম করাইয়া দেশপ্রেমিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে উহাকে ব্যবহার করাইয়াছেন।. . .ইহার বিনিময়ে আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে জান্নাতে ফেরদৌস বখ্‌শিশ করেন কিনা বলা যায় না। তবে এ কথা সত্য যে, এই ইসলাম রক্ষা অভিযানে তাহারা শত শত

মুসলমানকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাইয়া অথবা সুদূর আন্দামানে নির্বাসনে পাঠাইয়া অন্ততঃপক্ষে তাহাদের পারলৌকিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে পারিয়াছে। (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, পৃঃ ৬০-৬১)।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব ও তদীয় জামাতা মুহাম্মদ বিন সউদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের উত্থানপতনের ঘটনাপঞ্জী

১৭০৩ খৃঃ— মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের জন্ম আরবের উয়াইনা অঞ্চলে তামিম গোত্রের শাখা বানু সিনান বংশে।
১৭৪৭ খৃঃ— রিয়াদের শেখের সাথে সংঘর্ষ
১৭৭৩ খৃঃ— রিয়াদের শাসক দাহ্হাম পরাজিত।
১৭৮৭ খৃঃ— মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের এন্তেকাল।
১৭৯১ খৃ— মক্কা আক্রমণ
১৭৯৭ খৃঃ— এশিয়ার সমগ্র তুর্কী অধিকার মুহাম্মদ বিন সউদের পৌত্র সউদের হাতে।
১৮০৩ খৃঃ— মক্কা দখল।
১৮০৪ খৃঃ— মদীনা দখল।
১৮০৬ খৃঃ— মক্কা পুনর্দখল।
১৮১১ খৃঃ— উত্তরে আলেপ্পো থেকে ভারত মহাসাগর এবং পারস্য উপসাগর ও ইরাক সীমান্তের পরবর্তী পূর্বে লোহিত সাগর পর্যন্ত সউদের হাতে।
১৮১১ খৃঃ— মিসরবাহিনী মদীনা দখল করে।
১৮১২ খৃঃ— মিসরবাহিনী মক্কা দখল করে।
১৮১৪ খৃঃ— সউদের মৃত্যু।
১৮১৮ খৃঃ— দারিয়াহ্র রাজধানী বিধ্বস্ত হয়।
১৯০৪ খৃঃ— পুনঃপ্রতিষ্ঠালাভ। সউদ পৌত্র আবদুল আযীয বিন আবদুর রহমান নজ্‌দে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন।
১৯২৪ খৃঃ— মক্কা দখল।
১৯২৫ খৃঃ— মদীনা ও জেদ্দা অধিকার করেন।

এভাবে প্রায় সমগ্র জাজিরাতুল আরব (কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমীরি অধিকার ব্যতীত) সউদী আরব নামাংকিত আরবী জাতীয় রাষ্ট্রে রূপায়িত হয় যা এখনো

বিদ্যমান। (ওহাবী আন্দোলন, আবদুল মওদূদ পৃঃ ১১২–১৫ দ্রঃ)।

হান্টার সাহেব তাঁর গ্রন্থে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তাও উদ্ধৃত করা হলো।

রক্তের অক্ষরে তাঁরা যে নীতিমালা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা ছিল মহান। সর্বপ্রথম তাঁরা যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন, তা হলো এই যে, তুর্কীরা তাদের ইন্দ্রিয় পরায়ণতার দ্বারা পবিত্র নগরীকে (মক্কা) কলুষিত করেছিল। বহুবিবাহেও তারা পরিতৃপ্ত হতে পারেনি। হজ্বে আগমন কালে তারা সংগে নিয়ে আসতো জঘন্যতম চরিত্রের স্ত্রীলোক এবং তারা এমন সব কুকর্মে লিপ্ত হতো যেগুলি কোরআনে নিষিদ্ধ ছিল সম্পূর্ণরূপে। পবিত্র নগরীর রাজপথে তারা প্রকাশ্যে মদ ও আফিম খেতো। তুর্কী তীর্থ যাত্রীদল মক্কার পথে ঘৃণ্যতম লাম্পট্যের আচরণ করতো। মুহাম্মদ বিন্ আবদুল ওয়াহ্হাব সর্বপ্রথম এসব জঘন্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের আওয়াজ তোলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর মতামতগুলি একটি ধর্মীয় মতবাদের রূপ ধারণ করে এবং ওয়াহ্হাবী মতবাদ নামে বিস্তার লাভ করে।[1] ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশই এখন এ মতাবলম্বী। এ মতবাদ অনুসারে মুহাম্মদের প্রবর্তিত ধর্মকে বিশুদ্ধ আস্তিকতায় পরিণত করা হ'য়েছিল এবং সাতটি নীতির উপরে তা ছিল স্থাপিত। এক—এক আল্লাহ্‌তে অবিচল আস্থা। দুই—স্রষ্টা ও মানুষের মাঝখানে কোন মধ্যস্থতাকারীর অস্তিত্ব অস্বীকার। অলী দরবেশদের নিকটে প্রার্থনা করা, এমনকি মুহাম্মদের আধা ঐশ্বরিক রূপকল্পনাও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তিন—মুসলমানী ধর্মগ্রন্থের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার অধিকার এবং পবিত্র গ্রন্থের ধর্মযাজকসুলভ ব্যাখ্যা বর্জন। চার—মধ্য ও আধুনিক যুগের মুসলমান যেসব রসম রেওয়াজ ও বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান পবিত্র তাওহীদ বিশ্বাসের উপর চাপিয়ে দিয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করা। পাঁচ—যে ইমামের নেতৃত্বে প্রকৃত ঈমানদারগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়যুক্ত হবে তাঁর প্রতীক্ষা। ছয়—সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সংগ্রাম করা যে অবশ্য কর্তব্য তা তত্ত্বগত ও বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বদা স্বীকার করা। সাত—আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শকের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য।

---

(১) 'ওয়াহ্হাবী' বা 'ওহাবী' পরিভাষাটি বহির্জগতের বিশেষ করে ইউরোপীয়দের কল্পনা রাজ্যের সৃষ্টি।

হান্টারের মতে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের প্রচেষ্টায় মুহাম্মদের প্রবর্তিত ধর্মকে (অর্থাৎ ইসলামকে) বিশুদ্ধ আস্তিকতায় পরিণত করা হয়েছিল। অর্থাৎ ইসলামের ভিতরে অধর্ম বিধর্ম ও পৌত্তলিকতার যে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তা থেকে ইসলামকে মুক্ত করে সত্যিকার ইসলামী রূপ ও আকৃতি ফিরে আনাই ত তাঁর কাজ ছিল। এতে তিনি প্রকৃত ইসলামের সেবাই করেছেন। এইত প্রকৃত মুসলমানের কাজ। ইসলামের বিকৃত রূপকে পরিবর্তন করে তার প্রকৃত রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই ত যুগে যুগে সংস্কারক আগমন করার ভবিষ্যদ্বাণী ইসলামের নবী করে গেছেন যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'মুজাদ্দিদ' বলা হ'য়েছে। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপকে ইসলাম বিরোধী ও মতবাদকে ইসলাম থেকে পৃথক মতবাদরূপে গণ্য করে 'ওহাবী' মতবাদে আখ্যায়িত করা হলো কেন? ইউরোপীয়দের এবং ভ্রান্তির গহীন সাগরে নিমজ্জিত একশ্রেণীর মুসলমানদের কাছে এর কী জবাব আছে? ইউরোপীয় খৃষ্টানগণ ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি তাদের চিরকালের বিদ্বেষাত্মক মনোবৃত্তির দরুন এমন করতে পারেন। এটা তাঁদের স্বভাবসুলভ— এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু ইসলামকে বিকৃত করে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পৌত্তলিক ও অনৈসলামী আচার অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার আমদানী করে তাকে একটি বাহ্যিক অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মে পরিণত করে যারা তাদের ব্যবসার বাজার জমজমাট করে রেখেছিল এবং এখনো রাখে, তাদের কাছে সত্যিই এর কোন জবাব নেই। চরিত্রহীন ও লম্পট তুর্কী শাসকরা এবং তাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট ও উচ্ছিষ্টভোজী অনুচরবৃন্দ সর্বপ্রথম এই শ্রেষ্ঠ সাধক ও মুজাদ্দিদ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচার শুরু করেন। অতঃপর ব্রিটিশ ভারতে যখন অনুরূপ সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী, তখন স্বার্থান্বেষী ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ তাঁকে 'ওহাবী' নামে আখ্যায়িত করে ভাড়াটিয়া আলেম নামধারী লোকদের দ্বারা তাঁর উপরে ফতোয়ার মেশিনগান থেকে অবিরাম ধারায় গোলাগুলী বর্ষণ করতে থাকে। তবে সাইয়েদ আহমদের জিহাদী আন্দোলন চলাকালে এসব মেশিনগানের গুলীগোলা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'য়েছে। তাই হান্টার বলেছেন 'ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশই এখন এ মতাবলম্বী'।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ

বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীরের মৃত্যুর চার বৎসর পূর্বে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দিল্লী নগরীতে এক অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহ্ আবদুর রহীম ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র পূর্বপুরুষ ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকের রোবংশধর।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর শিক্ষা–দীক্ষা গ্রহণ করেন তাঁর পিতা শাহ্ আবদুর রহীমের নিকটে। পরে তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বার বছর যাবত শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি আরবে গমন করেন এবং মক্কা মদীনায় সুদীর্ঘকাল কাটান। মক্কা মদীনা অবস্থানকালে শাহ্ সাহেব ইজতেহাদের উপযোগী গুণাবলী ও যোগ্যতা অর্জন করেন। শিবলী বলেন, ইবনে রুশদ্ ও ইমাম ইবনে তাইমিয়ার পর মুসলিম জগতের যে চরম অবনতি ঘটেছিল, তাকে পুনরায় উজ্জীবিত করেন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ)। দীর্ঘকাল যাবত কোরআন–হাদীস ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন, গবেষণা এবং বিশেষ করে মক্কা মদীনা সফরের ফলে লব্ধ প্রেরণাই তাঁকে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করার জন্যে সচেষ্ট করে তুলেছিল।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যে অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে ধীরে ধীরে মোগল সাম্রাজ্য তথা ভারতে মুসলিম সুলতানাত ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল এবং ইংরেজ বণিক বেশে এ দেশে আগমন করে ক্রমশঃ এ দেশের মালিক–মোখতার হ'য়ে গেল, এসব কিছুর পট পরিবর্তন হলো শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র চোখের সামনে। এ দৃশ্য শাহ্ সাহেবকে অত্যন্ত ব্যথিত ও পীড়িত করেছিল। তিনি পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের এ অধঃপতনের প্রধান কারণ হলো তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় অধঃপতন।

ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ ও চিন্তা গবেষণার ফলে তাঁর মনোজগতে ইসলামী রাষ্ট্রের এক রূপরেখা প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু তিনি পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন যে, প্রকৃত যোগ্যতা ও গুণাবলীর অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত শুধু বাহুবলে কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর যদি তা কখনো সম্ভবও হয়, তাকে টিকিয়ে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে সত্যিকার ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রের লোক তৈরী হলো

পূর্বশর্ত। কিন্তু এ ধরনের গুণাবলী ও যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের শুধু অভাবই ছিল না, বরঞ্চ মুসলমানরা নানাবিধ জাহেলী বা অনৈসলামী কুসংস্কার জালে ছিল আবদ্ধ। এ বেড়াজাল থেকে মুসলিম সমাজকে মুক্ত করার জন্যে তিনি সর্বপ্রথমে আত্মনিয়োগ করলেন ইসলামী সংস্কার আন্দোলনে। তাঁর আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী সংস্কার সাধন করে ইসলামকে তার প্রাথমিক পবিত্রতা ও জীবনীশক্তিতে ফিরিয়ে আনা এবং দেশের ক্রমবর্ধমান ইংরেজ শক্তিকে ধ্বংস করে পুনরায় ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করা। এ জন্যে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ আরবের মুজাদ্দিদ ও মুজাহিদ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের ন্যায় মুসলমানদের অনৈসলামী রীতি–নীতি, কুসংস্কার ও অনাচারের মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করেন।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ লক্ষ্য করেছিলেন, শরীয়তে–ইসলামের প্রতি তাসাওউফপন্থী সূফীদের উদাসীনতা ও অবজ্ঞা ইসলাম ও মুসলিম সমাজের জন্যে ছিল ক্ষতিকর, তাদের আচরিত বহু অনাচারের ও প্রচারিত ইসলাম বিরুদ্ধ মতবাদের অনুপ্রবেশ মুসলিম ধর্ম জীবনকে করে রেখেছিল কলুষিত ও বিকৃত। ব্যবসায়ী সূফীদের প্রাদুর্ভাব ও পীরপূজা–কবরপূজার প্রথাও ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল। ওয়ালিউল্লাহ্ অবশ্য তাসাওউফের উচ্ছেদ চাননি, তিনি চেয়েছিলেন তার পূর্ণ সংস্কার ও পরিশুদ্ধি। তিনি সূফীবাদকে সংস্কার করে তাকে করতে চেয়েছিলেন কল্যাণমুখী। পেশাদার পীর, ফকীর, কবরপূজা, কেরামতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে তার ওসিয়তনামায় বহু অকাট্য যুক্তি ও নির্দেশ আছে।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ এক শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রব পরিবেশে লোকচরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সংস্কার আন্দোলন বা গঠনমূলক কাজ শুরু করেন। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে একাধারে মুসলিম সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতি ও কুসংস্কারগুলির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করেন এবং অপর পক্ষে তাদের সঠিক কর্মপন্থাও সুস্পষ্ট করে তোলেন। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার মধ্যে ফত্হুল কবীর, 'হুজ্জাতুল্লাহেল্ বালেগা' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মৃত, ঘুমন্ত ও পথভ্রষ্ট জাতিকে লেখনীর বেত্রাঘাতে জীবন্ত ও জাগ্রত করে সঠিক পথে চালাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে এ প্রতিভাবান মনীষী ইহলোক ত্যাগ করেন।

শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (রহ)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ্র এন্তেকালের পর তাঁর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ্ আবদুল আযীয (১৭৪৬–১৮২৩ খৃঃ) তাঁর প্রদর্শিত পথ ধরে সম্মুখে অগ্রসর হন। ভারতীয় আলেম সমাজের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এ দেশকে নির্ভয়ে 'দারুল হরব' বলে ফতোয়া জারী করেন। বিধর্মী ইংরেজ শাসিত দেশে মুসলমানদের সামাজিক ও দ্বীনি অবস্থা কী হবে— এ প্রশ্নটি মুসলমানদের মনমস্তিষ্ককে আলোড়িত করে রেখেছিল। বীর মুজাহিদ শাহ্ আবদুল আযীয উদাত্ত কণ্ঠে ও অকুতোভয়ে ঘোষণা করলেন যে, অনৈসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাধীন ভারত হ'চ্ছে 'দারুল হরব'। এখানে নিশ্চিন্তে ও সন্তুষ্টচিত্তে মুসলমানদের বসবাস করা ঈমানের পরিপন্থী। হয় তাদেরকে জেহাদ করে এ দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে, অন্যথায় হিজরত করে অন্যত্র গমন করতে হবে। তাঁর এ ঘোষণা মুসলমানদের মনেপ্রাণে জেহাদের এক দুর্দমনীয় প্রেরণার হিল্লোল প্রবাহিত করে।

স্বৈরাচারীর প্রভাব থেকে মুসলিম ভারতকে মুক্ত করার আকুল আগ্রহে শাহ্ আবদুল আযীয প্রবর্তন করেন 'তারগীবে মুহাম্মদীয়া' নামে সমাজ সংস্কারক আন্দোলন। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল— যেসব ইসলাম বিরুদ্ধ রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে তার মূলোচ্ছেদ করে মুসলমানদেরকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। এক সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে শাহ্ সাহেব, সারা ভারতে এ আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং এ কাজে নিয়োগ করেন তাঁরই নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল নিঃস্বার্থ ও অক্লান্তকর্মা লোক। কালক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ 'তারগীবে মুহাম্মদীয়া' আন্দোলন একটি জিহাদী আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে এবং অত্যাচারী শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে আযাদীর আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী এবং তাঁর প্রধান সহকর্মী ছিলেন শাহ সাহেবের ভাইপো শাহ্ ইসমাইল শহীদ ও জামাতা মওলানা আবদুল হাই।
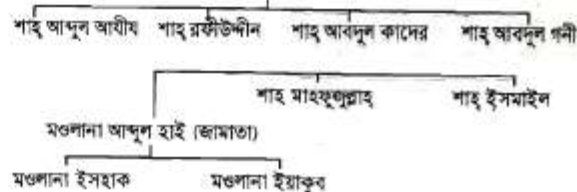
সাইয়েদ আহমদ শহীদ

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট সুসংগঠিত স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠে। এ আন্দোলন পরিচালিত হ'য়েছিল একমাত্র ভারতীয় মুসলমানদের দ্বারাই। এ আন্দোলনের প্রাণশক্তি ছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহ)। এ আন্দোলনকে ইতিহাসে 'ওহাবী আন্দোলন' বলে আখ্যায়িত করা হ'য়েছে অথচ এ ছিল একাধারে ইসলামী ও আযাদী আন্দোলন। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল আসমুদ্রহিমাচলে একটি অখণ্ড স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলা। কিন্তু কতিপয় লোকের চরম বিশ্বাসঘাতকতার দরুন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। তথাপি এ আন্দোলন আগাগোড়া যেরূপ গোপনে ও সুনিপুণ কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়, তা কল্পনাকেও বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে দেয়।

সাইয়েদ আহমদ ৬ই সফর ১২০১ হিজরী (ইং ১৭৮৬) এলাহাবাদের রায় বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনী লেখকগণ তাঁর জন্ম সংক্রান্ত এক বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁর পুণ্যময়ী জননী স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর রক্তে লেখা একখানি কাগজ পত পত করে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাঁর জনৈক নিকটআত্মীয় স্বপ্নের কথা শুনে বল্লেন, চিন্তার কারণ নেই। আপনার গর্ভ থেকে যিনি জন্মগ্রহণ করবেন তিনি হবেন ইতিহাসের একজন অতি খ্যাতনামা ব্যক্তি। —(সাইয়েদ আহমদ শহীদ, গোলাম রসুল মেহের, পৃঃ ৫৬)।

এ স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে। সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও তাঁর অনুসারীদের তাজা খুনে বাংলাদেশ থেকে বালাকোট পর্যন্ত ভারতভূমি রঞ্জিত হয়েছে। তাঁদের সে রক্তলেখা স্মৃতি পরবর্তী এক শতাব্দী কাল পর্যন্ত মুসলমানদেরকে অবিরাম জেহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে, যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে— বিদেশী ও বিধর্মী শাসন-শোষণের নাগপাশ থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত করে।

সাইয়েদ আহমদের বয়স যখন চার বৎসর চার মাস চারদিন তখন সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের প্রথা অনুযায়ী তাঁকে মকতবে পাঠানো হয়। কিন্তু শিশু সাইয়েদ আহমদের শিক্ষার প্রতি কোন অনুরাগই ছিল না।

গোলাম রসূল মেহের বলেন, শৈশবে কেন যে তিনি শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করতেন তা বলা মুশকিল। তবে পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে, তিনি ফারসী ভালোমত রপ্ত করে ফেলেছিলেন এবং অনর্গল এ ভাষায় কথা বলতে পারতেন। আরবী ভাষাও এতটা শিখেছিলেন যে "মেশকাতুল মাসাবীহ্" নিজে নিজেই পড়তে পারতেন। 'হাফেজ', 'বেদেল' এবং অন্যান্য কবিদের কবিতা বলতে পারতেন। কিন্তু তথাপি পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁর বাল্যশিক্ষা সন্তোষজনক ছিল না। তাঁর বড়ো ভাই সাইয়েদ ইব্রাহীম ও সাইয়েদ ইসহাক তাঁর পড়াশুনার জন্যে যথেষ্ট তাকীদ করতেন। কিন্তু পিতা নৈরাশ্য সহকারে বলতেন, "বিষয়টি তার উপরেই ছেড়ে দাও।"

পরবর্তীকালে তিনি দিল্লী গমন করলে, শাহ্ আবদুল আযীয আকবরাবাদী মসজিদে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর শিক্ষার জন্যে শাহ আবদুল কাদেরকে নিযুক্ত করেন। সাইয়েদ আহমদ তাঁর কাছে আরবী ও ফার্সী শিক্ষা করতেন। একথা ঠিক যে, শাহ ইসমাইল অথবা মওলানা আবদুল হাই এর মতো বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতা তিনি লাভ করতে পারেন নি, কিন্তু আরবী ও ফার্সী বলতেও পারতেন এবং সহজেই বুঝতে পারতেন।

মৌলভী সাইয়েদ জাফর আলী নকভী বলেন, শাহ্ ইসমাইল প্রতিদিন ফজর নামাজের পর হাদীস ব্যাখ্যা করে শুনাতেন। সাইয়েদ সাহেবও কোন কোন হাদীসের গুরুত্ব বর্ণনা করতেন এবং শ্রোতাগণ এর থেকে বিশেষ উপকৃত হতেন। —(সাইয়েদ আহমদ শহীদ, গোলাম গোলাম রসূল মেহের, পৃঃ ৫৬,৭১,৭৩)

বাল্যকাল থেকেই সাইয়েদ আহমদ শরীর চর্চায় অভ্যস্থ ছিলেন এবং তিনি ছিলেন অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকারী। শৈশবকাল থেকে তাঁর মধ্যে জেহাদের প্রেরণা জাগ্রত ছিল এবং তিনি প্রায় সমবয়সীদের সামনে বলতেন 'আমি জেহাদ করব' 'আমি জেহাদ করব।' সকলেই এটাকে শিশুসুলভ প্রগলভ উক্তি মনে করতো। কিন্তু তাঁর মা শিশুর এ উক্তিকে সত্য বলে বিশ্বাস করতেন। গোলাম রসূল মেহের 'তাওয়ারিখে আজমিয়ার' বরাত দিয়ে বলেন, বালক সাইয়েদ আহমদ বস্তীর বালকদের মধ্য থেকে একটি 'লশকরে ইসলাম' দল গঠন করতেন এবং উচ্চস্বরে জেহাদী শ্লোগানসহ একটি কল্পিত 'লশকরে কুফফার' এর উপর আক্রমণ চালাতেন এবং 'ইসলামী সেনাদল' জয়লাভ করলো এবং 'কাফের সেনাদল' হেরে গেল বলে চীৎকার করে আকাশ বাতাস মুখরিত করতেন। —(সাইয়েদ আহমদ শহীদ, গোলাম রসূল মেহের, পৃঃ ৫৯)।

এভাবে একদিকে 'ইসলামী সৈন্য' এবং অপরদিকে 'অমুসলিম সৈন্য' কল্পনা করে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ চালিয়ে বাল্যকাল থেকেই সাইয়েদ আহমদ জেহাদীমনা হয়ে গড়ে উঠেছিলেন যার প্রতিফল ঘটেছিল পরবর্তীকালে তাঁর বাস্তব জীবনে।

আঠারো বৎসর বয়সে সাইয়েদ আহমদ আটজনের একটি দলসহ লক্ষ্ণৌ গমন করেন। অন্যান্যদের উদ্দেশ্য ছিল জীবিকা অন্বেষণ করা। কিন্তু সাইয়েদ সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নতর। চার মাস লক্ষ্ণৌ অবস্থানের পর তিনি সাথীদেরকে চাকুরীর বাসনা পরিত্যাগ করে দিল্লীতে ইমামুল হিন্দ শাহ্ আবদুল আযীযের নিকটে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। অতঃপর পায়ে হেঁটে কয়েকদিনের মধ্যে শাহ্ সাহেবের দরবারে উপনীত হন এবং তাঁর হস্তে বয়আত গ্রহণ করে মুরীদ হন।

উপরে বর্ণিত হয়েছে, আকবরাবাদী মসজিদে অবস্থান করতঃ সাইয়েদ আহমদ একাধারে কোরআন হাদীস ফেকাহ প্রভৃতিতে জ্ঞান লাভ এবং শাহ্ আবদুল আযীযের নিকটে আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করতে থাকেন। এভাবে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে পাঁচ বৎসর পর সাইয়েদ আহমদ তাঁর জন্মস্থান রায় বেরেলী প্রত্যাবর্তন করেন। তখন তিনি তেইশ বছরে পদার্পণ করেছেন মাত্র। এ সময়ে তিনি সাইয়েদা যোহরা নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বালিকাকে বিবাহ করেন। পরের বছর তিনি একটি কন্যা সন্তান লাভ করেন। কিন্তু শৈশবকাল থেকেই যে

জেহাদী প্রেরণা তিনি হৃদয়ে পোষণ করছিলেন, সে প্রেরণা তাঁকে ঘরের মায়া মোহ ও প্রেমে বেঁধে রাখতে পারলো না। তিনি গৃহ ত্যাগ করে নবাব আমীর খানের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আমীর খানকে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করে তাঁর সহায়তায় একটি মুজাহিদ বাহিনী গঠন করবেন। তিনি সাত বছর আমীর খানের সেনাবাহিনীতে থাকার পর নিরাশ হয়ে তাঁর সংগ পরিত্যাগ করেন। যাদের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদের পরিকল্পনা, সেই ইংরেজদের সাথে সন্ধিসূত্রে আমীর খান আবদ্ধ হলেন বলে তাঁর আশা-আকাংখা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তিনি শাহ্ আবদুল আযীযের নিকটে যে পত্র দেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো—

"এখানে সেনাবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। নবাব সাহেব ইংরেজদের সাথে মিলিত হয়েছেন। এখানে থাকার আর কোন উপায় নেই।" —(সাইয়েদ আহমদ শহীদ, গোলাম রসুল মেহের, পৃঃ ১০৯)।

নবাব আমীর খানের সেনাবাহিনী পরিত্যাগ করে সাইয়েদ সাহেব পুনরায় শাহ্ আবদুল আযীযের খেদমতে হাজীর হন। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল মুসলমানদেরকে সত্যিকার মুসলমান হিসাবে গড়ে তোলা, প্রথম যুগের মুসলমানদের মধ্যে যে ধরনের জেহাদী প্রেরণা জাগ্রত ছিল তা পুনর্বার উজ্জীবিত করা এবং ভারতে একটি প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা।

সাইয়েদ সাহেব আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে এতো উচ্চস্থান অর্জন করেছিলেন যে, মৌলভী মুহাম্মদ ইউসুফ, শাহ ইসমাইল ও মওলানা আবদুল হাই এর মতো শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ খান্দানের উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁর হস্তে বয়আত গ্রহণ করেন। এর পর থেকে দলে দলে লোক তাঁর মুরীদ হতে থাকেন। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে যে জেহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন তার লক্ষ্য হলো সত্যের পথে সংগ্রাম করে আল্লাহ্ প্রদর্শিত সরল ও সঠিক পথে চলা। এ পথেই তিনি তাঁর অনুগামীদেরকে আজীবন পরিচালনা করেন।

শাহ ইসমাইলের নিকটে লিখিত এক পত্রে জেহাদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে তিনি বলেন—

"জেহাদের উদ্দেশ্য ধন সম্পদ অর্জন অথবা খ্যাতি অর্জন করা নয়। বিভিন্ন অংশ জয় করা বা স্বীয় স্বার্থ পরিতৃপ্ত করা অথবা নিজের জন্য একটা রাজ্য স্থাপন করাও জেহাদের উদ্দেশ্য নয়। জেহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহকে

সন্তুষ্ট করা এবং মুসলিম সমাজে যেসব কুসংস্কার প্রচলিত আছে তাকে বিনষ্ট করা।" —(স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আবু জাফর, পৃঃ ৮৩)

সত্যিকার অর্থে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ব্যতীত না মুসলিম সমাজের কুসংস্কার ও অনৈসলামী আচার অনুষ্ঠান দূর করা সম্ভব, আর না খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব।

এমন মহান ও পবিত্র উদ্দেশ্য যাঁর, যাঁর চরিত্র ছিল নির্মল ও নিষ্কলুষ, যিনি ছিলেন ব্যক্তিস্বার্থের বহু উর্ধে এবং একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন যাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁর সম্পর্কে হান্টার বলেন— "এই বিস্ময়কর প্রভাবের উৎপত্তি কেবলমাত্র অশুভ ভিত্তির উপরেই ঘটেনি, সাইয়েদ আহমদ ধর্মীয় নেতা হিসাবে তাঁর জীবন আরম্ভ করেছিলেন দুটি মহান নীতির প্রবক্তা রূপে। নীতি দুটি হচ্ছে খোদার একত্ব এবং মানুষের সাম্য। সত্যিকার ধর্মপ্রচারকরা সকলেই এই দুই নীতি অনুসরণ করে থাকেন। দেশবাসীর অন্তরে যে ধর্মভাব দীর্ঘকাল যাবত সুপ্ত অবস্থায় ছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত হিন্দু ধর্মের সাহচর্যের দরুন সৃষ্ট কুসংস্কার অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মুসলমানদের মনকে যেভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, এবং ইসলাম ধর্মকে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছিল, সাইয়েদ আহমদ এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নাড়া দিয়েছিলেন মুসলমানদের সেই ধর্মনিষ্ঠ মনের দুয়ারে। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, মানুষের ধর্মবিশ্বাস প্রতিমা পূজার আনুষ্ঠানিকতায় সমাহিত হয়েছে। সাইয়েদ আহমদ একজন দুর্বৃত্ত দস্যু (Bandit) ছিলেন। তিনি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যবর্গ ভণ্ডের (Imposters) দলে পরিণত হয়েছিলেন একথা সত্য হওয়া সত্ত্বেও আমি একথা বিশ্বাস না করে পারি না যে, সাইয়েদ আহমদের জীবনে অন্তর্বর্তী এমন একটা সময় ছিল, যখন সর্বান্তঃকরণে বেদনাকুল হৃদয়ে তিনি তাঁর দেশবাসীর মুক্তি কামনা করেছিলেন এবং তাঁর অন্তর নিবদ্ধ হয়েছিল একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি।"

[W.W. Hunter, The Indian Mussalmans— অনুবাদ আনিসুজ্জামান (কিছু পরিবর্তনসহ) পৃঃ ৩৬]

হান্টার সাহেব তাঁর গ্রন্থে কিরূপ স্ববিরোধী উক্তি করেছেন তা যে কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি অনুধাবন করতে পারবেন। যে ব্যক্তির 'অন্তর নিবদ্ধ হয়েছিল আল্লাহ্র প্রতি' যিনি 'সর্বান্তঃকরণে বেদনাকুল হৃদয়ে তাঁর দেশবাসীর মুক্তি কামনা করেছিলেন, তাঁকে হান্টার বলেছেন দস্যু-দুর্বৃত্ত এবং ভণ্ড।

হান্টার সাহেব আরও বলেন, "ধর্মীয় ধ্যানে তিনি এমন মগ্ন থাকতেন যে, সেটাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে মৃগীরোগ বলে অভিহিত করা যায়।" (ঐ, ঐ)

আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকাকে তাসাওউফের পরিভাষায় বলা হয় মুরাকাবা-মুশাহাদা। হান্টারের মতো খোদায় অবিশ্বাসী পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা তাকে বলেন মৃগীরোগ। ইসলাম বিদ্বেষব্যাধি মনমস্তিষ্ককে কতখানি আক্রান্ত করে রাখলে এ ধরনের অশালীন উক্তি করা যায়, তা সহজেই অনুমেয়। সাইয়েদ আহমদ যদি শুধুমাত্র 'ধর্মীয় ধ্যানে মগ্ন' থাকতেন, তাহলে সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য লেখকগণ তাঁর কোন বিরূপ সমালোচনা করতেন না। কিন্তু যেহেতু তিনি বিধর্মী ও বিদেশী শাসন থেকে 'দেশবাসীর মুক্তি কামনা করেছিলেন', সেজন্যে তাঁদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন 'মৃগী রোগাক্রান্ত', দুর্বৃত্ত ও ভন্ড। এ ছিল তাদের বিদ্বেষদুষ্ট ও বিকৃত মানসিকতারই পরিচায়ক।

শাহ আবদুল আযীয দেহলভীর ভাইপো প্রখ্যাত আলেম শাহ ইসমাইল এবং জামাতা মওলানা আবদুল হাই, সাইয়েদ সাহেবের মুরীদ হওয়ার ফল এই হলো যে, সাইয়েদ সাহেবের খ্যাতি বিদ্যুৎ গতিতে মধ্য ভারতে ছড়িয়ে পড়লো। চারদিক থেকে জনসাধারণ তাঁকে দাওয়াত করতে থাকলো এবং তিনি তাঁর মুর্শেদ শাহ আবদুল আযীযের অনুমতিক্রমে দোয়াব অঞ্চলের গাযিয়াবাদ, মীরাট, মজফফরপুর, সাহারানপুর, দেওবন্দ প্রভৃতি স্থানসমূহে ব্যাপক সফর করেন। প্রায় চল্লিশ হাজার লোক তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে এবং বহু অমুসলমানও তাঁর কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তাঁর এ সফরকালে তিনি শিখদের হাতে মুসলমানদের নির্যাতন কাহিনী প্রথম শুনতে পান এবং তাঁর অন্তর সমবেদনায় বিগলিত হয়। ১৮১৯ সালে তিনি শেষবারের মতো দিল্লী ফিরে যান এবং অল্পকাল পরেই রায়বেরেলী প্রত্যাবর্তন করেন।

রায়বেরেলীতে তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করেন। সেখানে এই খোদাভক্তদের জীবনযাত্রা ছিল আদর্শস্থানীয় এবং দর্শকদের শিক্ষার যোগ্য। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলে প্রায় সত্তর আশীজন লোক সায় নদীর তীরবর্তী সাইয়েদ বংশের পুরাতন মসজিদের চারধারে নিজ হাতে কুটীর তৈরী করে বাস করতেন। সে বৎসর (১৮১৯ খৃঃ) গ্রীষ্মকালে জোর বৃষ্টি নামলো এবং নদীগুলোতে প্রবল প্লাবন এলো। খাবার হয়ে পড়লো দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু সাইয়েদ সাহেব নির্বিকার চিত্তে তাঁর

আশিজন খোদাপ্রিয় ও খোদাভক্ত সংগী নিয়ে এবাদত বন্দেগীতে, লোকসেবা ও প্রচার কার্যে দিনরাত ব্যস্ত রইলেন। তাঁর তখনকার কর্মব্যস্ততায় হযরত ঈসার (আ) 'সারমন অব দি মাউন্টের' বিখ্যাত উপদেশাবলীর আক্ষরিক প্রতিপালনই লক্ষ্য করা যায় ঃ তোমার নিজের জীবনে কি খাবে ও কি পান করবে সে বিষয়ে কোন চিন্তা করোনা— এমনকি দেহের চিন্তাও করোনা যে, কি পরবে। কিন্তু আল্লাহর প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর, তাহলে তোমার এ সবই হবে।

—(ওহাবী আন্দোলন, আবদুল মওদূদ, পৃঃ ১৫৪-৫৫)

উপরোক্ত দলে ছিলেন ইসলাম জগতের বহু জ্ঞান-জ্যোতিক যথা হুজ্জাতুল ইসলাম মওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাইল, শায়খুল ইসলাম মওলানা আবদুল হাই, কোতব-ই-ওয়াক্ত মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ প্রভৃতি। শাহ ইসমাইল তাঁর অসীম জ্ঞানগরিমা ও পান্ডিত্যসহ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপন পীর ও মুর্শেদের সাথে ছায়ার মতো ছিলেন এবং তাঁর সংগেই শাহাদতের অমৃত পান করেন। প্রাতঃকালে প্রচারণা, ওয়াজ নসিহত, কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যাদান, দিবাভাগে কঠোর দৈহিক পরিশ্রম এবং সারারাত তাহাজ্জুদ ও এবাদত বন্দেগীতেকাটানো— এ ছিল এসব খোদাপ্রেমিকদের দৈনন্দিন কর্মসূচী।

সাইয়েদ সাহেবের শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্ম থেকে ভন্ডামী ও জাঁকজমক দূর করা এবং জীবনের প্রত্যেক স্তরে বিশ্বনবীর সহজ সরল জীবনধারা অনুসরণ করা। ধর্ম বিশ্বাসে তিনি ছিলেন পুরাপুরি তাওহীদপন্থী, আল্লাহর সার্বভৌমত্বে অকুন্ঠ বিশ্বাসী, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সুন্নাহর একনিষ্ঠ পাবন্দ। সব রকম শির্ক থেকে দূরে থাকা, যেমন পীর আউলিয়ার কাছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মংগল কামনা, গায়েবী মদদ প্রার্থনা করা, বিভিন্ন প্রকারের কবর পূজা করা, পৌত্তলিক ও অন্যান্য বিধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা, প্রভৃতি। তিনি ইসলামকে নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত করার চেয়ে প্রকৃত সাধু জীবন যাপনের দিকেই বেশী জোর দিতেন— কারণ তার ফলেই মানুষ একটা মহৎ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং সকল ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহরই করুণার উপরে হয় নির্ভরশীল। একথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, তিনি নিজের ইচ্ছা ও আশা-আকাংখাকে আল্লাহর ইচ্ছা ও মরযীর উপরে একান্তভাবে সুপর্দ করেছিলেন, যার জন্যে তিনি তাঁর জীবনের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহরই ইচ্ছানুযায়ী চলতে প্রস্তুত থাকতেন।

সাইয়েদ সাহেব তাঁর অভীষ্ট পথে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে হজ্বে বায়তুল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর সাথে পবিত্র হজ্বে শরীক হওয়ার জন্যে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ তাঁর পাশে জমায়েত হতে লাগলো। ১২৩৬ হিঃ ৩০শে শাওয়াল, ই. ১৮২১ এর জুলাই মাসে প্রায় চারশো নারী পুরুষের এক বিরাট কাফেলা তাঁর সাথে হজ্বের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করলো। এলাহাবাদ পৌছতে পৌছতে কাফেলা সাতশোতে দাঁড়ালো। দলে দলে মানুষ তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগলো। তিনি মানুষকে সত্যিকার মুসলমানী জীবন যাপনের আহবান জানালেন এবং হজ্বের প্রয়োজনীয়তাও ব্যাখ্যা করেন।

হজ্বকাফেলা নৌকা যোগে এলাহাবাদ থেকে বেনারস, মীর্জাপুর, চুনারগড়, গাজীপুর, দানাপুর, ফুলওয়ারী শরীফ, প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করে আযীমাবাদ পৌছে।

আযীমাবাদ অবস্থানকালে তিব্বতের একটি দল তাঁর সাথে দেখা করে। তিনি তাদেরকে তিব্বতে ইসলামী দাওয়াতের কাজ সুপর্দ করেন এবং বলেন যে, অসীম ধৈর্য সহকারে এ কাজ করে যেতে হবে। এভাবে তিব্বতেও সাইয়েদ সাহেবের দ্বীনের দাওয়াত প্রচার হতে থাকে।

আযীমাবাদ থেকে হজ্বকাফেলা হুগলী পৌছলে কোলকাতা নিবাসী জনৈক মুন্সী আমীনুদ্দীন গোটা কাফেলাকে তাঁর মেহমান হিসাবে কোলকাতায় নিয়ে আসেন। এখানে চারদিক থেকে খোদাপ্রেমে পাগল হাজার হাজার নারী পুরুষ তাঁর মুরীদ হন। বহুলোক হজ্বের জন্যে বহু হাদিয়া ও উপঢৌকন পেশ করেন। সাইয়েদ সাহেবও তাঁর সুললিত ও অমিয় ভাষণে তাঁদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণ করেন। গোলাম রসুল মেহের তাঁর গ্রন্থে হজ্ব সফরের আগাগোড়া বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু কোলকাতা থেকে জাহাজ যোগে মক্কা রওয়ানার তারিখ লিপিবদ্ধ করেন নি।

সাইয়েদ সাহেবের কাফেলায় মোট সাত শ' তিপ্পান্ন জন হজ্বযাত্রী ছিলো। দশটি জাহাজে তাঁদেরকে বিভক্ত করে নেয়া হয়। সাইয়েদ সাহেব 'দরিয়া বাকা' নামক একটি পুরাতন জাহাজে দেড়শ' যাত্রীসহ যাত্রা করেন। ভালো ভালো জাহাজগুলি অন্যান্যদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেন।

রায় বেরেলী থেকে রওয়ানা হওয়ার দশ মাস পর ১২৩৭ হিঃ ২৮ শে শা'বান, ইং ১৮২২ সালের ২১শে মে কাফেলাসহ সাইয়েদ সাহেব পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন।

হজ্বের পর সাইয়েদ সাহেব কয়েক মাস মক্কায় অবস্থান করেন। গোটা রমযান মাস হারাম শরীফে কাটান। অতঃপর যিলকদ মাসের প্রারম্ভে গৃহের উদ্দেশ্যে জিদ্দা পরিত্যাগ করে ২০শে যিলহজ্ব বোম্বাই পৌছেন। বোম্বাই থেকে কোলকাতা এবং অতঃপর ইং ১৮২৪ সালের ২৯ শে এপ্রিল আপন জন্মস্থান রায়বেরেলী পৌছেন।

হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যেখানেই তিনি যান, অসংখ্য লোক তাঁকে এক নজর দেখার জন্যে এবং তাঁর পবিত্র হস্তে বয়আত করার জন্যে ভীড় করতে থাকে। হাজার হাজার লোক তাঁর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর দলভুক্ত হয়ে যায়।

রায় বেরেলী পৌছার পর সাইয়েদ সাহেব সর্বাত্মক সংগ্রাম বা জেহাদের প্রস্তুতি করতে থাকেন। মুসলমানদেরকে অনৈসলামী কুসংস্কারমুক্ত করে খাঁটি তৌহীদপন্থী বানাবার জন্যে সংস্কার সংশোধনের কাজ শুরু করেন শাহ ইসমাইল। তাঁর প্রণীত "তাক্‌বিয়াতুল ঈমান" এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ। অবশ্য পীরপূজা ও কবরপূজাকে ভিত্তি করে যারা তাদের ব্যবসা জমজমাট করে রেখেছিল, তাদের পক্ষ থেকে বিরোধিতাও করা হয়েছিল।

সাইয়েদ সাহেবের যখন জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়েছিল তখন তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন, এ দেশের বিরাট মোগল সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ ও ধ্বংস হয়ে গেছে। তার ধ্বংসস্তূপের উপর যে দু'চারটি মুসলমান রাষ্ট্র মাথা তুলেছিল, তাও শেষ হয়ে গেছে। ইংরেজ গোটা ভারতের উপরে তার আধিপত্য বিস্তার করে থাকলেও একটি বিরাট অঞ্চলে শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানরা শুধু রাজ্য হারায় নাই, আপন দ্বীন ও 'সেরাতে মুস্তাকীম' থেকে বহু দূরে সরে পড়েছে। তাদের আকীদাহ বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও আচার অনুষ্ঠান অনৈসলামী চিন্তাধারা ও ধর্মকর্মের দ্বারা প্রভাবিত। মুসলমান আমীর-ওমরা যাঁরা অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁরা ভোগবিলাসে লিপ্ত এবং তাদের জীবনের লক্ষ্য এ ছাড়া আর অন্য কিছু ছিল না যে— যেমন করেই হোক তাদের জীবনের সুখ সম্ভোগের উপায় উপাদানগুলি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। তার জাতীয় পরিণাম যা কিছুই হোক না কেন, এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ তাদের ছিল না। জনগণের মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই ছিল যেন তাদের উপরে বজ্রপাত হয়েছে এবং তারা জ্ঞান ও সম্বিতহারা হয়ে পড়েছে, অথবা প্রবল ভূকম্পন শুরু হয়েছে এবং তারা হয়ে পড়েছে দিশাহারা।

যাদের কিছু জ্ঞান বুদ্ধি ছিল, তারা কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছিল না। অন্ধকার ভবিষ্যতকে তারা ভাগ্যের লিখন মনে করে চুপচাপ হাত পা গুটিয়ে বসে ছিল এটা মনে করে যে, যা হবার তা হবেই। কিন্তু তরী যখন নদীবক্ষে ঘূর্ণাবর্তে পতিত হবে, তার পাল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, নংগর কোন কাজে আসবে না, এবং কর্ণধারেরও কোন সন্ধান পাওয়া যাবে না তখন আরোহীদের জীবন রক্ষার কোন্ আশা আর বলবৎ থাকবে? মুসলমানরা তখন এমনি এক নৈরাশ্যের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল।

মুসলমানদের জাতীয় জীবনের এমনি এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে সাইয়েদ সাহেব তাঁর জ্ঞানচক্ষু খোলেন। তিনি দেখলেন তাঁর সম্মুখে মাত্র তিনটি পথই উন্মুক্ত রয়েছে।

এক– হক্‌কে পরিত্যাগ করে বাতিলের সাথে সম্পর্ক সম্বন্ধ স্থাপন করা।

দুই– হক্‌কে পরিত্যাগ না করা। বরঞ্চ হকের সংগে জড়িত থাকতে গিয়ে যেসব বিপদ আপদ ও দুঃখ দারিদ্র্য আসবে, তা নীরবে সহ্য করা।

তিন– পুরুষোচিত সাহস ও শৌর্যবীর্য সহকারে বাতিলের মুকাবিলা করতঃ এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করার আপ্রাণ চেষ্টা করা— যাতে করে হক্বের জন্যে বিজয় সাফল্য সূচিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

প্রথমটি হলো মৃত্যুর পথ, জীবনের পথ নয়। দ্বিতীয়টির পরিণাম ফল এই হতে পারে যে ক্রমশঃ ধুঁকে ধুঁকে এবং যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার ভিতর দিয়ে জাতির জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। তৃতীয় পথটিই হলো জাতীয় আত্মমর্যাদার পথ, বীরত্ব ও সৎ সাহসের পথ। নবজীবন লাভ করে আত্মমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ। সাইয়েদ সাহেব এই তৃতীয় পথটিই অবলম্বন করেছিলেন। এ পথে চলার সকল যোগ্যতা ও গুণাবলী তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

মক্কা শরীফ থেকে রায় বেরেলী প্রত্যাবর্তনের পর থেকে কয়েক বৎসর তিনি জেহাদের প্রস্তুতি ও প্রচারণা চালান। তিনি দেশের ধর্মীয় নেতাদের নিকট পত্র পাঠালেন ফরয হিসাবে জেহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে। তিনি স্বয়ং এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমাজ সংস্কার ও সংগঠন করতে হলে শক্তি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। তিনি কতিপয় বিশিষ্ট মুসলমানের নিকটে সর্বতোভাবে জেহাদে অংশগ্রহণ করার ও সাহায্য করার আবেদন জানান। একখানি পত্রে তিনি নবাব সুলেমানজাকে লিখেছিলেন ঃ

আমাদের বরাতের ফেরে হিন্দুস্থান কিছুকাল খৃষ্টান ও হিন্দুদের শাসনে এসেছে এবং তারা মুসলমানদের উপর ব্যাপকভাবে জুলুম শুরু করে দিয়েছে। কুফরী ও বেদাতীতে দেশ ছেয়ে গেছে এবং ইসলামী চালচলন প্রায় উঠে গেছে। এসব দেখে শুনে আমার মন ব্যথায় ভরে গেছে। আমি হিজরত করতে অথবা জেহাদ করতে মনস্থির করেছি।

—(ওহাবী আন্দোলন, আবদুল মওদূদ, পৃঃ ১৫৭)

সাইয়েদ আহমদ জেহাদ বলতে বুঝিয়েছেন ঃ

"যদি কোন মুসলমান অধ্যুষিত দেশ অমুসলমানদের অধীনে আসে, তাহলে সে দেশের প্রতিটি মুসলমান নর–নারীর উপরে জেহাদ ফরযে আইন হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের উপরে জেহাদ হয়ে পড়ে ফরযে কেফায়া।"

শাহ ইসমাইলকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

"জেহাদের উদ্দেশ্য ধন–সম্পদ অর্জন বা খ্যাতিলাভ করা নয়। বিভিন্ন অংশ জয় করা বা স্বীয় স্বার্থ পরিতৃপ্ত করা অথবা নিজের জন্যে একটা রাজ্য স্থাপন করাও জেহাদের উদ্দেশ্য নয়। জেহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং মুসলিম সমাজে যেসব কুসংস্কার প্রচলিত আছে তা বিনষ্ট করা।"

—(স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আবু জাফর, পৃঃ ৮৩)

সাইয়েদ সাহেব আল্লাহ্‌র পথে জেহাদকে তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে এবং পরকালে মুক্তির একমাত্র পথ হিসাবে গ্রহণ করেন। শুধু নিজের জন্যেই নয় জেহাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তিনি দেশে ও বিদেশে বহু মুসলিম শাসক ও আমীর ওমরাহ্‌র কাছে তাঁর জ্বালাময়ী ভাষায় বহু পত্র লিখেন। তাঁর বহু পত্রের মধ্যে কতিপয় পত্রের উল্লেখ করেছেন গোলাম রসুল মেহের তাঁর গ্রন্থে। সাইয়েদ সাহেব নিম্নলিখিত শাসকদের কাছে পত্র প্রেরণ করেন ঃ

১। আমীর দোস্ত মুহাম্মদ খান বারাকজাই– কাবুল।
২। ইয়ার মুহাম্মদ খান– পেশাওর।
৩। সুলতান মুহাম্মদ– কোহাট ও বান্নু।
৪। সাইয়েদ মুহাম্মদ খান– হাশ্‌ত্‌নগর।
৫। শাহ্ মাহমুদ দুররানী– হিরাট।
৬। জামান শাহ্ দুররানী

৭। নসরুল্লাহ– বোখারা।

৮। সুলায়মান শাহ– চিত্রাল।

৯। আহমদ আলী– রামপুর।

১০। মুহম্মদ বাহাওয়াল খান আব্বাসী নসরৎ জং– বাহাওয়ালপুর।

উপরন্তু ভারতের অত্যন্ত প্রভাবশালী ত্রিশ–পঁয়ত্রিশজন আমীর ওমরাহ্‌র নিকটেও তিনি জেহাদে যোগদানের জন্যে এবং সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতার জন্যে পত্র দ্বারা আহবান জানান। তাঁদের মধ্যে গোয়ালিয়রের জনৈক হিন্দু রাজা হিন্দু রাওয়ের নিকটেও তিনি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের মর্ম নিম্নরূপ :

"বিদেশী ব্যবসায়ীরা এ দেশের শাসক হয়ে বসেছে। তারা আমাদেরকে সকল দিক দিয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের কর্ণধার যারা তারা এখন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এমনি অবস্থায় নিতান্ত কর্তব্যের খাতিরে বাধ্য হয়ে কতিপয় নিঃস্ব ও দরিদ্র লোক আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে তাঁর দ্বীনের খেদমতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এরা দুনিয়ার ধনসম্পদ ও পদ মর্যাদার প্রত্যাশী নয়। তাদের উদ্দেশ্য হলো যে, জয়লাভ করলে এ দেশের শাসনভার এ দেশেরই লোকদের হাতে তুলে দেয়া হবে।"

আন্দোলনের ব্যাপক প্রস্তুতিকল্পে সাইয়েদ সাহেব একটা সংগঠন কায়েম করেন এবং ভারতের প্রধান প্রধান শহরে তাঁর বিশ্বস্ত খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১। মওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী রামপুরীকে তিনজন সহকর্মীসহ হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) পাঠানো হয়।

২। সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী অতঃপর মাদ্রাজ গমন করলে মওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদীকে দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হয়।

৩। মওলানা এনায়েত আলী আযীমাবাদীকে পাঠানো হয় বাংলায়।

৪। মওলানা সাইয়েদ আওলাদ হাসান কনৌজী এবং সাইয়েদ হাফীযুদ্দীনকে ইউপিতে দায়িত্ব দেয়া হয়।

৫। মিয়া দীন মুহাম্মদ, মিয়া পীর মুহাম্মদ এবং আরও অনেকের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয় যে, তাঁরা ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে জেহাদের আহবান পৌঁছাবেন এবং অর্থ সংগ্রহ করবেন।

জিহাদ কার্য পরিচালনার জন্যে পাটনাকে প্রধান কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। ১৮২২ সালে সাইয়েদ আহমদ যখন পাটনা গমন করেন, তখন বেলায়েত আলী ও মুহাম্মদ হোসেন তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। পাটনাকে আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রস্থল স্থাপন করতঃ সাইয়েদ সাহেব চারজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তাঁরা হলেন, মওলানা বেলায়েত আলী, মুহাম্মদ হোসেন, এনায়েত আলী এবং ফরহাদ হোসেন।

ভারতের সর্বত্র জেহাদের প্রচারণা ও প্রস্তুতি শেষ করে সাইয়েদ আহমদ ১৮২৬ সালে তাঁর জন্মভূমি রায়বেরেলী ত্যাগ করেন। তারপর আর সেখানে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ হয়নি। জীবনের বাকী বছর তিনি ক্রমাগত আল্লাহ্‌র পথে জেহাদে অতিবাহিত করে শাহাদতের অমৃত পানে জীবনকে ধন্য করেন।

যাহোক, যাত্রার পূর্বে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে অর্থ, যুদ্ধের হাতিয়ার, সরঞ্জাম, ঘোড়া, রসদ প্রভৃতি আনা শুরু হলো। আল্লাহর পথে জান কুরবান করার জন্যে হাজার হাজার মুজাহিদ তার ঝান্ডার নীচে জমায়েত হতে লাগলো। এভাবে যাত্রাকালে তাঁর মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ালো বারো হাজার। সাইয়েদ সাহেবের ভক্ত–অনুরক্ত টংকের নবাব মুজাহিদ বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানান এবং জেহাদের যাবতীয় সাজ–সরঞ্জাম নিজ তত্ত্বাবধানে সরবরাহ করে দিয়ে বিদায় করেন।

অতঃপর মুজাহিদ বাহিনী টংক থেকে সিন্ধু, হায়দরাবাদ, শিকারপুর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করে বোলান পাসের ভিতর দিয়ে আফগানিস্তানের কান্দাহারে প্রবেশ করে।

ইতিপূর্বে মুজাহিদ বাহিনী সিন্ধুর খয়েরপুর পৌঁছলে খয়েরপুরের মীর রুস্তম আলী সাইয়েদ সাহেবের মুরীদ হন এবং টংকের নবাবের মতো তাঁকে মোটা রকমের অর্থ সাহায্য করেন। আফগানিস্তান পৌঁছে সাইয়েদ সাহেব আফগান আমীরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমীর তাঁকে কোনরূপ সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকৃতি জানান। যাহোক তথা হতে মুজাহিদ বাহিনী সীমান্তের নওশেরায় উপনীত হয়। এ সুদীর্ঘ পথে মুজাহিদ বাহিনীকে চরম অসুবিধা ও দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। তবে তাদের যাত্রাপথে চারদিক থেকে সরদারগণ, শাসকগণ স্থানীয় কর্মচারীগণ ও জনসাধারণ সাইয়েদ সাহেবকে আনুগত্য জানিয়েছিল। কেউ বা বিবিধ উপঢৌকনাদি দিয়ে, কেউ তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ

করে এবং কেউ বা তাঁর বাহিনীতে যোগদান করে। তাঁর বাহিনীতে যোগদান করেছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক— এমনকি সুদূর বাংলাদেশের বহু সংখ্যক মুজাহিদ। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চট্টগ্রামের সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী যিনি বালাকোটের বিপর্যয়ের পর গাজী হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন আপন জন্মভূমিতে। তাঁর মুরীদ ও খলিফা ছিলেন সূফী ফতেহ আলী সাহেব যিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন কোলকাতার মানিকতলায়। বহু সংখ্যক বাংলাদেশী শাহাদত বরণ করেছেন এবং অনেকেই বালাকোট, সোয়াত প্রভৃতি স্থানে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করেন। তাঁদের বংশধর এখনো বিদ্যমান আছে। বালাকোটে তাঁদের জনৈক বংশধরের সাথে গ্রন্থকারের সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯৬৩ সালে।

সাইয়েদ সাহেব রায় বেরেলী থেকে দিল্লী গমন করে যখন শাহ আবদুল আযীযের নিকটে শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করছিলেন তখনই তিনি জানতে পারেন পাঞ্জাবে শিখ রাজ্যের অধীনে মুসলমানদের চরম নির্যাতনের কথা। মজলুম মুসলমানদের সহানুভূতিতে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠে এবং তখনই তিনি সংকল্প গ্রহণ করেন তার প্রতিকারের। তিনি চেয়েছিলেন মুসলিম অধ্যুষিত সীমান্তে তিনি একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবেন এবং সেখান থেকে অভিযান চালাবেন অন্যত্র মুসলিম দুশমন শক্তি সমূহের বিরুদ্ধে। এ কারণেই তিনি সীমান্তকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সংগ্রামের প্রাথমিক কেন্দ্র হিসাবে। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, সীমান্তের যেসব মুসলমানের সাহায্য সহযোগিতার আশা হৃদয়ে পোষণ করে সাইয়েদ সাহেব তাঁর জেহাদের রূপরেখা রচনা করেছিলেন, তাদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। নওশেরায় পৌঁছার পর থেকে বালাকোটের যুদ্ধ পর্যন্ত ছোটো বড়ো এগারটি বা ততোধিক যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী শত্রুর মুকাবিলা করে । এ সবের বিস্তারিত বিবরণের জন্যে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন। তার অবকাশ এখানে নেই।

নওশেরায় পৌঁছার পর সাইয়েদ সাহেব ইসলামের রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী শিখদেরকে প্রকাশ্যে আহবান জানান ইসলাম গ্রহণ করতে, অথবা বশ্যতা স্বীকার করতে অথবা অস্ত্রের মুকাবিলা করতে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই হলো এবং এক নৈশ যুদ্ধে মাত্র নয়শত মুজাহিদ বৃহৎ শিখবাহিনীকে পরাজিত করে। তাদের বিজয় লাভে সীমান্তবাসী তাঁদের প্রশংসায় মুখর হয়ে দলে দলে মুজাহিদ

বাহিনীতে যোগদান করলো। বহু স্থানীয় সরদার বিশেষ করে ইউসুফ জায়ীরা সাইয়েদ সাহেবের দলে যোগ দিলো।

কিছুকাল পর মনপুরী ও পঞ্জতরেও শিখরা পরাজয় বরণ করলো। মুজাহিদদের এ সাফল্যের ফলে গরহি ইমাজির দশহাজার যোদ্ধা সাইয়েদ সাহেবকে ইমাম হিসাবে স্বীকার করে নিল। পেশাওরবাসীগণ নওশেরায় ঘাঁটি করে শিখদের বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে অভিযান শুরু করার জন্যে সাইয়েদ সাহেবকে অনুরোধ জানায়। এ সময় প্রায় লক্ষাধিক লোক মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করে।

কিন্তু সীমান্তের সরদারগণ ছিল অত্যন্ত স্বার্থপর ও অর্থগৃধ্নু। শিখ সেনাপতি বুধ সিংহ অর্থের প্রলোভনে পেশাওরের সরদারকে হাত করে ফেলে। তারা এতটা নীচতায় নেমে যায় যে অর্থের জন্যে তারা সাইয়েদ সাহেবকে গোপনে বিষ প্রয়োগ করে। কিন্তু আল্লাহর অসীম কুদরতে তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। এ সময়ে শিখদের সাথে যে যুদ্ধ হয়, তাতে সরদারগণ শিখদের পক্ষ অবলম্বন করে এবং মুজাহিদ বাহিনী পরাজিত হয়।

সীমান্তের পাঠান সরদারদের ডিগবাজি ও বিশ্বাসঘাতকতার দরুন মুজাহিদ বাহিনীকে বিশেষ বেগ পেতে হয়। টংকের নবাবের নিকটে সাইয়েদ সাহেবের লিখিত এক পত্রে জানা যায় যে, প্রায় তিন লক্ষ লোক বয়আত গ্রহণ করে তাঁর দলে যোগদান করে। কিন্তু এর প্রায় সকলেই ছিল স্থানীয় লোক। সম্ভবতঃ যুদ্ধের মালে গনিমত লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই তারা সাইয়েদ সাহেবের দলে যোগদান করে। তাদের ইসলামী চরিত্র বলে কিছু ছিল না। সাইয়েদ সাহেব তাঁর অতি সরলতার জন্যে তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র নির্ভরযোগ্য সহকর্মী ছিলেন তাঁরাই যাঁরা বাইর থেকে গিয়েছিলেন। তাঁরা বিপদে আপদে সাইয়েদ সাহেবের সংগে ছায়ার মতো থাকতেন এবং প্রয়োজনে অকাতরে জান দিয়েছেন। এঁদের সংখ্যা ছিল হাজার খানেকের মতো। তাঁদের মধ্যে যারা যুদ্ধে শাহাদত বরণ করতেন তাদের স্থান অধিকার করতেন নবাগতের দল। দূর দূর অঞ্চল হতে কাফেলা আসতো জেহাদে যোগদানেচ্ছু মানুষ নিয়ে, টাকাকড়ি, রসদ ও চিঠিপত্র নিয়ে। তাঁদেরকে রসদ যোগান হতো সারা ভারতব্যাপী "তারগিবে মুহাম্মদীয়া" প্রতিষ্ঠানের গোপন কর্মকুশলতায়। ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের চোখে ধুলো দিয়ে টাকাকড়ি আসতো বিহার ও বাংলা থেকে। তার সংগে আসতো

খোদার পথে উৎসর্গীকৃত মুজাহিদের দল।

যুদ্ধের রসদ, খাদ্য দ্রব্যাদি, টাকাকড়ি প্রভৃতি যা আসতো তা বায়তুলমালে জমা করা হতো যার রক্ষক ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহর ভাইপো মুজাহিদ বাহিনীর কুতুব মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ। অতীব ন্যায়নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা ও সুশৃংখলতার সাথে রসদ ও টাকাকড়ি বন্টন করা হতো মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে। স্বয়ং সাইয়েদ সাহেবও একজন সাধারণ মুজাহিদের চেয়ে অধিক পরিমাণে কিছু পেতেন না।

অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, আল্লাহর পথে উৎসর্গীকৃত এসব আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের মুকাবিলা করতে হতো ত্রিপক্ষের। শিখ, বিশ্বাসঘাতক পাঠান সরদার এবং হুন্দের দুর্গমালিক খাদে খাঁ—এ ত্রিশক্তি ছিল মুজাহিদ বাহিনীর দুশমন। এক সাথে এই তিন শক্তির মুকাবিলা তাঁদেরকে করতে হয়েছিল।

শিখদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায় লেগেই থাকতো। বাংলা, বিহার ও মধ্য প্রদেশের মুজাহিদগণ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতেন। শিখ ও বিশ্বাসঘাতক পাঠানরা তাঁদের হাতে মার খেতো। পেশাওরের দুররানী সরদারগণও প্রকাশ্যে শিখদের সাথে যোগদান করলো এবং খাদে খাঁ স্থানীয় পাঠানদেরকে মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে সব সময়ে ক্ষিপ্ত করে তুলতো।

এবার সাইয়েদ সাহেব খাদে খাঁকে শায়েস্তা করার জন্যে শাহ্ ইসমাইলকে মাত্র দেড়শত মুজাহিদসহ হুন্দ দুর্গ অধিকারের জন্যে পাঠান। রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ তাঁরা হুন্দ আক্রমণ করে তা দখল করেন এবং খাদে খাঁ নিহত হয়। খাদে খাঁর ভাই ইয়ার মুহাম্মদের সংগে মিলিত হয়ে বিরাট বাহিনীসহ হুন্দ দুর্গ পুনরুদ্ধারের জন্যে অগ্রসর হয়। ফলে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয় এবং ইয়ার মুহাম্মদ নিহত হয়। শত্রুপক্ষের বহু কামান হস্তগত করা হয় এবং প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জাম ও মালামাল মুজাহিদ বাহিনীর হস্তগত হয়। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাগণ তার অধিকাংশই লুন্ঠন করে নিয়ে যায়। মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান বিশ্বাসঘাতক দুশমন খাদে খাঁ, ইয়ার মুহাম্মদ খাঁ ও আমীর খানের মৃত্যুর পর এখন শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী রইলো শিখ ও পেশাওরের সুলতান মুহাম্মদ খান। হুন্দের যুদ্ধের পর সাইয়েদ সাহেব পেশাওরে ঘাঁটি স্থাপন করার মনস্থ করলে আম্বের পায়েন্দা খান বাধা দেয়। এখানেও শিখ ও পাঠানদের মিলিত শক্তির মুকাবিলা মুজাহিদ বাহিনীকে করতে হয়। এখানেও তারা পরাজিত হয় এবং আম্ব থেকে মর্দান পর্যন্ত মুজাহিদ

বাহিনীর অধিকার স্বীকৃত হয়। এখন পেশাওর পর্যন্ত অগ্রসর হতে তাঁদের আর কোন প্রতিবন্ধকতা রইলোনা।

সুচতুর সুলতান মুহাম্মদ অবস্থা বেগতিক দেখে সাইয়েদ সাহেবের হাতে বয়আত গ্রহণ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করার অংগীকার করলে সাইয়েদ সাহেব তাকে ক্ষমা করেন এবং শাসন পরিচালনার দায়িত্ব তার উপরই অর্পিত হয়। মওলানা জাফর থানেশ্বরী তাঁর 'সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ' গ্রন্থে মন্তব্য করেন যে সাইয়েদ সাহেব তাঁর সরলতার দরুন নিঃস্বার্থভাবে সুলতান মুহাম্মদকে দায়িত্বভার দিয়ে ভুল করেছিলেন। অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, কিন্তু সাইয়েদ সাহেবের কাজের প্রতিবাদ করার সাহস কারো হয়নি। শরিয়তের আইনে বিচারের জন্যে মওলানা শাহ মযহার আলীকে কাযী নিযুক্ত করা হয়।

সাইয়েদ সাহেব এবং তাঁর হাতে গড়া মুজাহিদগণের পদমর্যাদা লাভের কোন বাসনা ছিল না। আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ জীবনে খোদার আইন জারী করাই তাঁদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। সুলতান মুহাম্মদের উপরে দায়িত্ব অর্পণ করার পেছনে সাইয়েদ সাহেবের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল যার জন্যে বহিরাগত মুজাহিদগণের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি স্থানীয় লোকের উপরই দায়িত্ব অর্পণ করেন। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শরিয়তের বিধান জারী করা, স্বয়ং ক্ষমতা উপভোগ করা নয়।

যাহোক, আপাতঃদৃষ্টিতে এক বিরাট অঞ্চলের উপর ইসলামী হুকুমত কায়েম হলো। সাইয়েদ সাহেব ইসলামী সমাজ ও ইসলামী আইন কানুন প্রবর্তনে বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন। পেশাওর তথা সমগ্র সীমান্ত এলাকা জুড়ে প্রচারকদল নিয়োজিত হলো। তাঁরা গ্রামে গ্রামে ইসলামী জীবন বিধান ও শরিয়তের আইন কানুনের প্রচারে লিপ্ত হলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় স্থানীয় অধিবাসীগণ ছিল দরিদ্র, অজ্ঞ, অর্থলোভী ও বহুদিনের জাহেলী কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। প্রচারকগণ যখন তাদের এসব কুসংস্কার পরিহার করে ইসলামী জীবন যাপনের আহবান জানাতে লাগলেন, তখন তাদের পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক, গোত্রীয় ও অর্থনৈতিক স্বার্থে চরম আঘাত লাগে। ফলে তারা শুরু করলো অসহযোগ। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার সঞ্জাত ক্ষমতা ও অর্থলোভী মোল্লার দলও করলো তীব্র বিরোধিতা। তার ফলে স্থানীয়

অধিবাসীগণ সাইয়েদ সাহেবের বিরুদ্ধে একটা অন্ধ আক্রোশে ফেটে পড়লো। বিশ্বাসঘাতক সুলতান মুহাম্মদও তাই চাইছিল এবং সে এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো। অতি গোপনে সমগ্র অঞ্চলে এক গভীর ষড়যন্ত্রজাল ছড়ানো হলো এবং একই দিনে একই সময়ে ফজরের নামাযের সময় নামাযে রত মুজাহিদ প্রচারকদলকে নির্মমভাবে নির্মূল করা হলো। একজন অলৌকিকভাবে আত্মরক্ষা করেন এবং পলায়নকরতঃ সাইয়েদ সাহেবের নিকটে ঘটনা বিবৃত করেন।

সাইয়েদ সাহেব অত্যন্ত মর্মাহত হন। একই আঘাতে তাঁর কয়েকশত আল্লাহর পথে উৎসর্গীকৃত কর্মী জীবন হারালেন। একটা আদর্শ ইসলামী সমাজ গঠনের আশাও তাঁর বিলীন হয়ে গেল। তিনি বিশ্বাসঘাতক ও নিমকহারামদের দেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ার মনস্থ করলেন।

জাফর থানেশ্বরী বলেন, সাইয়েদ সাহেব অতঃপর তাঁর কর্মীগণকে একত্র করে বলেন, "আমার আশা চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। পাঠানরা চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ইসলামী সমাজ গঠনের কোন আশা আর এখানে নেই। এখন আমার জন্যে হিজরত করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। আমি বালাকোট গিলগিট পথে অন্য দেশে চলে যাব। আল্লাহ্ তৌফিক দিলে আবার এ কাজে হাত দিব। আমি যে পথে অগ্রসর হতে চাই সে পথ বড়োই দুর্গম, পদে পদে বিপদের আশংকা রয়েছে। এ পথে চলার জন্যে তোমাদেরকে আহবান জানাব না। তোমরা ইচ্ছা করলে যে যার গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারো।"

তখন সকলেই এক বাক্যেই বলেছিলেন, 'জেহাদে পা বাড়িয়ে পশ্চাদপদ হওয়া ঈমানের খেলাপ। আমরা সর্বাবস্থায় হুজুরের অবিচ্ছেদ্য সংগী হয়ে থাকতে চাই।'

অতঃপর সাইয়েদ সাহেব তাঁর অবশিষ্ট মুজাহিদগণ সহ বালাকোটের দিকে যাত্রা করেন। এ সময়ে শের সিংহের সৈন্য বাহিনী মুজাহিদগণের মুখোমুখী ছিল।

সাইয়েদ সাহেব বালাকোট থেকে নওয়াব উযীরউদ্দৌলাকে যে পত্র লিখেন তার মর্ম নিম্নরূপ—

"পেশাওরের লোকেরা এমনই হতভাগ্য যে, তারা জেহাদে আমাদের মুজাহিদ বাহিনীর সংগে যোগ দিল না। উপরন্তু তারা প্রলোভনে পড়ে গেল এবং সারা দেশময় নানা কাজে আমাদের যেসব মহৎ লোক ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের অনেককেই হত্যা করে ফেল্লো।... সেখানে আমাদের অবস্থানের আসল উদ্দেশ্য

ছিল যে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদে বহু সংখ্যক স্থানীয় মুসলিমের সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়া যাবে। বর্তমানে যখন আর কোনও আশা নাই, তখন আমরা স্থির করলাম যে, সেখান থেকে পাখলীর পাহাড়ী অঞ্চলেই স্থান বদল করব। ... এখন আমাদের ঘাঁটি এমন নিরাপদ স্থানে অবস্থিত যে, আল্লাহর মরযী দুশমনরা আমাদের সন্ধানও পাবে না।... ইসলামের তরক্কীর জন্যে ও মুজাহিদ বাহিনীর সাফল্যের জন্যে আল্লাহর দরবারে দিনরাত মুনাজাত করতে থাকুন।"

—(ওহাবী আন্দোলন, আবদুল মওদুদ, পৃঃ ১৬৪)

সাইয়েদ সাহেব তাঁর মুজাহিদ বাহিনীসহ বলাকোটের সৌন্দর্য মন্ডিত উপত্যকা বিশ্রামের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন। পূর্ব দিক দিয়ে কুনহার বা কাগান পাহাড়ী নদী অবিরাম কুল কুল তানে বয়ে চলেছে। উত্তর পশ্চিম দিক থেকে সংকীর্ণ পাহাড়ী ঝর্ণা বার্না বড়ো বড়ো উপল খন্ডের ভেতর লুকোচুরি খেলতে খেলতে উদ্দাম উচ্ছল গতিতে বালাকোটে কুনহার নদীগর্ভে প্রবেশ করেছে। বার্না ঝর্ণার উত্তর দিকে প্রশান্ত নূরী ময়দান। প্রকৃতির এ লীলা ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে মনে হয় কে যেন জীবন নদীর পরপার থেকে হাতছানি দিচ্ছে। রণক্লান্ত মুজাহিদগণ বিশ্রামের জন্যে এখানে ছাউনী পাতলেও পরপারের হাতছানি হয়তো তাঁদের দৃষ্টির অগোচর হয়নি। তাই বিশ্রাম তাঁদের ভাগ্যে ঘটেনি।

ওদিকে শিখরা মুজাহিদ বাহিনীর সন্ধানে ছিল। তারা মনে করেছিল সাইয়েদ সাহেবের লক্ষাধিক মুজাহিদের কয়েক শ' মাত্র টিকে রয়েছে এবং তারা হয়ে পড়েছে হতোদ্যম। এ সুযোগেই তাদের আঘাত হানতে হবে।

সে সময়ে বালাকোটে যাওয়ার দুটি মাত্র পথ ছিল। একটি ছিল এমন পাহাড়ী বনজংগলে পরিপূর্ণ যে স্থানীয় লোক ব্যতীত সে পথে চলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। অপর পথটি ছিল একটি সংকীর্ণ গিরিসংকটের মধ্য দিয়ে ও একটি সেতুর উপর দিয়ে। এ দুইটি পথে অবশ্যি পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক মোটা অর্থের লোভে অরণ্য সংকুল পথটিই শিখদের দেখিয়ে দেয়। ফলে তারা অতর্কিতে মুজাহিদ বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। মুজাহিদ বাহিনী সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকলেও বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। সাইয়েদ আহমদ, শাহ ইসমাইল ও সাইয়েদ সাহেবের অন্যান্য প্রধান সহকর্মীগণ জেহাদ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন।

আবদুল মওদুদ বলেন, "তাঁর অনুসৃত বৃহৎ আন্দোলন স্তব্ধ হয় নাই। এই নিধন যজ্ঞের পরেও যাঁরা বেঁচে ছিলেন, তাঁদের অনেকেই টংকে অথবা বিহার শরীফের ছাতানায় সাইয়েদ সাহেবের বিশ্বস্ত খাদেমের নেতৃত্বে এই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল স্থাপন করলেন। পরবর্তীকালে পাঞ্জাবের সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা যখন শিখদের ন্যায় অত্যাচার শুরু করে, তখন মুজাহিদদের সর্বরোষ তাদের উপর উদ্যত হয়। কিন্তু তার দরুন তাদের ভাগ্যে জোটে কারাবাস, উৎপীড়ন ও ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুবরণের নির্মম শাস্তি এবং তার চেয়েও হীনতম ছিল নিম্নশ্রেণীর মোল্লা ও তথাকথিত আলেমদের দ্বারা এসব সংগ্রামী অগ্রপথিকদের নামে অযথা কুৎসা রটনা ও মিথ্যা ভাষণ।"

তিনি আরও বলেন, "এখন সময় এসেছে এসব বীর মুজাহিদের গৌরবোজ্জ্বল অসমসাহসিক কার্যাবলীকে স্বীকৃতি দেয়া ও শ্রদ্ধা করা, কারণ তাঁরাই প্রকৃত পক্ষে এই উপমহাদেশে বহু পূর্বেই পাকিস্তানের বুনিয়াদ স্থাপনের মাধ্যমে সব রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছিলেন। যদিও সাইয়েদ সাহেবের প্রতিষ্ঠানের মারফৎ পাকিস্তান হাসিল হয় নাই, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, তার মধ্যেই ছিল বীজমন্ত্র; আর ওয়াকিফহাল ব্যক্তিমাত্রই হৃদয়ংগম করবেন যে রায় বেরেলীর সাইয়েদ আহমদ শহীদের দান ছিল এই চেতনা উজ্জীবনে অপরিসীম।"

—(ওহাবী আন্দোলন, আবদুল মওদুদ, পৃঃ ১৬৫-১৬৬)

উপরে বলা হ'য়েছে যে, সাইয়েদ আহমদ শহীদের জেহাদী আন্দোলনে বাংলাদেশ থেকে কয়েক সহস্র মুজাহিদ ও বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রেরিত হয়। রায় বেরেলী থেকে জেহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার সময়ে বাংলাদেশের অনেকে সাইয়েদ সাহেবের সাথী হয়েছিলেন এবং জিহাদ চলাকালেও যেমন বাংলাদেশ থেকে প্রচুর অর্থ সম্পদ সীমান্তে পৌঁছেছে তেমনি পৌঁছেছে হাজার হাজার মুজাহিদ।

গোলাম রসুল মেহের বলেন— বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পথে মুজাহিদগণ দলে দলে সাইয়েদ সাহেবের সংগে মিলিত হন। এমনি একটি দলে ছিলেন মৌলভী ফতেহ্ আলী আযীমাবাদী। তিনি তাঁর দলের যে তালিকা পেশ করেন, অবশ্য যাদের নাম তাঁর স্মরণ ছিল, তাদের মধ্যে ছ'জন বাংলাদেশের ছিলেন। তাঁদের নাম ঃ

১। মৌলভী ইমামুদ্দীন
২। জহুরুল্লাহ
৩। লুৎফুল্লাহ্
৪। তালেবুল্লাহ্
৫। ফয়েজউদ্দীন
৬। কাজী মদনী

(সাইয়েদ আহমদ শহীদ, গোলাম রসুল মেহের, পৃঃ ৪১২ পরিশিষ্ট)

শিখ ও পাঠানদের সংগে মুজাহিদগণের প্রায় এগার বারটি প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়েছে। এসব যুদ্ধে অবশ্যই মুজাহিদগণের অনেকেই শহীদও হয়েছেন। তাঁদের নাম এবং একদিন ফজরের নামাযে তাদের যে কয়েকশতকে শহীদ করা হয়েছে, তাঁদেরও নামধাম জানা যায়নি। তবে বালাকোটে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের একটি নামের তালিকা পেশ করেছেন— গোলাম রসুল মেহের। তাঁর প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী বালাকোটে সর্বমোট একশ পঁয়ত্রিশ জন মুজাহিদ শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন বাংলাদেশের। তাঁদের নাম হলো, আলীমুদ্দীন, ফয়েজউদ্দীন, লুৎফুল্লাহ, শরফুদ্দীন, সাইয়েদ মুজাফফর হোসেন। উক্ত তালিকায় কাদের বখ্শ, আবদুল কাদের, গাজীউদ্দীন ও বখ্শউল্লাহ— এ চারটি নাম স্থান পেয়েছে। কিন্তু তাঁরা কোথাকার অধিবাসী তা দেয়া হয়নি। শুধু বখ্শউল্লাহর নামের শেষে বলা হয়েছে 'মেহের আলীর ভাই।' —(সাইয়েদ আহমদ শহীদ, গোলাম রসুল মেহের, পৃঃ ৪৩২-৩৪)

সীমান্তে যখন সারা ভারত থেকে আগত মুজাহিদগণ জেহাদে লিপ্ত ছিলেন, ঠিক সে সময়েই সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর হিন্দু জমিদার, নীলকর ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদে লিপ্ত ছিলেন। তিতুমীর সাইয়েদ সাহেবের মুরীদ ছিলেন। কিন্তু স্বদেশেই তিনি এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন যে, সাইয়েদ সাহেবের সান্নিধ্যে থেকে শাহাদৎ বরণ করার সৌভাগ্য তার হয় নি। তবে যে পথে তাঁর মুর্শেদ খোদার সাথে মিলিত হন, সেই পথই অনুসরণ করেন শহীদ তিতুমীর। ১৮৩১ সালের ৬ই মে রোজ শুক্রবার প্রায় দুপুরের দিকে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মুজাহিদ সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী (রহ) শাহাদৎ বরণ করেন। ১৯৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর ইংরেজ সৈন্যদের কামানের গোলায় শাহাদৎ বরণ করেন সাইয়েদ তিতুমীর।

বালাকোট বিপর্যয়ের কারণ

সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর নেতৃত্বে শাহ মুহাম্মদ ইসমাইল, মওলানা আবদুল হাই প্রমুখ মনীষীগণ ভারতে ইসলামী আযাদীর তথা ইসলামী হুকুমত বা শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং যে আন্দোলন সাফল্যের দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে ব্যর্থতার সম্মুখীন হলো, তার কারণ অবশ্যই অনুসন্ধান করে দেখা আমাদের উচিত। কারণ অতীত ইতিহাসের চুলচেরা বিচার ও পরীক্ষা নিরীক্ষায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সঠিকভাবে নির্ণীত হতে পারে। চিন্তাশীল মনীষীগণ উপরোক্ত আন্দোলনের ব্যর্থতার যে কারণসমূহ বর্ণনা করেছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। তবে সামগ্রিকভাবে এ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এর প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূর প্রসারী। সাইয়েদ আহমদ শহীদ যে খুনরাঙা পথে চলার দুর্বার প্রেরণা দিয়ে গেলেন ভারতীয় মুসলমানদেরকে; বাংগালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি,পাঠান নির্বিশেষে ভারতীয় মুসলমানগণ সে খুনরাঙা পথে অবিরাম চলেছে প্রায় শতাব্দীকাল পর্যন্ত। জেল-জুলুম, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, স্থাবর, অস্থাবর সম্পদের বাজেয়াপ্তকরণ, অমানুষিক ও পৈশাচিক দৈহিক নির্যাতন ক্ষণকালের জন্যেও তাদেরকে এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তথাপি এ আন্দোলনের নেতা স্বয়ং নিজের জীবদ্দশায় কেন এ সাফল্য দেখে যেতে পারেননি, তার কারণও আমাদের চিহ্নিত করা দরকার। প্রধান প্রধান কারণগুলি নিম্নরূপ বলে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

১। ইসলামী আন্দোলন তথা আল্লাহর পথে জেহাদ পরিচালনার জন্যে যে কর্মীবাহিনীর প্রয়োজন, তাদের প্রত্যেকের চরিত্র হতে হবে নির্ভেজাল ইসলামী আদর্শে গড়া। তাদেরকে হতে হবে আল্লাহর পথে উৎসর্গীকৃত। সাইয়েদ সাহেব বাইরে থেকে যে মুজাহিদ বাহিনী সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে তাঁরা উক্ত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এবং তাঁরাও অনুরূপ চরিত্রে চরিত্রবান ছিলেন, যাঁরা জেহাদ চলাকালে বাংলা, বিহার, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আত্মীয়স্বজন, আপন ঘরদোর, ক্ষেত-খামার ছেড়ে সাইয়েদ সাহেবের মুজাহিদ বাহিনীতে গিয়ে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু এঁদের সংখ্যা এক থেকে দু' হাজারের মধ্যেই ছিল সব সময়ে সীমিত। জেহাদের জন্যে সাইয়েদ সাহেবের জ্বালাময়ী ভাষণ শুনে এবং প্রথমদিকে শিখদের উপরে অপ্রত্যাশিত বিজয়লাভ দেখে দলে দলে পাঠানরা সাইয়েদ সাহেবের দলে

যোগদান করে। কিন্তু তাদের সত্যিকার কোন ইসলামী চরিত্র ছিল না। তাদের মধ্যে ইসলামী প্রেরণা ও জোশ ছিল প্রচুর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র, অজ্ঞ, অর্থলোভী এবং বহুদিনের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। যারা ছিল সরদার অথবা গোত্রীয় শাসক, তারাও ছিল অত্যন্ত স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী। কোন কোন সময়ে মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা তিন লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছেছে। এরা প্রায় সবই বিভিন্ন পাঠান গোত্রের লোক। এরা অর্থলোভে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, চরম মুহূর্তে প্রতিপক্ষ শিখ সৈন্যদের সংগে যোগদান করেছে। অথবা মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা কালীন শুধু গনিমতের মাল লুণ্ঠনে লিপ্ত হয়ে বাহিনীর মধ্যে শৃংখলা ও নিয়মতান্ত্রিকতা ভংগ করেছে। অন্ধ ব্যক্তিস্বার্থ ও অর্থলোভের প্রবল প্লাবনে তাদের জলবুদবুদসম ইসলামী প্রেরণা ও জোশ ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

২। স্বয়ং সাইয়েদ সাহেব ও শাহ ইসমাইল দুর্ধর্ষ বীরযোদ্ধা ও রণকৌশলী থাকা সত্ত্বেও গোটা মুজাহিদ বাহিনীকে তৎকালীন যুদ্ধ বিদ্যায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি।

৩। বিশ্বাসঘাতক ও চরিত্রহীন পাঠানদের প্রতি পূর্ণমাত্রায় আস্থা স্থাপন করাও ঠিক হয়নি। যে সুলতান মুহাম্মদ খাঁ এবং তার ভ্রাতৃবৃন্দ সাইয়েদ সাহেবের চরম বিরোধিতা করত, সেই সুলতান মুহাম্মদের উপরে পেশাওয়ারের শাসনভার অর্পণ করাও ঠিক হয়নি। সুলতান মুহাম্মদই শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের উপর চরম আঘাত করে এবং একই রাতে এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সাইয়েদ সাহেবের কয়েকশ' বাছা বাছা মুজাহিদের প্রাণনাশ করে। যার ফলে সাইয়েদ সাহেবকে পেশাওর থেকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়।

৪। স্থানীয় পাঠানদের আল্লাহর পথে জীবন দানের চেয়ে জীবন বাঁচিয়ে পার্থিব স্বার্থলাভই উদ্দেশ্য ছিল। তাই যুদ্ধকালে তারা সত্যিকার মুজাহিদগণকে পুরোভাগে থাকতে বাধ্য করতো এবং নিজেরা যথাসম্ভব নিশ্চেষ্ট থাকতো এবং লুণ্ঠনের সুযোগ সন্ধান করতো।

৫। দেশের অধিকার লাভ করার পর শরিয়ত- আইন কার্যকর করার ব্যাপারেও হিকমতের পরিপন্থী কাজ করা হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে বহু দিনের নানাবিধ কুসংস্কার এমন শক্তভাবে দানা বেঁধে ছিল যে, শরিয়ত-আইন কার্যকর করতে গিয়ে তাদের সেসব কুসংস্কারে চরম আঘাত লাগে। যেসব অশিক্ষিত

মোল্লার দল এসব কুসংস্কার জিইয়ে রেখে তাদের জীবিকা অর্জন করছিল তারা হয়ে পড়েছিল ক্ষিপ্ত। সুবিধাবাদী সরদারগণও এর সুযোগ গ্রহণ করেছিল। অতএব জনসাধারণ, মোল্লার দল এবং সরদারগণ একযোগে বিরোধিতা শুরু করে মুজাহিদগণের। প্রথমে উচিত ছিল জনগণের চরিত্রের সংস্কার সংশোধনের কাজ শুরু করা এবং মনমস্তিষ্ক শরিয়তী আইন মেনে চলার উপযোগী হলে তা ক্রমশঃ কার্যকর করা। জনসাধারণ অবশ্য ছিল ইসলামেই দৃঢ় বিশ্বাসী এবং আযাদী সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা, কিন্তু তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন প্রাকইসলামী "জাইয়ামে জাহেলিয়াতের" চেয়ে কোন অংশেই উন্নত ছিল না।

স্থানীয় জনসাধারণ ও আদিবাসীদের মধ্যে এমন সব কুপ্রথা প্রচলিত ছিল যা ছিল ইসলামী শরিয়তের সম্পূর্ণ খেলাপ। যেমন, যাকে খুশী তাকে বলপূর্বক বিয়ে করা, বিয়ের জন্যে কন্যা উচ্চমূল্যে বিক্রয় করা, বিধবাদেরকে মৃতের ওয়ারিশানের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দেয়া, চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা, বিধবা বিবাহ না দেয়া, মৃতের নাজাতের জন্যে মোল্লাদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেয়া প্রভৃতি। সাইয়েদ আহমদ যে শরিয়তী আইন জারী করেন তার মধ্যে ছিল— শরিয়ত বিরুদ্ধ সকল প্রকার আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও প্রথা একেবারে বাতিলযোগ্য। শরিয়তী আইনের মধ্যে আরও ছিল যে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তির জন্যে শরিয়তী আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে, উৎপন্ন ফসলের 'ওশর' বা দশমাংশ ও যাকাত আদায়ের পর তা বায়তুলমালে জমা হবে, এ বায়তুলমাল থেকে মুজাহিদ ও অন্যান্যের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হবে, আদিবাসী ও উপজাতীয়দের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে তার চরম নিষ্পত্তির অধিকার থাকবে একমাত্র খলিফার, একটি পুলিশ বিভাগ স্থাপন করা হবে যার কাজ হবে জনগণের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করা, প্রত্যেক মুসলমানকে সিয়াম (রোযা) ও সালাত (নামায) পালনে বাধ্য করা। এ ধরনের আরও অনেক গঠনমূলক ও কল্যাণমুখী আইন জারী করা হয়। নিঃসন্দেহে এ ছিল এক আদর্শিক পদ্ধতি যা নবী মুস্তাফা ও খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপদ্ধতি অনুকরণেই গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু আদিবাসী, উপজাতীয় পাঠান, জনসাধারণ ও মোল্লার দল এগুলোকে মেনে নেবে এমন মনমস্তিষ্ক তাদের গড়ে উঠেনি। অতএব শরিয়তী আইন পর্যায়ক্রমে কার্যকর না করে হঠাৎ তাদের উপর চাপিয়ে দেয়াতে তারা তা মানতে অস্বীকার করে।

আদিবাসী পাঠানদের বিরোধিতার আর একটি প্রধান কারণ ছিল, শান্তি ও শৃংখলার জন্যে সকলকে একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীন করা হয়েছিল। কিন্তু আদিবাসী পাঠানদের মজ্জাগত প্রবৃত্তিই ছিল কারও হুকুমের অধীন না হওয়া। তাদের নিকটে আযাদী ছিল বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারিতা। কিন্তু কোনও সভ্য সরকার বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিতে পারে না বলে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমত যখন আইন-শৃংখলার খাতিরে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলো তখন তারা ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক মনোভাব পোষণ করলো।

আবদুল মওদুদ বলেন, "এ রকম পরিস্থিতিতে সহসা 'শরিয়তী আইন' প্রবর্তন কতদূর সমীচীন হয়েছিল, বিবেচনার যোগ্য। ইতিহাসের শিক্ষা ও দূরদর্শিতার মাপকাঠিতে বিচার করলে মনে হয়, এই পরিবর্তন সময়োপযোগী হয়নি। সহসা কোন জাতির জীবনধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব হয় না। ক্রমে ক্রমে জাতীয় জীবনের ধারাকে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করতে হয় লোকমানসের সাথে উপযোগী করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করে। লোকমানসকে উপেক্ষা করে রাতারাতি তার পরিবর্তন করতে গেলে সংশয় ও মানসিক দ্বন্দ্বের ফলে জনমন তার প্রতি বিমুখই হয়ে উঠে, অন্তরের সংগে তা গ্রহণ করতে পারে না। লোকমানস ও পরিবেশকে অবহেলা করে দ্রুত জীবনধারার পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা বহু ক্ষেত্রেই বেদনাদায়কভাবে ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে গেছে।"

—(ওহাবী আন্দোলন, আব্দুল মওদূদ, পৃঃ ১৭৭)

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সর্বোৎকৃষ্ট জেহাদ— এ ছিল নিঃশ্বশীর দৃপ্ত ঘোষণা। বাংলায় উৎপীড়নমূলক কোম্পানী শাসনে এবং হিন্দু জমিদার মহাজন, নীলকর ও তাদের দেশী বিদেশী দালালদের অত্যাচার উৎপীড়নে মুসলমান সমাজ যখন বিলুপ্তির পথে, তখন তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তারপর সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভীর সুযোগ্য খলিফা সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। অনুরূপভাবে বিদেশী ও বিধর্মী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে মুসলমানদের উপর শিখ শাসনের অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ব্যাপক কর্মসূচীর জেহাদ ঘোষণা করেন সাইয়েদ আহমদ। এ ছিল একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমানের দাবী। হিজরত, জিহাদ অথবা শাহাদত— এ তিনের যে কোন একটি গ্রহণেই একজন মুসলমান ঈমানের স্বাক্ষর বহন করেন। তাই মওলানা মুহাম্মদ আলী

জওহর বলেছিলেন— মুসলমানের জীবন কাহিনীর বিস্তৃতি মাত্র তিনটি অধ্যায়ে :- হিজরত, জেহাদ ও শাহাদত। সাইয়েদ আহমদ ও শাহ ইসমাইলের জীবন এই তিনটি অধ্যায়ের মূর্ত প্রতীক।

বালাকোটের বিপর্যয়ের পর

বালাকোট প্রান্তরে মুজাহিদগণ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও এবং মুজাহিদ বাহিনীর পরিচালক সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী ও শাহ ইসমাইল অন্যান্যের সাথে শাহাদৎ বরণ করলেও যাঁরা গাজী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাঁদের কর্মতৎপরতা মোটেই হ্রাস পায়নি। এদের অনেকেই ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জেহাদী আন্দোলন জাগ্রত রাখেন যার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব তথা সারা ভারতব্যাপী আযাদী আন্দোলনে। এ আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়নি ১৮৫৭ সালে, বরঞ্চ ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত ও বিপন্ন করে রেখেছিল। এ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন— মওলানা বেলায়েত আলী, মওলানা মাহমুদুল্লা, মওলানা জাফর থানেশ্বরী, মওলানা ইয়াহিয়া আলী, মওলানা ইমামুদ্দীন, সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী প্রমুখ সাইয়েদ আহমদ শহীদের খলিফাগণ। তাঁদের সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা না করলে জেহাদী আন্দোলনের পূর্ণাংগ চিত্র পরিস্ফুট হবে না।

মওলানা বেলায়েত আলী

মওলানা বেলায়েত আলী ছিলেন পাটনার মওলভী ফতেহ্ আলীর পুত্র এবং তথাকার প্রসিদ্ধ আমীর রফিউদ্দিন হুসাইন খানের বংশধর। প্রচুর ঐশ্বর্যের কোলে লালিত পালিত হন বেলায়েত আলী। তাঁর কৈশোর ও যৌবনকাল অতিবাহিত হয় আমীর ওমরাহদের গৌরবমন্ডিত শহর লক্ষ্ণৌ-এ। এ সময়ে যখন সাইয়েদ আহমদ জেহাদের দাওয়াত পেশ করতে লক্ষ্ণৌ আসেন, তখন বেলায়েত আলী তাঁর বিলাসবহুল জীবন পরিত্যাগ করে জেহাদের ডাকে সাড়া দেন এবং রায়-বেরেলী গমন করেন। এখানে তিনি মওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইলের নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে থাকেন এবং বিলাসী জীবনের পরিবর্তে ফকিরী জীবন যাপন করতে শুরু করেন। তিনি সাইয়েদ আহমদ শহীদের সাথে মিলে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন এবং বনজংগল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে নিজ হাতে

রান্নার কাজ করতেন। আল্লাহ্‌র পথে এমন উৎসর্গীকৃত প্রাণকে সাইয়েদ সাহেব অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি যখন হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন, তখন তিনি তাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাইয়েদ সাহেবের নির্দেশে তিনি দু'মাস যাবত আফগানিস্তানে প্রচার কার্য চালান। জনৈক মওলানা মুহাম্মদ আলীসহ তিনি সোয়াত, হায়দরাবাদ ও দাক্ষিণাত্যে প্রচার কার্য চালাতে থাকেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে সাইয়েদ সাহেব বালাকোটে শাহাদৎবরণ করেন।

বালাকোটের বিপর্যয়ের পর মাওলানা বেলায়েত আলী ব্রিটিশ ভারতে প্রবেশ করে সাইয়েদ সাহেবের অসম্পূর্ণ কাজে হাত দেন। তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন স্থানে প্রচার কার্যে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর সহোদর ভাই মওলানা এনায়েত আলীকে পাঠান বাংলায়। মাওলানা যয়নুল আবেদীন ও মওলানা আব্বাস আলীকে তিনি যথাক্রমে উড়িষ্যা ও যুক্ত প্রদেশে মুবাল্লেগ নিযুক্ত করেন।

পাটনায় কেন্দ্রীয় দপ্তর স্থাপন করতঃ মওলানা বেলায়েত আলী প্রচার কার্য শুরু করেন। দু'বৎসর পর তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। হজ্বের পর তিনি ইয়ামেন, নজদ, মাসকত, হাদারামওত প্রভৃতি স্থান সফর করেন। এ সময়ে তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস কাজী মুহাম্মদ ইবনে আলী শওকানীর নিকটে হাদীস শাস্ত্রে সনদ লাভ করেন।

আরব থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁর ভ্রাতা এনায়েত আলীর নেতৃত্বে একটি মুজাহিদ বাহিনীকে গোলাব সিংহের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্যে সীমান্তে প্রেরণ করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে গোলাব সিংহ ব্রিটিশের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে সীমান্তের মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং এনায়েত আলীর মুজাহিদ বাহিনী ছত্রভংগ হয়।

সীমান্ত অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর মওলানা বেলায়েত আলী লাহোরে প্রত্যাবর্তন করেন। লাহোরের পুলিশ কমিশনার মওলানা ভ্রাতৃদ্বয়কে সকল প্রকার কর্মতৎপরতা থেকে বিরত থেকে দু'বৎসরের জন্যে একটি মুচ্‌লেকায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। অতঃপর তাঁরা পাটনায় প্রত্যাবর্তন করে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন।

মুচ্‌লেকার দু'বৎসর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর মওলানা বেলায়েত আলী হিজরতের উদ্দেশ্যে কতিপয় সহকর্মীসহ পাটনা থেকে দিল্লী গমন করেন। এ সময়ে দিল্লী জামে মসজিদে এবং ফতেহ্‌পুর মসজিদে ইসলামের দাওয়াত পেশ

করতে থাকেন। এ হচ্ছে ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলনের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বের ঘটনা। এ সময়ে তিনি বাহাদুর শাহের আমন্ত্রণে লালকেল্লায় একবার তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন।

দিল্লীতে কিছুকাল অবস্থানের পর মওলানা বেলায়েত আলী লুধিয়ানা হয়ে পাঞ্জাব সীমান্তের সিত্তানায় গমন করেন। সিত্তানা ছিল মুজাহিদ বাহিনীর বড়ো কেন্দ্র। এখানে একটি খান্‌কাহ্ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খান্‌কাহ্ অর্থে মুজাহিদগণ বুঝতেন তাদের অভিযান কেন্দ্র। পাটনাকে বলা হতো ছোট খান্‌কাহ্ এবং সিত্তানাকে বড়ো খান্‌কাহ্। ছোটো খান্‌কাহ্ থেকে অর্থ, রসদ, মুজাহিদ বড়ো খান্‌কায় প্রেরিত হতো।

মওলানা বেলায়েত আলী সিত্তানায় পৌছে দেখেন যে তথাকার কর্মচাঞ্চল্য অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। তিনি ছিলেন অনলবর্ষী বক্তা। তিনি মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন।

এ সময়ে মওলানা বেলায়েত আলীর বিরুদ্ধে একটা ব্রিটিশ সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্র মামলা আনয়ন করা হয়। মামলা চলাকালে তাঁর পাটনা সাদেকপুরস্থ দুটি বাসভবন ও বাগানবাড়ীসহ কয়েক লক্ষ টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। গৃহের অধিবাসীগণকে এবং বিশেষ করে শিশু ও নারীদিগকে নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় করে দেয়া হয়। ১৮৫৩ সালে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

মওলানা বেলায়েত আলী ও মওলানা এনায়েত আলী ভ্রাতৃদ্বয় সম্পর্কে হান্টার তাঁর দি ইন্ডিয়ান মুসলমান গ্রন্থে বলেন : "১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে স্যার হেনরী লরেন্স এক প্রতিবেদনে বলেন যে, উক্ত খলিফাদ্বয় (মওলানা বেলায়েত আলী ও মওলানা এনায়েত আলী) পাঞ্জাবে মুজাহেদীন বলে সুপরিচিত ছিলেন এবং সেজন্যে তাঁদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশের হেফাজতে পাটনায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের নিকট থেকে এবং তাঁদের স্বধর্মীয় দুজন উচ্চ বিত্তশালী লোকের নিকট থেকে ভবিষ্যতে সদাচরণের শর্তে মুচলেকা গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে আমি তাঁদেরকে দেখেছি সমতল বংগের রাজশাহী জেলায় রাজদ্রোহ মূলক প্রচারকার্য চালাতে। একাধিকবার এ ধরনের প্রচারকার্যের জন্যে তাঁদেরকে দুই দুইবার রাজশাহী থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। পাটনায় জামিন মুচলেকার দ্বারা এই দুই খলিফাকে তাদের আপন গৃহে যতোই আবদ্ধ রাখা হোক না কেন, ১৮৫১ সালেই তাঁদেরকে আবার দেখা গেছে পাঞ্জাবের সীমান্তে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অনল উদ্‌গীরণ করতে।"

বিপ্লবী আহমদুল্লাহ

সাইয়েদ আহমদের জেহাদী আন্দোলনে বাংগালী অবাংগালী নির্বিশেষে যেমন সারা ভারতের মুসলমান সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল, তেমনি অংশগ্রহণ করেছিল সকল শ্রেণীর মুসলমান। চাষী, মজুর, দরজী, কশাই, মোল্লা, মওলভী, মওলানা এবং সরকারী দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী জীবনের সকল প্রকার ঝুঁকি নিয়ে একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে অংশগ্রহণ করেন জেহাদী আন্দোলনে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আহমদুল্লাহ তাদের মধ্যে অন্যতম।

আহমদুল্লাহর পিতার নাম ছিল এলাহী বখ্‌শ্। পাটনার অন্তর্গত ইতিহাস প্রসিদ্ধ সাদিকপুরে এক অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জন্মগ্রহণ করেন আহমদুল্লাহ। আহমদুল্লাহ্ আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ইংরাজী ভাষায়ও তাঁর প্রচুর ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর পিতা এলাহী বখ্‌শ্ একজন প্রখ্যাত আলেম ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি শুধু একাই সাইয়েদ আহমদ শহীদের মুরীদ হননি, তাঁর তিন পুত্র ইয়াহিয়া আলী, ফয়েজ আলী ও আহ্‌মাদুল্লাহকেও সাইয়েদ সাহেবের মুরীদ করেন। আহমদুল্লাহ প্রথম জীবনে ইংরেজ সরকারের শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত হন এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পাটনায় জনশিক্ষা কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। আহ্‌মদুল্লাহর পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল আহমদ বখ্‌ত্। সাইয়েদ সাহেব তা পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখেন আহমদুল্লাহ। তাঁর প্রথম নাম লোপ পায় এবং তিনি আহমদুল্লাহ নামেই পরিচিত হন।

সীমান্তে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে সাইয়েদ সাহেবের সৈন্যসংখ্যা ছিল দু'লক্ষেরও অধিক। এ বিরাট বাহিনীর জন্যে লোক ও অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল তৎকালীন ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশ থেকেই বিশেষ করে বাংলা, বিহার উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশ থেকে। এ কাজ চলতো একটা সুনিয়ন্ত্রিত গোপন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যা ১৮৫২ সালের পূর্ব পর্যন্ত বিশ-পঁচিশ বৎসর যাবত ইংরেজ সরকার ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। এ গোপন প্রতিষ্ঠান ও তার সকল প্রকার কর্মতৎপরতার সাথে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী

আহমদুল্লাহ্ কতোখানি ওতোপ্রোত জড়িত ছিলেন তা জানা যায় একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে যা মিঃ র‍্যাভেন শ' (Raven Shaw) পেশ করেন ৯-৫-১৮৬৫ তারিখে বাংলা সরকারের নিকটে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে কর্তৃপক্ষ একটি ষড়যন্ত্রমূলক চিঠি হস্তগত করে। হিন্দুস্থানী ধর্মান্ধরা (মুজাহিদগণ) শৈলশিখর থেকে ভারতীয় চতুর্থ রেজিমেন্টের (Regiment of Native Infantry) সংগে যে একটা গোলযোগ পাকাতে চেষ্টা করেছিল, তার প্রমাণ এ থেকে পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, এ ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি হয় পাটনায়, এবং যে চিঠি ধরা পড়ে তাতে জানা যায় যে, সাদিকপুর পরিবারের বহু মৌলভী এবং অস্ত্রসজ্জিত বহু কাফেলা তখন সীমান্তের দিকে রওয়ানা হয়েছে। পেশাওরের একখানা স্বাক্ষরহীন চিঠিতে জানা যায় যে মওলভী বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী, ফয়েজ আলী ও ইয়াহ্ইয়া আলী (আহমদুল্লাহ্‌র দুই ভাই) এবং দিনাজপুরের জনৈক দরজী মওলভী করম আলী সুরাটের অন্তর্গত সিত্তানায় তাঁবু ফেলেছিলেন এবং বাদশাহ্ সাইয়েদ আকবরের সহযোগিতায় গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তৈরী হচ্ছিলেন। আমি পূর্বেই বলেছি যে, সাইয়েদ আকবর সোয়াতের একজন সরকার মনোনীত রাজা ছিলেন। চিঠিতে এ রকম বর্ণনা ছিল ঃ মওলভী বেলায়েত আলীর ভাই মওলভী ফরহাত আলী আযীমাবাদে, মওলভী ফয়েজ আলীর ভাই আহমদুল্লাহ্ ও মওলভী ইয়াহ্ইয়া আলী আপন আপন বাটিতে নিজ নিজ মহল্লায় অর্থ সংগ্রহ করছিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পাঠাচ্ছিলেন। অন্যান্য চিঠি থেকে জানা যায় যে, সৈন্য ও রসদ পাটনা থেকে মীরাট ও রাওয়ালপিন্ডির মধ্য দিয়ে পাঠানো হতো। এ দু'জায়গায় আলাদা এজেন্ট নিযুক্ত থাকতো। এবং তারা সীমান্তের জেহাদের জন্যে রসদ সরবরাহের সব বন্দোবস্ত করতো।

"পাঞ্জাব সরকারের অনুরোধক্রমে পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট হোসেন আলী খানের খানা তল্লাসী করে। সে ছিল আহমদুল্লাহ্‌র খানসামা এবং চিঠিপত্র তার নামেই চলাচল হতো। আসলে কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক খানা তল্লাসীর দুদিন আগেই পাঞ্জাব থেকে ফেরত একজন হাকিমের (Native Doctor) মারফৎ এ খবরটা জানাজানি হয়ে যায় ও তাদের বাড়ীর যাবতীয় চিঠিপত্র নষ্ট করে ফেলা হয়। যাহোক, "১৮৫২ সালের ১০ই আগষ্ট তারিখের রিপোর্টে ম্যাজিস্ট্রেট গভর্ণমেন্টকে জানান যে, ওহাবীদের তখন বেশ সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল, এবং

মওলভী বেলায়েত আলী, আহমদুল্লাহ্ ও তাঁর পিতা এলাহী বখ্‌শের বাড়ীতে জেহাদের জন্যে সর্বপ্রকার গুপ্ত মন্ত্রণা হতো ও সেখান থেকে প্রচার কার্য চলতো। তিনি আরও জানান যে, ওহাবীদের স্থানীয় পুলিশের সংগে যোগাযোগ ছিল। তার দরুন তাঁদের কার্যকলাপের কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ তাঁর নিকট যায়নি। তবে মওলভী আহমদুল্লাহ্‌র বাড়ীতে ছয়-সাত শ' সশস্ত্র লোক ম্যাজিস্ট্রেটের খানা তল্লাশীর বিরোধিতা করতে ও বিদ্রোহের নিশানা তুলতে প্রস্তুত ছিল।"

"১৮৫২ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের কাউন্সিল বৈঠকে একটা বিষয় (minute) লিপিবদ্ধ করা হয়— সেটা করা হয় পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের লেখা অনুযায়ী এসব চিঠিপত্র সম্পর্কে, এবং সীমান্তের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রয়োজনীয়তাও তাতে স্বীকৃত হয়। কারণ তারা বাঙালী ও হিন্দুস্তানী ওহাবীদের দ্বারা ক্রমাগত উত্তেজিত হচ্ছিল। চতুর্থ দেশীয় রেজিমেন্টের মুন্সী মুহাম্মদ ওয়ালীকে ফৌজদারীতে সুপর্দ করা হয় এবং রাওয়ালপিন্ডিতে ১৮৫৩ সালের ১২ই মে তারিখে তার বিচার ও শাস্তি হয়। তখনও মওলভী আহমদুল্লাহ্ এবং পাটনার অন্যান্য অধিবাসীদের নাম পুনরায় সাক্ষ্য প্রমাণে ওঠে এবং তাঁদের দ্বারা সীমান্তে রসদ পাঠানো বিষয়ও আলোচনা হয়।"

"অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, গভর্ণমেন্ট কোন সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেননি এবং পাটনার ষড়যন্ত্রও নষ্ট করে দেননি। রাজদ্রোহিতার দমন নিশ্চয়ই হতো, আম্বালা অভিযানে কোনো সৈন্যক্ষয় হতো না এবং সরকারী কর্মচারীরা বহু পরিশ্রম ও অহেতুক লাঞ্ছনা থেকে রেহাই পেতেন, কারণ ১৮৫২ সালের সশস্ত্র রাজদ্রোহী আহমদুল্লাহ্ই হচ্ছে এক 'সামান্য কেতাবওয়ালা' ও ১৮৫৭ সালের 'ওহাবী ভদ্রলোক'।

—(ওহাবী আন্দোলন, আবদুল মওদুদ, পৃঃ ১৯৮-২০০)

সারা ভারতে ১৮৫৭ সালে আযাদী আন্দোলন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে আহমদুল্লাহ সহ পাটনার বহু মুসলমানকে গ্রেফতার ও বন্দী করেন তদানীন্তন কমিশনার মিঃ টেইলার। টেইলার সন্দেহ করেন যে, সাতান্ন সালের আন্দোলনে এসব মুসলমান জড়িত ছিলেন। টেইলার বন্দীকৃত মুসলমানদেরকে বিনা বিচারে অতি নিষ্ঠুর ও পৈশাচিকভাবে দৈনিক কিছু সংখ্যক করে তাঁর বাংলার ময়দানে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে থাকেন। কিন্তু এ নিষ্ঠুর ও অন্যায় অবিচার কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছা মাত্র অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্তির আদেশ দেয়া হয়

এবং টেইলারের কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। এভাবে আহমদুল্লাহ্ টেইলারের মৃত্যুযজ্ঞ থেকে রক্ষা পান। এ পৈশাচিক হত্যাকান্ডের জন্যে টেইলারকে কমিশনারের পদ থেকে অপসারণ করা হয়।

সাতান্নর আযাদী আন্দোলন দমিত ও প্রশমিত হলে, ইংরেজরা মুসলমানদের মন জয় করার ভূমিকা গ্রহণ করে। ওদিকে স্যার সৈয়দ আহমদও ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। আহমদুল্লাহ্র প্রতিও সরকারের সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়। ফলে ১৮৬০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বরের এক ঘোষণার দ্বারা তিনি ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে নিয়োজিত হন। কিন্তু তখনও পাটনার বড়ো খান্‌কাহ্ বা প্রধান কেন্দ্রস্থল থেকে মুলকা ও সিত্তানায় রীতিমতো মুজাহিদ ও রসদ সরবরাহ অব্যাহত ছিল। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়েও আহমদুল্লাহ্ একমাত্র খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করতেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে বাংলা বিহার থেকে মুজাহিদ ও রসদ সংগ্রহ পূর্ণ উদ্যমে চলতো। এ ব্যাপারে প্রধান ঘাঁটি ছিল তাঁর নিজবাড়ী। প্রত্যেক জুমার দিনে বাদমাগরিব তাঁর বাড়ীতে মিলাদের আয়োজন করা হতো এবং মীলাদের নামে সেখানে মুজাহিদগণ জমায়েত হতেন এবং দৈনন্দিন কর্মসূচী নির্ধারিত করতেন। তাঁরা তাঁদের কাজকর্মের জন্যে এমন এক সংকেত পদ্ধতি (CODE) ব্যবহার করতেন যা তাঁরা ব্যতীত আর কারো বোধগম্য ছিল না। প্রত্যেকে ভিন্ন নামে নিজেদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। যুদ্ধকে বলা হতো 'মোকদ্দমা', মোহরকে 'লালমোতি।' টাকা পয়সা প্রেরণ করা হতো কেতাবের মূল্য হিসাবে। আহমদুল্লাহ 'কেতাবওয়ালা' বলে পরিচিত ছিলেন।

বাংলা ও বিহারে আহমদুল্লাহর বিশ্বস্ত, কর্মঠ ও খোদার পথে উৎসর্গীকৃত এজেন্ট ছিল। বাংলার এজেন্ট ছিলেন ঢাকার প্রসিদ্ধ চামড়া ব্যবসায়ী হাজী বদরুদ্দীন। তিনি পূর্বাঞ্চলের সমুদয় অর্থ সংগ্রহ করে পাটনার ফাগুলাল নামধারী জনৈক ব্যবসায়ীর নামে হুন্ডী করে পাঠাতেন। কোলকাতার মুড়িগঞ্জ মহল্লায় আবদুল জাব্বার নামে এবং মুকসেদ আলী নামে অন্য একজন হাইকোর্টের মোক্তার এজেন্ট ছিলেন। মুকসেদ আলীর পাটনাতেও বাড়ী ছিল। তাছাড়া, চব্বিশ পরগণা, যশোর, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রংপুর প্রভৃতি জেলাতেও এজেন্ট ছিল। বিহার, উড়িষ্যা, ইউপি ও মধ্য প্রদেশের বড়ো বড়ো শহরগুলিতেও এজেন্ট নিয়োজিত ছিল। আহমদুল্লাহ্ সাহেব সাংকেতিক ভাষায় চিঠিপত্রের

আদান প্রদান করতেন তাদের সংগে। ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত মওলবী আহমদুল্লাহ্ই ছিলেন জেহাদী আন্দোলনের প্রধান কর্ণধার। সরকারী উচ্চপদের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে তিনি নিরঙ্কুশভাবে এ আন্দোলন পরিচালনা করতেন এটাই ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কারণ যে কোন বিপ্লব সফল করতে হলে প্রতিষ্ঠিত সরকারের পুলিশ, সামরিক বাহিনী, প্রশাসন বিভাগ প্রভৃতির সাহায্য সহযোগিতা অপরিহার্য।

আঠারো শ' সাতান্ন সালে সমগ্র ভারতব্যাপী যে বিপ্লবী আন্দোলন চলেছিল তার প্রেরণা সঞ্চার করেছিল মুজাহিদ বাহিনী, তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল মুজাহিদ বাহিনী। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার দরুন সে আন্দোলন ফলপ্রসূ না হলেও মুজাহিদগণ দমিত হননি, ভগ্নোৎসাহ হননি। তাদের কর্মপ্রেরণা হ্রাস পায়নি মোটেও। চূড়ান্ত বিজয় লাভ সম্ভব না হলেও সাতান্ন বিপর্যয়ের পরও একদশক কাল পর্যন্ত এ আন্দোলনকে তাঁরা এগিয়ে নিয়ে গেছেন প্রায় সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে।

সমগ্র বাংলা থেকে হাজার হাজার মুসলমান গাজী অথবা শহীদ হওয়ার আকাংখায় পাটনা সাদিকপুরে আহমদুল্লাহ সাহেবের বাড়ীতে জমায়েত হতো এবং সেখান থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে সিত্তানার জন্যে রওয়ানা হতো। এ রকম একটি দলের চারজন বাংলার মুসলমান আম্বালা যাওয়ার পথে গুজান খান নামক জনৈক পাঞ্জাবী সার্জেন্টের হাতে ধরা পড়ে। তাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। তারা নিজদেরকে নির্দোষ ও নিরীহ পথচারী বলে জানালে ম্যাজিস্ট্রেট তাদেরকে মুক্তি দেন। গুজান খান মনে বড়ো দুঃখ পায় এবং তার এক পুত্রকে সিত্তানায় গুপ্তচরবৃত্তির জন্যে পাঠিয়ে দেয়। গুজান খানের পুত্র জানায় যে থানেশ্বর নিবাসী জনৈক জাফর আলী সিত্তানায় মুজাহিদ ও রসদ পাঠানোর কাজ করেন। কর্তৃপক্ষ সংবাদ পাওয়া মাত্র জাফর আলী থানেশ্বরীর বাড়ী তল্লাশী করে এবং বহু সন্দেহজনক কাগজপত্র হস্তগত করে। জাফর আলী পলাতক হন, কিন্তু বহু মুজাহিদসহ আলীগড়ে ধরা পড়েন। তাঁদের জবানবন্দীতে জানা যায় যে, তারা সাদিকপুরের এলাহী বখ্‌শের গুপ্তচর। এলাহী বখ্‌শের খানা তল্লাসীর পরও সেখান থেকে বহু আপত্তিকর কাগজপত্র পাওয়া যায়।

এসব কাগজপত্র থেকে কর্তৃপক্ষ একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্রের সন্ধান পায় এবং পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট র‍্যাভেন শ'কে তদন্তের ভার দেয়া হয়। তদন্তের সাথে সাথে

আহমদুল্লাহ সাহেবকে গ্রেফতার করা হয় এবং চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। চার মাস তদন্তের পর আহমদুল্লাহ্র বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতা প্রভৃতি আট দফা চার্জ গঠন করে কারাগারে সুপর্দ করা হয়। বিচারে দায়রা জজ তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেন। এ দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে কোলকাতা আপীল দায়ের করা হয়। বিচারপতি ট্রিভার এবং ও লক (Trevor and O. Lock J.J) ১৮৬৫ সালের ১৩ই এপ্রিল রায় প্রদান করেন। রায়ে তারা বলেন, "প্রাণদণ্ডের আদেশ অনুমোদন না করে এই আদেশ দিলাম যে তার যাবজ্জীবন দীপান্তর হোক ও তার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি রাজসরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হোক।"

ঐ বছর জুন মাসেই তাকে আন্দামান পাঠানো হয় এবং প্রায় ষোল বছর বন্দী জীবন যাপনের পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই বীর মুজাহিদ সহাস্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।

তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহ্ইয়া আলীরও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কারাদণ্ড হয়েছিল এবং তিনি ইতিপূর্বেই আন্দামানে এন্তেকাল করেন। আহমদুল্লাহর অন্তিম ইচ্ছা ছিল সহোদরের পাশেই সমাহিত হতে। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাঁর এ নির্দোষ ও অক্ষতিকর ইচ্ছাটুকুও পূরণ করেনি।

সাদিকপুর পরিবারের বাসগৃহটি ছিল পাটনার অতি সম্রান্ত ও বিখ্যাত বাসগৃহ। বাসগৃহটি ভূমিসাৎ করে সেখানে পাটনার মিউনিসিপ্যাল মার্কেট নির্মিত হয়। এ নির্মাণকার্যের ব্যয় বহন করা হয় এ পরিবারের অন্যান্য সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়েই।

সাদিকপুরের এ সম্রান্ত ও প্রসিদ্ধ পরিবারটি আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে যেভাবে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো, এবং অনুপম ত্যাগ ও কুরবানীর যে স্বাক্ষর এ পরিবারটি রেখে গেল, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। নারী ও শিশু নির্বিশেষে পরিবারের প্রতিটি সদস্য সরকারের কোপানলে তিলে তিলে দগ্ধিভূত হয়েছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার এই যে, মুসলমানদের পবিত্র ও আনন্দময় ঈদের দিনে ইংরেজ সরকার আহমদুল্লাহর পরিবারকে বাসগৃহ থেকে শুধুমাত্র একবস্ত্রে ও খালি হাতে উৎখাত করে চরম আত্মতৃপ্তি লাভ করে। এমন পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা ও অপরের ধর্মীয় উৎসব দিবসের এমন অবমাননা কোন সভ্য জাতির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিষ্পাপ শিশু ও নারীদের নীরব আর্তনাদ ও হাহাকার সেদিন আকাশ বিদীর্ণ করেছিল। আহমদুল্লাহ্ হয়তো তাই এ দিনটিকে স্মরণ

করে নিম্নোক্ত শোকগাথাটি রচনা করেছিলেন ঃ

চুঁ শব-ই-ঈদরা সেহর করদান্দ্
হামারা আয্ মাকান বদর করদান্দ্
মায়া ইযায়শ্ সাযে মাতম্ সওদ্
ঈদ-ই-মা গুররা-ই-মুহররম সওদ্।

—ঈদের রাতের শেষে যখন উষার আলোক প্রতিভাত হলো, তখন আমরা সব বিতাড়িত হলাম আপন গৃহ থেকে। আনন্দের সব উচ্ছ্বাস শোকের রূপ ধারণ করলো—আমাদের ঈদ মুহররমের কারবালায় পরিণত হলো।

পৈশাচিকতার এখানেই শেষ নয়। সাদিকপুর পরিবারের সুবৃহৎ পারিবারিক কবরস্থানটি চাষ দিয়ে উৎখাত করা হয় এবং হিন্দুদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে দেয়া হয়।

মওলানা ইয়াহইয়া আলী

মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ছিলেন বিপ্লবী আহমদুল্লাহ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভীর অসম্পূর্ণ কাজকে পূর্ণ রূপ দেয়ার জন্যে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মুজাহিদগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যেভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জাগ্রত রেখেছিলেন তা এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। এ কাজের জন্যে তিনি আপন জীবন ও ধন সম্পদ খোদার পথে বিসর্জন দিয়েছিলেন। বলতে গেলে সাইয়েদ সাহেবের শাহাদাতের পর মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীই মুজাহিদগণের আধ্যাত্মিক নেতা বা ইমাম ছিলেন। ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত জেহাদী আন্দোলন পরিচালনা করার পর তিনি অন্যান্যের সাথে ব্রিটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হন।

হান্টার তাঁর গ্রন্থে বলেন, "প্রধান ইমাম ইয়াহ্ইয়া আলীর উপর বহুবিধ কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। ভারতে ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক পরিচালক হিসাবে তাঁকে অধীনস্থ প্রচারকদের সাথে নিয়মিত পত্রালাপ করতে হতো। তাঁকে এক ধরনের গোপন ভাষায় চিঠি তৈরী করতে হতো এবং এ গোপন ভাষাটা তাঁরই আবিষ্কার। প্রচুর অর্থ সীমান্তের বিদ্রোহী শিবিরে নিয়মিত পাঠাবার ব্যবস্থাটাও তাঁকেই পরিচালনা করতে হতো। মসজিদে নামাজের ইমামতি করা, ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের রাইফেলগুলি পরীক্ষা করে তাদের হাতে তুলে দেয়া, ছাত্রদের

মাঝে ধর্মীয় বক্তৃতা করা এবং ব্যক্তিগত পড়াশুনার মাধ্যমে আরবী ধর্মগুরুদের প্রবর্তিত তত্ত্বজ্ঞান আরো গভীরভাবে রপ্ত করা এ সবই ছিল তাঁর কর্মসূচীর অন্তর্গত।"

বলতে গেলে তিনি ছিলেন একাধারে মুজাহিদ বাহিনীর পরিচালক, তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দাতা, মসজিদের ইমাম, এলমে তাসাওউফের মুর্শেদ এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে সংকেত-পদ্ধতির আবিষ্কারক। আঠারো শ' চৌষট্টি সালের জুলাই মাসে আম্বালার সেশন জজ স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ডস্ যে রায় প্রদান করেন তার বরাত দিয়ে হান্টার বলেন, "ভারতে অর্ধচন্দ্রের (ইসলামী) শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে পাটনার মসজিদে তিনি (ইয়াহ্ইয়া আলী) ধর্ম বিষয়ক প্রচারণায় নিয়োজিত ছিলেন। অর্থ সংগ্রহ এবং মুসলমানদের জিহাদ পরিচালনার জন্য তিনি বহু সংখ্যক অধঃস্তন এজেন্ট নিযুক্ত করেন।"

তিনি আরো বলেন, "মামলার বিচারকার্য থেকে তিনটি সর্বাধিক বিস্ময়কর ব্যাপার উদঘাটিত হয় তা হ'চ্ছে— ব্যাপক এলাকা জুড়ে সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে সংগঠকদের বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা পরিচালনাকালে গোপনীয়তা রক্ষায় কর্মীদের দক্ষতা, এবং তাঁদের পরস্পরের প্রতি সার্বিক বিশ্বস্ততা। তাদের সাফল্যের মূলে অনেকাংশে ছিল ছদ্মনাম গ্রহণের ব্যবস্থা এবং সংবাদ আদান প্রদানের জন্যে এক ধরনের গুপ্ত ভাষার প্রবর্তন।

এ মামলার আসামী ছিলেন মোট এগারোজন। আন্দোলনের অগ্রনায়ক যারা ছিলেন তাদের বিচারে প্রাণদন্ড হয়। কিন্তু এই প্রাণদন্ডাদেশ তাঁরা এমন সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে যে তা ব্রিটিশ সরকারকে বিস্মিত করে। কারণ এসব মুজাহেদীনের জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে দৃষ্টিভংগী ছিল শাসকদের দৃষ্টিভংগী থেকে ভিন্নতর। আল্লাহ্‌র পথে শাহাদত বরণকে তাঁরা জীবনের বড়ো সাফল্য বলে দৃঢ়প্রত্যয় রাখতেন। তাই প্রদেশের সর্বোচ্চ আদালত তাদের প্রাণদন্ড মওকুফ করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে পরিবর্তিত করেন। হান্টার সাহেব উপরোক্ত সত্যটি স্বীকার করে বলেন, "ষড়যন্ত্রের সবচেয়ে অগ্রনায়ক যাঁরা ছিলেন এমনকি তাঁদেরকে, শহীদ হবার সুযোগ না দিয়ে ব্রিটিশ সরকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।"

এ মামলার আসামী যাঁরা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন :

মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী, পাটনার প্রচার কেন্দ্রের কোষাধ্যক্ষ আবদুল

গাফ্ফার, জাফর থানেশ্বরী, ব্রিটিশ সেনানিবাসে মাংস সরবরাহকারী কন্ট্রাক্টর মুহাম্মদ শফি, আবদুর রহীম, এলাহী বখ্শ্, মুহাম্মদ হুসাইন, কাজী মিঞাজান, আবদুল করিম, থানেশ্বরের হুসাইনী এবং আবদুল গাফ্ফার (২)।

পাঁচ নম্বর আসামী আবদুর রহীমের বাড়ীতে বাঙালী মুজাহিদগণ জমায়েত হ'য়ে অবস্থান করতেন। খাদেম তাঁদের টাকা পয়সা জমা রাখতো, খাওয়া দাওয়া করাতো, খাতির তাজিম করতো এবং বিদায়ের সময় টাকা পয়সা ফেরৎ দিত। ইয়াহ্ইয়া আলী তাঁদেরকে জেহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতেন।

এলাহী বখ্শ্ সংগৃহীত তহবিল জা'ফর থানেশ্বরীর কাছে পাঠাতেন এবং তিনি তা মুল্কায় ও সিত্তানায় বিদ্রোহী শিবিরে পাঠাতেন।

পাটনার মুহাম্মদ হুসাইন ছিলেন এলাহী বখ্শের খাদেম, তিনি স্বর্ণ মোহর আস্তিনের মধ্যে সিলাই করে পাটনা থেকে দিল্লী যান এবং নির্দেশ মুতাবেক জাফর থানেশ্বরীর কাছে হস্তান্তর করেন।

কাজী মিঞাজান মুজাহিদ সংগ্রহের কাজ করতেন, অর্থ সংগ্রহ করে পাঠানো এবং চিঠিপত্র আদান প্রদানের কাজও তিনি করতেন।

আবদুল করিম ছিলেন মাংস সরবরাহকারী মুহাম্মদ শফির গুপ্তচর। তিনিও পাটনা থেকে টাকা কড়ি বহন করে নিয়ে যেতেন। মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী তাঁর 'তাওয়ারীখ-ই-আজীব' গ্রন্থে বলেছেন, মিঞাজান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী নিবাসী ছিলেন। তিনি জেলখানায় মৃত্যুবরণ করেন।

থানেশ্বরের হুসাইনী— মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী ও মুহাম্মদ শফির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। একদিন ২৯০টি স্বর্ণ মোহর মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরীর নিকট থেকে বহন করে নিয়ে মুহাম্মদ শফির নিকটে যাবার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েন।

মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ভোগের সময় তথায় শেষ নিঃশাস ত্যাগ করেন। এভাবে ভারতে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনায়কের ইংরেজ শাসকদের নিপীড়নের মধ্যে জীবনাবসান হয়।

মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত তিনজনের মধ্যে (মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী, হাজী মুহাম্মদ শফি ও মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী) জাফর থানেশ্বরী অন্যতম। তিনি থানেশ্বরের

একজন অতি প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুদন্ড মওকুফ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দন্ডিত করা হয়। তিনি আঠারো বৎসর আন্দামানে কারাদন্ড ভোগ করার পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তাওয়ারীখ–ই–আজীব নামক একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর দীর্ঘ আন্দামান জীবনের অভিজ্ঞতা, কয়েদীদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার, ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলনের এবং জেহাদী আন্দোলনের বহু মূল্যবান তথ্য এই গ্রন্থে তিনি সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে ১৮৬৩ সালের আম্বালা যুদ্ধের এক চমদপ্রদ বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি বলেন ঃ

"১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে বৃটিশ সরকারের একান্ত জবরদস্তির ফলে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জেনারেল চ্যাম্বারলেন ছিলেন ইংরেজ পক্ষের সেনাপতি। আম্বালার ঘাঁটিতে তাঁর বাহিনীকে যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এ পররাজ্য আক্রমণ ও সীমালংঘনেরই শামিল। সেজন্যে সোয়াতের বিখ্যাত পীর সাহেবও বহু সংখ্যক শিষ্য নিয়ে মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর সাহায্যের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। আফগানরা দেশ ও জাতির ইজ্জৎ রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ভীষণ যুদ্ধ চলতে থাকে। স্বয়ং জেনারেল চ্যাম্বারলেন গুরুতর জখম্ হন। প্রায় সাত হাজার ইংরেজ সৈন্য হতাহত হয়। মুজাহিদ বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই বৃটিশ সরকার পররাজ্যের অভ্যন্তরে হলেও এ অভিযান প্রেরণ করে। মুজাহিদগণের সংকল্প হচ্ছে, হয় বিজয় নয় শাহাদাৎ। তাঁরা বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে লেগে যান। কাজেই যুদ্ধ প্রচন্ড আকার ধারণ করে।

এদিকে ভারতের ভাইস্রয় লর্ড্ এলগিন নিজের অযৌক্তিক কার্যকলাপ ও অন্যায় আক্রমণের পরিণাম ফলের মর্মজ্বালায় কুবনের পর্বতশিরে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভারত বর্ষ রাজপ্রতিনিধিহীন হ'য়ে পড়ে।

যুগপৎ যুদ্ধ ও ভাইসরয়ের মৃত্যু নিঃসন্দেহে সংকট সৃষ্টি করে। এমনি সময়ে আঠারো শ' তেষট্টি সালের এগারোই ডিসেম্বর তারিখে কর্ণাল জেলার পানিপথ চৌকির ভারপ্রাপ্ত অশ্বারোহী পাঠান পুলিশ গুজান খান কোন সূত্রে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে আমার যোগসূত্র জানতে পারে। সে স্বভাবতঃই একে পদোন্নতির এক সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। তখন সে এক দীর্ঘ বিবৃতিতে কর্ণালের ডিপুটি কমিশনারকে তা জানিয়ে দেয়। সে জানায়, সীমান্তে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যে

ভয়াবহ সংগ্রাম চলছে, তাতে থানেশ্বর শহরের নম্বরদার মুহাম্মদ জাফর টাকা ও লোক দিয়ে সাহায্য করে থাকে। ডিপুটি কমিশনার খবর পাওয়া মাত্র আম্বালা জেলার কর্তৃপক্ষকে, যার অধীনে থানেশ্বর শহর অবস্থিত, টেলিগ্রামযোগে এ সংবাদ জানিয়ে দেয়। সংবাদদাতা বেরিয়ে আসবার সংগে সংগেই আমার জনৈক পুলিশ বন্ধু ডিপুটি কমিশনারের বাংলোতে যান। তিনি তাঁর কাছে গোপন সংবাদটি জানতে পেরে আমাকে অবহিত করার জন্যে একজন পুলিশ অফিসারকে পাঠান, আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছি বলে তিনি পরদিন প্রাতে জানাবেন মনে করে চলে যান। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমার পুলিশ বন্ধুটি আসার পূর্বেই আমার বাড়ী ঘেরাও করে ফেলে পুলিশ সুপার ক্যাপ্টেন পার্সন।"

(তাওয়ারীখ–ই–আজীব, বাংলা অনুবাদ 'আন্দামান' বন্দীর আত্মকাহিনী, পৃঃ ১–২)।

মওলানা ইমামুদ্দীন

বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার সদর থানার অধীন হাজীপুর (সোদুল্লাপুর) গ্রামে মওলানা ইমামুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার জন্যে কোলকাতা গমন করেন এবং সেখান থেকে শাহ আবদুল আযীয দেহলবীর নিকট শিক্ষাগ্রহণের জন্যে দিল্লী গমন করেন। দিল্লী অবস্থানকালে সাইয়েদ আহমদ শহীদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হয়। কিন্তু তখন তিনি তাঁর দীক্ষা গ্রহণ করেননি। পরবর্তীকালে লক্ষ্ণৌ শহরে পুনরায় তাঁর সাইয়েদ আহমদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। এবার তিনি তাঁর হাতে 'বয়আত' গ্রহণ করে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করেন, কিছুকাল পরে সাইয়েদ সাহেব তাঁকে তাঁর খলিফা পদে বরণ করেন।

সাইয়েদ সাহেব যখন হজ্বের উদ্দেশ্যে হেজাজ গমন করেন তখন মওলানা ইমামুদ্দীন কোলকাতায় স্বীয় মুর্শেদের নিকটে বিদায় নিয়ে বৃদ্ধ পিতার সংগে সাক্ষাতের জন্যে নোয়াখালী যান। অতঃপর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলীমুদ্দীন এবং ত্রিশ চল্লিশজন লোকসহ হেজাজ গমন করে সাইয়েদ সাহেবের কাফেলার সাথে মিলিত হন।

হজ্বের পর তিনি জেহাদ অভিযানে শরীক হন এবং বালাকোট প্রান্তরেও সাইয়েদ সাহেবের সাথী হন। যুদ্ধে তাঁর ভাই আলীমুদ্দীন শহীদ হন এবং তিনি

গাজীরূপে প্রত্যাবর্তন করেন। বালাকোট বিপর্যয়ের পর টংকের নবাব ওয়াজিরুদ্দৌলার আমন্ত্রণে তিনি টংক রাজ্যে গমন করেন। নবাব সাহেব তাঁর নিকটে বহু বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী

সূফী নূর মুহাম্মদ চট্টগ্রাম নিবাসী ছিলেন, তাঁর বিস্তারিত জীবনী জানা না গেলেও তিনি ছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদের অন্যতম খলিফা। তিনি যথারীতি মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করেন, সাইয়েদ সাহেবের কাফেলাভুক্ত হ'য়ে হজ্জব্রত পালন করেন এবং জেহাদ অভিযানে শেষ পর্যন্ত সাইয়েদ সাহেবের সাথে অংশগ্রহণ করেন। বালাকোটের যুদ্ধের পর তিনিও গাজী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

পশ্চিমবংগের বিখ্যাত পীর শাহ সূফী ফতেহ আলী সাহেব সূফী নূর মুহাম্মদের নিকট এলমে তাসাওউফের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সূফী ফতেহ আলী সাহেবের মাজার কোলকাতার মানিকতলায় অবস্থিত। তাঁর খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন হুগলী জেলার ফুরফুরা নিবাসী মওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী।

দ্বাদশ অধ্যায়

বৃটিশ ভারতের প্রথম আযাদী সংগ্রাম

আঠারো শ' সাতান্ন খৃষ্টাব্দে সারা ভারতব্যাপী এক প্রচণ্ড ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম শুরু হয়। শাসকগোষ্ঠী তার নাম দিয়েছে "সিপাহী বিদ্রোহ"। ১৮৫৭ সনে সিপাহী, জনতা, মুজাহেদীন মিলে যে সংগ্রাম শুরু করেছিল, তাতে এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিমূল আলোড়িত হ'য়েছিল। শাসকদের দৃষ্টিতে একে 'বিদ্রোহ' বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ছিল বৈদেশিক শাসন–শোষণের বিরুদ্ধে সত্যিকার আযাদীর সংগ্রাম।

ভারতবর্ষে বিগত দুই শতকের মধ্যে তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা বিশেষ স্মরণীয়। এ তিনটি ঘটনা সংঘটিত হয় ১৭৫৭, ১৮৫৭ এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে। ১৭৫৭ সনে সংঘটিত হয় পলাশীর যুদ্ধ। ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে যুদ্ধ না করেও সুচতুর ক্লাইভ জয়লাভ করে এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায়। পলাশীর অভিযান ছিল ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও মধ্যবিত্ত হিন্দুদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের ফল। অবশ্য এর জন্যে মীর জাফর আলীকে দাঁড় করানো হ'য়েছিল শিখণ্ডীরূপে। ১৮৫৭ সনের সংগ্রাম ছিল সিপাহী জনতার সংগ্রাম—ভারতভূমিকে স্বেচ্ছাচারী ব্রিটিশ শাসকদের গোলামীর শৃংখল থেকে মুক্ত করার। তার নব্বই বছর পর ১৯৪৭ সনে ভারতীয় মুসলমানদের সংগ্রাম ছিল ব্রিটিশকে বিতাড়িত করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু শাসনের অধীন না হ'য়ে নিজস্ব স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার। মুসলমান বিজয় লাভ করেছিল শেষোক্ত সংগ্রামে।

আঠারো শ' সাতান্ন সালের আযাদী সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস বিবৃত করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। সংক্ষেপে তার পটভূমি, সংগ্রামের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী এবং পরাজয়ের মূল কারণসমূহ উল্লেখ করাই এ নিবন্ধের লক্ষ্য।

পটভূমিকা

এ সংগ্রামের পটভূমিকা ও কারণ নির্ণয় করতে হলে আমাদেরকে আরও একশ' বছর পেছনের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে হবে। পলাশীর যুদ্ধের পর

মুসলমানদের শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাই হাতছাড়া হয়নি। বরঞ্চ তার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় সত্তা, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা ও তাহজিব তামাদ্দুনও বিপন্ন হ'য়ে পড়ে। মুসলিম শাসন আমলে ইংরেজ বণিকরা ভারতে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের নাম করে। ব্যবসায় সুযোগ সুবিধা লাভের জন্যে তারা মুসলমান বাদশাহদের দুয়ারে ধর্ণা দিতো এবং তাঁদের করুণা লাভের আশায় দিন গুণতো। মুসলমান বাদশাহগণ উদার মনোভাব সহকারে তাদেরকে এ দেশে ব্যবসার পূর্ণ সুযোগ সুবিধা দান করেন। কিন্তু তারা এ সুযোগের বার বার অপব্যবহার করতে থাকে। যার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে কখনো কখনো কঠোর ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে হয়। এতে করে মুসলমান বাদশাহগণ ও মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধেই তাদের মনে এক প্রতিহিংসার বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। তারা এ দেশে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজদন্ড হস্তগত করার পরিকল্পনা করে। তাদের এ পরিকল্পনায় ইন্ধন যোগায় বাংলার মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ।

অদৃষ্টের পরিহাস এই যে সেই ইংরেজ বণিকরাই যখন বাংলা ও দিল্লীর মসনদ অধিকার করে বসে, তখন তারা ভারতের পূর্বতন মালিকদেরকে, যাদের কৃপায় তারা এ দেশে ব্যবসার জাল বিস্তার করতে পেরেছিল, তাদেরকে ঘৃণা ও সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। মুসলমানদেরকে তাদের রাজ্য বিস্তারে প্রতিবন্ধক মনে করে তাদের প্রতি অবলম্বন করলো চরম দমননীতি। পক্ষান্তরে তাদের করুণা ও আশীর্বাদ শত ধারায় বর্ষিত হতে লাগলো হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গোটা মুসলমান সমাজকে নিষ্পেষিত ও নির্মূল করার নীতি গ্রহণ করেছিল ইংরেজ শাসকগণ। মুসলমান আমলে সকল প্রকার সরকারী চাকুরীতে সিংহভাগ ছিল মুসলমানদের। ইংরেজ এদেশের মালিক মোখতার হওয়ার পর ধীরে ধীরে মুসলমানগণ সকল বিভাগের চাকুরী থেকে বিতাড়িত হতে লাগলো। শেষে সরকারের বিঘোষিত নীতিই এই হ'য়ে দাঁড়ালো যে, কোনও বিভাগে চাকুরী খালি হ'লেই বিজ্ঞাপনে এ কথার বিশেষভাবে উল্লেখ থাকতো যে মুসলমান ব্যতীত অন্য যে কেউ প্রার্থী হ'তে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত আইন পাশ করে মুসলমান বাদশাহগণ কর্তৃক প্রদত্ত সকল প্রকার জায়গীর, আয়মা, লাখেরাজ, আলতমগা, মদদে মায়াশ প্রভৃতি ভূসম্পদ মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তাদেরকে পথের

ভিখারীতে পরিণত করে। একমাত্র বাংলাদেশেই অন্যূন পঞ্চাশ হাজার ও ইনাম কমিশন দ্বারা দাক্ষিণাত্যের বিশ হাজার লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের বহু লক্ষ টাকা আয়ের ওয়াকফকৃত সম্পত্তি সরকার অন্যায়ভাবে নিজেদের তত্ত্বাবধানে রেখে প্রকৃত হকদারকে বঞ্চিত করে। সরকারের এসব দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বহু প্রাচীন মুসলিম পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় এবং বহু খানকাহ, মাদ্রাসা, মসজিদ প্রভৃতি মুসলিম শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সূর্যাস্ত আইন দ্বারা মুসলমানদের অধিকার থেকে যাবতীয় জমিদারী, তালুকদারী, ইজারা প্রভৃতি কেড়ে নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে বন্টন করা হলো। ফলে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারগুলি উৎখাত হয়ে গেল। বাংলার কৃষকদের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ছিল মুসলমান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার শ্রেণী হলো হিন্দু এবং জমির একচ্ছত্র মালিক। কৃষককুল হলো তাদের অনুগ্রহ মর্জির উপর একান্ত নির্ভরশীল। তাদের শুধু জমি চাষের অনুমতি রইলো, জমির উপর কোন অধিকার বা স্বত্ব রইলো না। হিন্দু জমিদারগণ প্রজাদের নানানভাবে রক্ত শোষণ করতে লাগলো। জমির উত্তরোত্তর খাজনা বৃদ্ধি, আবওয়াব, সেলামী, নজরানা, বিভিন্ন প্রকারের কর প্রভৃতির দ্বারা কৃষকদের মেরুদন্ড ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। হিন্দু জমিদারগণ মুসলমানদের কাছ থেকে দাড়ির ট্যাক্স, মসজিদের ট্যাক্স, মুসলমানী নাম রাখার ট্যাক্স, পূজাপার্বনের ট্যাক্স প্রভৃতি জবরদস্তিমূলকভাবে আদায় করতে লাগলো যেসবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ, তিতুমীর প্রমুখ মনীষীগণ। এসব আলোচনা যথাস্থানে করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষার অংগন থেকেও মুসলমানদেরকে বহু দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে ইংরেজ কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের ফলে দেশীয় শিল্পবাণিজ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আবদুল মওদূদ বলেন, "দেশীয় কারিগর শ্রেণীকে নির্মমভাবে পেষণ করে দেশীয় শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনও বন্ধ করে দেয়া হয়। তার দরুন শ্রমজীবীদের জীবিকার পথ একমাত্র ভূমি কর্ষণ ব্যতীত আর কিছুই খোলা রইলোনা। আর ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বণিক-রাজের কুঠিগুলির আশ্রয়ে নতুন দালাল শ্রেণীর ব্যবসায়ীও জন্মলাভ করলো বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, মুন্সী, দেওয়ান উপাধিতে।

বহির্বাণিজ্যে ও অন্তর্বাণিজ্যে বণিকরাজ সবদিক দখল করে যে দালাল শ্রেণীর জন্মদান করলো, তারাও হয়ে উঠলো স্বার্থ ভোগের লোভে দেশীয় শিল্প ও কারিগরির প্রতি বিরূপ। এই নতুন আর্থিক বিন্যাসের ফলে যে নতুন ভূস্বামী ও দালাল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো, তাদের একজনও মুসলমান নয়— মুসলমানদের সে সমাজে প্রবেশাধিকারও ছিলনা এবং এই সম্প্রদায়ই ছিল বিস্তৃত গণবিক্ষোভ বা জাতীয় জাগরণের প্রধান শত্রু। এ কথা খোদ লর্ড বেন্টিংকেও স্বীকার করে গেছেন—

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহু গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি আছে সত্য, তবে এর দ্বারা জনগণের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশালী বড়ো একদল ধনী ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তার একটি বড়ো সুবিধা এই যে, যদি ব্যাপক গণবিক্ষোভ বা বিপ্লবের ফলে শাসনকার্যের নির্বিঘ্নতার ব্যাঘাত ঘটে, তাহলে এই সম্প্রদায়ই নিজেদের স্বার্থে সর্বদাই ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখার জন্যে প্রস্তুত থাকবে।"

—[সিপাহী বিপ্লবের পটভূমিকা, আবদুল মওদূদ (শতাব্দী পরিক্রমা), পৃঃ ৬২]।

এ সম্পর্কে আবদুল মওদূদ বলেন—

"এ মতবাদের সমর্থক এ দেশীয় লোকেরও অভাব নেই। এই সেদিনও বিশ্বভারতীতে বাংলার জাগরণ সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব বলেছেন ঃ সেদিনে বাংলাদেশে অন্ততঃ বাংলার প্রাণকেন্দ্র কোলকাতায় সিপাহী বিদ্রোহের কোন প্রভাব অনুভূত হয়নি। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ মুখার্জি এই বিদ্রোহ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, সিপাহী বিদ্রোহ কেবলমাত্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহীদের কর্মমাত্র, দেশের প্রজাবর্গের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। প্রজাকুল ইংরেজ গভর্ণমেন্টের প্রতি অনুরক্ত ও কৃতজ্ঞ এবং তাহাদের রাজভক্তি অবিচলিত রহিয়াছে।"

কাজী সাহেব আরও বলেন, হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকের মত যে মোটের উপর সেদিনের বাংলাদেশের মত ছিল, তার একটি ভালো প্রমাণ—বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথের মতো স্বাধীনচেতা বাঙালীরাও সেদিন সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে কোন রকম কৌতূহল দেখাননি।. . .সিপাহী বিদ্রোহ সেদিনে শিক্ষিত বাঙালীকে সাড়া দেয়নি, অশিক্ষিত, হিন্দু বাঙালীকে নাড়া দেয়নি।" (সিপাহী বিপ্লবের পটভূমিকা, আবদুল মওদূদ, পৃঃ ৫৮)।

কাজী সাহেবের মন্তব্যও ঠিক এবং হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদকের মন্তব্যও ঠিক। কাজী সাহেবের 'বাঙালী' এবং হরিশ মুখার্জির 'প্রজাকুল' বলতে হিন্দু সম্প্রদায়কেই বুঝানো হ'য়েছে। অবশ্য একথা সত্য যে কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত বাংলা ও ভারতের গোটা হিন্দু সম্প্রদায় সিপাহী বিদ্রোহ তথা ভারতের আযাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি। বাংলার বাইরে যেসব হিন্দু এ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন, ইংরেজ সরকার তাঁদের স্বার্থে চরম আঘাত হেনেছিল। বিশেষ করে বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যাবে কোন দুঃখে? ব্রিটিশ সরকারই তাদেরকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল, দেশের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার দ্বার তাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হ'য়েছিল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের স্থানে তাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হ'য়েছিল। তারাই ছিল ইংরেজ প্রভুদের একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু ও শুভাকাংখী। পক্ষান্তরে মুসলমানরা ছিল সন্দেহভাজন ও শত্রু। সুতরাং বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ তথা হিন্দু প্রজাকুল ইংরেজ গভর্ণমেন্টের প্রতি অনুরক্ত ও কৃতজ্ঞ থাকবে এবং তাদের রাজভক্তি অবিচলিত থাকবে এটাই ত অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ কারণেই সংগ্রামে পরাজয় বরণ করার পর একমাত্র ভারতের মুসলমানরাই ব্রিটিশের রোষবহ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হয়, তাদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়, সকল প্রকার স্থাবর অস্থাবর সম্পদ থেকে উৎখাত করা হয়, জেল, ফাঁসী, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তাদেরকে ভোগ করতে হয়।

স্যার সাইয়েদ আহমদ খান তাঁর 'রিসালা আসবাবে বাগওয়াতে হিন্দ' নামক পুস্তিকায় 'সিপাহী বিপ্লবের' কিছু কারণ নির্ণয় করেছেন। সাইয়েদ সাহেব ছিলেন একজন ব্রিটিশ অনুগত সরকারী কর্মচারী। তিনি যে সময়ে বিজনৌরে চাকুরীরত ছিলেন, তখন বিপ্লব শুরু হয়। বিপ্লবীগণ জেলখানার দ্বার ভেঙে খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করে। এ সময়ে স্যার সাইয়েদ বহু বিপন্ন ইংরেজের প্রাণ রক্ষা করেন।

স্যার সাইয়েদ আহমদ তাঁর পুস্তিকায় বিপ্লবের কারণ বর্ণনার পূর্বে একথা বলেন যে, জেহাদের উদ্দেশ্যে বিপ্লবীগণ এ সংগ্রামে যোগদান করেনি, তাঁর মতে যারা জেহাদের ধ্বনি তুলেছিল তারা কোন ধার্মিক অথবা শাস্ত্রবিদ ছিল না। তারা ছিল নীতিভ্রষ্ট ও মদোন্মত্ত ইতর শ্রেণীর লোক (Depraved and filthy bacchanals। সাইয়েদ আহমদের সাথে অতীত ও বর্তমানের কোন মুসলমানই একমত ছিল না এবং নয়। অবশ্য তাঁর চোখের সামনে যেসব লুঠতরাজ ও

হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, তা দেখেই তিনি এরূপ মন্তব্য করে থাকবেন। তবে যারা কয়েক দশক পূর্ব থেকে মুসলমানদের মধ্যে জেহাদের প্রেরণা সঞ্চারিত করে রেখেছিলেন, সাতান্নোর বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ ছিল তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এ বিপ্লব কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়নি। আপামর জনসাধারণ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রুদ্র আক্রোশে ফেটে পড়েছিল এবং বিভিন্ন চরিত্রের লোক এ বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে। যাদের মধ্যে চরিত্রের কোন বালাই ছিল না তাদের দ্বারাই লুঠ-তরাজ ও পৈশাচিক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু সত্যিকার জেহাদী মনোভাব ও প্রেরণা নিয়ে যাঁরা কয়েক দশক যাবত সংগ্রাম চালিয়েছেন তাঁদের পক্ষ থেকে এমন আচরণের কোনই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নি।

যাহোক আসল কথায় ফিরে আসা যাক। সাইয়েদ আহমদ সিপাহী বিপ্লবের যে সব কারণ বর্ণনা করেন, তা নিম্নরূপ—

১। কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রচন্ড বিক্ষোভের কারণ হলো খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণ তৎপরতা। সকলের এটাই ছিল সাধারণ বিশ্বাস যে ইংরেজ সরকার ক্রমশঃ এবং নিশ্চিতরূপে এ দেশবাসীকে খৃষ্টানধর্মে দীক্ষিত করে ছাড়বে। গোপনে গোপনে তাদের এ পরিকল্পনা এগিয়ে চলছিল এবং জনগণের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার দরুন তাদেরকে একসময় খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হবে। তাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগটি ফলাও করে প্রচার করা হয়, যখন ১৮৩৭ সালের দুর্ভিক্ষে বিরাট সংখ্যক এতিম শিশুকে খৃষ্টান রূপে প্রতিপালনের জন্যে মিশনারীদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ১৮৫৬ সালে কোলকাতায় অবস্থিত বড়োলাটের ভবন থেকে এডমন্ড নামক জনৈক কর্মচারী কোম্পানীর সকল স্তরের কর্মচারীদের নিকটে এই মর্মে এক পত্র প্রেরণ করে খৃষ্টান ধর্মের সত্যতার উপরে চিন্তাভাবনা করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করে। উপরন্তু তাদের প্রতি চাপ সৃষ্টি করা হয় আধুনিক যানবাহনের সাহায্যে খৃষ্টধর্মের আধ্যাত্মিক বন্ধনের ভিত্তিতে ভারতীয় ঐক্যের চূড়ান্ত রূপ দেয়ার জন্যে। স্বধর্মত্যাগের জন্যে এ এক সাধারণ আহবান বলে এর ব্যাখ্যা করা হয় এবং এ সন্দেহ প্রমাণিত হয় যখন দেখা গেল যে সরকারের পক্ষ থেকে মিশনারীদের নিয়োগপত্র এবং সরকারী তহবিল থেকে তাদের বেতন দেয়া হতে থাকে। উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ দরাজহস্তে মিশনারী তহবিলে অর্থ সাহায্য করতে থাকে এবং অধঃস্তন ভারতীয় কর্মচারীদের সাথে ধর্মীয় বিতর্কে অবতীর্ণ হয়। তারা নিম্ন

বেতনভুক কর্মচারীদেরকে তাদের বাড়ী গিয়ে খৃষ্টধর্মের প্রচার-প্রচারণা শ্রবণ করাতে বাধ্য করে। মিশনারীগণ অন্য ধর্মের প্রতি অশালীন উক্তি সম্বলিত প্রচার পুস্তিকা জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ্যে ছড়াতে থাকে। ১৮৫৪ সালের সরকারী নীতি অনুসারে সকল মিশনারী স্কুল সরকারী সাহায্য লাভ করবে বলে যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো মিশনারী স্কুল গজাতে থাকে। সরকারী কর্মচারীগণ প্রায়ই এসব স্কুল পরিদর্শনে যেতো এবং এই বলে বাইবেল পড়তে ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করতো যে খৃষ্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে পুরস্কৃত করা হবে। গ্রাম্য স্কুলগুলিতে শুধুমাত্র উর্দু পড়ানো হতো এবং আরবী ফার্সী পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল।

২। একই রান্নায় সকল সম্প্রদায়ের কয়েদীদেরকে খানা খাওয়ানো হতো। এ ছিল তাদের চিরাচরিত বর্ণ প্রথার পরিপন্থী। ১৯৫০ সালে একটি আইনের মাধ্যমে এ কথা ঘোষণা করা হয় যে স্বধর্ম ত্যাগকারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে আইনতঃ দন্ডনীয়। এতে করে কারো একথা আর বুঝতে বাকি রইলো না যে এ আইনের দ্বারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়েছে। ১৮৫৬ সালের একটি আইন দ্বারা বিধবা বিবাহকে উৎসাহিত করা হয়। এর দ্বারা হিন্দুধর্মে আঘাত করা হয়।

৩। সূদী মহাজন শ্রেণীর অর্থ শোষণের অদম্য লালসা এবং প্রজাদের উপর অতিরিক্ত করভার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় এবং তারা ব্রিটিশ আনুগত্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। বিচার প্রার্থনার জন্যে স্ট্যাম্পপ্রথার প্রচলন সুবিচার বিক্রয় করা অথবা সুবিচার অস্বীকার করা বলে বিবেচিত হয়। কোন কোন প্রদেশে বিচারকদেরকে স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

৪। কোম্পানী শাসনের অধীন লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ দ্বারা অসংখ্য পরিবার ধ্বংস করা হয়। দেশীয় শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস করা হয় এবং দেশের অর্থনীতিকে দেউলিয়া করা হয়।

৫। সর্বশেষ কারণ হিসাবে স্যার সাইয়েদ বলেন যে, মুসলমানদেরকে উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরী থেকে অপসারিত করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সরকারী পদগুলিতে যোগ্য লোক নিয়োগই আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি এমনসব লোক দ্বারা পূরণ করা হতো— যারা ছিল 'নীচ

বংশজাত' (low form), ইতর-অমার্জিত (vulgar) ও অশিষ্ট (ill-bred)। এরা জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে না।

—(Muslim Separatism in India, Abdul Hamid, pp 2-4 and 6)।

সাইয়েদ আহমদ তাঁর পুস্তিকায় উপসংহারে এ বিপ্লব বিদ্রোহের সমাধান পেশ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

. . . the solution to these difficulties lay in bringing the ruler and the ruled closer together by the admission of Indian members of the legislature to ensure that the laws passed by this body satisfied the needs of the country and were not merely academic. I do not wish to enter into the question as to how the ignorant and uneducated people of Hindustan could be allowed to share in the delibrations of the Legislative Council, or as to how they should be selected to form an assembly like the British *Parliament. These are knotty points", Ibid-p. 4)।*

—"ভারতীয় সদস্যদেরকে আইন সভায় গ্রহণ করে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে পারলেই এসব বিরোধের মীমাংসা হতে পারে। আইনগুলি যাতে অবাস্তব ও অকার্যকর না হয় সেজন্যে এ নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যে, আইন সভায় যেসব আইন পাশ হবে তা যেন দেশের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। আমি অবশ্য এ বিতর্কে অবতীর্ণ হতে চাই না যে ভারতের অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ লোকদেরকে কিভাবে আইন সভায় আলোচনার সুযোগ দেয়া হবে এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ন্যায় একটি আইন সভায় কিভাবে তাদেরকে বেছে নেয়া হবে।"

শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক যে মোটেই ভালো ছিল না, বরঞ্চ শাসক শ্রেণী ভারতবাসীকে ঘৃণার চোখে দেখতো তার একটি দৃষ্টান্ত আলতাফ হোসেন হালী তাঁর 'হায়াতে জাবিদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ১৮৬৭ সালে আগ্রায় একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপর গভর্ণরের 'দরবার' অনুষ্ঠান পালিত হয়। আগরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দেন যে, দরবারে ইউরোপীয়গণ ও ভারতীয়গণ পৃথকভাবে তাদের আসন গ্রহণ করবে। একজন সম্ভ্রান্ত ভারতীয় অতিথি আসন খালি দেখে জনৈক ব্রিটিশ কর্মচারীর জন্যে চিহ্নিত আসনে উপবেশন করেন।

তৎক্ষণাৎ তাঁকে উক্ত আসন ছেড়ে দিয়ে আপন লোকদের মধ্যে স্থান করে নিতে আদেশ করা হয়। স্যার সাইয়েদ এতে অত্যন্ত অপমান বোধ করলেন এবং এ ধরনের বর্ণবিদ্বেষের নির্লজ্জ অভিব্যক্তিতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। এ নিয়ে একজন ব্রিটিশ কর্মচারীর সাথে বেশ কথা কাটাকাটিও হলো। জনৈক থর্নহিল এতে যেন জ্বলে পুড়ে গেল এবং ক্রোধে গর্ গর্ করে বলতে লাগলো— "You did your worst in the meeting. How do you expect to be seated on terms of equality with us and our women folk ?" (সিপাহী বিদ্রোহে তোমরা জঘন্যতম আচরণ করেছ। এর পর কি করে আশা করতে পার যে তোমরা আমাদের এবং আমাদের মেয়ে লোকদের সাথে সমতার ভিত্তিতে বসবে?) সাইয়েদ আহমদ রাগে অপমানে সভাস্থল ত্যাগ করে চলে যান। তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এর জন্যে খুব অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তার জন্যে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয়।

—(Muslim Separatismin India, A Hamid, p. 6)।

এসব বিবরণ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আঠারো শ' সাতান্ন সালে সারা ভারত যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রুদ্ররোষে ফেটে পড়েছিল, তার কারণ ছিল বহু ও নানাবিধ। শতাব্দীর পুঞ্জিভূত আক্রোশ আগ্নেয়গিরির ন্যায় বিস্ফোরিত হয়েছিল সাতান্নো সনে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ, শাহ আবদুল আযীয, সাইয়েদ আহমদ শহীদ, শাহ ইসমাইল শহীদ প্রমুখ বীর মুজাহিদগণ যে জেহাদী প্রেরণার সঞ্চার করে রেখেছিলেন তা যেন বারুদের স্তূপে দিয়াশলাইয়ের কাজ করলো। চারদিকে দাউ দাউ করে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলো। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে যে যেখানে পেরেছে সংগ্রামে যোগদান করেছে। সিপাহীদের অধিকাংশেরই সত্যিকার ইসলামী চরিত্র না থাকারই কথা, তাদের সাথে যোগ দিয়েছে সাধারণ মানুষ— কৃষক, মজুর, সরকারী বেসরকারী বহু কর্মচারী। কোন আদর্শবান কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে এ সংগ্রাম পরিচালিত হয়নি। উপরন্তু অনেক সুযোগ সন্ধানীও এসে ভিড়েছে এ আন্দোলনে। সে কারণে কোথাও কোথাও ইসলামী নীতি লংঘিত হয়েছে, হয়েছে লুঠ-তরাজ ও অপ্রয়োজনীয় হত্যাকাণ্ড। নবী মুস্তাফার (সা) জীবদ্দশায় বহু যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে, খোলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণময় যুগে দেশের পর দেশ বিজিত হয়েছে, সালাউদ্দীন আইয়ুবী, নূরুদ্দীন যঙ্গী যুদ্ধের পর যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু এ সবের কোথাও ইসলামী নীতি লংঘিত হয়নি, মানবীয় অধিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ

করা হয়নি, অন্যায় ও অবাঞ্ছিত রক্তপাত করা হয়নি। সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও তাঁর দীক্ষাপ্রাপ্ত অনুসারীদের দ্বারা কোন নীতিবিরোধী আচরণ পরিলক্ষিত হয়নি।

ইংরেজ সরকারের কতিপয় দমনমূলক কার্যকলাপ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে। ১৮৪৩ সালে আমীরদের হাত থেকে সিন্ধুদেশ ইংরেজ সরকার গ্রাস করে। উনপঞ্চাশ সালে লর্ড ডালহৌসী গোটা পাঞ্জাব প্রদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে ফেলেন। ইতিপূর্বে কোম্পানী সরকার এক আইন প্রণয়ন করে অপুত্রক রাজার গৃহীত দত্তক পুত্রের উত্তরাধিকার বাতিল করে দেয়। এই স্বত্বলোপ (Doctrine Lapse) নীতি অনুযায়ী লর্ড ডালহৌসী সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্য হস্তগত করেন। উপরন্তু আঞ্জোর, কর্ণাট প্রভৃতি রাজ্যের রাজাগণের দত্তক পুত্রদের বৃত্তি বন্ধ করে দেন। ১৮১৮ সালে যুদ্ধের পর রাজ্যহারা পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি নিয়ে কানপুরের নিকটস্থ বিঠুরে বাস করছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দত্তক পুত্রের বৃত্তি বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৮৫০ সালে ডালহৌসী নবদীক্ষিত খৃষ্টানদেরকে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার দিয়ে আইন প্রণয়ন করলে তার প্রতিবাদে একমাত্র কোলকাতা শহরের ষাট হাজার নাগরিকের স্বাক্ষরিত এক স্মারকলিপি বড়োলাটের নিকট পেশ করে কোন ফল হয়নি। তার ফলে জনসাধারণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে ইংরেজ সরকার এ দেশবাসীকে খৃষ্টানধর্মে দীক্ষিত করতে ইচ্ছুক। ১৮৫৬ সালে ডালহৌসী মুসলমানদের শেষ স্বাধীন রাজ্য অযোধ্যা অন্যায়ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে ফেলেন, হতভাগ্য অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় ধনসম্পদ, এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর দুই লক্ষ টাকা মূল্যের হস্তলিখিত গ্রন্থাদি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রী করে কোম্পানীর কোষাগার পূর্ণ করা হয়। এর চেয়েও অধিকতর পৈশাচিক ব্যবহার ও বর্বরতা করা হয় অন্তঃপুরবাসিনী বেগমদের সাথে। তাঁদেরকে বলপূর্বক অন্তঃপুর থেকে বাইরে এনে তাঁদের মূল্যবান দ্রব্যাদি বিনষ্ট ও লুন্ঠন করা হয়। বার্ষিক বার লক্ষ টাকার বৃত্তির বিনিময়ে নিরীহ নবাবকে কোলকাতা এনে অবরুদ্ধ করা হয়। এই পৈশাচিক কার্য সম্পাদন করতে স্যার চার্লস্ আউট্রাম্ স্বয়ং অযোধ্যায় যান। তিনি স্বীকার করেছেন যে এ নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত কাজ দেখে তাঁর নিজের রক্ষী বাহিনীর সিপাহীদের মনে গভীর ক্ষোভ ও দুঃখের সঞ্চার হয়েছিল। এসব নিষ্ঠুরতা, মানবতাবিরোধী

কার্যকলাপ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের অদম্য লালসায় নিপীড়ন নিষ্পেষণ মর্মন্তুদ হাহাকার ও আর্তনাদের রূপ ধারণ করে ভারতের আকাশ বাতাস মথিত করে এবং সাতান্ন সালে বিরাট বিপ্লব রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

Annals of the Indian Rebellion, Sir J. W. Kaey প্রণীত History of the Sepoy War এবং Col. J.B. Malleson প্রণীত History of the Indian Mutiny গ্রন্থে সিপাহী বিপ্লবের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বিপ্লবের সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাওয়া যায় ১৮৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে তৎকালীন বাংলার ব্যারাকপুরে। ২২শে জানুয়ারী দমদম থেকে ম্যাস্কেটারী স্কুলের ক্যাপ্টেন রাইট (Captain Wright) জানান যে, নতুন এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজ চর্বিযুক্ত করার জন্যে যেসব উপাদান ব্যবহৃত হয়, সে সম্পর্কে সিপাহীদের মনে দারুণ ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ২৮শে জানুয়ারী ব্যারাকপুর সেনানিবাস থেকে মেজর জেনারেল হিয়ার্সে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এড্‌জুটেন্ট জেনারেলকে জানালেন যে, কোলকাতার বিধবা বিবাহ বিরোধীদের প্রচারণার ফলে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, সিপাহীদেরকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যেই এনফিল্ড রাইফেলের নতুন কার্তুজ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ কার্তুজে গরু ও শুকরের চর্বি মিশ্রিত আছে এবং তা দাঁতে কেটে ব্যবহার করতে হয়। এতে করে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মচ্যুত হয়ে যাবে। হিয়ার্সে আরও জানান যে, রাণীগঞ্জের একজন সার্জেন্টের বাংলো এবং ব্যারাকপুর টেলিগ্রাফ অফিসসহ তিনটি বাংলো অগ্নিতে ভস্মীভূত করা হয়েছে।

১১ই ফেব্রুয়ারী হিয়ার্সে পুনরায় ভারত সরকারের সেক্রেটারীকে জানান : আমরা ব্যারাকপুরে বিস্ফোরণোন্মুখ মাইনের উপর বাস করছি।

২৬শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুরের ১৮ নং পল্টন, প্যারেডের সময় কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করে। লেঃ কর্ণেল মিচেল তখন কঠোর ভাষায় সিপাহীদেরকে বলেন যে, কার্তুজ ব্যবহার না করলে তাদেরকে চীন ও রেঙ্গুনে পাঠানো হবে। সিপাহীগণ এতে অধিকতর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং বিদেশে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে স্বদেশে মৃত্যুবরণকেই শ্রেয় মনে করে। তাদের এ অবাধ্যতার জন্যে তাদেরকে বহরমপুর থেকে ব্যারাকপুর নিয়ে গিয়ে পল্টন ভেঙে দেয়া হয়। এই ১৯ নং পল্টনের এক হাজার সিপাহীর মধ্যে ছিল ব্রাহ্মণ ৪০৯ জন, রাজপুত ২৫০ জন, মুসলমান ১৫০ জন এবং অবশিষ্ট ছিল নিম্নশ্রেণীর হিন্দু।

তাদেরকে সুসজ্জিত কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে নিরস্ত্র করে ৮৫ নং গোরা পল্টনের পাহারায় ফলতাঘাট পার করে দেয়া হয়। এ নিরস্ত্রীকরণ কার্য সম্পাদন করা হয় ৩১শে মার্চ।

এর থেকে বুঝা যায় যে, বাংলায় সিপাহীদের বিদ্রোহের প্রধান এবং প্রত্যক্ষ কারণ (Immediate cause) হলো তাদেরকে চর্বিমিশ্রিত কার্তুজ ব্যবহার করতে বাধ্য করা। এ সব সিপাহীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল বর্ণহিন্দু ও ব্রাহ্মণ।

ইতিমধ্যে মার্চের শেষের দিকে এক সংবাদ রটলো যে, জাহাজ বোম্বাই গোরা সৈন্য ব্যারাকপুর আসছে বিদ্রোহীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য। ৩৪ নং পল্টনের ৫ নং কোম্পানীর জনৈক মংগল পান্ডে এ সংবাদ শুনে ভাবলো যে, তাদের সর্বনাশের সময় আসন্ন। তখন সে উন্মত্ত প্রায় হয়ে অস্ত্র হাতে বাইরে আসে এবং সার্জেন্ট জেনারেল হিউসন ও হিয়ার্সেকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বিচারে পান্ডের ফাঁসী হয়। ৬ই মে ৩৪ নং পল্টন পাইকারীভাবে বরখাস্ত করা হয়।

বহরমপুরের সংবাদ দ্রুতবেগে আম্বালায় পৌছে। সেখানকার ছাউনীগুলি অগ্নি সংযোগে ভষ্মীভূত করা হয়। নগিনার নবাব আহমদুল্লাহ খানের নেতৃত্বে ১লা মে বিজনৌরে বিপ্লব শুরু হয়। ৩০শে মে লক্ষ্ণৌ সেনানিবাসের ৪৮ নং পল্টনের সিপাহীরা ইউরোপীয়দের বাংলোগুলি ভষ্মীভূত করে দেয়। সম্মুখ সমরে স্যার হেনরি লরেন্সের সৈন্যরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। ইংরেজ সৈন্যরা অগত্যা রেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ করে তিন মাসকাল অবরুদ্ধ অবস্থায় কাটায়।

একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, আঠারো শ' সাতান্ন সালের আযাদী সংগ্রামের বহু দৃশ্যপট যবনিকার অন্তরালে রয়েছে। সিকান্দার দারা শিকোহ বলেন :

বিপ্লবের এক চরম পর্যায়ে দিলওয়ার জং মৌলভী আমদুল্লাহর প্রচেষ্টায় বিরজিজিস কাদেরকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসানো হয় এবং অভিভাবিকারূপে বেগম হজরত মহল দেশের শাসন কার্য তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন।

আহমদুল্লাহ শাহ ও হজরত মহল ব্রিটিশ ফৌজের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। ...শাহ শাহেব মুহাম্মদীপুরে 'ইসলামী হুকুমত' কায়েম করেন। শাহাজাদা ফিরোজশাহ ও রাণা রাও সেই হুকুমতের উজীর নিযুক্ত হন। সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন জেনারেল বখত্ খান।

...কিন্তু ফিরোজ শাহ নিজেই বাদশাহ হবার স্বপ্ন দেখছিলেন। ফলে আহমদুল্লাহ এখানেও বেশী দিন টিকতে পারেননি। রাজা বলদেব সিংহের আমন্ত্রণক্রমে তিনি গড়ডি অভিমুখে রওয়ানা হন। একদিন বিশ্বাসঘাতকদের প্ররোচনায় তিনি হাতীর পিঠে আরোহণ করেন এবং সেই অবস্থায় শত্রুর গুলীতে শাহাদাৎ বরণ করেন। তাঁর শির খন্ডিত করে কোতোয়ালীতে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং দেহ খন্ড বিখন্ড করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কয়েকদিন পর আহমদপুর মহল্লায় তাঁর পবিত্র শির দাফন করা হয়। আহমদুল্লাহ শাহের হত্যাকারীকে রাজা (বলদেব সিং) পঞ্চাশ হাজার টাকা বখশিশ দেন। —(শতাব্দী পরিক্রমা, পৃঃ ১৪৭–৪৮)

সাতান্নো সালে ভারতের সংগ্রাম স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তার একটি কারণ হলো কতিপয় স্বার্থান্বেষীর চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজ তৈরীর প্রধান কারখানা ছিল মীরাটে। সেখানে তৃতীয় অশ্বারোহীর ৮৫ জন সিপাহী নতুন কার্তুজ স্পর্শ করতে অস্বীকার করলে তাদেরকে সামরিক বিচারান্তে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় ৯ই মে কারাগারে পাঠানো হয়। পরদিন সন্ধ্যায় সিপাহী জনতার গোলাগুলীর আওয়াজে চারদিক মুখরিত হয়। তারা কারাগার থেকে ৮৫ জন শৃংখলাবদ্ধ সিপাহীকে মুক্ত করে আনে এবং ইউরোপীয়দের বাংলোগুলি ভষ্মীভূত করে। এ ব্যাপারে শহর ও সদর বাজারের অধিবাসীগণই সিপাহীদের চেয়ে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করে। সাইয়েদ হাসান আলী বেরেলভী ছিলেন বিপ্লবীদের পরিচালক। উন্মত্ত জনতা-সিপাহী এখানে একটি মারাত্মক ভুল করে। তারা ইউরোপীয় দুটি রেজিমেন্ট, সেনানিবাস ও অস্ত্রগারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে রাতে দিল্লীর পথে রওয়ানা হয়।

যাহোক তারা চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করে কোন প্রকারে দিল্লী নগরীতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। তৎকালে দিল্লীতে ৩৮, ৫৪ ও ৭৪ নং তিনটি পদাতিক বাহিনী ও দুটি কোম্পানীতে মোট ৩৫০০০ দেশীয় সৈন্য এবং ৫০ জন ইংরেজ অফিসার ছিল। সকাল সাতটায় একদল বিপ্লবী অশ্বারোহী বাহাদুর শাহের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলো। ক্যাপ্টেন ডগলাস, রেসিডেন্ট ফ্রেজার ও ম্যাজিস্ট্রেট হ্যাবিনসন তাদের বাধা দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলো। বিকেল তিনটায় বিপ্লবীগণ যখন অস্ত্রাগারের দুই স্থানে প্রবেশ করে, তখন অবস্থা

বেগতিক দেখে বারুদাগারের প্রধান লেঃ উইলোবীর আদেশে স্কালী (Scully) বারুদের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন দিল্লী নগরীতে কিয়ামত শুরু হয়। প্রচণ্ড শব্দে বারুদখানা উড়ে যায়। আশেপাশের প্রায় পাঁচ শ' লোক মৃত্যুবরণ করলো। বহু অগ্নিদগ্ধ হলো। বিপ্লবীগণ তখন ক্ষিপ্ত হ'য়ে অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠন শুরু করলো। ধনাগার লুণ্ঠন করে ২১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা হস্তগত করা হলো এবং তা বাদশাহের হেফাজতে রাখা হলো। রাত্রে একুশটি কামান পর পর গর্জে উঠলো এবং এভাবে সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের প্রতি রাজকীয় অভিবাদন (Salute) জ্ঞাপন করা হলো।

১২ই মে বাদশাহ স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে নগর পরিদর্শন করেন এবং বাজারের দোকানপাট খোলার ব্যবস্থা করেন। শাহাজাদাগণকে নগরের বিভিন্ন তোরণে শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়।

১৬ই মে কয়েকজন বিপ্লবী সিপাহী একটি সীলমোহরযুক্ত গোপন পত্রে বাদশাহকে জানায় যে, বাদশাহের চিকিৎসক হাকিম আহসানউল্লাহ এবং পরিষদ নবাব মাহবুব আলী খান ব্রিটিশের সংগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যে, পত্রখানি জাল। এতে করে বাদশাহ প্রতারিত হন। শাহজাদাগণ পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক এবং পৌত্র মীর্জা আবু বকর অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক হন। অরাজকতা ও লুঠতরাজ দমনের জন্যে কয়েকটি অশ্বারোহী দল প্রেরণ করা হয়। শাহজাদা মীর্জা জওয়ান বখত্ প্রধান উজির নিযুক্ত হন। হাকিম আহসানউল্লাহ মীর্জা আবু বকরকে দিল্লী থেকে অপসারণের অভিসন্ধি করে মীরাট অধিনায়ক পদে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করেন। ৩১শে মে তাঁর সৈন্যরা প্রয়োজনীয় গোলাবারুদের অভাবে হিন্দান নদীর তীরে ইংরেজদের কাছে পরাজয় বরণ করে।

বিদ্রোহের আগুন চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে। ফিরোজপুর, বেরেলী, কানপুর, জৌনপুর, সীতাপুর প্রভৃতি স্থানে দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে। কানপুরের সমস্ত ইউরোপীয় সৈন্যরা দুটি সামরিক হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিল। সেনাপতি স্যার হিউ হুইলার ৬ই জুন খবর পেলেন যে, বিদ্রোহীগণ আশ্রয়ঘাঁটি আক্রমণ করবে। নানা সাহেবের 'সফেদা কুঠি' বিপ্লবীদের মন্ত্রণালয়ে পরিণত হয়েছে। মন্ত্রণাদাতা ছিলেন আজিমুল্লাহ খান, সেনাপতি টিকা সিংহ, তাতিয়াটোপী, জওলাপ্রসাদ, বালরাও। বাবা ভট্ট ও মিনাবাই জাতীয় বাহিনীর

পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন। 'সফেদা কুঠি' থেকে ইউরোপীয় নারী ও শিশুদেরকে 'বিবিঘরে' স্থানান্তরিত করা হলো, কর্ণেল হ্যাভ্‌লাক ৬৪ নং পোল্টা পল্টনসহ কানপুর অভিমুখে রওয়ানা হন। ফতেহপুরে জওলাপ্রসাদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। রণাংগনে বালরাওয়ের সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষে সেনাপতি রেন্ড্ নিহত হন। বিজয় উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে দেশীয় সৈন্যরা বিবিঘরে আটক নারী শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ নির্মম নীতিবিরুদ্ধ হত্যাকাণ্ডে মর্মাহত হয়ে আজিমুল্লাহ খান কানপুর ত্যাগ করে লক্ষ্ণৌ চলে যান এবং মৌলভী আহমদুল্লাহর মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি নেপালে ইন্তেকাল করেন।

এর থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, যাঁরা দেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত করার জন্যে আল্লাহর পথে জেহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাঁরা অন্যায় হত্যাকাণ্ড ও নীতিবিরোধী তৎপরতা থেকে দূরে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিল সহনশীলতা, খোদাভীতি এবং একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভ ছিল তাঁদের লক্ষ্য। "যাঁরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। কিন্তু সীমালংঘন করো না। কারণ সীমালংঘনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না"— খোদার এ বাণীর মর্যাদা রক্ষা করে তাঁরা চলবার চেষ্টা করেছেন।

যাহোক, ইংরেজরা ওদিকে মোটেই চুপ করে বসে ছিল না। তারা বিভিন্ন স্থান থেকে সৈন্য সংগ্রহের কাজ শুরু করলো। চীন, সিংহল ও অন্যান্য স্থান থেকে ইউরোপীয়দেরকে এবং পার্বত্য প্রদেশ থেকে গুর্খাদেরকে আনা হলো। পারস্য থেকে তিনটি বাহিনী বাংলায় আনা হলো। দিল্লীর অদূরে এক টিলায় ইংরেজ সৈন্যরা সমবেত হয়ে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করলো। উভয় পক্ষ চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো। ২৯শে মে ইংরেজ পক্ষের রাজা নরেন্দ্র সিংহের কিছু সংখ্যক শিখ সৈন্য বিপ্লবীদের দলে যোগ দেয়। তখন ইংরেজরা শিখদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্যে অতীত ইতিহাসের আঁস্তাকুড় ঘেঁটে হীন প্রচারণা শুরু করলো যে অতীতে মুসলমান বাদশাহগণ শিখদের উপর চরম নির্যাতন করতেন। অতএব শিখদের ইংরেজের সংগে যোগদান করে তার প্রতিশোধ নেয়া উচিত। মুসলমান আমীর ওমরাহদেরকে নানা প্রলোভন দিয়ে তাদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টির চেষ্টা শুরু করলো। এ ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতক রজব আলী ইংরেজদের সহায়ক হয়। সে সম্রাটের দরবার থেকে সম্রাট পক্ষীয় গোপন তথ্য ইংরেজদেরকে সরবরাহ করতো, হাকিম আহসানউল্লাহর সাথেও তার

আঁতাত সৃষ্টি হলো।

দুর্ভাগ্যবশতঃ দিল্লীতে প্রবল বর্ষা দেখা দিল। নগরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ঘটলো। দ্রব্যসামগ্রী মহার্ঘ হলো। ওদিকে ইংরেজরা দিল্লীর চারদিকে অবরোধ সৃষ্টি করে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ বন্ধ করে দিল। ২৩ শে জুন ইংরেজরা সবজীমন্ডী দখল করলো। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে বেরেলী বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মুহাম্মদ বখ্‌ত্ খান চারটি পদাতিক বাহিনী, ৭ শত অশ্বারোহী সৈন্য, ১৪টি হস্তী, প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্রসহ দিল্লীতে উপনীত হলেন। তখন দিল্লীতে মোট সৈন্যসংখ্যা হলো ৯০,০০০। কিন্তু উজিরাবাদ অস্ত্রশালা দস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ায় কেল্লায় গোলাবারুদের অভাব ঘটলো। তখন বেগম সমরুর মহলে বারুদ তৈরীর কারখানা তৈরী হলো। কিন্তু ৭ই আগস্ট হঠাৎ এক বিস্ফোরণে বারুদ কারখানা উড়ে গেল। হাকিম আহসানউল্লাহ্র এতে কারসাজি ছিল বলে সকলের সন্দেহ হলো। কিন্তু সে ইতিমধ্যেই পলায়ন করেছে বলে তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। অবশ্য হাকিমের গৃহ লুণ্ঠিত হলো। ৭ই সেপ্টেম্বর ইংরেজ সেনাপতি উইলসনের নির্দেশে দিল্লীর সকল ফটকের দিকে কামান স্থাপন করা হলো। ১১ই সেপ্টেম্বর সেসব কামান থেকে প্রচন্ড গোলা বর্ষণ শুরু করলো। পুনঃ পুনঃ গোলার আঘাতে অবশেষে কাশ্মীর ফটক ধসে পড়লো। ১৮ই সেপ্টেম্বর দেওয়ানই খাসের ফটক বন্ধ করে দেয়া হলো। জেনারেল বখ্‌ত্ খান অসীম বীরত্ব সহকারে শত্রু নিপাত করতে থাকেন। কিন্তু মীর্জা মুগল যেখানে সৈন্য চালনা করেন সেখানেই বিপর্যয় ঘটে। ইংরেজদের গোলার আঘাতে নগর প্রাচীর দুই স্থানে ভেঙে গেল। জাতীয় বাহিনীর মধ্যে চরম বিশৃংখলা দেখা দিল। ২০শে সেপ্টেম্বর জেনারেল বখ্‌ত্ খান বাদশাহকে বল্লেন, "চারদিকেই বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র। আমাদের সকল পরিকল্পনাই শত্রুর গোচরীভূত হচ্ছে। হাজার হাজার রোহিলা এখনো প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আপনি বাইরে আসুন, আমরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ জয় করব।"

কিন্তু মীর্জা এলাহী বখ্‌শ্ ও বেগম জিনতমহল সম্মত না হওয়ায় বাদশাহ্ জেনারেল বখ্‌ত্ খানের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। অগত্যা বখত্ খান অযোধ্যায় গিয়ে আহমদুল্লাহর বাহিনীতে যোগদান করে লক্ষ্ণৌ ও শাহজাহানপুরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু চারদিকে যখন বিপর্যয়ের কালো ছায়া নেমে এলো, তখন তিনি ভগ্নহৃদয়ে নেপাল উপত্যকায় গিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিশ্বাসঘাতক হাকিম আহসানউল্লাহ খান, শেখ রজব আলী ও মীর্জা এলাহী বখ্‌শের গুপ্তচরবৃত্তির ফলেই সম্রাট বাহাদুর শাহ, বেগম জিনতমহল ও শাহজাদা জওয়ান বখ্‌ত্ ক্যাপ্টেন হড্‌সনের হাতে বন্দী হন। তিনজন শাহজাদা হুমায়ুন মক্‌বেরাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তাদেরকে বন্দী করে আনার সময় পথে নরপিশাচ হড্‌সন তাদেরকে স্বহস্তে গুলী করে হত্যা করেন। আতংক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁদের লাশ কোতোয়ালীর সামনে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হলো। অতঃপর ইংরেজরা দিল্লী নগরী ভয়াবহ শ্মশানে পরিণত করলো। নিরীহ নাগরিকদের মৃতদেহে শহরের রাজপথ ভরে গেল।

চারদিকে বিপ্লব দমনের জন্যে তারা সর্বত্র পৈশাচিক নরমেধ যজ্ঞ শুরু করলো। আলীগড়, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বেরেলী, কানপুর, ফতেহপুর, ঝাঁসি, গোয়ালিয়র, দানাপুর, ছোটনাগপুর প্রভৃতি বিপ্লব কেন্দ্রগুলিতে তারা অমানুষিক উৎপীড়ন ও নিধনযজ্ঞ শুরু করলো।

চট্টগ্রামের সিপাহীরা বিপ্লব শুরু করতেই ইংরেজরা অরণ্য পথে পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করে। সিপাহীরা নির্বিবাদে ধনাগার লুন্ঠন করে, বন্দীদেরকে মুক্ত করে, সেনানিবাস ভস্মীভূত করে এবং বারুদঘর উড়িয়ে দিয়ে বন্যপথ দিয়ে, সিলেট ও পাহাড়ের দিকে চলে যায়।

২২শে নভেম্বর প্রাতঃকালে ঢাকা শহরে নৃশংস কান্ড অনুষ্ঠিত হয়, ইংরেজরা অতর্কিত লালকেল্লা আক্রমণ করে। সেখানে বিপ্লবীদের সাথে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়, অবশেষে বিপ্লবীগণ নদী সাঁতরিয়ে পলায়ন করে, যারা ধরা পড়লো তাদেরকে আন্টাঘর ময়দানে (বর্তমান বাহাদুরশাহ্ পার্ক), সদরঘাট, লালবাগ ও চকবাজারে এনে ফাঁসী দেয়া হলো।

আঠারো শ' আটান্ন সালের ২৭শে জানুয়ারী থেকে ৯ই মার্চ পর্যন্ত বিচারে ভারতের মুসলমানদের সর্বশেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ্ রেঙ্গুনে নির্বাসিত হলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন বেগম জিনতমহল, বেগম তাজমহল, শাহজাদা জওয়ান বখ্‌ত্ এবং নবাব শাহ জামানী বেগম।

স্যার জন্ লরেন্সের নির্দেশে গঠিত একটি মিলিটারী কমিশন সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার করে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে তিনি নিজেকে ভারত সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ইতিহাসের এ এক নির্মম পরিহাস যে, গৃহস্বামী হলো দস্যু এবং দস্যু হলো

গৃহস্বামী। ঐতিহাসিক সত্য এই যে, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী স্বাক্ষরকৃত এক চুক্তির মাধ্যমে ভারত সম্রাটকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার আধার বলে স্বীকার করে নেয়। তারপর কোম্পানী এবং সম্রাটের মধ্যে আর কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। অতএব প্রকৃতপক্ষে সম্রাট বাহাদুর শাহই ছিলেন তৎকালীন ভারতের প্রকৃত আইনগত শাসক এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীই রাজকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে করেছিল নিমকহারামী ও বিদ্রোহ। অতএব যা ছিল স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রাম, কায়েমী স্বার্থের দল তার নাম দিল বিদ্রোহ। মিলিটারী কমিশনের বিচারে ভারতে কয়েক শতাব্দী যাবত মুসলিম শাসনের শেষ চিহ্নটুকু চিরদিনের জন্যে বিলুপ্ত হলো।

ভারতের এ আযাদী আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল প্রধানতঃ যে ক'টি কারণে তা হলো—

এক– ইংরেজদের উন্নত ধরনের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের মুকাবেলায় বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল পুরাতন ও অসময়োপযোগী।

দুই– দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে ছিল ঐক্য ও শৃংখলার অভাব।

তিন– চট্টগ্রাম, ঢাকা, ব্যারাকপুর, বহরমপুর থেকে আরম্ভ করে দিল্লী পর্যন্ত বিরাট অঞ্চলের সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপ্লব শুরু হলেও তাদের ছিলনা কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সকলের মধ্যে কোন পারস্পরিক যোগসূত্রও ছিল না।

চার– কতিপয় বিশ্বাসঘাতকের ক্রিয়াকলাপ বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিপর্যয় এনেছিল। বিপ্লবীদের সকল প্রকার গোপন তথ্য শত্রুপক্ষকে সরবরাহ করা হতো এবং চরম মুহূর্তে দুই দুই বার বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা বারুদখানা বিস্ফোরিত হওয়ায় দেশীয় সৈন্যগণ গোলাবারুদের অভাবের সম্মুখীন হয়।

পাঁচ– দেশীয় সৈন্যদের অনেকের মধ্যে আদর্শ চরিত্রের অভাব ছিল। অনেক অবাঞ্ছিত লোক লুঠতরাজ ও অন্যায় হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্যে বিপ্লবীদের দলে যোগদান করে। তার সাথে যুক্ত হ'য়েছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস।

ছয়– হায়দারাবাদ, গোয়ালিয়র, নেপাল এবং শিখ প্রভৃতি শক্তিগুলি বলতে গেলে ছিল নিষ্ক্রিয় বা ইংরেজদের পক্ষে।

সাত– দেশীয় সৈন্যদের ইংরেজকে হটাও ছাড়া অন্য কোন মহান আদর্শ ছিল না। সাইয়েদ আহমদ শহীদের সময় থেকে যাঁরা এদেশে মুসলমানদের মধ্যে

জেহাদের প্রেরণা জাগ্রত করে রেখেছিলেন, তাঁদের পক্ষ থেকে কোন সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই বিপ্লব শুরু হয়েছিল এবং এ বিপ্লবী কর্মধারা ছিল তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

এ আযাদী আন্দোলন সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও এর পরিণাম ফল হয়েছে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। যুদ্ধকালে স্থানে স্থানে উন্মত্ত দেশীয় সিপাহীদের দ্বারা কিছু পৈশাচিক ক্রিয়াকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল সত্য। কিন্তু ইংরেজরা যে পৈশাচিকতার সাথে তার প্রতিশোধ নিয়েছে, তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক বিরাট কলংকের অধ্যায় সংযোজিত করেছে। মুসলিম মুজাহেদীন তার পরও এক দশক কাল ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন।

ঊনবিংশতি শতাব্দীর ছয় দশকের পর ভারতে যে নীরব ও শান্ত অবস্থা বিরাজ করছিল, তাকে বলা যেতে পারে সমাধিক্ষেত্রের নীরবতা। আযাদী আন্দোলনের জন্যে এককভাবে দায়ী করা হয় তৎকালীন ভারতের মুসলমানদেরকে। ফলে ব্রিটিশের রুদ্র আক্রোশে, তাদের অত্যাচার নিষ্পেষণে জর্জরিত হয় মুসলিম সমাজ। সুদূর বাংলা থেকে সীমান্ত পর্যন্ত মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে ধরপাকড়, জেল-ফাঁসি, দ্বীপান্তর, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ প্রভৃতির দ্বারা মুসলিম সমাজে নেমে এসেছিল সমাধিক্ষেত্রের নীরব নিথর কালোছায়া। কিন্তু তথাপি এ নীরবতা ছিল সাময়িক। সুদীর্ঘকালের সংগ্রামে মুসলমানরা স্বাধীনতা প্রেমের যে উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরেছিল তা ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হ'য়ে রইলো। এই মহান আদর্শই পরবর্তীকালে ভারতবাসীকে উজ্জীবিত করেছিল। যার ফলস্বরূপ আঠারো শ' সাতান্ন সালের নব্বই বছর পর ভারতবাসী ইংরেজের গোলামীর শৃংখল চিরতরে ছিন্ন করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু তথাপি এ সত্য অনস্বীকার্য যে, সাইয়েদ আহমদ শহীদের সংগ্রাম, ফারায়েজী আন্দোলন ও তিতুমীরের সংগ্রাম, আঠারো শ' সাতান্নোর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পরবর্তীকালে সীমান্তে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর ভারতের মুসলিম জাতি এক চরম দুর্গতি ও দুর্দিনের সম্মুখীন হয়। এ দুঃসময়ে স্যার সাইয়েদ আহমদ খানের ভূমিকা মুসলমানদের দুর্দশা দূরীকরণে বিশেষ অবদান রাখে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্যার সাইয়েদ আহমদ খান

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ব্রিটিশ সরকারের অধীনে উচ্চপদের চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপরে ভারতে এক সুশৃংখল ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায়ও তারা মুসলমানদের চেয়ে বহু গুণে উন্নত। এ দেশ থেকে সহসা তাদেরকে উৎখাত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তাদের সাথে এমতাবস্থায় সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া মুসলমানদের আত্মহত্যারই শামিল হবে। স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি ব্রিটিশের সমর্থন দিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের (তাদের ভাষায় বিদ্রোহের) সকল দোষ শুধুমাত্র মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাদের উপর পাইকারী হারে যে অমানুষিক নিষ্পেষণ চালানো হচ্ছিল, তাতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তিকা 'আসবাব-ই বাগাওয়াতে হিন্দ' ও 'ভারতীয় মুসলমান' নামক পুস্তিকার মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের রুদ্ররোষ প্রশমিত করার চেষ্টা করেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলমানদের পশ্চাদ্পদতাকে তিনি তাদের অবনতির কারণ বলে উল্লেখ করেন। তাঁর বাণী ছিল—'আগে মূলকে রোগমুক্ত কর। তাহলেই বৃক্ষ বর্ধনশীল হবে।' ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি গাজীপুরে একটি অনুবাদ সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সমিতির মাধ্যমে বহু বিদেশী গ্রন্থ অনূদিত হ'য়ে প্রকাশিত হয়।

মুসলিম সমাজের উন্নয়নকল্পে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান এই যে, তিনি ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ১৮৭৫ সালে আলীগড় মোহামেডান ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন। এ কলেজে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে ধর্মীয় শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। তৎকালে সরকারী ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় মুসলমানরা সেখানে তাদের সন্তানকে পাঠাতে সংকোচ বোধ করতো। আধুনিক শিক্ষালাভের পথ থেকে সে প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয় আলীগড় কলেজের মাধ্যমে।

এ কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্যার সাইয়েদ আহমদ মুসলিম সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তা 'আলীগড় আন্দোলন' নামে

খ্যাতি লাভ করে। এ মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনে কবি হালী, মুহসিনুল মুল্ক, নাজির আহমদ, চেরাগ আলী প্রমুখ মনীষীবৃন্দ যোগদান করে আন্দোলনের অগ্রগতি সাধিত করেন।

মুসলিম স্বার্থের রক্ষাকবচ হিসাবে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্যার সাইয়েদ আহমদ মুসলমানদের জন্যে পৃথক সরকারী মনোনয়ন প্রথার দাবী জানান। তিনি বলেন এসব প্রতিষ্ঠানে সাধারণ যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলে মুসলমানদের স্বার্থ পদদলিত হবে। ১৮৮৩ সালের ১২ই জানুয়ারী গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের নিকটে মুসলমানদের জন্যে পৃথক নমিনেশন প্রথার সমর্থনে তিনি বলেন : "সাধারণ যুক্ত নির্বাচন প্রথার দ্বারা শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা হয়। যে দেশে শুধুমাত্র একজাতি ও এক ধর্মের লোক বাস করে সেখানে এ প্রথা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ভারতে বিভিন্ন জাতির বাস, কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠ, কেউ সংখ্যালঘু এবং তাদের মধ্যে জাতিভেদ ও ধর্মভেদ বিদ্যমান। এমতাবস্থায় যুক্ত নির্বাচন প্রবর্তন করলে কুফল দেখা দিতে বাধ্য। এ প্রথা প্রবর্তন করলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগুলির দ্বারা সংখ্যালঘুদের স্বার্থ পদদলিত হবে। তাতে জাতি বিদ্বেষ ও ধর্ম বিদ্বেষ প্রবল আকার ধারণ করবে। এর জন্যে সরকারকেই দায়ী হতে হবে।"

তার এ যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব মুসলিম সমাজের জন্যে এক চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করে এবং তার এ প্রস্তাব ফলবতী হয়—ছাব্বিশ বছর পর। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ভারতের বিশিষ্ট ৩৬ জন মুসলমানের একটি প্রতিনিধিদল ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর কাছে পৃথক নির্বাচন প্রথার দাবীতে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কারে এ দাবী স্বীকৃতি লাভ করে। এতে করে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠে। কারণ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতি ছিল একজাতীয়তাবাদ। এই নিয়ে বহু বৎসর ধরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ও তিক্ততা চলে। অবশেষে ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনান্তে উভয় প্রতিষ্ঠানের যথারীতি ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণ তাঁদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এটাই ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ চুক্তি নামে অভিহিত। চুক্তিটি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়। লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে আইন পরিষদের সদস্য

নির্বাচনে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনাধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। এভাবে হিন্দু কংগ্রেস ভারতে একজাতীয়তার পরিবর্তে দ্বিজাতিত্ব স্বীকার করে নেয়, যা ছিল ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।

স্যার সাইয়েদ আহমদের প্রতিটি নীতি ও কথায় একমত হওয়া না যেতে পারে তবে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগদান করতে এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, কংগ্রেস শুধুমাত্র ভারতের হিন্দু স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করবে এবং মুসলমানদের স্বার্থ হবে উপেক্ষিত। এ সত্যটি প্রথমে মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতো মুসলিম মনীষীগণ উপলব্ধি না করলেও স্যার সাইয়েদের সাবধানবাণীর সত্যতা তাঁদের কাছে পরবর্তীকালে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়েছিল। যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতীয়তার প্রেরণা জাগ্রত হয় এবং মুসলিম মানস এ পথেই অগ্রসর হয়। তাই বলতে হয়, ভারতীয় *মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার বীজমন্ত্র বহু আগেই দান* করেছিলেন স্যার সাইয়েদ আহমদ।

বংগভংগ

বংগভংগ ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের জেনে রাখা দরকার বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলা তথা সারা ভারতের রাজনৈতিক অংগনে হিন্দু ও মুসলমানদের পজিশন কি ছিল। ১৮৫৭ সালের পর গোটা মুসলিম সমাজদেহে যে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল, সে ক্ষত তখনো শুকোয়নি এবং তার থেকে তখনো রক্ত ঝরছিল। ভারতের হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারাকে পুরাপুরি গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে সুযোগ সুবিধা ষোল আনা আদায় করছিল। ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান অর্জন করে সরকারী চাকুরীর মাধ্যমে অফিস আদালতে তারা জেঁকে বসেছিল। ব্রিটিশ সরকারের সাথে কোম্পানী শাসন থেকেই তাদের গভীর মিতালি ছিল। বিপ্লবী মুসলিম জাতিকে ভালোভাবে শায়েস্তা করার জন্যে সে মিতালি গভীরতর করার প্রয়োজন উভয়েরই ছিল। বাংলায় ফারায়েজী ও তিতুমীরের আন্দোলন, সাইয়েদ আহমদ শহীদের আন্দোলন এবং ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে ভারতের প্রথম আযাদী আন্দোলন, প্রভৃতির জন্যে ব্রিটিশরা মুসলমানদেরকেই দায়ী করেন। অতঃপর

তাঁরা মুসলমানদের একেবারে মূলোৎপাটন করার অথবা চিরতরে পংগু করে রাখার পরিকল্পনা করে তাদের উপর নির্যাতন চালাতে থাকেন। ব্রিটিশ বিরোধী বলে অভিহিত পাটনার দ্বিতীয় মামলা ১৮৭১ সালের শেষে অথবা ১৮৭২ সালে শেষ হয়।

গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা মিঃ জে, এইচ, র‍্যালীর একখানি অসংগতিপূর্ণ রিপোর্টের উপর নির্ভর করেই সরকার সাত ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও অভিযুক্ত করেন। ··· পাঁচজন আসামী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দন্ডে দন্ডিত হন এবং তাদের যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়।

—(মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ ঃ আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃঃ ১৫৩)

ভারতের মুসলিম জাতির এমন সংকট সন্ধিক্ষণে সাইয়েদ আহমদ খান এগিয়ে আসেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ব্রিটিশের সাথে সংঘর্ষে মুসলমানদের কোন মংগল না হয়ে অমংগলই হবে। হিন্দুজাতি শিক্ষা দীক্ষা, চাকুরী বাকুরী, *ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতিতে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। মুসলমানদেরকে শিক্ষা দীক্ষা,* বিশেষ করে ইংরেজী ভাষা ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করেই জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। তাঁর মতে আপাততঃ সরকার বিরোধী কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত না হয়ে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করাই মুসলমান জাতির আশু কর্তব্য। অতএব সাইয়েদ আহমদ মুসলমানদের ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দেন এবং তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮৭৭ সালে ইংলিশ পাবলিক স্কুল ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়। প্রতিষ্ঠানটির নাম দেয়া হয় মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ (M.A.O. College)। সাইয়েদ আহমদ ১৮৮৬ সালে মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা করে এ উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে সর্বপ্রথম তাদের চিন্তাধারা প্রকাশের সুযোগ করে দেন।

আর্য সমাজ

অপরদিকে ১৮৫৭ সালে বোম্বাই শহরে দয়ানন্দ আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এর প্রধান কার্যালয় লাহোরে স্থানান্তরিত হয়। দয়ানন্দ ভারতে গো–সংরক্ষণ প্রচারণা শুরু করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠন করেন।

দেশে গরু জবাই বন্ধের জন্যে আর্য সমাজের পক্ষ থেকে সরকারের নিকটে বিরাট আবেদন পত্র প্রেরণ করা হয়। তিনি প্রাচীন বৈদিক বিশ্বাসের প্রতি হিন্দু সমাজকে আহবান জানান এবং ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের মতো বৈদেশিক ধর্মের মূলোচ্ছেদের জন্যে জোর প্রচারণা চালান। "ভারত ভারতীয়দের জন্যে"— তাঁর এই সংগ্রামের আহবান বিরাট রাজনৈতিক পরিণাম ডেকে আনে।

—(A Hamid : Muslim Separatism in India, p. 27; Farquhar : Modern Religious Movement in India, p. 205)

মুসলমানদের বেলায় ত কথাই নেই, হিন্দুদের সাথে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক কারণে গভীর মিতালি বিদ্যমান থাকলেও, শাসক ও শাসিতের মনোভাব পুরাপুরিই ছিল। Sir Bampfylde Fuller তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বলিত গ্রন্থে বলেন : "কিছু সংখ্যক ইংরেজ ভারতে এসে ভদ্রতাসুলভ আচরণের প্রাথমিক রীতিপদ্ধতিও ভুলে গিয়েছিল। ইংরেজদের মহলে, রেস্তোরাঁ ও ক্লাবে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। সিপাহী বিদ্রোহে নিহত ইংরেজদের স্মরণার্থে কানপুরে একটি উদ্যান তৈরি করা হয়েছিল, সেখানে কোন ভারতীয় প্রবেশ করতে পারত না। যেসব স্থানে ইংরেজরা ঘুরাফেরা করতো সেখানে ভারতীয়দের যাতায়াত বিপজ্জনক ছিল। ভারতীয়দের প্রতি তাদের ঘৃণা বিদ্বেষ এতোটা চরমে পৌঁছেছিল যে, প্রায়ই তাদের উপর বর্বরতা চালানো হতো এবং হত্যাও করা হতো। অপরাধীর কোন শাস্তিই হতো না, অথবা হলে অত্যন্ত সামান্য জরিমানা পর্যন্তই তা সীমিত থাকতো। তাদের কাছে ভারতীয়দের জীবনের কোন মূল্যই ছিল না। বিনা বিচারে আসামীদের গুলী করে উড়িয়ে দেয়ার অথবা প্রাণদন্ড দেয়ার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে অফিসারদের বাড়াবাড়িও উপেক্ষা করা হতো। স্যার ব্যামফিল্ড তাঁর ডাইরীতে এ ঘটনাও লিপিবদ্ধ করেন যে, যখন তিনি কানপুরের রাস্তা দিয়ে চলছিলেন তখন জেলার কর্তা রাস্তা ছেড়ে দেয়ার জন্যে পথচারীদেরকে বেত্রাঘাত করছিলেন।

—(Sir Fuller Bampfylde : Some Personal Experiences, p-56, Muorag, London-1930; A Hamid : Muslim Separatism in India, p. 28)

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

এ ধরনের আরও ছোটো বড়ো বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে, যার ফলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটা চাপা অসন্তোষ গুঞ্জরিত হচ্ছিল। এ সময়ে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়। মজার ব্যাপার এই যে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'অ্যালেন হিউম' নামে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান। তাঁর যোগ্যতা যেমন ছিল, তেমনি প্রভূত অর্থ সম্পদের মালিকও ছিলেন তিনি। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গঠনে তাঁর যেমন ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল, তেমনি এর পেছনে ছিল তৎকালীন ভারতের বড়োলাট ডাফ্রীনের (Dufferin) আশীর্বাদ। মিঃ হিউম বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণের পর ভারতেই রয়ে যান এবং ভারতের সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক উৎকর্ষ লাভের উদ্দেশ্যে একটি নিখিল ভারত সংগঠনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি একটি খোলাচিঠির মাধ্যমে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের কাছে আবেদন জানান একতা ও সংগঠনের জন্যে। তিনি এ কথার উপর জোর দিয়ে বলেন যে, সরকার জনগণ থেকে দূরে থাকেন এবং সে কারণে তাঁরা এ দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছেন। পুনর্গঠনের কাজ এ দেশবাসীকেই করতে হবে, বিদেশীদের দ্বারা তা সম্ভব নয়। কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে মাদ্রাজের গভর্নর প্রতিনিধিদেরকে বৈকালিক চায়ের মজলিসে আতিথ্য দ্বারা আপ্যায়িত করেন। অতএব প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেস এবং সরকারের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কংগ্রেসের দুজন অবিসংবাদিত নেতা বাল গংগাধর তিলক ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নীতি ও আদর্শ থেকে কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য জানতে পারা যায়।

বাল গংগাধর তিলক

বাল গংগাধর তিলক বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের পর বিগত শতকের আটের দশকে সাংবাদিকতা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনে তাঁকে রাজনীতির পুরোভাগে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সুদক্ষ রাজনীতিবিদ। পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে বিরোধিতার পরিবর্তে তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের (Direct Action) নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি যুদ্ধপ্রিয় মারাঠা জাতির ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য পুনর্জীবিত করে তা

কংগ্রেসের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করেন।

—(C. Y. Chintamoni : Indian Politics Since the Mutiny, p. 81, Andhara University, Waltar-1937; A Hamid : Muslim Separatism in India, p. 29)

বিগত শতাব্দীর ছয়ের দশকে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। ক'বছর পর চাকুরী থেকে অপসারিত হওয়ার পর সাংবাদিকতায় যোগদান করেন। তিনি যুব সমাজকে স্বাধীন ও আক্রমণাত্মক ভাবাপন্ন হওয়ার দীক্ষা দেন।

তিলকের ভালভাবে জানা ছিল কিভাবে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগ্রত করে দিতে হয়। তিনি বহু আগে থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, হিন্দুজাতীয়তা তার ধর্মনিরপেক্ষতার রূপ পরিহার না করলে কিছুতেই শক্তি অর্জন করতে পারবে না। অতএব কয়েক বছর আগে থেকেই তিনি তাঁর গো–বধ প্রতিরোধ সমিতির (Ati-cow-killing society) কর্মতৎপরতা প্রসারিত করেন এবং গণপতি উৎসব পালনের উদ্দেশ্যে বিশেষ এক সংগীত রচনা, তার প্রকাশনা ও বিতরণের ব্যবস্থাদি করেন। ঐতিহাসিক 'হিন্দু মুসলিম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ' এবং তার 'হিসাব নিকাশের দিনের আগমনী' সম্পর্কিত বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ ছিল এসব সংগীত। তিনি উগ্র হিন্দু শ্রেণী–চেতনা জাগ্রত করেন এবং মুসলিম সমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র মারাঠা বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন। তিলকের গো–বধ প্রতিরোধ সমিতি মূলতঃ দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও, তার কর্মতৎপরতা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রচারক বাহিনী দেশের শহরে শহরে, গ্রামেগঞ্জে 'গো মাতার আর্তনাদ' The cry of the cow শীর্ষক প্রচারপত্র বিতরণ করতে থাকে। জনসভায় হিন্দুগণ গোহত্যার প্রতিবাদ করে প্রস্তাবাদি গ্রহণ করতে থাকেন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে তা জনগণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে থাকে। স্বভাবতঃই তার ফলে স্থানে স্থানে হিন্দু–মুসলিম্ সংঘর্ষও হতে থাকে।

—(A Hamid : Muslim Separatism in India, pp. 45, 48)

সারাদেশে যে সময়ে এ ধরনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, সে সময়ে ১৮৯৯ সালে, লর্ড কার্জন ভারতের বড়োলাট হিসাবে দায়িত্বগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, সে সময়ে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল কোলকাতায়। প্রথম কয়েক

বৎসর কার্জন বাঙালী হিন্দুদের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন প্রশাসন ক্ষেত্রে দক্ষতার উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অযোগ্যতা, দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা, প্রভৃতি উচ্ছেদ করে প্রশাসনের মানোন্নয়নে মনোযোগ দেন, তখন স্বার্থান্বেষী মহল তাঁর প্রশংসা, মাহাত্ম্যকীর্তন ও স্তুতির পরিবর্তে নিন্দা ও সমালোচনা শুরু করে। কার্জন প্রশাসন ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। তার সবগুলি, মনঃপূত না হলেও, বিনাবাক্যে গৃহীত হয়। কিন্তু তাঁর বংগভংগ প্রতিক্রিয়াশীলদের অতিমাত্রায় ক্ষিপ্ত করে তোলে।

বংগভংগ ছিল কার্জন প্রশাসনের সবচেয়ে সুফলপ্রদ ব্যবস্থা। কিন্তু তথাপি এ এক অশুভ পরিণাম ডেকে আনে, ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করে, হিন্দু ও মুসলিম জাতির মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। যে মুসলিম জাতি কিছুকাল যাবত রাজনৈতিক অংগন থেকে দূরে সরে ছিল, তাদের মধ্যে পুনরায় রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়। অতএব বংগভংগ ভারতীয় রাজনীতিতে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে সন্দেহ নেই।

এখন আমাদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগিসহ আলোচনা করা দরকার যে, বংগভংগের প্রকৃত কারণই বা কি ছিল, এবং তা অর্ধযুগ পরে বাতিলই বা হলো কেন।

বংগভংগ করা হয়েছিল সুষ্ঠু ও সুফলপ্রসূ প্রশাসনিক কারণে। বাংলা তখন ব্রিটিশ ভারতের সর্বপ্রধান প্রদেশ ছিল। বিহার ও উড়িষ্যা এই প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং আয়তন ছিল ১৭৯,০০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭৯,০০০,০০০। এত বড়ো একটি প্রদেশ একজন ছোটলাট বা গভর্নরের শাসনাধীন ছিল। এত বড়ো প্রদেশের সুষ্ঠু শাসন পরিচালনা, আইন শৃংখলা মজবুত রাখা এবং সকল অঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রাখা ছিল একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। বাংলার পূর্বাঞ্চল যেহেতু নদীবহুল এবং যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা না থাকায় ছোটলাটের পক্ষে এ অঞ্চল দেখাশুনা করা সম্ভব ছিল না। ছোটলাটের পাঁচ বৎসরের কার্যকালের মধ্যে একবারও এ অঞ্চল পরিদর্শন করার সুযোগ হতো না বলে, এ দিকটা ছিল অত্যন্ত অবহেলিত ও অনুন্নত। (A. R. Mallick : Partition of Bengal, p. 1-2; এম এ রহিম ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২০১)।

বিগত শতকের ছয়ের দশকে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে নিযুক্ত তদন্ত কমিটি মন্তব্য করেন যে, বিশাল বাংলা প্রদেশের প্রশাসনিক অব্যবস্থাই এই দুর্ভিক্ষের কারণ। বাংলার গভর্নর উইলিয়ম গ্রে ১৮৬৭ সালে এবং স্যার জন ক্যাম্পবেল ১৮৭২ সালে অভিযোগ করেন যে, এত বড়ো প্রদেশের শাসন কার্য পরিচালনা করা একজনের পক্ষে বড়োই কঠিন। তার ফলে শ্রীহট্ট, কাছার ও গোয়ালপাড়া একজন চীফ কমিশনারের শাসনাধীন করা হয়। তবুও বাংলা প্রদেশের আয়তন বিশালই রয়ে যায় এবং শাসন পরিচালনায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পুনরায় ১৮৯২ সালে এবং ১৮৯৬ সালে সরকারী মহল থেকেই প্রস্তাব করা হয় যে, আসাম ও পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা ময়মনসিংহ জেলাদ্বয় নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হোক। এ শতকের শেষে লর্ড কার্জন যখন বড়োলাটের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন তাঁর নিকটে উক্ত প্রস্তাব পেশ করা হয়।

উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার পূর্বে আর একটি গুরুতর বিষয় লর্ড কার্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার (Andrew Fraser) প্রস্তাব দেন যে, যেহেতু মধ্য প্রদেশের অধীন সম্বলপুরের আদালতে উড়িয়া ভাষা ব্যবহৃত হয়, অথচ সমগ্র প্রদেশে এ ভাষায় প্রচলন নেই, সেজন্যে উড়িয়া ভাষার পরিবর্তে হিন্দি ভাষা ব্যবহার করা হোক, অথবা সম্বলপুরকে উড়িষ্যার সাথে যুক্ত করে দেয়া হোক। উল্লেখ্য যে উড়িষ্যা ছিল বাংলার সাথে যুক্ত। এ প্রস্তাবও করা হয় যে, অন্যথায় গোটা উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে যুক্ত প্রদেশের সাথে শামিল করা হোক।

একদিকে বাংলার গভর্নরদের পক্ষ থেকে বাংলার আয়তন হ্রাস করার প্রস্তাব এবং অপরদিকে স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের প্রস্তাব লর্ড কার্জনকে বিব্রত করে। তিনি স্বয়ং বেরারকে ব্রিটিশ ভারতের সাথে সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯০২ সালের মে মাসে সেক্রেটারিয়েট ফাইলে এভাবে তাঁর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন যে, বেরারের বিষয়টির সাথে বাংলার সমস্যা বিবেচনা করা যেতে পারে।

আলোচনার পর চট্টগ্রাম বন্দরকে আসামের সাথে সংযুক্ত করার প্রস্তাব পেশ করা হয়। তার জন্যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, এর দ্বারা বাংলা সরকারের প্রশাসনিক গুরুভার লাঘব করা হবে, পূর্ব বাংলার জেলাগুলিতে শাসন

পরিচালনায় পরিলক্ষিত ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ দূরীভূত হবে এবং আসামের জন্যে যে সমুদ্রপথ একান্ত আবশ্যক, চট্টগ্রামের সংযুক্তিতে সে আবশ্যক পূরণ হবে। ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন এ প্রস্তাব অনুমোদন করে ভারত সচিবকে অবহিত করেন। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে জনগণের মতামত ও প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে পূর্ববংগে ব্যাপক সফর করেন। চট্টগ্রাম বিভাগের সাথে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা দু'টিকেও আসামের সাথে সংযুক্ত করার কথাও প্রস্তাবের মধ্যে শামিল ছিল বলে জনগণের মধ্যে তিনি বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। পূর্ব বাংলাকে আসামের অন্তর্ভুক্তকরণ জনগণ কিছুতেই মেনে নিবে না—এ কথা কার্জন স্পষ্ট উপলব্ধি করেন।

অতঃপর লর্ড কার্জন ইংলন্ড গমন করেন এবং ১৯০৫ সালের প্রথম দিকে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বৃহত্তর আসাম গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কার্জনের প্রত্যাবর্তনের পর পরিকল্পনাটি ভারত সচিব ব্রডরিক সমীপে পেশ করা হয়। ব্রডরিক পরিকল্পিত নতুন প্রদেশের নাম দেন ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম (পূর্ব বংগ ও আসাম)।

—(A Hamid : Muslim Separatism in India, pp. 51-52)

বংগভংগ নানা ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও বিধ্বস্ত মুসলিম সমাজের জন্যে অত্যন্ত মংগলময় হলেও এর পিছনে তাদের কোন প্রচেষ্টাই ছিল না। বংগভংগের পর তাদের যে প্রভূত মংগল সাধিত হতে যাচ্ছিল, তা ছিল তাদের কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত। শাসন কার্য সহজ, দ্রুততর, সুষ্ঠু ও সুন্দর করার জন্যে এবং এর সুফল যাতে অবহেলিত ও অনুন্নত বাংলার পূর্বাঞ্চলও ভোগ করতে পারে তার জন্যে এ বংগভংগের পরিকল্পনা ছিল শাসকদের। মুসলমানদের নয়। এর কারণগুলি ছিল অত্যন্ত ন্যায়সংগত এবং তা নিম্নরূপঃ—

প্রথমতঃ এ অঞ্চলটি ছিল সর্বদিক দিয়ে অনুন্নত। হিন্দু জমিদারগণ এ অঞ্চলের কৃষক প্রজাদের শোষণ করে সে শোষণলব্ধ অর্থ কোলকাতায় বসে বিলাসিতায় উড়িয়ে দিতেন। প্রজাদের শিক্ষাদীক্ষা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার প্রতি ছিল তাঁদের চরম অবহেলা ঔদাসিন্য। কোলকাতা শহর ও পশ্চিম বাংলা উত্তরোত্তর উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করছিল। প্রশাসন ব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তার জন্যে পূর্বাঞ্চলকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল। এ অঞ্চল নদীবহুল ছিল বলে নৌকা যাত্রীদের ধনসম্পদ জলদস্যুগণ নির্বিবাদে লুণ্ঠন করে

নিয়ে যেতো যার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করা যেতো না। পুলিশ বাহিনী ছিল অপর্যাপ্ত ও দুর্বল যার ফলে সমাজের সর্বস্তরে অরাজকতা ও বিশৃংখলা বিরাজ করতো। প্রদেশের শাসকগণ এ অঞ্চলের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব পরিহার করে বসেছিলেন এবং তাদের সকল সময় ও শ্রম কোলকাতার জন্যে ব্যয়িত হতো। পূর্বাঞ্চলের শিক্ষার জন্যে কোন অর্থ বরাদ্দও করা হতো না। কর্মচারীগণ পূর্বাঞ্চলের নামে ভীত শংকিত হয়ে পড়তেন এবং পূর্বাঞ্চলে বদলী হওয়াকে নির্বাসন দন্ড মনে করতেন।

উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্যে বংগভংগ করা হয়েছিল। নতুন প্রদেশ আসাম, উত্তর ও পূর্ববংগ নিয়ে গঠিত হলো এবং এর আয়তন দাঁড়ালো ১০৬,৫০০ বর্গমাইল যার দুই তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান। অর্থাৎ প্রদেশটি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হয়ে পড়লো। ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই নতুন প্রদেশ গঠন ঘোষিত হলো এবং ১৬ই অক্টোবর থেকে এর কাজ শুরু হলো। নতুন প্রদেশের প্রথম গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার (Sir Bampfylde Fuller) প্রথম দিন ঢাকায় উপনীত হয়ে বিব্রত হয়ে পড়েন। মুসলমানগণ নতুন গভর্নরকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং হিন্দুগণ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন। নতুন গভর্নরকে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে হিন্দুগণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ক্রুদ্ধ জনতা তিনজন ইংরেজ মহিলাকে পথ চলাকালে আক্রমণ করে।

—(Fuller : Some Personal Experiences— p. 126; A Hamid : Muslim Separatism in India, p. 53)

হিন্দুবাংলা বংগভংগের ফলে উগ্রমূর্তি ধারণ করে। এটাকে হিন্দুমহল প্রথমতঃ 'জাতীয় ঐক্যের' প্রতি আঘাত বলে অভিহিত করে। অতঃপর নানানভাবে এর ব্যাখ্যা দিতে থাকে, যথা তাদের 'রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার শাস্তি', 'মুসলমানদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্ব', এবং অবশেষে এটাকে 'মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা' নামে অভিহিত করে। রাতারাতি বংগভংগের বিরুদ্ধে হিন্দুগণ আন্দোলন শুরু করে দিলেন। 'জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করা হলো', 'পবিত্র বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করা হলো', 'ব্রিটিশ সরকার এবং দেশদ্রোহী মুসলমানদের মধ্যে এক অশুভ আঁতাত' প্রভৃতি উত্তেজনাকর উক্তির দ্বারা বাংলার আকাশ বাতাস বিষাক্ত করা শুরু করলো বাংলার হিন্দু সমাজ।

হিন্দু আইনজীবীগণ এর আইনগত বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, বাংলা ভাষার সাহিত্যিকগণ প্রচার শুরু করলেন যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি চরম আঘাত হানা হলো। সমগ্র হিন্দুবাংলা এ ধরনের প্রলাপোক্তি শুরু করলো।

এ ধরনের অসংগত ও অবাস্তব প্রচারণার কারণ কি ছিল? মুসলমানদের উপরে হঠাৎ এ আক্রমণ ও অশোভন উক্তি শুরু হলো কেন? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে বংগভংগে কায়েমী স্বার্থ বিপন্ন ও বেসামাল হয়ে পড়েছিল। যে সংখ্যাধিক্যের কারণে বাংগালী হিন্দুগণ উভয় বাংলার চাকুরী বাকুরী ও জীবন জীবিকার উপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল, তা বংগভংগের ফলে বিনষ্ট হয়ে গেল। নতুন বাংলায় মুসলমানরা হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলার পূর্বাঞ্চলের মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর বশ্যতা ও পরাভব থেকে মুক্তি লাভ করলেন এবং তাঁদের মনে এ আশার সঞ্চার হলো যে, এখন স্থানীয় সমস্যাদির উপর তাঁদের কথা বলার অধিকার থাকবে। সমসাময়িক লেখক সরদার আলী খান বলেন, "যত সব হৈ হল্লা · · · এবং হঠাৎ রাতারাতি যে দেশপ্রেমের আন্দোলন শুরু হলো মাতৃভূমি অথবা ভারতের কল্যাণের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। যে প্রদেশে হিন্দুগণ সুস্পষ্ট সংখ্যালঘু সেখানে তাদের শ্রেণীপ্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা ব্যতীত অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য এ আন্দোলনের নেই। (Sarder Ali Khan : India of Today, p-62, Bombay, Times Press, 1908)

বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনে অন্যতম নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বলেন— বংগভংগের ঘোষণা আকস্মিক বজ্রপাতের ন্যায়। যে ১৬ই অক্টোবর নতুন বাংলার (পূর্ব বাংলা ও আসাম) সূচনা হয়, সেদিন কোলকাতায় হিন্দুগণ জাতীয় শোকদিবস পালন করেন। ঐ দিন তারা কালো ব্যাজ পরিধান করেন, মাথায় ভস্ম মাখেন, পানাহার পরিত্যাগ করে নানারূপ বিক্ষোভ ধ্বনি সহকারে মিছিল করে গঙ্গাস্নান করেন। অপরাহ্নে এক জনসভায় মিলিত হয়ে তাঁরা বংগভংগ রদের শপথ গ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর 'আমাদের মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থে বলেন ঃ "যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একই লেফটন্যান্ট গভর্নরের শাসনাধীন ছিল। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য পূর্ব বাংলাকে আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠনের বিষয় ব্রিটিশ সরকার অনেকদিন হইতে চিন্তা করিতেছিলেন। বড়লাট লর্ড কার্জন অবশেষে ভারত

সচিবের সহিত পরামর্শ করিয়া বংগ বিভাগের অনুকূলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ হওয়া মাত্রই বাংলার শিক্ষিত হিন্দু সমাজ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হইয়া উঠে। দূর মফঃস্বলেও বংগভংগের বিরোধিতা করিয়া সভাসমিতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইতে থাকে।" (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃঃ ১৭৭)।

বংগভংগ বিরোধী আন্দোলন কিভাবে বিস্তৃতি লাভ ও শক্তি সঞ্চয় করে তার উল্লেখ করে ওয়ালিউল্লাহ বলেন—

"... আন্দোলন শহর হইতে গ্রামে এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। নেতৃস্থানীয় বিপ্লববাদীরা একটু দূরে থাকিয়া ভাবপ্রবণ ছাত্র সমাজ হইতে সদস্য সংগ্রহ পূর্বক তাহাদের দলের পুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ বরোদা রাজ্যের চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়া বাংলায় ফিরিয়া আসেন। বিপ্লবীরা তাঁহার নিকট নতুন প্রেরণা লাভ করে। শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতার সাহায্যে দেশের সর্বত্র বিপ্লবের বীজ ছড়াইতে থাকেন।" —(আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃঃ ১৭৯)।

কতিপয় মুসলমান হিন্দুদের প্রচার ও তথাকথিত দেশপ্রেম আন্দোলনে বিভ্রান্ত হয়ে বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে, বালগংগাধর তিলক প্রমুখ হিন্দু নেতৃবৃন্দ শিবাজীকে আন্দোলনের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুজাতির সুপ্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগ্রত করতে লাগলেন, তখন তাঁরা বংগভংগের সুদূরপ্রসারী মংগল ও তার বিরোধিতার মূল রহস্য উপলব্ধি করে আন্দোলন পরিত্যাগ করেন। এ প্রসংগে আবদুল মওদুদ তাঁর "মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর" গ্রন্থে বলেন— "কিন্তু এই বংগভংগ বিভাগকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় যে তুমুল আন্দোলন করে, তার প্রতিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল ব্রিটেনের সংবাদপত্রগুলি ও বেতনভুক সাংবাদিকরা। নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র ও ডিসপ্যাচসমূহে যেসব পরস্পর বিরোধী সংবাদ পরিবেশিত হতে লাগলো 'দি টাইমস' ও 'মানচেস্টার গার্জেনে' তাতে ব্রিটিশ জনমত বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়লো সঠিক পরিস্থিতি অনুধাবন করতে অসমর্থ হয়ে। টাইমস পত্রিকায় বংগভংগকে সমর্থন করে ও কার্জনের কার্যাবলীকে পূর্ণ অনুমোদন জানিয়ে সুন্দর সুন্দর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; মানচেস্টার গার্জেনে বিভাগকে নিন্দা করে

গরম গরম প্রবন্ধ বের হ'তে থাকে, নিজস্ব সংবাদদাতার লোমহর্ষক বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে আন্দোলন সম্পর্কে ও বিক্ষোভকে সমর্থন জানিয়ে। কটন, নেভিন্সন্ ও হার্ডি বিক্ষোভকে সমর্থন করে বিবৃতি প্রচার করতে থাকেন। নেভিন্সন্ ছিলেন মানচেস্টার গার্জেনের কলকাতাস্থ রিপোর্টার ও কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ লোক। তিনি বিলেতে এক কৌতুকপ্রদ সংবাদ পরিবেশন করেন ঃ 'জাতীয় অন্যায়ের বার্ষিকী পালনটা ভারতের 'ভস্মবধুবারে' পরিণত হয়েছে। ঐদিন সহস্র সহস্র ভারতীয় কপালে ভস্মের তিলক ধারণ করে। প্রভাতে তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে নীরবে গংগাস্নান করে ও উপবাস করে। গ্রামে, শহরে, বাজারে সব দোকানপাট বন্ধ করে, স্ত্রীলোকেরা রান্না করে না ও অলংকার প্রসাধন ত্যাগ করে। পুরুষগণ পরস্পর হাতে হলদে সুতার রাখীবন্দ করে লজ্জার এ দিনটিকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে এবং সারাদিনটি প্রায়শ্চিত্তে, শোক পালনে ও উপবাসে কাটায়। (The New Spirit of India, pp. 167-70)

জনৈক ব্যারিস্টার আবদুর রসূল ও কতিপয় মুসলমান ব্যক্তিগত স্বার্থে এ আন্দোলনে যোগদান করেন। সেটাকে ফলাও করে বলা হয়, বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই শরীক ছিল। এ সম্পর্কে আবদুল মওদুদের প্রকাশিত তথ্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"মিঃ রসূল ১২৫ টাকা, নোয়াখালীর লিয়াকত হোসেন ৬০ টাকা, ও মাদারীপুরের জনৈক দিলওয়ার আহমদ ৪০ টাকা মাসিক ভাতায় কংগ্রেস কর্তৃক মুসলমানদের নিকট আন্দোলন প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন, সমসাময়িক পুলিশ রিপোর্টে দেখা যায়। রিপোর্টে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল ঃ Mr. Rasul is a Muslim Leader of the Hindus (মিঃ রসূল হিন্দুদের মুসলমান নেতা)।

—(আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ২৮২)

মজার ব্যাপার এই যে, ১৯০৭ সালের শেষের দিকে মিঃ হার্ডি এ দেশে আসেন আন্দোলন দেখার জন্যে। তিনি বাংলায় পৌঁছলে 'অমৃত বাজার' পত্রিকা প্রচার করে, "লোকে তাঁকে দেখে আনন্দে উন্মত্ত হয়েছে। এবং ঈশ্বর তাঁকে হিন্দুর বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র ফাঁস করতে প্রেরণ করেছেন।"

এভাবে হিন্দুদের নিকটে 'ঈশ্বর প্রদত্ত দেবতা' হার্ডি তাদের অসীম শ্রদ্ধা ও গরম গরম সম্বর্ধনা লাভ করে দেশে ফিরে গিয়ে বলেন— হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় বংগভংগ বিভাগের তীব্র বিরোধী। সিরাজগঞ্জে তিনি

মুসলমানদের মুখে 'বন্দেমাতরম' গান শুনেছেন, বরিশালে হিন্দু মুসলমান উভয়ে তাঁকে এ গান শুনিয়েছে, ইত্যাদি। কিন্তু ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক তাঁকে দু'একজন মুসলমানের নাম করতে বললে তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত গোপনীয়। তাঁর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে আবদুর রসূলের নামটাও হয়তো তার জানা ছিল না। টাইমস্ পত্রিকা তাঁকে তীব্র র্ভৎসনা করে ও অন্যান্য সংবাদপত্রে তাঁকে 'মূর্খ', 'হাস্যাস্পদ', 'বিদূষক ও পাগল' উপাধিতে ভূষিত করে।

—(আবদুল মওদূদ ঃ ঐ পৃঃ ২৮২–৮৩)

বিভাগ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের যে সমর্থন ছিল না তার জ্বলন্ত প্রমাণ ঢাকার খাজা সলিমুল্লাহ ও মুসলিম বাংলার তৎকালীন উদীয়মান নেতা এবং পরবর্তীকালের শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বক্তৃতা বিবৃতি। বংগভংগ রদ ঠেকাবার বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে খাজা সলিমুল্লাহ অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ১৯১২ সালের মার্চ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি যে উক্তি করেন তাতে বাংলার মুসলমানদের অসন্তোষ বিক্ষোভই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, বংগভংগ রদের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মনে চরম আঘাত লেগেছে এবং তাদের ঘরে ঘরে বিষাদের সঞ্চার হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, বংগভংগের ফলে অনুন্নত পূর্ব বাংলা ও আসামের অবহেলিত অধিবাসীগণ যে সুযোগ পেয়েছিল, এবং বিশেষ করে মুসলমানদের উন্নতির যে সুযোগ তা সহ্য করতে না পেরে বিভাগ বিরোধীরা বংগভংগ বানচাল করার জন্যে রাজদ্রোহিতা মূলক ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। এতে করে, তিনি বলেন, ব্রিটিশ সরকার এ আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন। নবাব সলিমুল্লাহ ব্রিটিশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "এতদিন সমগ্র প্রাচ্যে মনে করা হতো যে যাই ঘটুক না কেন ব্রিটিশ সরকার কখনো প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না। যদি কোন কারণে এ বিশ্বাস খর্ব হয়, তাহলে ভারতে ও প্রাচ্যে ব্রিটিশের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে।"

—(ডাঃ এম এ রহিম ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২০৯–১০, A Hamid : Muslim Separatism in India, pp. 94-95)

নবাব সলিমুল্লাহ উক্ত অধিবেশনে আরও বলেন ঃ

"বাংলা বিভাগে আমরা তেমন বেশী কিছু লাভ করিনি। কিন্তু তবুও তা আমাদের দেশবাসী অন্য সম্প্রদায়ের সহ্য হলো না বলে তারা তা আমাদের কাছ

থেকে কেড়ে নিতে আকাশ-পাতাল আলোড়ন সৃষ্টি করলো। খুন খারাবি ও ডাকাতির মাধ্যমে তারা প্রতিশোধ নেয়া শুরু করলো। তারা বিলেতী দ্রব্যাদি বর্জন করলো। এ সবকিছুই সরকারের কাছে অর্থহীন ছিল। মুসলমানরা এসব অপরাধ যজ্ঞে শরীক না হয়ে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। ··· মুসলিম কৃষক সম্প্রদায় এ বিভাগে লাভবান হয়েছিল। তাদের হিন্দু জমিদারগণ তাদেরকে বিরোধিতার সংগ্রামে টেনে আনবার চেষ্টা করে। এতে তারা কর্ণপাত করেনি। ·· ·· এতে হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ বাধে। ··· সরকার দমননীতি অবলম্বন করেন। তাতেও লাভ হয়নি। একদিকে ছিল ধনশালী বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায়। অপরদিকে ছিল দরিদ্রমুসলমান— যারা সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে। এভাবে চলে বছরের পর বছর। হঠাৎ সরকার বংগভংগ রদ করে দেন প্রশাসনিক কারণে। ··· এর আগে আমাদের সাথে কোন পরামর্শও করা হয়নি। আমরা সব কিছু নীরবে সহ্য করেছি।" অতঃপর সরকার দিল্লী দরবারে তাঁকে যে জি সি আই ই উপাধিতে ভূষিত করেন, তার জন্যে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে এ উপাধিকে ঘুষ ও তাঁর গলায় অপমানের বন্ধন বলে গণ্য করেন। —(A Hamid : Muslim Separatism in India, p. 92; আহমদ ঃ রুহে রওশন মুস্তাক্‌বেল, পৃঃ ৫৮–৫৯)

পরবর্তীকালে মওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন ঃ

পূর্ব বাংলার মুসলমানদেরকে তাদের শাসকদের যুদ্ধে নামানো হ'য়েছিল ··· ·· এবং যখন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আর সুবিধাজনক রইলো না, তখন তারা সন্ধি করে বসলো সুবিধাজনক গতিতে।

ইতিহাসের এর চেয়ে ঘৃণ্যতর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ সদ্যলব্ধ অধিকারসমূহ কেড়ে নেওয়া হলো এবং সন্তোষ প্রকাশকে চরম অপরাধ গণ্য করে শাস্তি দেয়া হলো।

—(Iqbal : Select Writings and Speeches, p. 262)

বংগভংগের ফলে পূর্ববাংলার হতভাগ্য মুসলমানদের সুযোগ সুবিধার আশার আলোক দেখা দিয়েছিল। বংগভংগ রদ করে তা নস্যাৎ করার যে তীব্র আন্দোলন শুরু করেছিল হিন্দুবাংলা, তাতে দূরদর্শী মুসলিম রাজনীতিবিদগণ আতংকিত হয়ে পড়লেন। হিন্দুদের চক্রান্ত উন্মোচন করে বাংলা তথা ভারতের মুসলিম স্বার্থ

সমুন্নত করার জন্যে ভারতের সকল মুসলমান চিন্তাশীল ও রাজনীতিবিদগণ চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকা শহরে নিখিলভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন নাম দিয়ে এক সম্মেলন আহবান করেন। মুসলমানদের সংকট মুহূর্তে এমন সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সকলে উপলব্ধি করলেন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আট হাজার প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুহসিনুল মুল্‌ক, ভিখারুল মুল্‌ক, আগা খান, হাকিম আজমল খান ও মওলানা মুহাম্মদ আলী। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত এবং 'মুসলিম লীগ' নামে একটি পৃথক দল গঠিত হয়। কারণ বিভাগ বিরোধী আন্দোলনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে এ দলটির লক্ষ্য শুধু হিন্দুস্বার্থ সংরক্ষণ ও মুসলিম স্বার্থ দলন। বিভাগকে বানচাল করার জন্যে নানান অপকৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। কোলকাতায় বর্ণহিন্দুদের ঘনো ঘনো বৈঠকে আলোচনার পর ঘোষণা করা হয়, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাঙালী জাতিকে নির্মূল করার জন্যে বংগমাতাকে দ্বিখন্ডিত করেছে, বাঙালী কৃষককূলকে আসামের চা বাগানে কুলিমজুর হিসাবে নিয়োগ করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। অতএব হে বাঙালী জাতি। 'বংগভংগ রদকে' বাঙালীর 'মুক্তি সনদ' হিসেবে গ্রহণ করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়। যারা 'মুক্তি সনদে' বিশ্বাসী নয় তারা বাঙালী নয়, বিশ্বাসঘাতক ও ইংরেজের দালাল। মুসলিম লীগ অধিবেশনে নবাব সলিমুল্লাহর উপর অর্পিত হলো বাংলার মুসলমানদেরকে হিন্দুদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত 'মুক্তিসনদ' আন্দোলন থেকে দূরে রাখার দায়িত্ব। ফলে বর্ণহিন্দুদের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়লো খাজা সলিমুল্লাহর উপর। শুরু হলো ফ্যাসিবাদী ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। খাজা সাহেব বরিশাল ভ্রমণ করলে তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হয়, তাঁকে ইংরেজের দালাল, 'বাংলার দুশমন' বলে গালি দেয়া হয়। কুমিল্লার জনসভায় তাঁকে আক্রমণ করা হয়। তাঁকে নিয়ে হোসামিয়া মাদ্রাসার ছাত্রশিক্ষক ও মুসলিম জনগণ শোভাযাত্রা করা কালে যোগীরাম পাল নামক জনৈক হিন্দু কর্তৃক একটি দোতলার বারান্দা থেকে একটি ঝাড়ু দেখিয়ে দেখিয়ে অপমান করা হয়। রাজগঞ্জের রাস্তা অতিক্রমকালে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ছোড়া হয়। তিনি প্রাণে রক্ষা পেলেও সাঈদ নামে জনৈক যুবক প্রাণ হারায়। বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বাহ্যতঃ ইংরেজদের বিরুদ্ধে হলেও এর দ্বারা 'এক ঢিলে দুই পাখী' মারার লক্ষ্যই আন্দোলনকারীদের ছিল। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে

ইংরেজদের দালাল হিসাবে চিত্রিত করে তাদের নির্মূল করা এবং ইংরেজদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া।

১৯০৮ সালে ৩০শে মে কোলকাতার যুগান্তর পত্রিকা হিন্দুদের প্রতি এক উদাত্ত আহবান জানিয়ে বংগমাতার খন্ডনকারীদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। বলা হয়, "মা জননী পিপাসার্ত হয়ে নিজ সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করছে, একমাত্র কোন্ বস্তু তার পিপাসা নিবারণ করতে পারে। মানুষের রক্ত এবং ছিন্ন মস্তক ব্যতিত অন্য কিছুই তাকে শান্ত করতে পারে না। অতএব জননীর সন্তানদের উচিত মায়ের পূজা করা এবং তার ইপ্সিত বস্তু দিয়ে সন্তুষ্টি বিধান করা। এসব হাসিল করতে যদি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়, তবুও পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত হবে না। যেদিন গ্রামে গ্রামে এমনিভাবে মায়ের পূজা করা হবে, সেদিনই ভারতবাসী স্বর্গীয় শক্তি ও আশীর্বাদে অভিষিক্ত হবে।"

—(ইবনে রায়হান ঃ বংগভংগের ইতিহাস–পৃঃ ৬–৭)।

বংগমাতাকে খুশী করার জন্যে যে উদাত্ত আহবান জানানো হলো, তার পর শুরু হলো হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও রক্তের হোলিখেলা।

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর 'আমাদের মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থে বলেন, "কলিকাতা এবং ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রধানতঃ বিপ্লব আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার বিপ্লববাদীরা 'যুগান্তর' এবং ঢাকার বিপ্লববাদীরা 'অনুশীলন' নাম দিয়া তাহাদের সমিতি গঠন করেন। সাধারণতঃ এই দুইটি সমিতির সদস্যগণই বোমা তৈরী ও আগ্নেয়াস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করিতেন। ইহার পর অন্যান্য নামেও মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে গুপ্ত সমিতি গঠিত হইয়াছিল।"

—(মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ ঃ আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃঃ ১৮০)

স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বংগভংগের তীব্র নিন্দা করে বলেন, বাংলাদেশ বিভক্ত করে হিন্দুদেরকে অপমান ও অপদস্ত করা হয়েছে। বংগভংগের প্রতিবাদে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৬ সালের ৭ই আগষ্ট স্বদেশী আন্দোলন শুরু করে। বিলাতী দ্রব্য বর্জন করা হয় এবং আগুন লাগানো হয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শিক্ষাংগন পরিত্যাগ করে। বালগংগাধর তিলক বংগভংগের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তা জাগ্রত ও সুসংহত করার জন্যে মারাঠা নায়ক শিবাজীকে ভারতের সকল হিন্দুদের জাতীয় বীরের আসনে প্রতিষ্ঠার

আয়োজন করেন। দেশের সর্বত্র শিবাজীর জন্মবার্ষিকী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিপালিত হয়। সভায় সভায় কংগ্রেসের নেতাগণ মুসলমান সম্রাটের বিরুদ্ধে শিবাজীর সংগ্রামের প্রশংসা করতে থাকেন। শিবাজীকে হিন্দুদের জাতীয় বীর ও তাঁর সংগ্রামকে জাতীয় সংগ্রাম বলে অভিহিত করেন। এ সময় বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী সংস্থা গড়ে উঠে। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদেরকে হত্যা করে বংগভংগ রদ করাই ছিল এসবের উদ্দেশ্য। —(এম এ রহিমঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২০৫-৬; সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ঃ নেশন্ ইন্ মেকিং, ১৮; এ হামিদ ঃ মুসলিম সেপারেটিজম্ ইন্ ইন্ডিয়া, ৫৭, ৬৯-৭০)।

বংগভংগের পর হিন্দুবাংলা মুসলমানদের প্রতি এতখানি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে যে সংবাদপত্রে এবং জনসভায় মুসলমানদের প্রতি নানারূপ অসম্মানকর ও বিদ্রূপাত্মক বিশ্লেষণ প্রয়োগ করা হতে থাকে। মুসলমানদের অতীত বর্বরতার বিবরণসহ কল্পিত ইতিহাস লিখিত হয়। সাইয়েদ আহমদ খানকে দেশদ্রোহী এবং মুসলমানদেরকে ইংরেজের দালালরূপে চিহ্নিত করা হয়। ... প্রতিদিন সংবাদপত্রে এ ধরনের সংবাদ পরিবেশ করা হয় যে, সরকার হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালাতে মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করছেন এবং তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন করছেন। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার জন্যে হিন্দুদেরকে আহবান জানানো হয়। একটি সংবাদপত্র এতদূর পর্যন্ত বলে যে মুসলিম গুন্ডাদেরকে এবং তাদের সাহায্যকারী সরকারী কর্মচারীদেরকে জীবন্ত দগ্ধিভূত করলেও হিন্দু সমাজের প্রতিশোধ গ্রহণ যথেষ্ট হবে না। —(Khan, India of Today, p. 87; A Hamid : Muslim Separatism in India, p. 61)

মিঃ এন সি চৌধুরী বলেন, বংগভংগ হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক চিরদিনের জন্যে বিনষ্ট করে দেয় এবং বন্ধুত্বের পরিবর্তে আমাদের মনে তাদের জন্যে ঘৃণার উদ্রেক করে। রাস্তাঘাটে, স্কুলে, বাজারে সর্বত্র এ ঘৃণার ভাব পরিস্ফুট হয়। স্কুলে হিন্দু ছেলেরা মুসলমানদের নিকটে বসতে ঘৃণা প্রকাশ করে এই বলে যে তাদের মুখ থেকে পিঁয়াজের গন্ধ বেরুচ্ছে। মিঃ চৌধুরী বলেন যে, তিনি স্কুলে গিয়ে এ আচরণ স্বচক্ষে দেখেছেন। ফলে ক্লাশে হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক পৃথক আসনের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি আরও বলেন, "আমরা লেখাপড়া শিখবার আগেই

আমাদেরকে বলা হতো যে এককালে মুসলমানরা এ দেশ শাসন করতে গিয়ে আমাদের উপর অত্যাচার করেছে। এক হাতে কোরআন এবং অন্য হাতে তরবারী নিয়ে এ দেশে তারা ইসলাম জারী করেছে। মুসলমান শাসকগণ আমাদের নারী হরণ করেছে, মন্দির ধ্বংস করেছে, আমাদের ধর্মীয় স্থানসমূহ অপবিত্র করেছে। অতএব বংগভংগই মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করেনি। এ ছিল বহু পূর্ব থেকেই। বংগভংগ তা বর্ধিত করেছে মাত্র।

—(N. C. Chowdhury: The Auto-biography of an Unknown Indian pp. 227, 230; Zuberi : TAZKIRA WADAR, p. 169-70; A Hamid : Muslim Separatism in India, pp. 61-62)

বংগভংগ রদ করার জন্যে উভয় বাংলার হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়েছে বলে বিকৃত, কাল্পনিক ও উদ্ভট ইতিহাস পরিবেশন করে পরবর্তী বংশধরগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। এ কথাও বলা হয় যে, এক খাজা সলিমুল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বাংগালী মুসলমান বংগভংগ মেনে নেয়নি। এ প্রকৃত সত্যের অপলাপ ব্যতীত কিছু নয়। উপরের আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বংগভংগের ফলে অবহেলিত মুসলমান সমাজের আশা-আকাংখা প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল বলে হিন্দুবাংলা নিছক হিংসা পরবশ হয়ে বিভাগ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। তাদের বক্তৃতা বিবৃতি, তাদের আচরণ, মারাঠা নেতা শিবাজীকে দৃশ্যপটে টেনে এনে হিন্দু জাতীয়তা জাগ্রত করার প্রচেষ্টা ইত্যাদি হিন্দু মুসলিম ঐক্য ও মিলনকে নস্যাৎ করে দিয়েছে, চারদিকে দাংগা হাংগামা শুরু হয়েছে, মুসলমানদের উপর নির্যাতন শুরু হয়েছে। এতসবের পর হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে বংগভংগ রদ করেছে এ কথা বলা মস্তিষ্ক বিকৃতিরই পরিচায়ক অথবা দুরভিসন্ধিমূলক সন্দেহ নেই।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বংগভংগের ফলে বাংলায় যে সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করেছিল বাংলার হিন্দুগণ, যার প্রতি মুসলমানদের কোন সমর্থন ছিল না, বরঞ্চ মুসলমানদের জীবন ও ধনসম্পদ বিপন্ন হয়েছিল, সে সন্ত্রাসবাদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং সে সংকটসন্ধিক্ষণে মুসলমানদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্যে ১৯০৬ সালে ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন আহুত হয়। এ সম্মেলন সাফল্যমন্ডিত করার পিছনে বাংলার মুসলমানদের তৎকালীন উদীয়মান

নেতা আবুল কাসেম ফজলুল হকের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। উক্ত সম্মেলনের জন্যে যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় তার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন এ, কে, ফজলুল হক ও ভিখারুল মুল্‌ক। সম্মেলনকে জয়যুক্ত করার জন্যে ৩৩ বৎসর বয়স্ক যুবক এ, কে, ফজলুল হক প্রভৃত উৎসাহ উদ্যমসহ সারা ভারত সফর করেন যার ফলে সম্মেলনে ৮০০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন। এ সম্মেলনেই বাংলা তথা সারা ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে এবং জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বলতে গেলে বংগভংগের ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে হিন্দু বিদ্বেষ, ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, তাই মুসলিম লীগের জন্ম দিয়েছিল। ফজলুলহক তারপর কোন রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে পারেন নি। কারণ ১৯০৬ সালেই তিনি ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং ১৯১১ সাল পর্যন্ত সরকারী চাকুরী করেন। ১৯১১ সালে চাকুরী ইস্তফা দেয়ার পর খাজা সলিমুল্লাহর পরামর্শক্রমেই তিনি কোলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯১৩ সালে বংগীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। ঢাকা বিভাগ নির্বাচনী এলাকা থেকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রায় বাহাদুর কুমার মহেন্দ্র মিত্রকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে জয়যুক্ত হন। অতঃপর ব্যবস্থাপক সভার প্রথম বাজেট অধিবেশনে তাঁর প্রথম বক্তৃতায় বিভাগ রদের তীব্র সমালোচনা করেন।

একথা অনস্বীকার্য যে এ কে ফজলুল হককে বাদ দিয়ে বাংলার মুসলমান বলে আর কিছু চিন্তা করা যায় না। অতএব তিনি যখন বংগভংগের সপক্ষে ছিলেন এবং বংগভংগ রদের বিরুদ্ধে বংগীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন, তখন এ কথা অবিশ্বাস্য, হাস্যকর ও চিন্তার অতীত যে হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে বংগভংগ রদ আন্দোলন পরিচালনা করে।

বংগীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ কে ফজলুল হক সাহেবের বক্তৃতায় এ কথা অধিকতর সুস্পষ্ট হয় যে বংগভংগ রদ ছিল মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী এবং এর দ্বারা তাদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করা হয়। ১৯১৩ সালে ৪ঠা এপ্রিল, বংগীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯১৩-১৪ সালের বাজেট অধিবেশনে বাংলার মুসলমানদের জনপ্রিয় নেতা জনাব এ কে ফজলুল হক তাঁর প্রথম বক্তৃতায় বলেন,

"I would only remind the officials that they are in honour bound to render adequate compensations to the Muslim Community for all the grievous wrong inflicted on them by the unceremonious annulment of the partition . . . Our share we claim as our indevisible right, and the excess we claim by way of compensation for the wrong done to us by the annulment of the partition. This is the view of the general Muslim public, and if the officials will not meet the demands in full, there is certain to be discontent in the community."

—(Budget Speech of Mr. A. K. Fazlul Huq, Bengal Legislative Council, dated 4th April, 1913 : Bangladesh Historical Studies-Journal of the Bangladesh Itihaṣh Samiti, vol 1, 1976, p. 148)

—আমি সরকারী কর্মচারীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, লৌকিকতাহীনভাবে বংগভংগ রদ করে তাঁরা মুসলিম সমাজের প্রতি যে মর্মান্তিক অত্যাচার করেছেন, তার যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে তাঁরা নীতিগতভাবে বাধ্য। · · · অখন্ডনীয় অধিকার হিসাবে আমরা আমাদের অংশ দাবী করছি এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে অতিরিক্ত দাবী আমরা এ জন্যে করছি যে বিভাগ রদ করে আমাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। এ দাবী হচ্ছে মুসলিম জনসাধারণের এবং এ দাবী পূরণ করা না হলে মুসলিম সমাজের বিক্ষুব্ধ হওয়া সুনিশ্চিত।"

বাঙালী মুসলমানদের নেতা জনাব ফজলুল হকের উপরোক্ত বাজেট বক্তৃতায় বাংলার মুসলমান জনগণের অন্তরের কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। বংগভংগ রদ করে মুসলমানদের প্রতি যে চরম অন্যায় করা হয়েছিল এবং এতদ্বারা মুসলমানগণ যে মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, সে বিক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল হক সাহেবের উপরোক্ত বক্তৃতায়। এর পর কি করে বলা যেতে পারে যে বংগভংগ ছিল মুসলমানদের কাছে অবাঞ্ছিত? এবং বংগভংগ রদের জন্যে তারা এমন শ্রেণীর সাথে হাত মিলিয়েছিল যাদের মুসলিম বিদ্বেষ এবং মুসলিম দলন নীতি ও কর্মসূচী বাংলা তথা সারা ভারতে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল?

বংগবিভাগের পর হিন্দুদের একচেটিয়া স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধা বিঘ্নিত হয়েছিল বলে গোটা হিন্দু বাংলা, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, এবং বলতে গেলে সারা ভারতের হিন্দুজাতি এ বিভাগ বানচাল করার জন্যে যেভাবে স্বর্গমর্ত আলোড়ন শুরু করেছিল এবং একসাথে মুসলিম ও ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ শুরু করেছিল, তাতে ইংরেজগণ অতিমাত্রায় বিচলিত ও বিব্রত হয়ে পড়েন কারণ ভারত ও বাংলার প্রকৃত অবস্থা তাদের জানার উপায় ছিল না। লন্ডনের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বাংলা ও ভারতের ঘটনা প্রবাহের বিপরীতমুখী সংবাদ পরিবেশন করা হতো। উপরন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একজন ইংরেজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের বহু অবসরপ্রাপ্ত অফিসার কংগ্রেসের সদস্য হওয়ায় স্বভাবতঃই তাঁদের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল কংগ্রেস তথা হিন্দুজাতির সপক্ষে।

১৯০৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে হাউস অব কমন্সে বেশ কিছু সংখ্যক এমন লোক নির্বাচিত হন যাঁরা ছিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। তাঁরা বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনের সাথে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন এবং পার্লামেন্টে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করে সরকারকে বিব্রত করে তোলেন। স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন (William Wedderburn) নামক তাঁদের একজন ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টারী কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এ দলের আর একজন সদস্য, স্যার হেনরী কটন, ভারতীয়দের আশা–আকাংখার প্রতিনিধিত্ব করে গর্ববোধ করেন। এ সমস্ত সদস্যগণ বার বার একথাই বলতে থাকেন যে ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হচ্ছে উভয় বাংলাকে এক করে দেয়া। পার্লামেন্টের জনৈক সদস্য লন্ডন থেকে তাঁর জনৈক ভারতীয় বন্ধুর নিকটে লিখিত একপত্রে এতখানি পর্যন্ত বলেন যে, "মন্ত্রী নতি স্বীকার করবে, আন্দোলন করতে থাক।" পত্রখানি বাংলার সংবাদপত্রে স্থান লাভ করে এবং তার ফলে আন্দোলন ক্রমশঃ জোরদার হতে থাকে। —(S. M. Mitra, Indian Problems, p 72, Murray, London, 1908; A Hamid : Muslim Separatism in India, p. 66)

শ্রমিক দলের দুজন নেতা, রামজে ম্যাকডোনাল্ড এবং কিয়ার হার্ডি (Keir Hardie) শান্তি মিশনের নামে ভারত সফরে আসেন। ভারতীয় কংগ্রেস তাদের

সফরের কর্মসূচী তৈরী করে সর্বত্র তাদেরকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। ম্যাকডোনাল্ড ছয় সপ্তাহ ভ্রমণের পর মন্তব্য করেন যে, বংগ বিভাগ মারাত্মক ভুল হয়েছে। তিনি জনৈক হিন্দুকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে ব্রিটিশ সরকার তাদের কথা মেনে না নিলে শ্রমিক দলের সদস্যগণ মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করবে না। হার্ডি দু'মাস কাল ভারতে অবস্থান করেন। তাঁর সফরসূচি ও বক্তৃতা বিবৃতি কোলকাতার হিন্দু সংবাদপত্র সমূহ ফলাও করে প্রকাশ করতো। তিনি বলেন পূর্ব বাংলার অবস্থা রাশিয়া থেকেও মর্মন্তুদ। এখানে হিন্দুদের উপর চরম নির্যাতন চলছে। তিনি প্রায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করেন যে তারা হিন্দু বিধবাদের শ্লীলতাহানি করছে। এতে করে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। তিনি প্রতিটি জনসভায় আন্দোলনকারীদের তুষ্টি সাধনের জন্যে উচ্চস্বরে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করেন। কোলকাতার অমৃত বাজার পত্রিকা বলে, "হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্যে ঈশ্বর হার্ডিকে পাঠিয়েছেন।" হার্ডি ইংলন্ডে ফিরে গিয়ে প্রস্তাব করেন যে, ভারতীয় অভাব অভিযোগের প্রতি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে ভারতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন লন্ডনে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

—(A Hamid : Muslim Separatism in India, 67, The Times, Weekly Edition, London, Oct. 1907, January-April, 1908, December 1910)

লর্ড ম্যাকডোনাল্ড, যিনি চরম মুসলিম বিদ্বেষী বলে পরিচিত ছিলেন, বংগ বিভাগকে পলাশী ক্ষেত্রে ক্লাইভের বিজয়ের পর প্রশাসন ক্ষেত্রে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের মারাত্মক ভুল বলে অভিহিত করেন। (Times, Weekly Edition, London, January, 1908, p-IV)

১৯১০ সালের শেষের দিকে বড়োলাট কার্জনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এলেন লর্ড মিন্টো। পরের বছর যুবরাজ জর্জের (পরবর্তীকালে রাজা পঞ্চম জর্জ) ভারত সফরের কথা। বংগভংগের জন্যে বিক্ষুব্ধ হিন্দুগণ যদি তাঁর সফরকালে কোনরূপে অবাঞ্ছিত আচরণ প্রদর্শন করে তাহলে যুবরাজের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং ভারত সরকারেরও দুর্নাম হবে এ আশংকায় লর্ড মিন্টো অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। অতএব তিনি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং গোখলের সাথে সাক্ষাত করে একথাই বুঝাবার চেষ্টা করেন যে বংগভংগের জন্যে তিনি মোটেই

দায়ী নন। তিনি আলাপ আলোচনায় তাঁদেরকে অনেকটা শান্ত করেন। ফলে মিন্টো বিভাগকে পুরাপুরি কার্যকর করার ব্যাপারে ততোটা মনোযোগ দিতে পারেননি। কিন্তু এ সময়ে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার জন্যে পূর্ব বাংলার গভর্নর ফুলার মোটে দায়ী না হলেও তাঁকেই কেন্দ্র করে বিভাগ বিরোধী আন্দোলন পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ঘটনাটি হলো এই যে, হত্যাকান্ডের অপরাধে নিম্ন আদালত জনৈক উদয় পান্ডেকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে। ইংলন্ডে হাউস অব কমন্সে প্রশ্নটি উত্থাপিত হলে ভারত সচিব এমন জবাব দান করেন যাতে ফুলারের প্রতি দোষারূপ করা হয়। ফুলারকে সমর্থন করারও কেউ থাকে না। এ বিভাগবিরোধী আন্দোলনে ইন্ধন যোগায়। একটি স্কুলের উত্তেজিত একদল ছাত্র জনৈক ইংরেজ ব্যাংক কর্মচারীকে আক্রমণ করে এবং বিলেতী বস্ত্র বোঝাই একটি গো–গাড়ীর উপর হামলা চালায়। সরকারী নিয়ম নীতি অনুযায়ী স্কুলটিকে অনুমোদিত স্কুলের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্যে ফুলার কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটকে অনুরোধ জানান। ভারত সরকার এটাকে অবিবেচনাপ্রসূত মনে করে ফুলারকে তাঁর অনুরোধ প্রত্যাহার করতে বলেন। এতে করে প্রাদেশিক গভর্নরের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে বলে ফুলার ভারত সরকারের নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানান। অন্যথায় তিনি চাকুরী থেকে ইস্তাফা দেয়ারও হুমকি দেন। বড়োলাট তাঁর কথায় অটল থাকলেন এবং ফুলারকে ইস্তাফা দিতে হলো। বড়োলাট সংগে সংগেই তাঁর ইস্তাফা মঞ্জুর করলেন। এভাবে পরিকল্পিত উপায়ে ফুলারের অপসারণে অবস্থার কোনই উন্নতি হলো না। আন্দোলন শতগুণে বর্ধিত হলো। ফুলারের অপসারণ বারুদের স্তূপে অগ্নি সংযোগের ন্যায় কাজ করলো। বিভাগ বিরোধী আন্দোলনকারীগণ যেন নতুন উৎসাহ, উদ্যম ও প্রেরণা লাভ করলো। বলতে গেলে আন্দোলনকারীদের সাদা চামড়ার মুরব্বীগণ লন্ডন থেকেই যুদ্ধের নাকাড়া বাজাচ্ছিলেন। ভারতীয় হিন্দু কংগ্রেসের বন্ধুমহল ত আছেই, ১৯০৫ সালের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বেশ কিছু সংখ্যক সদস্যও আছেন এবং তাদের সংগে প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে যোগ দিলেন ভারত সচিব মোর্লি। বংগভংগ রদের জন্যে ভারতের হিন্দুদেরকে তাঁরা নাচাতে শুরু করলেন।

উল্লেখ্য যে ১৮৮৫ সালে জনৈক ইংরেজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৫ সালের পূর্বে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করেনি। 'স্বরাজের' কথাও তাদের মনের কোণে স্থান পায়নি কোন দিন। দয়ানন্দ

সরস্বতীর 'আর্য সমাজ', রাজা রামমোহন রায়ের 'ব্রাহ্ম সমাজ' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলমানদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও ইংরেজ প্রভুদের বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি কখনো। বরঞ্চ বাংলার হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে বলা হতো, "আমরা পরমেশ্বরের সমীপে সর্বদা প্রার্থনা করি, পুরুষানুক্রমে যেন ইংরেজাধিকারে থাকিতে পারি। ভারত ভূমি কত পুণ্য করিয়াছিল এই কারণে ইংরেজ স্বামী পাইয়াছে।" –সংবাদ ভাস্কর ২০শে জুন, ১৮৫৭, কলিকাতা– Society for Pakistan Studies প্রকাশিত 'সিপাহী বিপ্লব ও বাঙালী হিন্দু সমাজ' এর সৌজন্যে)।

১৯০৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু সমাজ ইংরেজদের প্রতি এরূপ মনোভাবই পোষণ করে আসতো। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বাংলা তথা ভারতের মুসলমানগণ ইংরেজ ও হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছিল। কিন্তু বংগভংগের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য উন্নয়নের কিছু লক্ষণ দেখতে পাওয়া গেল বলে হিন্দু সমাজ ঈর্ষায় ফেটে পড়লো। বংগভংগ রদ করার তীব্র আন্দোলনে মেতে উঠলো হিন্দুবাংলা। Glimpses of old Dhaka গ্রন্থে বলা হয়েছে : "This Sinister movement was sponsored and conducted by Babus Surendra Nath Banarjee (afterwards knighted) and Bepin Chandra Pal, leader and demagogue of Hindu youths. They started boycotting and burning British made goods on account of which the mills of Lancashire were affected. The terrorists and their secret organisations began to harass the English people by the use of bomb and revolver. This educated gangster started committing dacoities in order to create a sense of insecurity in the country (Glimpses of old Dhaka, p/XXVII).

"এ অশুভ আন্দোলনের উদ্যোক্তা ও পরিচালক ছিলেন হিন্দু যুব সম্প্রদায়ের নেতা বাবু সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি (পরবর্তীকালে নাইট খেতাবপ্রাপ্ত) এবং বাবু বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁরা বিলাতী দ্রব্যাদি বর্জন ও জ্বালিয়ে দেয়ার কাজও শুরু করেন যার ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারের কলকারখানাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সন্ত্রাসবাদীরা এবং তাদের গোপন সংস্থাগুলি বোমা ও রিভলভারের আক্রমণে

ইংরেজদেরকে ব্যতিব্যস্ত করা শুরু করলো। তাদের শিক্ষিত গুন্ডাবাহিনী দেশের মধ্যে নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটাবার জন্যে দস্যুবৃত্তিও শুরু করে দিল।"

অন্যতম সন্ত্রাসবাদী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ লন্ডন থেকে কোলকাতায় এলেন ১৯০৪ সালে যখন বাংলা বিভাগের পরিকল্পনা পাকাপোক্ত হয়েছিল। পরের বৎসর এলেন তাঁর ভাই অরবিন্দ। 'বংগমাতার' অংগচ্ছেদ বলে বংগভংগের ধর্মীয় রূপ দেয়া হলো। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মেতে উঠলো সমগ্র হিন্দুবাংলা।

সারা ভারতের হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষ শতগুণে বর্ধিত হলো আরও দুটি কারণে। এতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ সম্পর্কে কথা বলার কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। বাংলা বিভাগ বিরোধী আন্দোলন ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নামে মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিল। এ বৎসরেই ১লা অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে নেতৃস্থানীয় ৩৬ জন মুসলমানের একটি প্রতিনিধিদল বড়োলাটের সাথে সাক্ষাত করে মুসলমানদের জন্যে পৃথক নির্বাচনের দাবী জানান। বড়োলাট সম্মত হন এবং তারপরও বহু চাপ সৃষ্টির ফলে এবং সৈয়দ আমীর আলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯০৯ সালে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'মুসলিম লীগ' এবং মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা—এ দুটি বস্তু সারা হিন্দুভারতের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে সন্ত্রাসবাদ ও 'স্বরাজ' আন্দোলন একসাথেই সারা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাদের প্রথম লক্ষ্য হলো বংগভংগ বানচাল করা। দ্বিখন্ডিত 'বাংলা মা'কে পুনর্জীবিত ও সন্তুষ্ট করার জন্যে মানুষের রক্তে হোলিখেলা শুরু হলো। পুলিন দাস ও প্রতুল গাঙ্গুলি পূর্ববংগের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন। যুবকদেরকে বোমা তৈরী ও অন্যান্য মারণাস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। বোমা বিস্ফোরণে সরকারী অফিস আদালত ধ্বংস করা, সভা সমিতি বানচাল করা, খুন জখম, লুটতরাজ প্রভৃতি চলতে থাকলো পূর্ণ উদ্যমে। মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম ও বগুড়ার প্রফুল্ল চাকী এসব ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও হত্যাকান্ডে আত্মনিয়োগ করলো। বিভাগ বিরোধী আন্দোলন কেউ সমর্থন না করলে তার আর রক্ষা ছিল না। গুন্ডামী ও হত্যাকান্ডের সমালোচনা করলেও তার মুন্ডপাত করা হতো। এসব কারণে জনৈক হিন্দু সরকারী উকিলকে ১৯০৯ সালে গুলী করে হত্যা করা হয়। ১৯১০ সালে ডি এস পি শামসুল আলমকেও হত্যা করা হয়। বাংলার লেফটন্যান্ট

গভর্নরকে চার বার আক্রমণ করা হয়। ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এলেনের উপর হাতবোমা নিক্ষেপ করা হয়।

বংগভংগ সমর্থনকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে এসব সন্ত্রাসবাদীরা ছিল খড়গহস্ত। আবার নিরীহ ও সরলপ্রকৃতির কিছু মুসলমানদেরকে বিভাগ বিরোধী আন্দোলনে ভিড়াবার জন্যে হিন্দুগণ অন্যপথ অবলম্বন করলো। 'বংগভংগের ইতিকথায়' ইবনে রায়হান বলেন ঃ

হিন্দু মেয়েরা মুসলমানদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে হিন্দু মুসলিম দুটি প্রাণ তথা দুই বাংলার মিলনের প্রতীক রাখী বন্ধনী পরিয়ে দিত মুসলমানদের হাতে, তাদের হৃদয় মন জয় করার জন্যে চারদিক হতে ভেসে আসতো সুললিত কন্ঠের সুমধুর সুর—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল।
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক
হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক
হে ভগবান।

—(বংগভংগের ইতিকথা, ইবনে রায়হান, পৃঃ১০–১১)

নারী কন্ঠের এ মনমাতানো উদাত্ত আহবানে কিছু মুসলমান বিভ্রান্ত হলো। তাদের মধ্যে ছিলো ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী সাবেক ব্যারিষ্টার আবদুল রসূল। তাঁর কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এসব আত্মপ্রবঞ্চিত মুসলমানদের ভুল ভেঙে গেল যখন তারা দেখলো সন্ত্রাসবাদীদের সাহিত্য ও প্রচার পুস্তিকাসমূহ— যা ভরপুর ছিল হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের উদাত্ত আহবানে। এর পুরোভাগে ছিল হিন্দু ব্রাহ্মণগণ এবং হত্যাকান্ড চালাবার জন্যে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন গোপন সংস্থা ও দল। হিন্দু দেবতার নামে এসব হত্যাকান্ড উৎসর্গীকৃত করা হতো। এ কাজ করা হতো গঙ্গাজল স্পর্শ করে বিশিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে। নৃশংস হত্যাকান্ডের জন্যে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অনুমোদন লাভ করা হলো এভাবে যে 'ভগবৎগীতায়' আছে, হিন্দুত্ব রক্ষার্থে নরহত্যা দূষণীয় নয়; বরঞ্চ পুণ্য কাজ। 'স্বদেশী'

আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করা হতো কালীমন্দির প্রাংগণে। এভাবে এ বিভাগ বিরোধী আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চারিত হতো হিন্দু ধর্মের ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে। এসব লক্ষ্য করার পর কোন মুসলমানের পক্ষেই এ আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। (A. Hamid : Muslim Separatism in India. p. 60)

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে নরহত্যা শুধু যে বৈধ তা নয়, বরঞ্চ তা অপরিহার্য। আমরা বঙ্কিমের কপালকুন্ডলায় দেখতে পাই কিভাবে হিন্দুতান্ত্রিক কাপালিক নরমাংস দ্বারা ভৈরবীপূজা করে তার ধর্ম পালন করতো। পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে দু একটি বাক্য এখানে উধৃত করছি ঃ

"গৃহপার্শ্ব দিয়া কাপালিক নব কুমারকে সেই সৈকতে লইয়া চলিলেন, এমন সময় তীরে তুল্যবেগে পূর্বদৃষ্টা রমনী তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল; গমনকালে তাঁহার কর্ণে বলিয়া গেল, এখনো পালাও। নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না?

—নব কুমারের বলপ্রয়োগ দেখিয়া কাপালিক কহিল, 'মূর্খ! কি জন্য বল প্রকাশ কর? তোমার জন্ম আজি সার্থক হইল। ভৈরবীর পূজায় তোমার এই মাংসপিন্ড অর্পিত হইবেক, ইহার অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?"

—(বঙ্কিমের কপাল কুন্ডলা ঃ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 'কাপালিক সঙ্গে'–হতে গৃহীত)

অতএব যে সন্ত্রাসবাদ ও হত্যাকান্ডকে ধর্মীয় রূপ দেয়া হয়েছিল, হিন্দুধর্মীয় রূপ—তার সাথে মুসলমানদের সংশ্রব–সম্বন্ধ থাকতে পারেনা। আর থাকতে পারে না বলেই এ সন্ত্রাসবাদ ও হত্যাকান্ডের শিকার মুসলমানরাও হয়েছিল।

সন্ত্রাসবাদ, নাগরিকদের বিশেষ করে ইংরেজদের জীবনের নিরাপত্তাহীনতা যতোটা ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত করে তুলেছিল, সম্ভবত তার চেয়ে অধিক বিব্রত করেছিল—বিলাতী বস্ত্রাদি বর্জন নীতি। মানচেস্টারের কলকারখানাগুলি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। মানচেস্টার চ্যাম্বার অব কমার্সের কাছে হিন্দু বণিক সমিতির পক্ষ থেকে অনবরত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদেরকে বলা হচ্ছিল, 'যদি এ দেশে তোমাদের বস্ত্রাদি চালাতে চাও, তবে বংগভংগ রদ করো।'

ভারতীয় কংগ্রেসও ঘোষণা করে যে— বংগভংগ রদের একমাত্র পথ হচ্ছে বিলাতী দ্রব্যাদি বর্জন। তবে কংগ্রেস একথাও বলে যে এ বর্জন নীতি শুধু বাংলাদেশে সীমিত থাকবে।

একথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বিভাগবিরোধী আন্দোলনের ধারা ক্রমশঃ অন্য একটি খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। তা হলো এই যে, মুসলমান জাতিকেই একেবারে ভারত ভূমি থেকে নির্মূল করে দেয়া। সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন ১৯১১ সালে ভারতে আগমন করেন তখন বহু হিন্দু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রদত্ত আবেদনপত্রে বলা হয় যে, বিভিন্ন সংস্কারাদির দ্বারা মুসলমানদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করা হচ্ছে। হিন্দু পত্র–পত্রিকাগুলি বলে যে মুসলমানরা দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক, সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ভানমাত্র, ব্রিটেনের প্রতি তাদের দরদমাত্র নেই, তাদের যোগসাজশ রয়েছে মিশরীয় রাজদ্রোহীদের সাথে —(A. Hamid : Muslim Separatism in India, p. 83)। The Times, London এর সংবাদদাতা স্যার ভ্যালেন্টাইন বলেন যে, তিলক এবং তার ভাবাদর্শে পুনায় প্রতিষ্ঠিত স্কুল, পাঞ্জাব ও বাংলার জাতীয়তাবাদী হিন্দুগণকে প্রায় একথা বলতে শুনা যেতো যে, স্পেন থেকে কয়েক শতাব্দী পূর্বে যেমন মুসলমানদেরকে নির্মূল করা হয়েছে, তেমনি ভারত থেকেও তাঁদেরকে নির্মূল করা হবে। বড়োলাট কার্জনের ব্যক্তিগত স্টাফদের সাথে জড়িত স্যার ওয়ালটার লরেন্স ইন্দোরের মহারাজা স্যার প্রতাপ সিংহ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ

"একবার শিমলায় লর্ড কার্জন কর্তৃক আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে প্রদত্ত একটি বিদায়কালীন নৈশভোজে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন স্যার প্রতাপ সিংহ। ভোজের পর রাত দুটো পর্যন্ত তাঁর সাথে আমার বিভিন্ন আলাপ আলোচনা হয়। তিনি তাঁর জীবনের বহু আশা–আকাংখা আমার কাছে ব্যক্ত করেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ভারত থেকে মুসলমানদের নির্মূল করা। আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করে আমাদের উভয়েরই কতিপয় মুসলমান বন্ধুর নাম করলাম। তিনি বল্লেন, 'হাঁ, তাদেরকে আমি পছন্দ করি, কিন্তু অধিকতর পছন্দ করি তাদের মৃত্যু।" স্যার লরেন্স বলেন, "স্যার প্রতাপের এ ধরনের আলাপ সম্পর্কে আমি প্রায়ই চিন্তা করি। বহু বৎসর ধরে ভারতীয়দের সাথে কারো পরিচয় থাকতে পারে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন হঠাৎ তারা তাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করবে

এবং ভিতরের গোপন রহস্যটি উদঘাটন করে ফেলবে। স্যার প্রতাপ সিংহ একজন ভালো হিন্দু রাজপুত। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। বহু লোকের সাথে মিশেছেন। ভালো ইংরেজী জানেন। বহু জাতির লোকের সাথে তাঁর পরিচয়। বলতে গেলে তিনি একজন বিশ্বজনীন (Cosmopolitan) সভ্যতার ধারক বাহক। কিন্তু তাঁর অন্তরের গভীরতম প্রদেশে দুরপনেয় মুসলিম বিদ্বেষ বাসা বেঁধে আছে।"

(Sir Walter Lawrence: The India We Served, p. 209, Cassel London, 1928; A. Hamid : Muslim Separatism in India, pp. 83-84)

স্যার লরেন্স একটি অতি মোক্ষম সত্য উদঘাটন করেছেন। ভারত ভূমি থেকে মুসলমানদের নির্মূল করা স্যার প্রতাপ সিংহের মতো কেবলমাত্র দু'একজন হিন্দু ভদ্রলোকের অন্তরের কথাই নয়, বরঞ্চ এ হচ্ছে গোটা হিন্দুজাতিরই অন্তরের কথা। পরবর্তী সময়ে ভারতে পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখ হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্য বক্তৃতা বিবৃতিতে বার বার উপরোক্ত মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

বংগভংগ রদ ও তার প্রতিক্রিয়া

বাংলায় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ফলে এ আন্দোলন ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। ১৯১০ সালের শেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিকের দিকে ফিরে আসছিল। আন্দোলনের সিপাহীরা একরকম রণক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এ বৎসরেই জনৈক বাংগালী হিন্দু ব্যবস্থাপক সভায় বিষয়টি নতুন করে উত্থাপন করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। পরে তিনি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে সম্মত হন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ছিলেন আন্দোলনের উদ্যোক্তা। তিনিও সবশেষে তাঁর 'বাঙালী' পত্রিকার মাধ্যমে বলেন, "আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে এ বিভাগ টিকে থাকার জন্যে হয়েছে এবং আমরা একে বানচাল করতে চাইনা।" (Fraser, India Under Curzon and After, p. 391, A. Hamid : Muslim Separatism in India, p. 86)

কিন্তু সুদূর লন্ডনের বুকে কোন্ গোপন হস্ত বংগবিভাগের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্র তৈরী করে চলেছিল তা জানা যায়নি।

রাজা পঞ্চম জর্জ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে তাঁর আরোহণের কথা আপন মুখে ঘোষণা করার অভিপ্রায়ে ১৯১১ সালে ভারতে আগমন করেন। শুধুমাত্র রাজ্যাভিষেক ঘোষণার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে সুদূরবর্তী উপনিবেশে আগমন করা—এ ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ও নজীরবিহীন ঘটনা। সন্ত্রাসবাদীদের অশুভ ষড়যন্ত্রের আশংকা তখনো মন থেকে মুছে ফেলা যায়নি। ভারতে তখন দুর্ভিক্ষ বিরাজমান। ইতালী-তুর্কী যুদ্ধের কারণে মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ। এসব কারণে পঞ্চম জর্জের মন্ত্রীমন্ডলী ভারত সফর অবিবেচনা প্রসূত মনে করে তাঁকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করেন। রাজা সকল উপদেশ উপেক্ষা করে ভ্রমণের প্রস্তুতি করতে থাকেন। নবেম্বর মাসে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তিনি বোম্বাই অবতরণ করেন। ভারতবাসী অধীর প্রতীক্ষায় রইলো যে কখন কোন শুভ মুহূর্তে সম্রাট ভারতবাসীকে কি কি পুরস্কার বা রোয়েদাদ প্রদানে আপ্যায়িত করেন। সবশেষে

সে মুহূর্ত এসে গেলো। এক অতি জাঁকজমকপূর্ণ সমাবেশে ভাবগম্ভীর পরিবেশে রাজা পঞ্চম জর্জ এক একটি করে তাঁর অপার করুণা প্রিয় প্রজাবৃন্দের উপর বর্ষণ করতে লাগলেন। সকল রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলো, শিক্ষার উন্নয়নের জন্যে একটা মোটা রকমের অংক বরাদ্দ করা হলো; ভারতীয় সৈনিকদের জন্যে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' সম্মান লাভের অযোগ্যতা দূরীভূত হলো, অল্প বেতনভুক সরকারী কর্মচারীদেরকে অতিরিক্ত অর্ধ মাসের বেতন দেয়া হলো; ভারতের রাজধানী কোলকাতা থেকে দিল্লী স্থানান্তরিত করা হলো। সর্বশেষে বলা হলো "বংগভংগ' রদ করা হলো।" হিন্দুগণ আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়লো। বংগভংগ বাতিলের ঘোষণা দ্বারা তাৎক্ষণিক সুবিধা এই হলো যে, ভারত সাম্রাজ্যের অপরাধ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়ে রাজদম্পতির নিরাপদ ভ্রমণের নিশ্চয়তা পাওয়া গেল।

কিছুদিন পর যখন রাজা কোলকাতায় এলেন, তখন হিন্দুবাংলা আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাজা ও ব্রিটিশ সাম্রাজের প্রতি তাদের অদম্য আনুগত্য প্রদর্শন করে বিরাট বিরাট শোভাযাত্রা করে। হিন্দু সংবাদপত্রগুলি রাজার মহানুভবতার জন্যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে থাকে। কতিপয় সংবাদপত্র এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয় যে, হিন্দু মন্দিরে শ্বেত মহারাজা ও মহারাণীর মূরতি স্থাপনের প্রস্তাব করে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং লর্ড হার্ডিঞ্জেরও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।

অপরদিকে বিভাগ বাতিল করে মুসলমানদের প্রতি করা হয় চরম বিশ্বাসঘাতকতা। কার্জন বিভাগ সম্পাদন করে এবং হার্ডিঞ্জ তা বাতিল করে। কিন্তু উভয়ের কার্যপ্রণালীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য এই যে কার্জন প্রকাশ্যে বংগভংগের প্রস্তাব দেন, তার সপক্ষে ন্যায়সংগত যুক্তি পেশ করেন। এ নিয়ে বহুদিন আলাপ আলোচনা হয়, বহু কাগজ কালি ব্যয় হয়। প্রস্তাবটি যথারীতি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত এবং যথাসময়ে তা কার্যকর করা হয়। পক্ষান্তরে হার্ডিঞ্জের পরিকল্পনা অত্যন্ত গোপনীয়তাবে অগ্রসর হয় এবং জনসাধারণের কাছে তা প্রকাশ লাভ করে অতি আকস্মিকভাবে এবং এক অতি বিস্ময়ের রূপ নিয়ে। ব্রিটিশ সরকারের এ সিদ্ধান্তের দ্বারা একের সর্বনাশ করে অপরের পৌষ মাস এনে দিলেও এর দ্বারা তাদের প্রগলভতা, ডিগবাজী ও একটি অনুন্নত অঞ্চলের

সম্প্রদায়ের ন্যায়সংগত অধিকার ফিরে দিয়ে আবার তা কেড়ে নেয়ার অন্যায় অবিচারমূলক মনোবৃত্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় হয়ে থাকবে।

ব্রিটিশ সরকারের এ হাস্যকর অভিনয়ের কার্যকারণ সম্পর্কে যতটুকু আভাস পাওয়া যায় তা হলো এই যে, বিভাগ রদের খেয়ালটা তৎকালীন ভারত সচিব 'ক্রু'র (Crew) মস্তিকে স্থান লাভ করেছিল। যারা বিভাগকে মারাত্মক ভুল বলে অভিহিত করে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, তাদেরকে শান্ত করাই ছিল ক্রুর অভিপ্রায়। হার্ডিঞ্জ বলেন, "পরে আমাকে এ কথা জানানো হলো যে, উভয় বাংলায় যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সমস্ত বাংগালী যেটাকে অন্যায় অবিচার মনে করেছে তা দূর করার জন্যে কিছু করা একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অবশ্য এ সময়ে বিদেশেও এমন আশা করা হচ্ছিল যে এ 'অবিচার' দূর করার জন্যে কিছু করা হবে। আমি অনুভব করলাম যে যদি কিছু করা না হয়, তাহলে অতীতের চেয়ে ভবিষ্যতে আমাদেরকে অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।"

—(Hardinge of Penhurst : My Indian Years, p. 36, Murray London, 1948; A. Hamid : Muslim Separatism in India, p. 88)

উপরে বর্ণিত স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির উক্তিতে বুঝতে পারা যায় যে, বিভাগ বিরোধী আন্দোলনকারীগণ এক রকম হতাশ হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিলেন এবং বিভাগকে মেনে নিতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু লন্ডনে যেসব সাদা চামড়ার বন্ধুগণ ইন্ধন যোগাচ্ছিলেন, তাঁরা হাল ছেড়ে দেননি। তাঁরা তাদের কাজ করেই যাচ্ছিলেন যার দ্বারা ভারত সচিব ক্রু অবশ্যই প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আবদুল হামিদ বলেন যে, বিভাগ রদ করার সপক্ষে যত প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, "উভয় বাংলার হিন্দুগণ প্রায় সব ভূসম্পদের মালিক ছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরী বাকুরীতেও ছিল তাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব। ফলে তাঁরা জনগণের উপরও অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলেন। তাদের সম্পদ ও সংস্কৃতি তাদেরকে যে প্রভাব প্রতিপত্তি দান করেছিল, বংগ বিভাগের ফলে তাঁরা সে প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বেন। কায়েমী স্বার্থ ও শ্রেণীপ্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখার সপক্ষে এ যুক্তি বটে।

—(A. Hamid : Muslim Separatism in India, p. 89)

বিভাগ রদ করার পেছনে যে কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না, বরঞ্চ বলতে গেলে ছিল এক চরম দুরভিসন্ধি, তা উপরের কথায় সুস্পষ্ট হ'য়ে যায়। বংগভংগ রদ ছিল মুসলমানদের উপর এক চরম আঘাত। মুসলমানদের বুঝতে বাকী ছিল না যে সরকার তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তাদের আনুগত্যের বিনিময়ে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাদের ন্যায়সংগত অধিকার থেকে। এ সম্পর্কে মুশতাক হোসেন তাঁর এক নিবন্ধে বলেন,

"মুসলমানরা এ পদক্ষেপকে (উভয় বাংলার একত্রীকরণ) অবজ্ঞার চোখেই দেখবে। ব্রিটিশ মন্ত্রীমন্ডলী কার্জনের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর উভয় বাংলার একত্রীকরণ এটাই প্রমাণ করে যে কর্তৃপক্ষ পংগু হয়ে পড়েছেন। ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতির উপর কেউ আস্থা পোষণ করতে পারবে না। ··· আমরা এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাল্টাবার কোন আন্দোলন করব না। কিন্তু আমাদের দাবী এই যে বিভাগের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ যেসব সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল, তা যেকোন ভাবে তাদের জন্যে সুনিশ্চিত করতে হবে। ··· ত্রিপলী ও পারস্যের ব্যাপারে ব্রিটিশ নীতি মুসলমানদেরকে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে। ··· এই সর্বশেষ আঘাত আমাদের হতাশা ও নৈরাশ্য বাড়িয়ে দিয়েছে। ··· এই কঠোর পদক্ষেপ আমাদের জাতির মনে তিক্ততার সৃষ্টি করেছে। তারা ভাবতে শুরু করেছে যে কংগ্রেস থেকে সরে থেকে বিশেষ লাভ হয়নি। কেউ বা হয়তো মুসলিম লীগ ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করবে। এতদিন ধরে ঠিক এইটাই কংগ্রেস প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু আমরা এরূপ চিন্তাধারার সাথে একমত নই। আমরা আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বিসর্জন দিয়ে একটি শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে পারি না। এ হচ্ছে আত্মহত্যার পথ। একটি স্রোতস্বিনী সমুদ্রে মিলিত হওয়ার পর তার সত্তা হারিয়ে ফেলে। সরকারের প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে আমরা কংগ্রেসের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নই। আনুগত্যই আমাদের আসল উদ্দেশ্য নয়, বরঞ্চ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। আনুগত্য সর্বদাই শর্তসাপেক্ষ। আনুগত্য অসম্ভব রকমের চাপ সহ্য করতে পারে না।

··· এ দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে, মুসলমানগণ সরকারের প্রতি আর আস্থা স্থাপন করতে পারে না। আমাদের নির্ভর করতে হবে খোদার উপরে এবং আমাদের চেষ্টাচরিত্রের উপরে। ···এদিক দিয়ে যদি আমরা সুসংবদ্ধ হতে

পারি তাহলে সরকার আমাদের অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হবেন। যা কিছু ঘটেছে তার থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

··· আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা সরকার অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। রাজার পক্ষ থেকে ঘোষণাটি যেন একটি গোলন্দাজ বাহিনীর ন্যায় মুসলমানদের শবদেহকে নির্মমভাবে নিষ্পেষিত করে গেল।"

—(Zuberi : Tazkira Waqar, pp. 228-40; A. Hamid : Muslim Separatism in India, p. 91)

১৯১২ সালে মার্চ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে বংগভংগ সংগ্রামের আহত সৈনিক খাজা সলিমুল্লাহ বলেন:

বংগভংগের বিরুদ্ধে আন্দোলন থেমে যাওয়ার পর প্রসংগটি পুনরায় উত্থাপনের কোন ন্যায়সংগত কারণ কোন দায়িত্বশীল বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি আবিষ্কার করতে পারেনি। এ বিভাগ ১৯০৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়ে ১৯১১ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। মুসলমানদের আশা আকাংখার সম্ভাবনা দেখে আমাদের শত্রুগণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রকৃত পক্ষে বিভাগের ফলে আমরা তেমন বিশেষ কিছুই লাভ করিনি। যতটুকুই লাভ করেছিলাম আমাদের প্রতিবেশী অন্য সম্প্রদায় স্বর্গমর্ত্য আলোড়ন সৃষ্টি করে তাও আমাদের নিকট থেকে কেড়ে নিল। হত্যা ও দস্যুবৃত্তি করে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করলো, তারা বিলাতী দ্রব্যাদি বর্জন করলো। সরকার এতে কিছুই মনে করলেন না। এসব হত্যাকান্ডে মুসলমানগণ অংশগ্রহণ না করে সরকারের প্রতি অনুগতই রইলো। ··· বিভাগের ফলে মুসলমান কৃষককুল লাভবান হলো। হিন্দু জমিদারগণ তাদেরকে আন্দোলনে টেনে নামাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তারা কর্ণপাত করলো না। এতে করে হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ শুরু হলো। সরকার দমননীতি অবলম্বন করলেন। তাতে ফলোদয় হলো না। একদিকে ছিল সম্পদশালী বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায় এবং অপরদিকে দরিদ্র মুসলমান এবং এরা ছিল সরকারের সাথে। এভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হলো। আকস্মিকভাবে সরকার বিভাগ রদ করে দিলেন। এ বিষয়ে আমাদের সাথে কোন আলাপ আলোচনাও করা হলো না। (Ahmad, Ruh-i-Raushan Mustaqbil, pp. 58-59; A. Hamid : Muslim Separatism in India, p. 92)

১৯২৩ সালে কোকোনাদায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মাওলানা মুহাম্মদ আলী তাঁর সভাপতির ভাষণে বংগভংগ রদের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন : "আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ তাদের সদ্যলব্ধ অধিকার সমূহ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হলো এবং (সরকারের প্রতি) সন্তোষ প্রকাশকে চরম অপরাধ বলে শাস্তি দেয়া হলো। এ এমন এক ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত যা ইতিহাস থেকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে।"

—(Iqbal : Select Writings & Speeches. p. 162)

ব্রিটিশ সরকার যে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, ডিগবাজী খেয়েছিলেন, মুসলমানদের প্রতি যে চরম অন্যায় করা হয়েছিল এবং এক শ্রেণীর সন্ত্রাস ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্যে তাঁদের চির গর্বিত মস্তক অবনত হয়েছিল, এ অনুভূতি তাঁদের অনেকেরই মধ্যে এসেছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত দীর্ঘ দিনের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তকে সাত বৎসর পর রাজা পঞ্চম জর্জের মুখের ঘোষণা দ্বারা পরিবর্তিত করে দুনিয়ার সামনে তাঁদের মর্যাদা যে ক্ষুণ্ন হয়েছিল এ অনুভূতিও তাঁদের ছিল। তাই অনেকে বংগভংগের কার্যকারণের ইতিহাসকে বিকৃত করে রাজা পঞ্চম জর্জের মন রক্ষার চেষ্টা করেছেন।

অবশেষে পূর্ব বাংলার মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এবং বংগভংগ রদের দরুন তাদের যে বিপুল ক্ষতি হয়েছিল তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত সরকার করেন যাতে করে এ অঞ্চলের অনুন্নত লোকদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে। দুই বাংলার একত্রীকরণে বাংলার হিন্দুগণ আনন্দে গদগদ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মুসলমানদের কোন প্রকার উন্নতি ও সুখ সমৃদ্ধি তারা বরদাশত করতে কিছুতেই রাজী ছিল না। তাই সরকার কর্তৃক ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্তে তাদের মাথায় যেন আবার বজ্রাঘাত হলো। কতিপয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অগ্নিশর্মা হয়ে এ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেন। যেহেতু কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল হিন্দু শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রভাবের মূল উৎসকেন্দ্র, সেজন্য আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হলে প্রথমটির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে বলেও তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অবিলম্বে বড়োলাট লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে সাক্ষাৎ করে। তাঁরা বলেন যে, প্রদেশে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে জাতীয় জীবনের শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাধীন

অধিবাসীদের মধ্যে বিরাজমান অনৈক্য উত্তরোত্তর বর্ধিত হবে। তাঁরা বড়োলাটকে এ বিষয়েও সাবধান করে দেন যে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হবে অত্যন্ত নগণ্য ও হাস্যকর। কারণ, তাঁদের মতে, যথেষ্ট প্রজ্ঞাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর অভাব হবে এবং মূলতঃ মুসলমান কৃষিজীবীদের জন্যে প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের কোন মূল্য হবে বলেও তাঁদের সন্দেহ আছে।

—(Govt. of India, Speeches by Lord Hardinge of Penhurst. Vol. 1, pp. 203-20, Calcutta, 1916)

এ সম্পর্কে বাংলার মুসলিম জননেতা মরহুম এ কে ফজলুল হক বংগীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯১৩–১৪ সালের বাজেট অধিবেশনে যে বক্তৃতা করেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে তার কিঞ্চিত উদ্ধৃত করলাম। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন :

"ভারত সরকারের ২৫শে আগষ্টের প্রতিবেদনে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, বংগভংগ রদের দরুন যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তার দ্বারা মুসলিম স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে না, তারপর আঠার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল এবং এখন দেখার সময় এসেছে তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি কতখানি পালন করেন। দিল্লী দরবারের ঘোষণার অল্পদিন পর মহামান্য বড়োলাট যখন ঢাকায় পদার্পণ করেন, তখন প্রত্যেকেই আশা করেছিল যে, মুসলমানদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি কোন একটা ঘোষণা করবেন। অবশ্য আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা শুনতে পেয়েছি। কিন্তু আমি অবশ্যই বলব যে আমরা যা আশা করেছিলাম, সেদিক দিয়ে এ অতি তুচ্ছ। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বকে ছোট করতে চাই না। কারণ, পূর্ব বাংলার শিক্ষার উন্নয়নে যে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল, তা এর দ্বারা বিদূরিত হবে। একটি মুসলিম অধ্যুষিত কেন্দ্রে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অশেষ সুযোগ সুবিধার কথাও অস্বীকার করিনা। কিন্তু এই যে বলা হচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধু মুসলমানদের উপকারার্থে করা হচ্ছে অথবা এটা হচ্ছে মুসলমানদেরকে খুশী করার একটা বিশিষ্ট পদক্ষেপ— আমি এসবের প্রতিবাদ করছি। বড়োলাট সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'এ বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু মুসলমান উভয়েরই জন্যে এবং তাই হওয়া উচিত।' এ সংকুচিত করা হয়েছে এই ভয়ে যে হিন্দুদের মধ্যে আবার বংগভংগের প্রতিক্রিয়া জাগ্রত হতে পারে। এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পরিকল্পিত একটি মুসলিম কলেজ এবং ফ্যাকাল্টি অব ইসলামিক স্টাডিজ—

এটাকে মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ করার অভিপ্রায় বলেও ধরা যেতে পারে না। কারণ অর্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবত ষোল আনা শিক্ষক-কর্মচারী ও প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামাদি সহ সরকার কোলকাতায় একটি একচেটিয়া হিন্দু-কলেজ চালিয়ে আসছেন এবং ঢাকায় একটি মুসলিম কলেজ হলে তা হবে মুসলমানদের দীর্ঘ দিনের অবহেলিত দাবীর দীর্ঘসূত্রী স্বীকৃতি। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ সম্পর্কে কথা এই যে, যে অঞ্চলে মুসলমানগণ দীর্ঘকাল যাবত আরবী ও ফার্সী শিক্ষার বাসনা পোষণ করে আসছে, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামের শুধু স্বাভাবিক ফল মাত্র এই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ। এটা সকলের জানা না থাকতে পারে যে, পূর্ব বাংলার জেলাগুলি থেকে অধিক সংখ্যক ছাত্র বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলিতে পড়াশুনা করে এবং এই শ্রেণীর অধিবাসীদের প্রয়োজন পূরণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের কোন ব্যবস্থা ব্যতীত একটি বিশ্ববিদ্যালয় কিছুতেই ন্যায়সংগত হতোনা। আমি আশা করি সরকারী কর্মকর্তাগণ এ কথা উপলব্ধি করবেন যে, যদিও মুসলমানগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই রায় দিয়েছে, কিন্তু এটাকে, এমনকি একটি মুসলিম কলেজ এবং ফ্যাকাল্টি অব ইসলামিক স্টাডিজকেও তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ বলে তারা মনে করে না।

—(Bangladesh Historical Studies : Speech on the Budget for 1913-14, pp.149-50)

উপরের আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বংগভংগ, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, তথা মুসলমানদের কোন সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে হিন্দু ভারত ও ইংরেজদের মানসিকতা ও আচরণ কি ছিল।

বংগভংগ ও বংগভংগ রদের ফলে মুসলমানরা কি লাভ করলো আর কি হারালো তাই আমাদের যাচাই পর্যালোচনা করে দেখা দরকার।

সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজনে ভারতের ব্রিটিশ আমলাগণ বহু দিন যাবত কতিপয় প্রাদেশিক এলাকার পুনর্বন্টন ও পুনর্বিন্যাসের চিন্তাভাবনা করছিলেন এবং এ বিষয়ে সেক্রেটারিয়েটে ফাইলের পর ফাইল তৈরী হয়েছিল। লর্ড কার্জন এসবকে ভিত্তি করে সর্ববৃহৎ প্রদেশ বাংলাকে বিভক্ত করে 'পূর্ববাংলা ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন। বাংলার মুসলমানদের এ বিষয়ে কোন ধ্যান-ধারণাই ছিল না। অবশ্য বিভাগের ফলে মুসলিম অধ্যুষিত

পূর্ববাংলার মুসলামানদের সর্ববিধ মংগল ও উন্নতির আশা পরিলক্ষিত হলো। বাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সুযোগ সুবিধায় নিছক ঈর্ষান্বিত হয়ে বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। সে আন্দোলন পরে সন্ত্রাসবাদ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের রূপ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি হিন্দু মানসিকতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ভারতভূমিতে মুসলমানগণ তাদের অস্তিত্ব, তাহজিব তামাদ্দুন, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে বিপন্ন মনে করে। আত্মরক্ষার জন্যে 'মুসলিম লীগ' নামে ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়। ভারতের হিন্দু মুসলিম মিলে একজাতীয়তার ছদ্মনামে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করে তাদেরকে হিন্দুজাতীয়তার মধ্যে একাকার করার ষড়যন্ত্রও মুসলমানরা উপলব্ধি করে। আগা খানের নেতৃত্বে ৩৬ জন বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধি দল বড়োলাটকে তাঁদের এ আশংকা ব্যাখ্যা করে পৃথক নির্বাচন প্রথা দাবী করেন। পরে ব্রিটিশ সরকারও এর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করেন। মুসলমানগণ একটি পৃথক জাতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে, যার ফলশ্রুতি স্বরূপ— ভারত বিভক্ত হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লাভ হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

উনিশ শ' ছয় থেকে ছত্রিশ

উনিশ শ' ছয় থেকে ছত্রিশ—এ তিরিশ বছরের ইতিহাস মুসলমানদের আযাদী আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তবুও বলতে হবে এ তিনটি দশকে তারা ছিল আশা–নিরাশার দ্বন্দ্বে জর্জরিত এবং কখনো কখনো দেখতে পাই তাদের রাজনৈতিক মানস নৈরাশ্যে ঝিমিয়ে পড়েছে।

এ দশকত্রয়ের দুটি প্রান্তসীমা ছিল দুটি বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। ১৯০৬ সালে মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার উন্মেষে আশার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত এবং ছত্রিশে ভারত শাসন আইন (India Act of 1935) অনুযায়ী স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণে তৎপর। মাঝের সময়কালটুকু কেটেছে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে দ্বন্দ্ব কলহে, আত্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতায়, ব্রিটিশ সরকারের কাছে মুসলমানদের আত্মপ্রত্যয় বিশ্লেষণে এবং তার সাথে সাথে চলেছে আযাদী আন্দোলনও।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বংগ বিভাগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্যে। কিন্তু বংগ বিভাগ যখন হলো এবং মুসলিম অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের অবহেলিত মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ও বৈষয়িক উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হলো, তখন এ বিভাগের তীব্র বিরোধিতা শুরু করলো গোটা হিন্দু সমাজ। তাদের এ অন্ধ বিরোধিতায় এ সত্যটিই উদঘাটিত হলো যে হিন্দু মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি, তাদের আশাআকাঙ্খা, ধর্মকর্ম, জীবনের দৃষ্টিভংগী, সমাজ সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির গতিধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক। এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯০৬ সালে একটি শক্তিশালী মুসলিম প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে পৃথক নির্বাচনের দাবী সরকার সমীপে পেশ করা হয়। জাতীয় স্বাতন্ত্রের জন্যে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য বিধায় ১৯০৬ সালে 'মুসলিম লীগ' নামে ঢাকার বুকে মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—নতুন রাজনৈতিক ও জাতীয় চেতনার অবশ্যম্ভাবী ফল।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গালভরা বুলি ছিল এক–জাতীয়তাবাদের। কিন্তু বংগভংগ রদের জন্যে সমগ্র হিন্দুজাতির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তাদের এক–

জাতীয়তাবাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়। হিন্দু মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়ে পড়ে, পারস্পরিক তিক্ততা উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের রূপ ধারণ করে। পলাশীর বিয়োগান্ত নাটকের পর থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ পর্যন্ত ইংরেজ কর্তৃক যে মুসলিম দলন চলেছিল, তাতে হিন্দুরা উল্লাসবোধ করতো এবং এটা একথারই প্রমাণ বহন করে যে হিন্দুরা ছিল ইংরেজদের একান্ত বশংবদ ও প্রিয়পাত্র। পক্ষান্তরে মুসলমানরা ছিল তাদের কাছে অবিশ্বাস্য ও শত্রু। কিন্তু বংগভংগ, পৃথক নির্বাচন প্রভৃতির দ্বারা তাদের মনে যখন এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশের মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে এবং তারা হয়েছে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তখন হিন্দুদের আক্রোশ তাদের ব্রিটিশ প্রভুদের উপরেও পড়ে। তারপর শুরু হয় ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদ।

রাজা পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরী ১৯১১ সালে ভারত ভ্রমণে আসেন।তাঁদের আগমন উপলক্ষে দিল্লীতে বিরাট আড়ম্বরপূর্ণ এক দরবার অনুষ্ঠিত হয়। দরবার শেষে রাজা সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ঘোষণা করলেন, ভারতের রাজধানী কোলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হবে দিল্লীতে। পরের ঘোষণাটি অধিকতর বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত। তিনি ঘোষণা করেন যে, বংগভংগ রদ করা হলো। এ ছিল মুসলমানদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের চিরাচরিত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। এতে মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধিতা তীব্রতর হয়ে উঠে।

পক্ষান্তরে বংগভংগ রদে হিন্দুরা আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে। এর ফলে একদিকে যেমন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আদর্শিক ও রাজনৈতিক পার্থক্য ও দূরত্ব বাড়তে থাকে, তেমনি বাড়তে থাকে মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধিতা। মুসলিম লীগের তিন দফা উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথম দফাতেই ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির উল্লেখ। কিন্তু রাজা পঞ্চম জর্জের দ্বিতীয় ঘোষণাটি তাদের চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করলো ভিন্ন খাতে। ১৯১২ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংগঠনের উদ্দেশ্যকে প্রসারিত করার প্রস্তাব গৃহীত হলো। এ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। এ পরিবর্তিত প্রস্তাব লীগের সম্মুখে পূর্ণ আযাদী অর্জনে স্থির লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত করলো। ফলে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হলো।

উল্লেখ্য যে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ লীগের উক্ত অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। তবে লীগের সংগঠন সম্পর্কে তাঁর মধ্যে তখনো কোন উৎসাহ উদ্দীপনা দেখতে পাওয়া যায়নি। লীগের প্রতি তাঁর অনীহা প্রদর্শনের কারণ এই ছিল যে, তখন পর্যন্ত তাঁর মনে এ ধারণা ছিল যে লীগের নীতি ছিল সম্প্রদায় কেন্দ্রিক। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একজন অত্যুৎসাহী সদস্য এবং বিশ্বাসী ছিলেন হিন্দু মুসলিম ঐক্যে। তিনি রাজনীতিতে দীক্ষা গ্রহণ করেন গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের কাছে। গোখেল মন্তব্য করেছিলেন, "হিন্দু মুসলিম ঐক্যের দূত হওয়ার যোগ্যতা জিন্নাহ্র আছে।"

আনুষ্ঠানিকভাবে লীগের সদস্য হওয়াকে তিনি কংগ্রেসের সদস্য থাকার বিরোধী মনে করেননি বলে লীগেরও সদস্য হন। তাঁর একান্ত বাসনা ছিল লীগ ও কংগ্রেসের সদস্য থেকে তিনি হিন্দু মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করবেন। আপ্রাণ চেষ্টাও করেন তিনি। কিন্তু তাঁর অক্লান্ত মিলন প্রচেষ্টায় তিনি লক্ষ্য করেন যে, হিন্দু মুসলমানের মিলন ত দূরের কথা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মাধ্যমে তাদের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাদের উভয়ের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পৃথক এবং তাদের কর্মধারাও পৃথক পৃথক খাতে প্রবহমান।

উনিশ শ' চৌদ্দতে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই এ সময়ে ব্রিটিশকে সাহায্য করে। এ সময়ে হিন্দু মুসলিম মিলনের প্রচেষ্টা খুব জোরদার হয়। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস-লীগের এক যুক্ত কমিটিতে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির দুটি ফল হয়েছিল। এক- এ চুক্তি পরবর্তীকালের খেলাফত আন্দোলন কালীন কংগ্রেস লীগ ঐক্যের পূর্বসূত্র চিহ্নিত করে। দুই- এ চুক্তির ভিতর দিয়ে একজাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস লীগের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও গুরুত্ব স্বীকার করে নেয়। কংগ্রেস ভারতীয় আইন পরিষদের মোট নির্বাচিত সদস্যদের একতৃতীয়াংশ মুসলমানদেরকে দিতে রাজী হয়। বাংলাদেশে তারা পাবে শতকরা ৪০টি, পাঞ্জাবে ৫০টি, বিহারে ২৫টি, যুক্ত প্রদেশে ৩০টি, এর সাথে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নিয়ে কংগ্রেস মুসলিম জাতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নেয়।

কিন্তু লক্ষ্ণৌ চুক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুদের পক্ষ থেকে প্রবল বিরোধিতা শুরু হয় এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হাংগামাও শুরু হয়।

এ জিনিসটি কয়েকবার লক্ষ্য করা হয়েছে যে, যখনই কোন কিছুর ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে তখনই সংখ্যাগুরু দল সাম্প্রদায়িক হাংগামার সূত্রপাত করে মিলন প্রচেষ্টাকে বানচাল করেছে।

এ কালের তিনটি ঘটনা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। খেলাফত আন্দোলন, মোপলা বিদ্রোহ ও হিজরত আন্দোলন। তার পটভূমিকা বর্ণনা করাও প্রয়োজন বোধ করি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ব্রিটিশের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে। তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তারা আশা করেছিল ব্রিটিশ সরকার তাদের নিম্নতম দাবীসমূহ মেনে নিবে। ১৯১৭ সালে হাউস্ অব্ কমন্সে তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্ স্টেট্ যে ঘোষণা পাঠ করে শুনান, তাতে ভারত উপমহাদেশে একটি দায়িত্বশীল সরকারের ক্রমপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু ১৯১৯ সালে যে মন্টেগু চেমস্ ফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়, তা ছিল লক্ষ্ণৌ চুক্তির বিশ্লেষিত দাবীসমূহের পটভূমিতে খুবই অপ্রতুল। এ সালের আর একটি বিধিবদ্ধ আইন, যা রাওলাট আইন বলে পরিচিত, ভারতীয়গণকে বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ করে। এ আইনে জুরীর পরামর্শ ব্যতিরেকেই রাষ্ট্রবিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সরকারকে দেয়া হয়েছিল। ভারতে যে কোন আন্দোলন দমন করার জন্যেই যে এ আইন পাশ করা হয়েছিল, তা আর কারো বুঝতে বাকী রইলো না। যুদ্ধকালীন অকুণ্ঠ সমর্থনের এই পুরস্কার দেয়া হলো ভারতবাসীকে। এ আইন পাশ হলো ১৮ই মার্চ, গান্ধী তার প্রতিবাদে দেশব্যাপী হরতাল আহবান করলেন ৩০শে মার্চ। হরতাল করতে গিয়ে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হলো পাঞ্জাবে। তার ফলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হলো জালিয়ানওয়ালাবাগে। জেনারেল ডায়ার নির্মমভাবে ১৬৫০ রাউণ্ড গুলী চালিয়ে ৩৭৯ জনকে নিহত ও ১১৩৭ জনকে আহত করে এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের এক অতি কলংকময় অধ্যায় সংযোজন করে।

খেলাফত আন্দোলন

এসব ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত খেলাফত আন্দোলন। তবে এ সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলে রাখা দরকার। ভারতীয় মুসলমানরা এ দেশের শাসনক্ষমতা হারিয়ে মনোবেদনা ও আত্মাভিমানে দিন কাটাচ্ছিল। তারা তাদের এ

মনোবেদনায় কিছুটা সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করেছিল তুরস্কের সুলতানকে অবলম্বন করে। তুরস্ক শুধু মুসলিম রাষ্ট্রমাত্র ছিলনা, বরঞ্চ তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম জাহানের খলিফা ও মুসলিম জাহানের ঐক্যের প্রতীক মনে করা হতো। অবশ্য যতোদিন ভারতে মুগল সাম্রাজ্য শক্তিশালী ছিল, ততোদিন তুরস্কের সুলতানকে এ মর্যাদা দেয়া হয়নি। যাহোক, পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে প্যানইসলামী চেতনা তুরস্ককে মুসলিম ঐক্যের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ব্রিটিশের বিপক্ষ দলে যোগদান করে। ভারতীয় মুসলমান আশা করেছিল, ব্রিটিশকে তাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের কারণে তুরস্ককে কোন প্রকার শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে। লয়েড্ জর্জ সে ধরনের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের ঐক্যপ্রতীক বিনষ্ট করাই ছিল ব্রিটিশের উদ্দেশ্য। তার জন্যেই লরেন্সকে পাঠানো হয় আরবদের মধ্যে আরব জাতীয়তার বিষাক্ত মন্ত্রপ্রচারক হিসাবে। মক্কার শেরিফ শরীফ হুসাইন হাশেমী লরেন্সের প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে 'আরবদের জাতীয় স্বাধীনতার' নামে বিশ্বমুসলিম ঐক্য উপেক্ষা করে মুসলমানদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ শুরু করে এবং এভাবে তুরস্কের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করে। ভাষাভিত্তিক সংকীর্ণ আঞ্চলিক জাতীয়তার বিষবাষ্পে তুরস্কের সুলতানাত তথা মুসলিম বিশ্বের ঐক্যপ্রতীক বিনষ্ট করাই ছিল ব্রিটিশের লক্ষ্য এবং তা ফলপ্রসূ হলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সম্মিলিত শক্তির জয় হলো এবং তারা যুদ্ধে জয়ী হবার সাথে সাথেই একটি গোপন চুক্তির মাধ্যমে বিরাট তুরস্ক সাম্রাজ্যকে বাঁদরের পিঠা বন্টনের ন্যায় ভাগ বন্টন করে ফেলে। ১৯১৯ সালের মে মাসে উস্‌মানী রাজধানীতে নামসর্বস্ব সুলতান রয়ে গেলো। আল্‌জিরিয়া থেকে বাহ্‌রাইন পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল খণ্ডবিখণ্ড করে ফ্রান্স, গ্রীস ও বৃটেনের মধ্যে বিতরণ করা হলো।

এভাবে উস্‌মানীয়া রাষ্ট্রকে খণ্ডবিখণ্ড করার কারণে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ভারতের ভাইসরয়ের কাছে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর এবং সাইয়েদ সুলায়মান নদ্‌ভী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধি দল লন্ডন গমন করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকটে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। প্রত্যুত্তরে বলা হলো যে, শুধু তুরস্কের ভূখণ্ড ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল তুরস্ককে দেয়া যাবে না। তার জন্যে তুরস্কের খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে ভারতে শুরু হয় প্রচণ্ড খেলাফত আন্দোলন।

ভারতে শক্তিশালী খেলাফত কমিটি গঠিত হলো। মুসলমানদের দেড় শতাব্দী ব্যাপী পুঞ্জিভূত ব্যথা-বেদনা খেলাফত সংকটকে সম্মুখে রেখে প্রচণ্ড বিক্ষোভের অগ্নিশিখা লেলিহান করে। মুসলিম মানসের জাগরণ প্রচেষ্টার পথিকৃৎ ছিলেন মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর। তিনি ছিলেন 'মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলাম' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদিশারী। তিনি Comrade নামক একটি ইংরেজী পত্রিকার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ সঞ্চারে সচেষ্ট ছিলেন। খেলাফত আন্দোলনে সাড়া দেয়াকে তিনি প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য বলে উল্লেখ করেন।

কংগ্রেস ও কংগ্রেস সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ্ খেলাফত আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করলো। ১৯১৯ সালের ১০ই আগষ্ট সারা দেশে খেলাফত দিবস পালনের আহবান জানানো হলো। সারাদেশে হরতাল, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সভাসমিতির মাধ্যমে অভূতপূর্ব ও অপ্রতিহত প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হলো। এক মাসের মধ্যে বিশ হাজার মুসলমান কারাদণ্ডের জন্যে নিজেদেরকে পেশ করলো। হাটে ঘাটে মাঠে, শহরে বন্দরে গ্রামেগঞ্জে মানুষের মুখে শুধু খেলাফত আন্দোলনের কথা এবং তার জন্যে যে কোন ত্যাগ ও কুরবানী করার প্রস্তুতি।

নভেম্বর মাসে দিল্লীতে খেলাফত কমিটির অধিবেশন শুরু হয়। মিঃ গান্ধী এতে যোগদান করেন। তিনি তার বক্তৃতায় ব্রিটিশ সরকারের সাথে 'অসহযোগিতার' নীতি অবলম্বনের পরামর্শ দেন।

১৯২০ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত খেলাফত কমিটির সম্মেলনে 'অসহযোগ আন্দোলন' (Non-Cooperation Movement) করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তীব্রতর হতে থাকে।

আমি বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত পল্লীর বিদ্যালয়ে ১৯২২ সালে সর্বপ্রথম হাতেখড়ি গ্রহণ করি। যতোটা মনে পড়ে, সেই শৈশবকালে দেখেছি ছাত্র শিক্ষক, চাষীমজুর ও ইতরভদ্রের মধ্যে খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্পে আপামর জনসাধারণ সুদৃঢ় ও অবিচল। যে কোন ত্যাগ স্বীকার এবং হাসিমুখে জীবন দান করতে সদাপ্রস্তুত।

কিন্তু এতকিছুর পরেও এ প্রাণবন্ত খেলাফত আন্দোলন অপমৃত্যুর সম্মুখীন হয়। তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে ইংরেজদের হাত হতে বহু অঞ্চল পুনর্দখল করেন। তুর্কীজাতিকে করেন ঐক্যবদ্ধ এবং তুরস্ককে পুনরায় গৌরবের মর্যাদায় ভূষিত করেন। কিন্তু ক্ষমতা লাভ করার সাথে সাথেই ১৯২২ সালের নভেম্বরে সুলতান মুহাম্মদ হাশেমকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে তুরস্কের সর্বশেষ ও কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ খলিফা সুলতান আবদুল মজিদকে দেশ থেকে নির্বাসিত করে খেলাফতের উচ্ছেদ সাধন করেন। ভারতে খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে নেমে আসে হতাশা। ডক্টর মঈনুল হক বলেন, "ভারত উপমহাদেশে খেলাফত আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট মুসলমানদের প্রাণে চরম আঘাত করে কামাল আতাতুর্কের পদক্ষেপ। সকলের চেয়ে বেশী প্রাণে আঘাত পান মওলানা মুহাম্মদ আলী। কারণ তিনিই ছিলেন এ আন্দোলনের উৎস ও প্রাণকেন্দ্র। যে শরীফ হুসাইন ছিল ব্রিটিশের তাবেদার এবং যে তার কার্যকলাপের দ্বারা মুসলিম বিশ্বের নিকটে অপ্রিয় হ'য়ে পড়েছিল, সে এখন খেলাফতের দাবীদার বলে ঘোষণা করলো। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ তাকে কোন প্রকার সাহায্য করলোনা। ওদিকে ওহাবী নেতা ইবনে সউদের অভিযান ব্যাহত করার শক্তিও তার হলোনা। বছর শেষ হবার সাথে সাথেই ইবনে সউদ মক্কা ও তায়েফের উপর অভিযান চালিয়ে তা হস্তগত করেন এবং এভাবে হেজাজের অধিকাংশ অঞ্চলের উপরে তিনি অধিকার বিস্তার করেন।"

—(Dr. Moyenal Huq, History of Freedom Movement Vol.-III, Part 1; আবুল আফাক— একটি জীবন, একটি চিন্তাধারা, একটি আন্দোলন- (উর্দুগ্রন্থ), পৃঃ ৬৯)

হিজরত আন্দোলন

খেলাফত আন্দোলনের সময়ে ভারতে হিজরত আন্দোলন শুরু হয়। মওলানা আবুল কালাম আজাদ রাঁচী জেল থেকে মুক্তিলাভের পর হিজরত আন্দোলন শুরু করেন। আলেমগণ ফতোয়া দেন যে ভারত দারুল হরব এবং এখান থেকে হিজরত করে কোন দারুল ইসলামে যেতে হবে। আফগানিস্তানের বাদশাহ আমীর আমানুল্লাহ্ খান এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, "ভারতীয় মুসলমানগণ

হিজরত করে অবশ্যই আমাদের দেশে আসতে পারেন।" মওলানা আজাদের প্রস্তাবে একেবারে চক্ষু বন্ধ করে মুসলমানগণ হিজরতের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়। দিল্লীতে হিজরত কমিটি প্রতিষ্ঠিত হলো এবং যথারীতি অফিস খোলা হলো। এ আন্দোলনের ফলে, যার প্রেরণাদানকারী ছিলেন স্বয়ং মওলানা আবুল কালাম আজাদ, হাজার হাজার মুসলমান তাদের যথাসর্বস্ব বিক্রি করে আফগানিস্তানের পথে রওয়ানা হলো। ১৯২০ সালের কেবলমাত্র আগস্ট মাসেই আঠারো হাজার লোক হিজরত করে চলে যায়। পাঁচ লক্ষ থেকে বিশ লক্ষ মুসলমান এ আন্দোলনের ফলে বাস্তুহারা হয়েছে এবং তাদের ভাগ্যে জুটেছে বর্ণনাতীত দুর্গতি।

কিন্তু এ আন্দোলনের মূলে ছিল নিছক একটি ঝোঁকপ্রবণতা। কোন একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়াই এবং হিজরতের ফলাফল বিচার বিশ্লেষণ না করেই এ আন্দোলনে ঝাঁপ দেয়া হয়েছিল।

আলী সুফিয়ান আফাকী বলেন, "মওলানা মওদূদী এবং তাঁর ভাই হিজরত করতে মনস্থ করেন। হিজরত কমিটির সেক্রেটারী মিঃ তাজাম্মল হোসেন ছিলেন তাঁদের আত্মীয়। তিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে হিজরতের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু আলোচনায় জানা গেল যে হিজরত কমিটির এ ব্যাপারে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই। দলে দলে লোক আফগানিস্তানে চলে গেলেও আফগান সরকারের সাথে এ ব্যাপারে কোন কথা বলা হয়নি। মুফতী কেফায়েতুল্লাহ্ ও মওলানা আহমদ সাঈদ এ ব্যাপারে ছিলেন অগ্রগামী। মওদূদী সাহেব এ দুজনের সাথে দেখা করে একটি পরিকল্পনাহীন আন্দোলনের ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি অংগুলি সংকেত করেন। তাঁরা ত্রুটি স্বীকার করার পর মওদূদী সাহেবকে একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যে অনুরোধ করেন। মওদূদী সাহেব বলেন যে, সর্বপ্রথম আফগান সরকারের নিকটে শুনতে হবে যে তাঁরা হিন্দুস্তান থেকে হিজরতকারীদের পুনর্বাসনের জন্যে রাজী আছেন কিনা এবং পুনর্বাসনের পন্থাই বা কি হবে। আফগান রাষ্ট্রদূতের সংগে আলাপ করা হলো। তিনি বলেন যে 'তাঁর সরকার বর্তমানে খুবই বিব্রত বোধ করছেন। যাঁরা আফগানিস্তানে চলে গেছে তাদেরকে ফেরৎ পাঠাতে অবশ্য সরকার দ্বিধাবোধ করছেন। কিন্তু তথাপি তাদের বোঝা বহন করা সরকারের সাধ্যের অতীত।' এভাবে হিজরত প্রশ্নটির এখানেই সমাপ্তি ঘটে।"

—(আবুল আফাকঃ 'একটি জীবন, একটি চিন্তাধারা একটি আন্দোলন', পৃঃ ৭৭–৭৮)।

এভাবে ভারতে খেলাফত আন্দোলন ও হিজরত আন্দোলনের প্রবল গতিবেগ হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেল এবং দুটি আন্দোলনই ব্যর্থ হলো। এ ব্যর্থতার জন্যে ভারতীয় মুসলমানরা দায়ী ছিলনা মোটেই। তুরস্কের জন্যেই তাদের এ ব্যর্থতা। কামালপাশা শুধু খেলাফতেরই অবসান করেননি। দু'বছর পর খলিফাকেও নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। ভারতে খেলাফত আন্দোলনকে উপলক্ষ করে যে লেলিহান শিখা জ্বলে উঠে ভারত সরকারকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল তা অনেকটা ধূম্রজালের ভিতর দিয়েই নিতে গেল মুসলমানদের আশা ও উদ্দীপনাকে চূর্ণ–বিচূর্ণ করে।

এ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে হিন্দু–মুসলমানের মধ্যে যে ঐক্যপ্রচেষ্টা চলছিল, আন্দোলনের ব্যর্থতার সাথে তাও ব্যর্থ হ'য়ে গেল। হিন্দু–মুসলমানের মধ্যে আবার শুরু হলো রক্তাক্ত সংঘর্ষ। খেলাফত আন্দোলনে গান্ধীর সহযোগিতার মধ্যে আন্তরিকতা থাক বা না থাক, এ আন্দোলনকে মন দিয়ে সমর্থন কংগ্রেসের অনেক হিন্দু সদস্যই করতে পারেননি। তাঁদের অনেকের মনেই এ প্রশ্ন ছিল যে মুসলমানদের খেলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাদের কি লাভ। তাই খেলাফত আন্দোলন তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ প্রবণতা কিছু দিনের জন্যে দাবিয়ে রাখলেও খেলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মসজিদের সামনে জোরজবরদস্তি বাজনা বাজানোর উপলক্ষ করে, দাংগা–হাংগামার সূত্রপাত করলো তারা এবং এ দাংগা রক্তাক্ত সংঘর্ষের রূপ ধারণ করে চারদিকে বিস্তার লাভ করতে লাগলো। সম্প্রদায়গত পার্থক্যটা তাদের মধ্যে স্পষ্টতর হতে লাগলো। বিগত দেড় শতাব্দীর অবহেলিত ও পশ্চাদপদ মুসলমান জীবনক্ষেত্রে কোন সুযোগ সুবিধা চাইতে গেলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী সম্প্রদায়ের সাথে বিরোধ হ'য়ে পড়তো অপরিহার্য। বাংলার হিন্দু জমিদারগণ এবং পাঞ্জাবের ব্যবসায়ীগণ এ সময়ে তাদের মুসলমান প্রজা ও খাতকদের উপর চরম নির্যাতন শুরু করেছিল। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন মানুষের মনে যে বিক্ষোভ প্রকাশের প্রেরণা জাগিয়েছিল, আন্দোলন দুটি স্তব্ধ হ'য়ে যাওয়ার পর সে বিক্ষোভ প্রেরণা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে প্রকাশ লাভ করলো।

মোপলা বিদ্রোহ

খেলাফত আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত তৎকালীন মোপলা বিদ্রোহ। এই মোপলা বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ শাসকদের হিংস্ররূপ যেমন একদিকে পরিস্ফুট হয়েছে, তেমনি মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদেরও হিংসাত্মক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

গ্রন্থের প্রারম্ভে মোপলাদের কিছু পরিচয় দেয়া হয়েছে। তারা ছিল দাক্ষিণাত্যের মালাবার অঞ্চলের মুসলমান অধিবাসী, তারা নিজেদেরকে আরব বণিকদের বংশসম্ভূত বলে দাবী করে। তারা ছিল অত্যন্ত সাহসী ও ধর্মভীরু। তারা ইংরেজদের দ্বারা শোষিত নিষ্পেষিত হওয়ার কারণে ১৮৭৩, ১৮৮৫, ১৮৯৪ এবং ১৮৯৬ সালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে ব্রিটিশদের হাতে বার বার নির্যাতিত হয়। চাষ ও মৎস্য ব্যবসা ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। শিক্ষাদীক্ষায় তারা ছিল অনগ্রসর এবং হিন্দু জমিদার, মহাজন ও তহসিলদার তাদের উপর চরম অত্যাচার উৎপীড়ন করতো। ব্রিটিশ শাসকদের কাছে আবেদন নিবেদন করেও তারা কোন ফল পায়নি। অতএব তাদের নির্যাতনের কাহিনী দীর্ঘদিনের। ব্রিটিশ ও হিন্দু জমিদার মহাজনের নিষ্পেষণে তারা যুগ যুগ ধরে ধুঁকে ধুঁকে মরছিল। তারপর বিংশতি শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষে ভারতে শুরু হলো খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। এ আন্দোলনের ঢেউ মালাবারেও গিয়ে পৌঁছলো। আগেই বলা হয়েছে মোপলাগণ ছিল স্বাধীনচেতা, সাহসী ও ধর্মভীরু। ইসলামী খেলাফতের পুনরুদ্ধার ও সেইসংগে ভারতে স্বাধীনতা অর্জনের ফলে তাদের দীর্ঘদিনের নির্যাতন নিষ্পেষণের অবসান হবে মনে করে তারাও প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে। তারপরই তাদের সংঘর্ষ শুরু হয় শাসকদের বিরুদ্ধে। প্রতিবেশী হিন্দু জনসাধারণ তাদের দমন করার কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করে শাসকশ্রেণীকে। ফলে মোপলাদেরকে একসংগে শাসকগোষ্ঠী ও হিন্দুসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়।

মোপলা দমন করতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকার যে বর্বরতা ও নৃশংসতা প্রদর্শন করেছিল, সে লোমহর্ষক ও মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণনা করার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চলাকালে সরকার সমগ্র মালাবারে জনসভার অনুষ্ঠান, বাইর থেকে সংবাদ ও সংবাদপত্রের প্রবেশ এবং মালাবার থেকে

বাইরে বিনা সেন্সারে সংবাদাদি, টেলিগ্রাম ও পত্রাদি প্রেরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মালাবারকে এক লৌহ যবনিকার অন্তরালে রাখা হয়। তবুও যদি কোন প্রকারে তাদের নির্যাতনের কাহিনী বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং বহির্জগতের মানুষ বিশেষ করে মুসলমান তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে, তার জন্যে মোপলাদের বিরুদ্ধেই স্বার্থান্ধ মহল তীব্র প্রচারণা শুরু করে। সেসব প্রচারণা ছিল অমূলক, বানোয়াট ও কল্পনাপ্রসূত। ১৯২২ সালে সাহরানপুর ও অমৃতশহর থেকে হিন্দুদের দ্বারা দু'খানি প্রচার পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

অমৃতশহর থেকে প্রকাশিত 'দাস্তানে জুলুম' শীর্ষক পুস্তিকায় মোপলাদের পক্ষ থেকে হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার–কাহিনী বর্ণনা করে হিন্দু সম্প্রদায়কে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, হিন্দু নারী হরণ, বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতকরণ প্রভৃতি অভিযোগ করা হয় মোপলাদের বিরুদ্ধে। বিবরণে বলা হয়েছে যে—উৎপীড়নের শিকার যদি হিন্দু পুরুষ হয় তাহলে তাকে প্রথমতঃ গোসল করিয়ে তার মুসলমানী ধরনে চুল কেটে দেয়া হয় অতঃপর তাকে মসজিদে নিয়ে কালেমা পাঠ করতে বাধ্য করা হয়, খৎনা করানো হয় এবং মুসলমানী পোষাক পরিধান করানো হয়। মহিলা হলে শুধু তাকে এক ধরনের রঙিন মোপলা পোষাক পরিধান করানো হয় এবং এক ধরনের কানবালা পরিয়ে দেয়া হয়।

সাহরানপুর থেকে প্রকাশিত 'মালাবার কি খুনী দাস্তান' পুস্তিকায় বলা হয়েছে যে, মোপলাগণ প্রতিবেশী হিন্দুদেরকে খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের আহবান জানায়। যোগদান করলে ভালো, নচেৎ অস্বীকারকারীকে মোপলাদের ঘরে আবদ্ধ করে তাকে বলপ্রয়োগে গোমাংস ভক্ষণ করানো হয়। অতঃপর তার আত্মীয় স্বজনকে তার সম্মুখে হত্যা করা হয়। এতেও রাজী না হলে তাকে হত্যা করে তার খণ্ডবিখণ্ড মৃতদেহ কোন কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার বাড়ীঘর ভস্মীভূত করা হয়।

একদিকে যেমন হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রচেষ্টা চলছিল, হিন্দু-মুসলিমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের মনমানস তৈরীর কাজ চলছিল, অপরদিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়কে ক্ষিপ্ত করে শুধু খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন থেকেই তাদেরকে নিবৃত্ত করা হচ্ছিল না, বরং সারাদেশে পাইকারী হারে

মুসলিম নিধনযজ্ঞের আহবান জানানো হচ্ছিল। স্বাধীনতা অর্জন অপেক্ষা মুসলিম নিধন একশ্রেণীর লোকের কাছে অধিক প্রিয় ছিল। তাই তারা কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া বিষাক্ত করে তোলে, যার ফলে নতুন আকারে ভারতব্যাপী দাংগাহাংগামার সূত্রপাত হতে থাকে।

এসব মারাত্মক প্রচারণা খেলাফত আন্দোলনকারী মুসলমানদের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। কেন্দ্রীয় খেলাফত কমিটি মোপলাদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্যে একটি কমিটি নিয়োগ করে পাঠান এবং তারা যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে মোপলা বিদ্রোহের জন্যে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদেরকে প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ দায়ী করেন। তারা বলেন যে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও শান্ত ছিল এবং বিদ্রোহের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয়নি। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের ন্যায় মোপলা মুসলমানগণও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করে এবং স্থানীয় সরকার তা কঠোর হস্তে দমন করার জন্যে উঠেপড়ে লাগে। পুলিশের বর্বরতা তাদেরকে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করে। সংঘর্ষের সূচনা এভাবে হয় যে, স্থানীয় খেলাফত কমিটির সেক্রেটারীকে পুলিশ গ্রেফতার করে একটি গাছের সাথে বেঁধে রাখে। অতঃপর তার স্ত্রীকে তাঁর সম্মুখে এনে বিবস্ত্র করা হয় এবং তিনি অসহায়ের ন্যায় সেদিকে তাকিয়ে থাকেন। পুলিশের এমন ধরনের অশ্লীল আচরণ আদিম যুগের বর্বরতাকেও ম্লান করে দেয়। তারপর তুচ্ছ অপরাধের জন্যে মোপলাদের জনৈক শ্রদ্ধেয় পীরের মুখে একজন পুলিশ কনস্টেবল চপেটাঘাত করে। অতঃপর অন্য একজন খেলাফত কর্মীকে অস্ত্র নির্মাণের কল্পিত অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। অবশেষে পুলিশ মোপলাদের বাড়ীঘরের উপর চড়াও হয়, তাদের যাবতীয় জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে এবং কোথাও বাড়ীর লোকজনের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। এতেও নিরস্ত না হয়ে তারা মোপলাদের উপর বেপরোয়া গুলীবর্ষণ করে। মোপলাগণ স্বভাবতঃই ছিল স্বাধীনচেতা, সাহসী ও বীর যোদ্ধা। তাদের উপর যখন এরূপ নির্মম অত্যাচার চালানো হয়, তখন তারা মরণপণ করে পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়। অতঃপর যে সংগ্রাম শুরু হয়, সে সংগ্রামে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মিলিত শক্তি পরাজয় বরণ করে এবং কর্মস্থল থেকে বিতাড়িত হয়। তারা বহু অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে পলায়ন করে। অতঃপর পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে মোপলাদের আয়ত্তাধীন হয়। এযাবত হিন্দুদের সাথে

তাদের সম্পর্ক ছিল ভালো। উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে মোপলাগণ হিন্দুদের জীবন ও ধনসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। ১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে মোপলাগণ দস্তুরমত স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই মোপলাগণ ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে এরনা এবং ওয়ালুভানাদ নামক দুটি বৃহৎ তালুক ছিনিয়ে নিয়ে সেখানে একটি স্বাধীন খেলাফত রাজ্য স্থাপন করে।

দু'সপ্তাহ পরে ব্রিটিশ সরকার মালাবারে শত শত সৈন্য, ছোটবড়ো ট্যাংক, কামান, বোমা, কয়েকখানি গানবোট এবং রণপোত প্রেরণ করে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে যেন কোন বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে এক মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। প্রথম সংগ্রামের সময় পুলিশের ন্যায় কয়েকজন অত্যাচারী জমিদার মহাজন জনতার রুদ্ররোষে পড়ে প্রাণ হারায়। ব্রিটিশ সরকার একে সম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে হিন্দুদেরকে মোপলাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তখন হিন্দু জনসাধারণ ও জমিদার মহাজন সৈন্য ও পুলিশের সহায়তায় এগিয়ে আসে। হিন্দুদের অধিকাংশই মোপলাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি শুরু করে এবং অন্যায়ভাবে তাদেরকে ধরিয়ে দিতে থাকে। ফলে ব্রিটিশ এবং হিন্দু উভয়ের বিরুদ্ধেই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু হতভাগা মোপলাগণ বিরাট সুসংহত ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে কতক্ষণই বা লড়তে পারে? ভারত থেকে আর্যসমাজের শত শত স্বেচ্ছাসেবক সাহায্য বিতরণের নাম করে মালাবারে গিয়ে পুলিশ ও সৈন্যদেরকে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকে।

মোপলাগণ অসীম সাহসিকতার সাথে একমাস কাল ব্রিটিশ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম চালায়, সরকার মোপলা এলাকাসমূহের উপর আকাশ থেকে বোমা, রণতরী ও কামান থেকে নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করে প্রায় দশ হাজার নরনারীর প্রাণনাশ করে, তাদের বাড়ীঘর, দোকান পাট ও ক্ষেতখামার ধ্বংস্তূপে পরিণত করে। তারপর হিন্দু জনসাধারণের সহায়তায় শুরু হয় পাইকারী হারে ধরপাকড়, পৈশাচিক অত্যাচার ও নির্যাতন। সরকারের পৈশাচিকতা ও বর্বরতার দৃষ্টান্ত একটি ঘটনার দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় একশ' জন বিশিষ্ট মোপলা নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে একটি মালগাড়ীতে বোঝাই করা হয় এবং দরজা বন্ধ করে তাদেরকে কালিকট প্রেরণ করা হয়। গন্তব্যস্থানে দরজা খোলা হলে দেখা গেল ষাটজন মৃত্যুবরণ করেছে এবং

অবশিষ্টজন মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছে। তাদের মৃতদেহের প্রতিও কোন সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি, মানুষের প্রতি মানুষের এ ধরনের পৈশাচিক ও নৃশংস ব্যবহার সভ্যযুগে ত দূরের কথা আদিম যুগের ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ ও সৈন্যদের অত্যাচার নির্যাতনের পর যারা বেঁচে রইলো তাদের বিচার শুরু হলো। প্রায় বিশ হাজার মোপলা নরনারীকে গ্রেফতার করা হয়। জেল হাজতেও এদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। তাদের বিচারের জন্যে সরকার স্পেশাল কোর্ট গঠন করে। বাইরে থেকে কোন আইনজীবীকে মালাবারে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি বলে হতভাগ্য মোপলাগণ আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ পায়নি। বিচার চলাকালে বিচারাধীন আসামীদের ঘরে ঘরে অন্নবস্ত্রের হাহাকার শুরু হয়। অন্নাভাবে বহু নরনারী ও শিশু মৃত্যুবরণ করে। এ সময়ে উৎপীড়িতের মর্মন্তুদ হাহাকার ও ক্রন্দন রোলে মালাবারের আকাশ বাতাস ধ্বনিত ও মথিত হয়। প্রায় এক হাজার লোকের প্রাণদন্ড হয়। যাবজ্জীবন কারাদন্ড, দীর্ঘমেয়াদী সশ্রম কারাদন্ড প্রাপ্ত ও দ্বীপান্তরিত মোপলার সংখ্যা দু'হাজারের উপর। অতি অল্প সংখ্যক মোপলাকে খালাস দেয়া হয়। পাঁচ থেকে দশ বছর সশ্রম কারাদন্ড লাভ করেছিল প্রায় আট হাজার মোপলা। অবশিষ্টদের মধ্যে কারও কারাদণ্ড ছয় মাসের কম ছিলনা। উপদ্রুত এলাকাসমূহের মসজিদগুলির প্রায় সকল ইমামই রাজদ্রোহিতায় অভিযুক্ত হন। এভাবে মসজিদগুলিকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হয়। দন্ডপ্রাপ্ত মোপলাগণ দ্বীপান্তরে কয়েক বৎসর বর্ণনাতীত দুঃখকষ্ট ভোগ করার পর সরকার তাদের পরিবারবর্গকে আন্দামান গিয়ে তাদের সংগে বসবাসের অনুমতি দেয়। এভাবে মালাবার থেকে মোপলাদের একেবারে প্রায় উচ্ছেদ করে ব্রিটিশ সরকার আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

ভারতের খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাসে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মোপলাদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের কাহিনী সর্বাপেক্ষা মর্মন্তুদ ও হৃদয়স্পর্শী। গান্ধী ও কংগ্রেস এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করে।

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল প্লাবনে সে সময়ে মুসলিম জীবন্মৃত অবস্থায় ছিল এবং তাদের ক্ষীণকণ্ঠের আওয়াজ ব্রিটিশ সরকারের কর্ণকুহরে পৌঁছায়নি। বহু কষ্টে একমাত্র খেলাফত কমিটি অসহায় মোপলাদের কিছু

সাহায্যদান করতে পেরেছিল। নতুবা আরও বহু মোপলা নরনারী ও শিশু অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। মোপলাদের প্রতি কংগ্রেসের আচরণে কংগ্রেসের বহু মুসলিম সদস্য বেদনাবোধ করে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তাদের ধারণা মোপলাদের উপর নির্যাতনের প্রতি কংগ্রেসের সমর্থন ছিল বলেই কংগ্রেস নীরবতা অবলম্বন করে।

ব্রিটিশ সরকার ও হিন্দু মুসলিমকে পাশাপাশি রেখে বিগত কয়েক শতাব্দীর ভারতের ইতিহাস আলোচনা করে একথাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ ও হিন্দুসম্প্রদায় মুসলমানদের পরম শত্রুরূপে তাদের ভূমিকা পালন করতে কোন দিক দিয়ে ত্রুটি করেনি। এ উপমহাদেশ থেকে মুসলিম জাতির উচ্ছেদ সাধনই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। পরবর্তী ইতিহাস আলোচনায় এ সত্য অধিকতর সুস্পষ্ট হবে।

(Muslim Separatism in India, Abdul Hamid এবং আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, মুহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ দ্রষ্টব্য)।

চরম নৃশংসতার সাথে মোপলা বিদ্রোহ দমন, খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং মোপলাদের প্রতি কংগ্রেস ও গান্ধীর সম্পূর্ণ উদাসীনতা হিন্দুমুসলিম সম্পর্কে পুনরায় ফাটল সৃষ্টি করে। ১৯২৪ সালে মিঃ গান্ধী কর্তৃক প্রেরিত ডাঃ মাহমুদ মালাবারের হিন্দুসম্প্রদায়ের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গান্ধীকে যে রিপোর্ট দেন তাতে বলা হয় যে মোপলাদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের অভিযোগ অতিমাত্রায় অতিরঞ্জিত। হিন্দুদের বিরুদ্ধেও মোপলাদের অভিযোগ আছে। হিন্দুদেরকে বলপ্রয়োগে মুসলমান করার অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। তদুত্তরে গান্ধী বলেন, "প্রকৃত সত্য কারোই জানা নেই।"

—(The Indian Quarterly Register, 1924, Vol. 1, No. 2, p. 645; Muslim Separatism in India, A Hamid. p. 160)

গান্ধীর উপরোক্ত উক্তিতে এ কথারই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুসলমানদের কোন কথাই তাঁর বিশ্বাস্য নয় এবং হিন্দু যা কিছুই বলুক তা তিনি বেদবাক্যরূপে গ্রহণ করতে রাজী।

এসব দুঃখজনক ঘটনার পর যা ঘটলো, তা অধিকতর দুঃখজনক। ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুলতানে মহররমকে কেন্দ্র করে হিন্দুরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়। পরের বছর অবস্থার চরম অবনতি ঘটে সাহরানপুরে যেখান

থেকে—আগের বছর 'মালাবার কি খুনী দাস্তান' শীর্ষক পুস্তিকা বিতরণের মাধ্যমে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয়া হচ্ছিল। সাহরানপুরের এ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ৩০০ জন নিহত হয় এবং তার অধিকাংশ ছিল মুসলমান। ১৯২৪ সালে বিভিন্ন স্থানে ১৮টি দাংগাহাংগামা সংঘটিত হয়। এ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দ্রুত গতিতে বিহার ও বাংলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করে।

ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের উপর সুপরিকল্পিত হামলা

ভারতীয় মুসলিম লীগ ক্রমশঃই তাদের জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলছিল। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে তারা জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে আগেই পিছিয়ে পড়েছিল। সারাদেশে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাংগাহাংগামার সময় পুলিশ সাহায্যপুষ্ট হিন্দুদের সাথে তারা পেরে উঠছিল না। অতএব হাংগামায় মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য সাহায্য করাও তাদের সাধ্যের অতীত ছিল। এদিকে অহিংসাবাদী ও সাম্প্রদায়িক মিলনে আস্থাবান বহু কংগ্রেসী সদস্য দাংগা-হাংগামায় উস্কানী দিতে থাকায় কংগ্রেসও মুসলমানদের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়ে। মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক মিলনের আশায় অতিরিক্ত উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে ইসলামের চিরাচরিত নীতি ভংগ করে। আর্যসমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে তারা দিল্লী জামে মসজিদের পবিত্র মিম্বর থেকে বক্তৃতা করার অনুমতি প্রদান করে। মসজিদের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করে তাঁকে তথা হিন্দুসমাজকে মুসলমানরা যে অভূতপূর্ব উদারতা প্রদর্শন করলো তার প্রতিদান স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এমনভাবে দিলেন যে তা বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসে এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে অটুট রইলো।

উল্লেখ্য যে এই আর্যসমাজী নেতা কংগ্রেসেরও একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। লাহোর জেলে থাকাকালীন পাঞ্জাবের জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর সাথে তাঁর গোপন শলাপরামর্শ হয় এবং মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই মুক্তিলাভ করেন। জেল থেকে মুক্তিলাভ করেই তিনি মুসলমানদেরকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার সংকল্প প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করে তাদেরকে এক নতুন অস্পৃশ্য নিম্নজাতিতে পরিণত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এভাবে মুসলমান জাতিকে একটা

অপবিত্র জাতির পর্যায়ে ঠেলে দিবার প্রচেষ্টায় তিনি মেতে উঠলেন। গুরগাও, আলোয়ার, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে বহু সংখ্যক অশিক্ষিত মুসলমানকে নানা প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন করে ধর্মান্তরিত করা হতে থাকে। ধর্মান্তরের পূর্বে মুসলমানদেরকে গোবরের পানি খেতে এবং গোবর পানিতে আপাদমস্তক ধুয়ে অবগাহন করতে বাধ্য করা হতো। বলপ্রয়োগে এভাবে নিরীহ ও নিরক্ষর মুসলমানদেরকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার কাজ পূর্ণউদ্যমে চলতে লাগলো।

মুসলমান এবং তাদের ধর্মের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের কোনকালেই কোন শ্রদ্ধার মনোভাব ছিলনা। নতুবা ইচ্ছা করলে এ ধর্মীয় উৎপীড়ন তারা অনায়াসেই বন্ধ করতে পারতো। কিন্তু তারা সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে রইলো। আর্যসমাজীদের এ অশুভ তৎপরতা, (সম্ভবতঃ কতিপয় শক্তিশালী ইংরেজ রাজকর্মচারীর ইংগিতে) মুসলমানদেরকে এতখানি বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে তুলেছিল যে, জনৈক আবদুর রশীদ প্রকাশ্য দিবালোকে শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করে এ অশুভ তৎপরতার সমাপ্তি ঘটায়। বিচারে এই অজ্ঞাতকুলশীল আবদুর রশীদের প্রাণদণ্ড হলে সে হাসিমুখে ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করলো।

এ ঘটনার পর স্বয়ং গান্ধীজি প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্মের প্রতি কটূক্তি করা শুরু করেন। তিনি প্রকাশ্যে জনসভায় বলতে থাকেন, "ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীকে হত্যা করার মন্ত্রে দীক্ষা দেয় এবং এটাকে মুসলমানরা মনে করে পরকালের মুক্তির উপায়।"

গান্ধীর উপরোক্ত উক্তিতে মুসলিম ভারত মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। মওলানা মুহাম্মদ আলী দিল্লীর জামে মসজিদে একদা বক্তৃতা প্রসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "গান্ধীজির এ উক্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া দরকার। কারণ তাঁর এ উক্তিতে ইসলামের পবিত্র ও মহান জেহাদের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে।"

অতঃপর মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী "আল জিহাদু ফিল্ ইসলাম" নামক একখানি অতীব যুক্তিপূর্ণ প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থে তিনি ইসলামের মূলনীতি, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, ইসলামী যুদ্ধ ও সন্ধি, আন্তর্জাতিক নীতি ও সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন এবং ইসলাম ও ইসলামী জেহাদ সম্পর্কে গান্ধীজি তাঁর উক্তির দ্বারা যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করেন তা খণ্ডন করা হয়।

এ গ্রন্থটি সম্পর্কে কিছু কথা পাঠকবর্গের গোচরীভূত করা অপ্রাসংগিক হবেনা বলে মনে করি।

এ বিরাট গ্রন্থখানির প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে ইসলামী জিহাদের মর্যাদা, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, সংস্কারমূলক যুদ্ধ, ইসলাম প্রচার ও তরবারী এবং যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে ইসলামী আইন কানুনের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের যুদ্ধ নীতি।

সপ্তম অধ্যায়ে বর্তমান সভ্যতার অধীনে পরিচালিত যুদ্ধ ও সন্ধিকে আলোচনার বিষয়বস্তু করা হয়েছে। এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, বিষয়টির ওপর এমন তথ্যবহুল, যুক্তিপূর্ণ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন ভাষায় কারো দ্বারা লিখিত হয়নি।

এ সম্মান আল্লাহ তায়ালা দান করেন, একমাত্র মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে।

আল্লামা ইকবাল গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৯২।

সংগঠন আন্দোলন

'সংগঠন আন্দোলনের' নেতা লালা হরদয়াল প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, মুসলমানদেরকে হয় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হতে হবে, নতুবা তাদেরকে পাততাড়ি গুটিয়ে ভারত ত্যাগ করতে হবে।

১৯২৫ সালে জনৈক হিন্দুনেতা সত্যদেব ঘোষণা করেন, "আমরা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে শক্তিশালী, তখন মুসলমানদের নিকটে নিম্ন শর্তাবলী পেশ করব ঃ

"কোরআনকে ঐশীগ্রন্থ হিসাবে মানা চলবে না, মুহাম্মদকে নবী বলেও স্বীকার করা হবে না। মুসলমানী উৎসবাদি পরিত্যাগ করে হিন্দু উৎসব অনুষ্ঠান পালন করতে হবে। মুসলমানী নাম পরিহার করে রামদীন, কৃষ্ণখান প্রভৃতি নাম রাখতে হবে। আরবী ভাষার পরিবর্তে হিন্দী ভাষায় উপাসনা করতে হবে।"

—(A History of Freedom Movement , Bengali Muslim Public

Opinion as Reflected in the Bengali Press—1901–30 Mustafa Nurul Islam.)

আর্যসমাজীদের শুদ্ধি আন্দোলনের সমসাময়িককালে ডঃ মুঞ্জে ও ভাই পরমানন্দ 'সংগঠন' আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন। ফলে বিভিন্নস্থানে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের উৎপত্তি হয়। অবস্থা চরম অবনতির দিকে ধাবিত হলে ডাঃ সাইফুদ্দীন কিচলু 'তানজীম' এবং আম্বালার সাইয়েদ গোলাম ভিক্ নায়রঙ্গ 'তাবলিগ' আন্দোলনসহ ময়দানে নেমে পড়েন। তাঁদের অক্লান্ত 'প্রচেষ্টায়, 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' আন্দোলনের মারাত্মক গতিবেগ খানিকটা প্রশমিত হয়।

কিন্তু হিন্দুদের অন্তর থেকে সাম্প্রদায়িক অগ্নিশিখা নির্বাপিত হয়নি কিছুতেই। লাহোরের রাজপাল নামক জনৈক আর্যসমাজী মুসলিম-বিদ্বেষাগ্নি পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করে। 'রঙ্গিলা রসূল' নামে একখানি পুস্তক সে প্রকাশ করে যার মধ্যে বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তাফার চরিত্রে জঘন্য ও কুৎসিত কলংক আরোপ করা হয়। এর দ্বারা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির উপর চরম আঘাত করা হয়। এবার ইলমুদ্দীন নামক জনৈক মুসলমান রাজপালকে হত্যা করে সহাস্যে ফাঁসীর মঞ্চে গমন করেন।

মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বাতন্ত্র দাবী

সাম্প্রদায়িক দাংগা-হাংগামার গতিবেগ প্রশমিত না হয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৯২৭ সালে কানপুরের মওলানা হসরত মোহানী ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বাতন্ত্রের দাবী সম্বলিত একটি প্রস্তাব সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে পেশ করেন। একে বলা যেতে পারে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রথম পথের দিশারী।

সর্বদলীয় সম্মেলন

এদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে মওলানা মুহাম্মদ আলী, মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খান, মিসেস সরোজিনী নাইডো, রাজা গোপালাচারিয়া, ডাঃ আনসারী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু দাংগা প্রতিরোধের কোন উপায় খুঁজে

পাচ্ছিলেন না। অবশেষে ১৯২৮ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে এক সর্বদলীয় সম্মেলন আহূত হয়। ভারতের নেতৃস্থানীয় হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্মেলনে যোগদান করেন। কংগ্রেসের বিদায়ী সভাপতি ডাঃ মুখতার আহমদ আনসারী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু উগ্রপন্থী হিন্দুদের হঠকারিতায় সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির আইন পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে তাদের প্রাপ্য আসন সংখ্যার কিছু সংখ্যক আসন অমুসলমানদেরকে ছেড়ে দিতে আগ্রহী হয় এবং এর বিনিময়ে কেন্দ্রীয় আইন সভায় তাদের ন্যায্য প্রাপ্য আসন অপেক্ষা শতকরা তিনটি আসন অতিরিক্ত দাবী করে। এ ছিল অধিক সংখ্যক আসন ছেড়ে দিয়ে কেন্দ্রে সামান্য কিছু লাভ করার দাবী। কিন্তু সম্মেলনের হিন্দু এবং শিখ নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে বৃহত্তর উদারতার বিনিময়ে সামান্য উদারতা প্রদর্শনের জন্যে মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর পুনঃ পুনঃ আবেদন ব্যর্থ হয়। ফলে সর্বদলীয় সম্মেলন কোন সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকেই চরম ব্যর্থতার সাথে শেষ হয়।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঐতিহাসিক চৌদ্দ দফা

মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথমে কংগ্রেসের একজন অতি উৎসাহী ও একনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন এবং তিনি ছিলেন হিন্দু মুসলিম মিলনের দূত। কিন্তু তাঁর দীর্ঘদিনের মিলন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি কংগ্রেসের হিন্দু সদস্যদের আচরণ এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের বৈরী নীতিতে অত্যন্ত ব্যথিত হন। অতঃপর ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেসের সাথে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কিন্তু ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ্যে কংগ্রেসের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকেন। এ সম্মেলনে হিন্দু ও শিখদের বিদ্বেষাত্মক মনোভাব লক্ষ্য করে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। তার পর পরই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম কনফারেন্সে তিনি তাঁর চৌদ্দ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। এ চৌদ্দ দফার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বোম্বাই থেকে সিন্ধুকে পৃথক করে সিন্ধুপ্রদেশ গঠন, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে শাসন সংস্কার

প্রবর্তন, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির আইন পরিষদে জনসংখ্যার অনুপাতে আসন বন্টন এবং দেশের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতিনিধি নির্বাচনে মুসলমানদের জন্যে পৃথক নির্বাচন প্রবর্তন। তখন থেকে মিঃ জিন্নাহ্ (পরবর্তীকালে কায়েদে আজম) কংগ্রেস বিরোধিতায় হ'য়ে পড়েন সোচ্চার। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে (Communal Award) 'চৌদ্দ দফার' অধিকাংশ দফা স্বীকৃতি লাভ করে। এ চৌদ্দ দফার বাইরে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ উড়িষ্যা এবং আসাম দুটি পৃথক প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে।

সাইমন কমিশন

ভারত শাসন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অথবা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৮ সালে ভারতে একটি রয়েল কমিশন প্রেরণ করেন। এ কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার জন সাইমন। কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য নেয়া হয়নি বলে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি এ কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত করে। কমিশনের সদস্যগণ বোম্বাইয়ে অবতরণ করলে তাঁদেরকে কৃষ্ণ পতাকা দেখানো হয়। যাহোক, সাইমন কমিশন লন্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠকের সুপারিশ পেশ করে।

গোলটেবিল বৈঠক

সাইমন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৩০ সালে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠক আহূত হয়। কংগ্রেস এ বৈঠকে যোগদান করা থেকে বিরত থাকে। আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন মওলানা মুহাম্মদ আলী, মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মিঃ এ, কে, ফজলুল হক, স্যার মুহাম্মদ ইসমাইল, আগা খান, স্যার আবদুল কাইয়ুম, স্যার আবদুল হালিম গজনবী, স্যার আকবর হায়দারী, স্যার মুহাম্মদ শফি, স্যার শাহ নওয়াজ ভুট্টু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মুসলিম সদস্যগণ লন্ডনে পৌঁছে মহামান্য আগা খানকে তাঁদের নেতা নির্বাচিত করেন।

প্রায় দু'মাসকাল বৈঠক স্থায়ী হয়। মওলানা মুহাম্মদ আলী ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে বৈঠকে যোগদান করেন এবং অসুস্থ অবস্থায় আসনে উপবেশন করেই তাঁর নব্বই

মিনিটব্যাপী দীর্ঘতম ভাষণ দান করেন। এই অগ্নিপুরুষের জ্বালাময়ী ভাষণ যেমন একদিক দিয়ে ছিল একটি উচ্চাংগের সাহিত্য, তেমনি অপর দিক দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম অবদান। তিনি সম্রাট পঞ্চম জর্জের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যে ভাষায় ব্রিটিশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন, তা শুধুমাত্র তাঁর মতো একজন নির্ভীক মুজাহিদের পক্ষেই ছিল সম্ভব। ভারতের স্বাধীনতা তাঁর কাছে ছিল জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু। তিনি তাঁর বক্তৃতার এক পর্যায়ে অতি আবেগময় কণ্ঠে বলেন, "আমি ভারতের স্বাধীনতার সারাংশ নিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে চাই। যদি তোমরা স্বাধীনতা না দাও, তাহলে তার পরিবর্তে এখানে আমার জন্যে রচনা করো সমাধি। কারণ একটি গোলামীর দেশে ফিরে যাওয়ার চেয়ে একটি স্বাধীন দেশে মৃত্যুবরণকে আমি শ্রেয়ঃ মনে করি।"

তাঁর এ আন্তরিকতাপূর্ণ উক্তি ছিল একটি ভবিষ্যদ্বাণী যা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হতে মোটেই বিলম্ব হলো না। তাঁকে আর তাঁর প্রিয় জন্মভূমিতে ফিরে আসতে হয়নি। ভারতের স্বাধীনতা হয়নি, হয়েছে তাঁর জীবনের অবসান লন্ডনের বুকেই ক'দিন পরে।

মওলানা মুহাম্মদ আলী বারবার কারাবরণ করে এবং দীর্ঘদিন কারাগারে অতিবাহিত করে একেবারে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু ভারতের কোটি কোটি নরনারীকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করে। ১৯৩০ সালে ৪ঠা জানুয়ারী তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং এ নিদারুণ সংবাদ তড়িৎগতিতে সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর সুধী সমাজ মর্মাহত হয়ে ভারতের এ সিংহপুরুষের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে তারবার্তা প্রেরণ করতে থাকেন।

মওলানা মুহাম্মদ আলীর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁর মৃতদেহকে পরাধীন ভারত ভূমিতে না এনে বায়তুল মাকদেসে অবস্থিত খলিফা ওমরের মসজিদ প্রাংগণে সমাধিস্থ করা হয়।

দেশপ্রেমিক, কবি ও সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বাগ্মী মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহরের মৃত্যুতে ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা আর পূরণ হয়নি। তবে লন্ডন যাত্রাকালে তাঁকে যখন স্ট্রেচারের সাহায্যে বোম্বাই বন্দরে জাহাজে তোলা হয়, তখন অনেকেই অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন—"ভারতে আপনার স্থলাভিষিক্ত কে হবে।" তখন তিনি বলেছিলেন "তোমাদের

জন্যে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ রইলো।" তাঁর এ অন্তিম ইচ্ছাও পূরণ হয়েছিল। পরবর্তীকালে মুসলমানদের আশা-আকাংখার বাস্তবায়ন হয়েছিল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর অক্লান্ত প্রচেষ্টায়।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বর্জন করেছিল। উপরন্তু মিঃ গান্ধী লবণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে ভারতে ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত করে তোলেন। সরকারও আন্দোলনকারীদেরকে কঠোর হস্তে দমন করার চেষ্টা করেন। এমতাবস্থায় সরকারের সাথে একটা আপোষ নিস্পত্তিতে উপনীত হবার জন্যে স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, ভূপালের নবাব হামীদুল্লাহ্ খান, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং শ্রী জয়াকর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মিঃ গান্ধীর সাথে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনায় একটি আপোষের ক্ষেত্র তৈরী হয়। বড়োলাটের সাথে গান্ধীজির সরাসরি আলাপ আলোচনার পর কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটিবিল বৈঠকে যোগদান করতে সম্মত হয়।

১৯৩১ সালের আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিতব্য গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ গান্ধী লন্ডন যাত্রা করেন। লন্ডনে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন যে সরকার মুসলমানদের ন্যায় তফশিলী সম্প্রদায়কেও একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে গণনা করতে বদ্ধকর। গান্ধী তা মেনে নিতে রাজী ছিলেন না এবং তিনি তার প্রতিবাদে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। গান্ধী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকারীদের সাথে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

গান্ধীর গোলটেবিল বৈঠক ত্যাগের পর দু'মাসকাল যাবত বৈঠক চলে এবং বৈঠকে অনেকগুলি সাব কমিটি গঠিত হয়। এসব কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার জন্যে পরবর্তী বৎসরের আগষ্ট মাসে গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন আহূত হয়।

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক

বিভিন্ন আইন সভায় মুসলমানদের আসন সংখ্যা ও নির্বাচন প্রথা নিয়ে হিন্দু সদস্যগণ তাদের চিরাচরিত বৈরী ভূমিকাই পালন করেন। ১৯২৮ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে হিন্দুগণ যে আপোষহীন মনোভাব

ব্যক্ত করে সম্মেলনকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন, গোলটেবিল বৈঠককে অনুরূপভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করার চেষ্টা তাঁরা করছিলেন। কিন্তু আগা খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে মুসলমান নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এমন যোগ্যতা ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তাঁদের ন্যায্য দাবীদাওয়াগুলি পেশ করেছিলেন যে তার অধিকাংশই ব্রিটিশ সরকার মেনে নিতে রাজী হন। আগা খান ও মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ব্যতীতও স্যার মুহাম্মদ শফি, স্যার আবদুল হালিম গজনভী, স্যার আকবর হায়দারী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ভূমিকাও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যুক্তিতর্কে হার মেনে নিয়ে পন্ডিত মদনমোহন মালব্য, ডাঃ মুঞ্জে, শ্রীজয়াকর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অন্যান্য হিন্দু সদস্যগণের সাথে পরামর্শক্রমে উপরোক্ত প্রশ্নটির (আইনসভায় মুসলমানদের আসন বন্টন ও নির্বাচন প্রথা) মীমাংসার ভার অর্পণ করেন তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের উপর।

ম্যাকডোনাল্ড অতীতে হিন্দুপ্রীতির পরিচয় দিয়েছিলেন এবং কংগ্রেসের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন বলে তার উপর হিন্দুদের গভীর আস্থা ছিল। কিন্তু তিনি যে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Communal Award) ঘোষণা করেন তাতে বিভিন্ন আইনসভায় মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্যে আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। পৃথক নির্বাচন প্রথাকেও স্বীকৃতি দেয়া হয়। শুধু আসন সংখ্যায় কিছু রদবদল করে উভয়ের গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করা হয়।

ম্যাকডোনাল্ডের ঘোষণায় হিন্দুগণ বিষম বিমূঢ় হয়ে পড়েন। কারণ তারা কখনো এরূপ আশা করেননি। বিশেষ করে তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুদের জন্যেও পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাবে তাঁরা খুব মর্মাহত হয়ে পড়েন। মিঃ গান্ধী তখন জারবেদা জেলে কারাজীবন যাপন করছিলেন। তিনি পৃথক নির্বাচনের প্রতিবাদে আমরণ অনশন ধর্মঘটের কথা ঘোষণা করেন।

পুনাচুক্তি

একদিকে হিন্দু নেতৃবৃন্দ পুনায় গমন করতঃ গান্ধীকে অনশন থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্যে বারবার আবেদন জানাতে থাকেন এবং অপরদিকে বর্ণ হিন্দুগণ তফশিলীদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন বাঁটোয়ারা সংশ্লিষ্ট অংশের রদবদল করতে। কবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তফশিলী সম্প্রদায়ের নেতা ডঃ আম্বেদকর বর্ণহিন্দুদের কাছে নতি স্বীকার

করেন এবং স্থিরীকৃত হয় যে বিভিন্ন আইন সভায় তফশিলীদের জন্যে আসন সংরক্ষিত থাকবে বটে, তবে মিশ্র নির্বাচন প্রথার সাহায্যে তাদেরকে নির্বাচিত হতে হবে। এ চুক্তিটি ইতিহাসে পুনা চুক্তি নামে খ্যাতি লাভ করে।

উল্লেখ্য যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তথা ভারতীয় বর্ণহিন্দুদের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ভারতবাসীকে একজাতীয়তার যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট করে এমন এক জাতীয়তার উদ্ভব করা যার কর্তৃত্ব নেতৃত্ব থাকবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের হাতে। ফলে মুসলিম জাতিকে কৃত্রিম জাতীয়তার সাথে একাকার করে তাদের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করে দেয়া হবে। কিন্তু মুসলমানদের জন্যে সরকার কর্তৃক পৃথক নির্বাচনের স্বীকৃতির মাধ্যমে তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যও স্বীকার করে নেয়া হয়। এতে বর্ণহিন্দুদের বহুদিনের স্বপ্নসাধ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তাদের সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়ে তাদের এককালীন পরম বন্ধু, হিতৈষী ও অভিভাবক ব্রিটিশ সরকারের উপর। তার জন্যে সৃষ্টি হয় সন্ত্রাসবাদের। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, রাজনৈতিক হত্যা প্রভৃতি নিত্যনতুন ঘটনা ঘটতে থাকে। এ সময়ের কয়েক বছরের উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা হলো হিন্দু সন্ত্রাসবাদী সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, গোয়েন্দা বিভাগের অন্যতম অফিসার খান বাহাদুর আহসান উল্লাহর হত্যা, ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ ও কয়েকজন নর-নারীর হত্যা, মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হত্যা, ডিনামাইট ষড়যন্ত্র প্রভৃতি। লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠক চলাকালীন দু'তিন বছরের মধ্যেই এ সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়।

ভারত শাসন আইন

পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। প্রদেশে কিছুটা দায়িত্বশীল সরকার এবং কেন্দ্রে ফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠা ছিল—এ আইনের বিষয়বস্তু বা উদ্দেশ্য। মন্টফোর্ড শাসন সংস্কারে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে যে পরিমাণ ক্ষমতা দিয়েছিলেন, ভারত শাসন আইনে তার চেয়ে অধিক ক্ষমতা তাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু প্রচুর রক্ষাকবচের মাধ্যমে আসল ক্ষমতা বড়োলাট ও প্রাদেশিক গভর্ণরদের হাতে রয়ে যায়। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে এ নতুন ভারত শাসন আইন চালু হবে বলেও ঘোষণা করা হয়।

কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এই সংকুচিত বা নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতায় (Controlled Power) মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তবুও নানান টালবাহানার পর নতুন আইনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে কিভাবে ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গঠন করে এবং তাদের আড়াই বছরের শাসনে কিভাবে মুসলমানদের উপর অন্যায় অবিচার ও নিষ্পেষণ চালায়, যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মুসলমানদের পাকিস্তান আন্দোলনের পথ উন্মুক্ত হয়, পরবর্তীতে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ঘোষিত হলে মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সকলকে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার উদাত্ত আহবান জানান। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কিছু সংখ্যক সদস্য মুসলিম লীগে নির্বাচিতও হয়েছিলেন। তখন পর্যন্তও মুসলিম লীগের আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ লাভ করেনি। নির্বাচনের পর মিঃ জিন্নাহ কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেন। কিন্তু কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। জিন্নাহর মতো একজন তেজস্বী ও খ্যাতনামা আইনবিদের পক্ষে কংগ্রেসের উপরোক্ত ঔদ্ধত্যের কাছে নতি স্বীকার করা সম্ভব হয়নি। বহু মানঅভিমানের পর বড়োলাট লিনলিথগোর আশ্বাসবাণীর পর কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করতে রাজী হলে, মিঃ জিন্নাহ লীগ সদস্যগণকে তার বিরোধিতা করার নির্দেশ দেন।

লীগ-কংগ্রেসের দ্বন্দ্বকলহের মধ্য দিয়েই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চলতে থাকে। মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের বিমাতাসুলভ আচরণ, মুসলমানদের তাহজিব তামাদ্দুনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে হিন্দু রামরাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা এবং মুসলমানদের প্রতি হিন্দু কংগ্রেসের অন্যায় অবিচার মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র আবাসভূমি লাভের সংগ্রামে বাধ্য করে। সে সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের ভিতর দিয়ে।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস'–এর প্রথম ভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বাংলায় তথা ভারত উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের প্রথম আগমন থেকে শুরু করে তাদের সাড়ে পাঁচ শতাধিক বৎসরব্যাপী (১৩০২–১৭৫৭ খৃঃ) বাংলা শাসনের ইতিহাস। অতঃপর এ ভূখন্ডে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত থেকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (Government of India Act, 1935) কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস।

এখন এ ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে আলোচনা করতে চাই ১৯৩৫ সালের উপরিউক্ত আইনের প্রয়োগকাল থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস।

ভারত বিভাগ কতিপয় ব্যক্তির নিকটে দুর্ভাগ্যজনক বিবেচিত হলেও এ ছিল এক অনিবার্য ও স্বাভাবিক বাস্তবতা। যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম অধিবাসীর উপর মুষ্টিমেয় মুসলমানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা হাজার বারোশ' বছর চলেছে, এ দীর্ঘ সময়ে মুসলমান অমুসলমান পাশাপাশি শান্তি ও সৌহার্দের সাথে একত্রে বসবাস করেছে, তারা বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে এসে আর একত্রে থাকতে পারলোনা কেন? এর সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের অবশ্যই জানা দরকার। ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার পর থেকে মুসলমানদের প্রতি হিন্দু ও ব্রিটিশের আচরণের ধারাবাহিক ইতিহাস, বিশেষ করে ব্রিটিশ ভারতে কংগ্রেসের আড়াই বছরের কুশাসন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগীসহ আলোচনা করলে এ সত্যে উপনীত হওয়া যাবে যে, ভারত বিভাগ ছিল এক অনিবার্য ও স্বাভাবিক বাস্তবতা।

পঁয়ত্রিশের ভারত শাসন আইন কার্যকর হওয়ার ফলে প্রদেশগুলোতে সীমিত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সাতটি হিন্দু সংখ্যাগুরু প্রদেশে অন্য দলের সহযোগিতা ব্যতীতই সরকার গঠন করতে সমর্থ হয় এবং ক্ষমতামদমত্ত হয়ে মুসলমানদের সাথে এমন অমানবিক আচরণ শুরু করে যার দরুন মুসলমানগণ এ উপমহাদেশে তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন মনে করতে থাকে। হিন্দু–মুসলিম সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে, দেশের সর্বত্র লোমহর্ষক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং মুসলমানদের জান–মাল ইজ্জৎ–আবরু লুণ্ঠিত হতে থাকে। পরিস্থিতি অবশেষে এমন একদিকে মোড় নেয় যেদিক থেকে প্রত্যাবর্তনের আর কোনই উপায় ছিলনা। ভারত দুটি পৃথক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ বিভক্তির পশ্চাতে ছিল ভারতীয় মুসলমানদের অদম্য ধর্মীয় বিশ্বাস ও আদর্শ, স্বতন্ত্র জাতীয়তার ধারণা, নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সভ্যতা–সংস্কৃতি এবং এসবসহ জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির প্রবল আশংকা। এক পক্ষ চাইছিল অপর পক্ষকে গোলাম বানিয়ে রাখতে অন্যথায় তাদেরকে ভারতের বুক থেকে নির্মূল করতে। অপর পক্ষ চাইছিল আত্মমর্যাদা ও সকল অধিকারসহ বেঁচে থাকতে। ইতিহাসের নিরপেক্ষ আলোচনায় আশা করি এ সত্য প্রমাণিত হবে।

ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ (Govt. of India Act, 1935)

এ আইনটি ১৯৩৭ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে কার্যকর করা হয়। ভারতীয় ফেডারেশন সম্পর্কিত আইনের দ্বিতীয় অংশটি কার্যকর হয়নি। কারণ নির্দিষ্ট সংখ্যক ভারতীয় দেশীয় রাজ্য ফেডারেশন মেনে নিতে পারেনি বলে তা কার্যকর হয়নি।

এই আইনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এ সর্বপ্রথম প্রদেশগুলোকে আইনানুগ পৃথক অস্তিত্ব দান করে। সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক প্রদেশের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে এই সর্বপ্রথম পূর্ণ প্রাদেশিক মর্যাদা দান করা হয়। ভোটদাতার সম্পদের অনুপাত হ্রাস করতঃ ভোটার সংখ্যা বর্ধিত করা হয়।

আইন অনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে মন্ত্রী পরিষদ থাকবে এবং গভর্ণর তার সুপারিশ মেনে চলবেন। তবে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে আপন বিবেক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। দ্বৈতশাসন বিলুপ্ত করা হয়। প্রদেশে ব্রিটিশ মডেলের একটি করে মন্ত্রীসভা থাকবে যার পরামর্শ অনুসারে গভর্ণর তাঁর কার্য সম্পাদন করবেন।

প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন

প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয় ১৯৩৭ এর ফেব্রুয়ারী ও মার্চে। ১৯৩৬ সালের শেষভাগে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টো ঘোষণা করে। উভয় মেনিফেস্টোর সামাজিক পলিসি ছিল একই রকমের। রাজনৈতিক ইস্যুতেও কেউ একে অপর থেকে বেশী দূরে অবস্থান করছিল না। কিন্তু দুটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বিরাট মতপার্থক্য ছিল। একটি এই যে, মুসলিম লীগ ওয়াদাবদ্ধ ছিল উর্দূ ভাষা ও বর্ণমালার সংরক্ষণ এবং সমৃদ্ধি সাধন করতে। পক্ষান্তরে কংগ্রেস বদ্ধপরিকর ছিল হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে। দ্বিতীয়তঃ মুসলিম লীগ অটল ছিল পৃথক নির্বাচনের উপর। কিন্তু কংগ্রেস ছিল তার চরম বিরোধী। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস পৃথক নির্বাচন মেনে নিয়ে মুসলিম লীগের সাথে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যা লাখ্নো চুক্তি নামে খ্যাত ছিল। অনেক কংগ্রেস নেতা লাখ্নো চুক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং এটাকে হিন্দু–মুসলিম মিলনের সেতুবন্ধন মনে করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কংগ্রেস এ চুক্তি অমান্য করে পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা শুরু করে। অবশ্য কংগ্রেসের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারত বিভাগ পর্যন্ত পৃথক নির্বাচন বলবৎ থাকে।

হিন্দু–মুসলিম মিলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোন কথা মুসলিম লীগ মেনিফেস্টোতে ছিলনা। বরঞ্চ তাতে ছিল সহযোগিতার সুস্পষ্ট আহবান। কংগ্রেস মুসলিম লীগের এ সহযোগিতার আহবান ঔদ্ধত্য সহকারে প্রত্যাখ্যান করে। কংগ্রেসের দাবী ছিল যে, সকল ভারতবাসী এক জাতি এবং ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান একমাত্র কংগ্রেস। কিন্তু ১৯৩৭ সালের নির্বাচন তার এ দাবী মিথ্যা প্রমাণিত করে।

নির্বাচনের যে ফল প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা যায় সর্বমোট ১৭৭১টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস লাভ করে মাত্র ৭০৬ টি যা অর্ধেকেরও কম। মুসলিম আসনের অধিকাংশ লাভ করে স্যার ফজলে হোসেনের পাঞ্জাব ইউনিয়নিষ্ট পার্টি। মুসলিম লীগ তখন পর্যন্ত অসংগঠিত ছিল বলে ৪৮২টি আসনের মধ্যে ১০২টি লাভ করে। কিন্তু কংগ্রেস হিন্দুমুসলিম উভয়ের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসাবে কয়টি মুসলিম আসনে বিজয়ী হয়? ৫৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয় মাত্র ২৬টি আসনে। পাঞ্জাবে সর্বমোট ১৭৫ আসনের মধ্যে ১৮ এবং বাংলায় ২৫০ এর মধ্যে ৬০ আসন লাভ করে।

(The Struggle for Pakistan. I.H. Qureshi). Return showing the results on election in India-1937. Nov. 1937)

মোট সাড়ে তিন কোটি ভোটের মধ্যে কংগ্রেস প্রায় দেড় কোটি ভোট লাভ করে। অতএব ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হওয়ার দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

ইউপিতে কংগ্রেস টিকেটে মাত্র একজন মুসলমান নির্বাচিত হন। তিনি বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনী এলাকা থেকে যুক্ত নির্বাচনে নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের প্রাদেশিক সভাপতি—একজন মুসলমান নির্বাচনে পরাজিত হন। — (The Struggle for Pakistan I. H. Qureshi)

দেশের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে ছয়টিতে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করতে সমর্থ হয়। সে ছয়টি হলো– বোম্বাই, মাদ্রাজ, ইউ পি, সি পি, বিহার ও উড়িষ্যা। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলোতে বহু চেষ্টা করেও যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান প্রার্থী সংগ্রহ করতে পারেনি। উপরোক্ত ছয়টি প্রদেশের তিনটিতে বোম্বাই, সিপি (মধ্য প্রদেশ) ও উড়িষ্যা–কংগ্রেস মনোনীত কোন মুসলমান প্রার্থী জয়লাভ করতে পারেননি।

নতুন প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক গভর্ণরগণ প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবৃন্দকে ডেকে পাঠান এবং মন্ত্রীসভা গঠনে সহায়তা করতে অনুরোধ জানান। পাঞ্জাব, বাংলা, সিন্ধু, উত্ত–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং আসাম—এ পাঁচটি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং পয়লা এপ্রিল থেকে স্বায়ত্তশাসিত ইউনিট হিসাবে কাজ শুরু করে। অবশিষ্ট ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে—যতোক্ষণ না গভর্ণরগণ সংবিধান অনুযায়ী তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে বিরত থাকার নিশ্চয়তা দান করেন। এ ধরনের নিশ্চয়তা দানে গভর্ণরগণ অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর যেসব দল বা গ্রুপের প্রতিনিধিগণ মন্ত্রীসভা গঠনে ইচ্ছুক তাঁদেরকে নিয়ে অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুসলমানদের নেতৃত্বে বোম্বাই, বিহার ও ইউপিতে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং কতিপয় মুসলিম লীগ সদস্যকেও মন্ত্রীসভায় স্থান দেয়া হয়। কিন্তু এসবকে 'মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা' নাম দেয়া হয়নি।

রক্ষাকবচ প্রশ্নে অচলাবস্থা সৃষ্টি

ভারত শাসন আইন ১৯৩৫-এর অধীনে প্রদেশের গভর্ণরগণকে যে নির্দেশনামা প্রদান করা হয় তাতে তাঁদের প্রতি এক বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে আইনে যে রক্ষাকবচের (Safeguard) নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখাই গভর্ণরগণের বিশেষ দায়িত্ব। বলা হয়েছে ঃ

The Instruments of Instructions issued to the Governors under the Government of India Act 1935, placed some special responsibilities on the provincial heads. These included the 'Safeguarding of all the legitimate interests of minorities as requiring him to secure, in general, that those racial or religious communities for the members of which special representation is accorded in the legislature and those classes of the people committed to his charge who, whether on account of the smallness of their number, or their lack of educational or material advantages or from any other cause, cannot as yet fully rely for their welfare upon joint political action in the legislature, shall not suffer, or have reasonable cause to fear neglect or oppression.

উপরোক্ত আইনে সব ধরনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল বৈধ স্বার্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। তাদের স্বার্থ যাতে সংরক্ষিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্যে প্রাদেশিক গভর্ণরগণকে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়।

জাতিগত ও ধর্মীয় এমন কতিপয় সম্প্রদায় আছে যাদের সদস্যদের জন্যে আইনসভায় বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে, গভর্ণরের তত্ত্বাবধানে এমন কতিপয় শ্রেণী আছে যারা সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে, অথবা শিক্ষাগত ও বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা না থাকার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে তাদের কল্যাণের জন্যে আইনসভায় গৃহীত যুক্ত রাজনৈতিক পদক্ষেপের উপর এখনো পুরোপুরি আস্থা পোষণ করতে পারেনা— এসব সম্প্রদায় ও শ্রেণী কোনরূপ দুর্গতি ভোগ করবে না অথবা অবহেলিত অথবা উৎপীড়িত হওয়ার কোন কারণ থাকবে না। এভাবে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব গভর্ণরদের উপরে অর্পিত হয়।

ভারতের সংখ্যালঘু বলতে প্রধানতঃ মুসলমানদেরকেই বলা হয় এবং তারা তাদের সকল প্রকার স্বার্থ সংরক্ষণ তথা রক্ষাকবচের জন্যে দীর্ঘকাল যাবত সংগ্রাম করে আসছে।

এ উপমহাদেশ কয়েকটি জাতির আবাসভূমি ছিল এবং তাদের মধ্যে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুও ছিল। এ বাস্তবতা কংগ্রেস স্বীকার করতোনা। কংগ্রেস দাবী করতো সকল ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন মাত্র একটি এবং তা হলো কংগ্রেস। মিঃ গান্ধী News Chronicle এর প্রতিনিধির কাছে বলেন, এখানে একটি মাত্র দল আছে যে কল্যাণ করতে পারে এবং তা হলো কংগ্রেস। কংগ্রেস ব্যতীত অন্য কোন দল আমি মেনে নেব না।

তিনি আরও বলেন, তোমরা যে নামেই ডাক, ভারতে একটি মাত্র দলই হতে পারে এবং তা হচ্ছে কংগ্রেস- (Muslim Separatism in India, A. Hamid, p. 217)

জওহরলাল নেহরুর মনোভাবও ছিল অনুরূপ। তিনি বলেন, একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও আবিষ্কার করা যাবে না যে ভারতে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে। দেশে মাত্র দুটি দল আছে— কংগ্রেস এবং সরকার। আর যারা আছে তাদেরকে আমাদের কর্মপদ্ধতি মেনে নিয়ে আমাদের সাথে থাকতে হবে। যারা আমাদের সাথে নেই—তারা আমাদের বিরোধী।

- পন্ডিত নেহরুর উপরোক্ত উক্তি ফ্যাসিবাদী মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ।- (উক্ত গ্রন্থ)

সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা ১৯৩৫ সালের আইনে রয়েছে এবং প্রাদেশিক গভর্ণরগণকে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যাতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয়। কিন্তু পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর কথায় এ দেশে সংখ্যালঘু বলে কোন বস্তুর অস্তিত্বই যখন নেই, তখন কংগ্রেসের মতে গভর্ণরদের বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্যে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজনও নেই। এর সুস্পষ্ট অর্থ হলো এই যে কংগ্রেস মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে মোটেই রাজী নয়। এ কারণেই কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে

অচলাবস্থার সৃষ্টি করে রাখে।

অবশেষে ভাইসরয় লর্ড লিন্‌লিথগোর সাথে কংগ্রেসের একটা আপস্ নিস্পত্তি হয়ে যায় যার ভিত্তিতে ৭ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসকে মন্ত্রীসভা গঠনের অনুমতি দান করার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

ভাইসরয়ের পক্ষ থেকে গোপনে পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভের পর কংগ্রেস সকল মান-অভিমান ত্যাগ করে ১৯৩৭ এর জুলাই মাসে সাতটি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করে। ১৯৩৮ সালে আসামের প্রধানমন্ত্রী স্যার মুহম্মদ সা'দুল্লাহ এস্তেফা দান করায় আসামে গোপীনাথ বারদলই কর্তৃক কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। যে সকল প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, সেসব প্রদেশে মুসলমানদের স্বার্থ পদদলিত হতে থাকে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

নির্বাচনের ফলাফল

কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর মুসলিম ভারতে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পূর্বে সাইত্রিশ সালের শুরু থেকেই যেসব প্রদেশে সরকার গঠিত হয় তাদের অবস্থা কি ছিল, তা একবার আলোচনা করা যাক।

বাংলা

নির্বাচনের পর বাংলার আইনসভার দলীয় অবস্থান ছিল নিম্নরূপ :

কংগ্রেস	৫৪
অকংগ্রেসী হিন্দু	৪২
স্বতন্ত্র মুসলমান	৪৩
মুসলিম লীগ	৪০
অন্যান্য মুসলমান	৩৮
ইউরোপিয়ান অ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৩১
নির্দলীয় মুসলমান	২
	মোট=২৫০

মুসলিম লীগ নন, এমন মুসলমানদের মধ্যে কৃষক প্রজা পার্টির সদস্য ছিল ৩৫। এ দলের নেতা ছিলেন মৌলভী এ কে ফজলুল হক (শেরে বাংলা)। এখানে

কোয়ালিশন ব্যতীত মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য কোন পথ ছিলনা। অতএব ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে, মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, তফসিলী সম্প্রদায় (Scheduled Castes) এবং স্বতন্ত্র অথবা অকংগ্রেসীয় বর্ণ হিন্দুদের নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, যার নেতা ছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক। তিনি দশ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেন যার মধ্যে পাঁচজন মুসলমান এবং পাঁচজন হিন্দু ছিলেন।

উল্লেখ্য নির্বাচনের পর তেসরা ফেব্রুয়ারী মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত জনসভায় জনাব ফজলুল হক তাঁর দলের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী কৃষক প্রজা পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত দলের নেতৃবৃন্দের সাথে মুসলিম লীগের নতুন সংবিধান কার্যকর করার উদ্দেশ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তা অনুমোদন করে। ৬ই মার্চ জনাব ফজলুল হক মন্ত্রীসভা গঠনে সম্মত হন। কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনুরোধে হক সাহেব মুসলিম লীগে যোগদান করেন। অতঃপর তিনি সর্বসম্মতিক্রমে লীগ কোয়ালিশন দলের নেতা নির্বাচিত হন যার ফলে তিনি বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

ফজলুল হক কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা নির্বিবাদে কাজ করতে পারেনি। কারণ কংগ্রেস পদে পদে এ মন্ত্রীসভার চরম বিরোধিতা করে। কিন্তু তার সুফল এই হয় যে, যে পরিমাণে বিরোধিতা হয় সেই পরিমাণে সংসদের ভেতরে ও বাইরে মুসলিম ঐক্য সংহত ও সুদৃঢ় হয়।

কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর কৃষক প্রজা পার্টি এবং মুসলিম লীগের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হয়। ১৮৩৭ সালের সেপ্টেম্বরে লাখ্‌নোতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশনে তিনি যোগদান করে ঘোষণা করেন যে, তাঁর দলের সদস্যগণ মুসলিম লীগে যোগদান করবেন। তাঁর মন্ত্রীসভায় খাজা নাজিমুদ্দীন ও হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী স্থান পেয়েছিলেন।

ফজলুল হক সাহেবের সাড়ে চার বছরের প্রধানমন্ত্রীত্ব তাঁর জীবনে এবং অবিভক্ত বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক শক্তিতে এক নব জোয়ার এনে দেয়। তাঁর মন্ত্রীসভা জনগণের মধ্যে বিরাট আশার সঞ্চার এবং মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তাদের এতদিনের হীনমন্যতা দূরীভূত হয় এবং হিন্দুদেরকে তারা সমকক্ষ মনে করে। সংসদে ফজলুল হক-সুহরাওয়ার্দীর ভাষণ, প্রতিপক্ষের কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব দান এবং তাঁদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা নেতৃবৃন্দের তুলনায় অধিকতর উচ্চমানের ছিল। তাঁদের প্রাণশক্তি ও প্রজ্ঞা, জ্ঞানবুদ্ধির প্রখরতা, অনর্গল বাগ্মিতা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা এবং কঠোর পরিশ্রম ও ধীশক্তির দ্বারা তাঁরা সংসদে হিন্দু সদস্যদের উপর তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন।

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে নবজীবনের সঞ্চার হয় তা সংসদ ভবনের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমিত ছিলনা। মানবীয় কর্মশীলতার সকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংগঠন, সাহিত্য, শিল্প, সাংবাদিকতা, খেলাধূলা প্রভৃতিতে তা দৃষ্টিগোচর হলো। মুসলিম লীগ একটি শক্তিশালী জীবন্ত সংগঠনে পরিণত হচ্ছিল এবং মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন জীবন ও আস্থার সঞ্চার করছিল।

প্রায় এক শতাব্দী যাবত যে বাংলা সাহিত্যের উপর হিন্দু কবি সাহিত্যিক তাঁদের প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলেন, সাহিত্য গগনে কাজী নজরুল ইসলামের উদয়ের ফলে তার অবসান ঘটে। তিনি শুধু একাকী নন, কবি জসিম উদ্দীন, গোলাম মোস্তফা, বেনজীর আহমদ প্রমুখের কাব্যজগতে অমর অবদানও অনস্বীকার্য। সংগীত সম্রাট আব্বাসউদ্দীনের মনমাতানো সুরে গাওয়া ইসলামী, মুর্শেদী, ভাটিয়ালী সংগীত মুসলমানদের মনে ইসলামী প্রেরণা সঞ্চার করে।

এ মুসলিম নবজাগরণে নতুন মুসলিম প্রেসের উত্থান বিরাট অবদান রেখেছে। সাংবাদিকতার জগতে কোলকাতা থেকে কতিপয় মাসিক ও সাপ্তাহিক প্রকাশিত হলেও নিয়মিত কোন দৈনিক পত্রিকা ছিলনা। ১৯৩৬ সালে মওলানা আকরাম খাঁ দৈনিক আজাদ প্রকাশিত করে মুসলমান জাতির বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেন এবং ফজলুল হক কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাকে সক্রিয় সমর্থন দান করেন। এ সময়ে আবদুল করিম গজনবী কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক ষ্টার অব ইন্ডিয়া এবং খাজা নূরুদ্দীন কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক মর্নিং নিউজ মুসলমানদের আশা আকাংখার প্রতিনিধিত্ব করে।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রীসভা— (১৯৩৭ থেকে ১৯৪১) বাংলার সংসদীয় সরকারের ইতিহাসের এক স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এ সময়ে তিনি বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশগুলোতে সফর করে মুসলিম লীগ সংগঠিত করেন এবং একে একটি শক্তিশালী সংগঠনে রূপান্তরিত করেন। তিনি ১৯৩৭ সালে লাখ্নৌতে, ১৯৩৮ সালে করাচীতে এবং ১৯৩৯ সালে কটকে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ সম্মেলনগুলোতে ভাষণ দান করেন। ১৯৪০ সালে

কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে লাহোরে ২২, ২৩ ও ২৪শে মার্চ মুসলিম লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তার ২৩শে মার্চের অধিবেশনে তিনি ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করেন।

ফজলুল হক এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুসলিম জাতির উন্নতি অগ্রগতির চাবিকাঠি হচ্ছে শিক্ষা। এ কারণেই তিনি তাঁর কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় নিজে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের উন্নতির জন্যে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। যথা লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ (মহিলা কলেজ), কোলকাতা; ইডেন গার্লস কলেজ, ঢাকা; কৃষি কলেজ (তেজগাঁ, ঢাকা); ফজলুল হক মুসলিম হল, ঢাকা; ফজলুল হক কলেজ, চাখার, বরিশাল।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব– ঔদ্ধত্য তিনি কিছুটা খর্ব করতে চেয়েছিলেন। এ ছিল প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের এক সুরক্ষিত বিদ্যামন্দির। হিন্দু রেনেসাঁর এবং বাংলায় হিন্দুর বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এক শক্তিশালী হাতিয়ার। এ ছিল এক বিরাট দুর্দমনীয় প্রতিষ্ঠান যা প্রবেশিকা এবং মাধ্যমিক পরীক্ষাগুলোও নিয়ন্ত্রণ করতো। অতএব উচ্চশিক্ষার উপর তার প্রভাব ছিল শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁর বিভাগ অপেক্ষা অনেক বেশী। এ প্রভাব থেকে পরীক্ষার্থীদের রক্ষা করার জন্যে তিনি সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্যে আইন পরিষদে একটি বিল উত্থাপনের চেষ্টা করেন। ফলে গোটা হিন্দু সম্প্রদায় ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পারস্পরিক সকল বিভেদ ভুলে গিয়ে উক্ত প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯০৫ সালের বংগভংগের পর এমন প্রচণ্ড বিক্ষোভ আর দেখা যায়নি। ১৯৪০ সালে কোলকাতায় স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো এক বিজ্ঞজন ব্যক্তির সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র প্রদেশ থেকে প্রায় দশ হাজার প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বার্ধক্যজনিত পীড়ায় ভুগছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি উক্ত সম্মেলনে তাঁর নাম ও মর্যাদা ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করেন। সম্মেলনে তিনি যে বাণী পাঠান তার শেষাংশে বলেন ঃ

আমার বার্ধক্য এবং স্বাস্থ্য আমাকে সম্মেলনে যোগদানে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু যে বিপদ আমাদের প্রদেশের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে, তা আমাকে ভয়ানক বিচলিত করেছে। সে জন্যে আমি আমার রোগশয্যা থেকে সম্মেলনে একটি কথা না পাঠিয়ে পারলাম না।

হিন্দুদের চরম বিরোধিতার কারণে বাংলার প্রধানমন্ত্রী সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড গঠনের যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা কার্যকর করা যায়নি।

তবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শেরে বাংলা ফজলুল হক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা এই যে, প্রদেশের সকল সরকারী চাকুরীতে হিন্দু ও মুসলমান সমান সুযোগ লাভ করবে। অর্থাৎ চাকুরীর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হিন্দু ও পঞ্চাশ ভাগ মুসলমান লাভ করবে। সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে হিন্দুদের চিরাচরিত একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানের প্রতি যে চরম অবিচার করা হচ্ছিল, উপরোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে মুসলমান শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে জীবন ক্ষেত্রে বিরাট আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয়। মুসলমান জাতির জন্যে এ ছিল এক বিরাট খেদমত।

পাঞ্জাব

যে কয়টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হতে পারেনি তার মধ্যে ছিল পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আসাম। নির্বাচনের ফলে পাঞ্জাবে দলীয় অবস্থান ছিল নিম্নরূপ ঃ

কংগ্রেস	১৮
অকংগ্রেস হিন্দু ও শিখ	৩৬
মুসলিম লীগ	২
অন্যান্য মুসলিম	৪
ইউনিয়নিষ্ট	৮৮
নির্দলীয়	২৭
	মোট = ১৭৫

পরে আটজন সদস্য ইউনিয়নিষ্ট পার্টিতে যোগদান করার ফলে এ দলে মোট সদস্য সংখ্যা হয় ৯৬। খালসা ন্যাশনালিষ্ট শিখ দলও স্যার সেকেন্দার হায়াতের প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং এ সুযোগে তিনি মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ১৯৪২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর মালিক খিজির হায়াত খান প্রধানমন্ত্রী হন এবং ১৯৪৫ সালে সকল প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত এ মন্ত্রীসভা বলবৎ থাকে।

সিন্ধু

সিন্ধু প্রদেশের দলীয় অবস্থান ছিল নিম্নরূপ ঃ

কংগ্রেস	৮
অকংগ্রেসীয় হিন্দু	১৪
মুসলিম স্বতন্ত্র	৯
অন্যান্য মুসলমান	৭
সিন্ধু ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি	১৮
নির্দলীয়	৪
	মোট = ৬০

এখানে কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় গোঁজামিল দিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করতে হয়। ফলে কোনটাই স্থিতিশীল হতে পারেনি। ভাঙা–গড়ার ভেতর দিয়েই এখানে মন্ত্রীসভাগুলো চলতে থাকে। প্রথমে স্যার গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লাহ মন্ত্রীসভা গঠন করেন। পরে আল্লাহ বখশ্ ও মীর বন্দে আলী খানের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীত্বের পালাবদল হতে থাকে।

আসাম

দলীয় অবস্থান এখানে নিম্নরূপ ঃ

কংগ্রেস	৩২
অকংগ্রেসীয় হিন্দু	৯
মুসলিম স্বতন্ত্র	৩০
মুসলিম লীগ	৪
নির্দলীয়	৩৩
	মোট = ১০৮

এখানেও কোন স্থিতিশীল সরকার গঠিত হতে পারেনি। স্যার মুহাম্মদ সা'দুল্লাহ মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে এস্তেফা দান করেন। অতঃপর গভর্ণরের আমন্ত্রণে কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বারদলই মন্ত্রীসভা গঠন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সকল মন্ত্রীসভার সাথে গোপীনাথ

মন্ত্রীসভাও পদত্যাগ করে। অতঃপর পুনরায় স্যার মুহাম্মদ সা'দুল্লাহ মন্ত্রীসভা গঠনের সুযোগ পান। কিন্তু ১৯৪১ সালের শেষভাগে তাঁর মন্ত্রীত্বের পতন ঘটে এবং গভর্ণর ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের ৯৩ ধারার বলে প্রদেশের শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা

এখন স্বল্পকালীন কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোর হালহকিকত পর্যালোচনা করে দেখা যাক মুসলমানদের প্রতি তাদের পক্ষ থেকে কোন্ ধরনের আচরণ করা হয়।

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে গভর্ণরগণকে আইন অনুযায়ী যে বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, তা প্রয়োগ না করার নিশ্চয়তা না দিলে কংগ্রেস সরকার গঠনে সম্মত হবে না। অর্থাৎ তাদের পরিষ্কার কথা এই যে, সংখ্যালঘু তথা মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে তারা মোটেই রাজী নয়। ভারত শাসনে বৃটিশ পলিসির মর্মকথা এই যে, কংগ্রেস তথা ভারতীয় হিন্দু জাতিকে যে কোন মূল্যে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। মুসলিম স্বার্থ পদদলিত করে হিন্দুদেরকে তুষ্ট করার দৃষ্টান্ত অতীতে বহু দেখা গেছে। এবারেও ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো কংগ্রেসকে সরকার গঠনে সম্মত করার জন্যে গোপনে এ নিশ্চয়তা দান করেন যে, গভর্ণরগণ তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না যা ১৯৩৫ সালের আইনে তাঁদেরকে দেয়া হয়েছে। এ নিশ্চয়তা দানের পরই কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনে রাজী হয়।

সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করে এবং সকল প্রাদেশিক দলীয় নীতি পুরোপুরি কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

মাদ্রাজে কংগ্রেস ৭৪টি আসন লাভ করে এবং রাজা গোপালাচারিয়া মন্ত্রীসভা গঠন করেন। বোম্বাইয়ে কংগ্রেস মাত্র ৪৮টি আসন লাভে সমর্থ হয়। অন্যান্য ছোটখাটো কয়েকটি সমমনা দল নিয়ে বি. জে. খের [B.J. Kher] মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

যুক্তপ্রদেশে শতকরা ৫৯ আসন কংগ্রেস লাভ করে এবং জিবি প্যান্ট্ প্রধানমন্ত্রী হন। বিহারে শতকরা ৬২ আসন লাভ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ সিন্‌হা সরকার গঠন করেন। মধ্যপ্রদেশে শতকরা ৬৩ আসন লাভের পর ডাঃ খারে এবং পরবর্তীকালে শুকলা প্রধানমন্ত্রী হন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস শতকরা মাত্র ৩৮ আসন পেলেও ডাঃ খান সরকার গঠন করেন।

উড়িষ্যায় কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে। কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পূর্বে পার্লাকিবেদীর মহারাজা চার মাসের জন্যে (এপ্রিল-জুলাই) স্বল্পকালীন সরকার গঠন করেন। বিশ্বনাথ দাস জুলাই ১৯৩৭ থেকে অক্টোবর ১৯৩৯ পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পরিচালনা করেন। কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পর গভর্ণর শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৯৪১ এর শেষভাগে গোদাবরী মিশ্রর নেতৃত্বে কতিপয় সংসদ সদস্য কংগ্রেস হাই কমান্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং পার্লাকিবেদীর মহারাজাকে মন্ত্রীসভা গঠনে সহায়তা করেন। মহারাজা তিনজনকে নিয়ে—তিনি স্বয়ং, মিশ্র এবং একজন মুসলমান মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কংগ্রেস হাই কমান্ডের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও মন্ত্রীসভা কাজ চালিয়ে যায়।

প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস শাসন

ভারতের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সীমান্ত প্রদেশসহ সাতটিতে কংগ্রেসের প্রায় আড়াই বছরের শাসন (জুলাই ১৯৩৭ থেকে অক্টোবর ১৯৩৯) হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের এক অতি বেদনাদায়ক ইতিহাস। এসব প্রদেশে সকল ক্ষমতার চাবিকাঠি ছিল কংগ্রেসের হাতে। এ ক্ষমতার ব্যবহার কংগ্রেস কিভাবে করেছিল এবং তা রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে কি অশুভ পরিণাম ডেকে এনেছিল তা-ই এখন আলোচনা করে দেখা যাক।

কোয়ালিশন সরকার গঠনে অস্বীকৃতি

সাইত্রিশ সালের নির্বাচনের পর পরই মুসলিম লীগ সভাপতি মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

সংবিধান এবং মুসলিম লীগ পলিসি আমাদেরকে অন্যান্য দলের স্বার্থে সহযোগিতা করতে বাধা দেয় না। আমরা যে কোন দলের সাথে সহযোগিতা করতে পারি আইনসভার ভেতরেও এবং বাইরেও।

কিছু সংখ্যক কংগ্রেসপন্থীসহ সকলেই এ আশা পোষণ করছিলেন যে, হিন্দু প্রধান প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হবে। কিন্তু মুসলিম লীগের সাথে কোন প্রকার সহযোগিতা করতে কংগ্রেসের

অস্বীকৃতি এ আশা ফলবতী হতে দেয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ যুক্ত প্রদেশের অবস্থা এখানে বর্ণনা করা যেতে পারে। এখানে আইন সভায় মোট ২২৮ আসনের মধ্যে মুসলমানদের জন্যে ৬৪ আসন ছিল। তার মধ্যে কংগ্রেস লাভ করে একটি, মুসলিম লীগ ২৬, স্বতন্ত্র মুসলমান ২৮ এবং জাতীয় কৃষি দল ৯। এখানে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ কোয়ালিশন গঠনের বিষয় নিয়ে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হয়। অবশেষে কংগ্রেস হাই কমান্ডের অন্যতম সদস্য মাওলানা আবুল কালাম আজাদ মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে জানিয়ে দেন কোন্ কোন্ শর্তে প্রাদেশিক সরকারগুলোতে মুসলিম লীগ যোগদান করতে পারে। শর্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. ইউপি আইন পরিষদে মুসলিম লীগ কোন পৃথক দল হিসাবে কাজ করবে না।

২. ইউপি আইন পরিষদের বর্তমান মুসলিম লীগ দল কংগ্রেসের অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে, কংগ্রেস পার্টির সদস্য হিসাবে তারা পার্টির অন্যান্য সদস্যদের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। পার্টির আলোচনায় অংশগ্রহণের অধিকারও তাদের থাকবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। প্রত্যেক সদস্যের একটি মাত্র ভোট দানের অধিকার থাকবে।

৩. আইন পরিষদের সদস্যদের জন্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে নীতি নির্ধারণ করবে এবং যেসব নির্দেশ দিবে, তা কংগ্রেস সদস্যগণ এবং এসব সদস্য মেনে চলবেন।

৪. ইউপি এবং মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড ভেঙ্গে দিতে হবে। ভবিষ্যতে কোন উপ-নির্বাচনে সে বোর্ড কোন প্রার্থী দিতে পারবে না। কোন আসন শূন্য হলে, কংগ্রেস যাকে নির্বাচনের জন্যে প্রার্থী মনোনীত করবে তাকেই সমর্থন করতে হবে।

৫. মন্ত্রীসভার সদস্যপদ এবং আইন সভার সদস্যপদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত যদি কংগ্রেস করে, তাহলে সে সিদ্ধান্ত মুসলিম লীগ থেকে আগত সদস্যগণ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

কংগ্রেস হাই কমান্ডের পক্ষ থেকে মুসলিম লীগকে প্রদত্ত উপরোক্ত শর্তগুলো ছিল হাস্যকর ও অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ফ্যাসিবাদী মানসিকতার

পরিচায়ক। সামান্যতম আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন কোন ব্যক্তি বা দল উপরোক্ত শর্তগুলোর কোন একটিও গ্রহণ করতে পারতো না। কারণ তা হতো আত্মঘাতী।

কংগ্রেসের এ অবিবেচনাপ্রসূত ঔদ্ধত্যের কারণ নির্ণয় করা মোটেই কষ্টকর নয়। মিঃ গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরু ভারতে একমাত্র কংগ্রেস ব্যতীত অন্য দলের অস্তিত্ব স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। এ দেশে কোন হিন্দু-মুসলিম সমস্যা আছে—একথাও তাঁরা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। জওহরলাল নেহরু ১২ই মে, ১৯৩৭ সালে চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে বলেন যে, তাঁর বিশ্বাস ভারতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যাটি শুধুমাত্র অল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবী, জমিদার ও পুঁজিপতিদের মধ্যে সীমিত, যাঁরা এমন এক সমস্যা সৃষ্টি করছেন যা জনগণ স্বীকার করেনা। আইনসভার ভেতরে মুসলমানদের একটা আলাদা দল থাকবে এমন ধারণার প্রতি তিনি বিদ্রূপ বান নিক্ষেপ করেন।

কংগ্রেস ঘোষিত নীতি অনুযায়ী নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের প্রতি আহবান জানানো হয় মন্ত্রীসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্যে নিজেদের দল ভেঙ্গে দিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করতে। যুক্ত প্রদেশে হাফেজ মুহাম্মদ ইব্রাহীম এবং বোম্বাইয়ে এম, ওয়াই, নূরী কংগ্রেস শপথনামায় স্বাক্ষর করে কংগ্রেস মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। উড়িষ্যায় কোন মুসলমানকে মন্ত্রীসভায় নেয়া হয়নি। মধ্য প্রদেশে জনৈক শরীফকে নেয়া হলেও পরবর্তীকালে তাঁকে সরিয়ে একজন হিন্দু নেয়া হয়।

কংগ্রেস প্রধান প্রদেশগুলোতে কোয়ালিশন সরকারের তো কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু অকংগ্রেস প্রধান প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসকে কোয়ালিশনে যোগদানের অনুমতি দেয়া হয়। এর ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির পথ করে দেয়া হয়। বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ১৯৩৮ সালে কোলকাতা মুসলিম লীগ সম্মেলনে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে বলেন, কংগ্রেস বারবার এই বলে চাপ সৃষ্টি করছিল যে মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে ,কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করলে তা হবে অধিকতর স্থিতিশীল। সিন্ধুতে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের (Communal Award) বদৌলতে হিন্দুরা যে কৌশলগত সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিলেন, তার ফলে সিন্ধু আইন পরিষদে মুসলিম লীগ দল গঠনে তাঁরা বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অকংগ্রেস মন্ত্রীসভা কংগ্রেসের খপ্পরে পড়ে অপসারিত হয়। কংগ্রেস চাচ্ছিল অন্যান্য সকল দল ভেঙ্গে

দিয়ে দেশের একমাত্র দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে। কংগ্রেস 'একদেশ-একদল-এক নেতার' নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। এ নেতৃত্ব ছিল মিঃ গান্ধীর হাতে। সকল কংগ্রেস সরকার প্রতিটি নীতি নির্ধারণে গান্ধীর শরণাপন্ন হতো এবং তাঁর নির্দেশ বেদবাক্যের মতো মেনে নিত। কোন সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হোক, গভর্ণরের সাথে কোন দ্বন্দ্ব-কলহ হোক, অথবা সাধারণ কোন নীতি পলিসি গ্রহণের বিষয় হোক, কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোর প্রধানমন্ত্রীগণ তাঁর (গান্ধীজির) শরণাপন্ন হতেন নির্দেশ-উপদেশ লাভের উদ্দেশ্যে। মিঃ গান্ধী ভাইসরয়ের সাথে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আলাপ আলোচনা করতেন। কিন্তু নিজেকে দেখাতেন একজন নিরপেক্ষ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক হিসাবে। কংগ্রেসের উপর তাঁর একনায়কসুলভ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রকাশিত থাকলেও কংগ্রেসের সদস্য তালিকায় তাঁর নাম ছিলনা। তাঁর জনৈক গুণগ্রাহী শেঠ গোবিন্দ দাস বলেন, কংগ্রেসীদের নিকটে গান্ধীর পদমর্যাদা ছিল ফ্যাসিষ্টদের নিকটে মুসোলিনির, নাৎসীদের নিকটে হিটলারের এবং কমিউনিষ্টদের নিকটে ষ্টালিনের পদমর্যাদার মতোই (Muslim Separatism in India, Abdul Hamid p. 218)

কংগ্রেসের মধ্যে সংসদীয় মানসিকতা অক্ষুণ্ণ থাকবে—কংগ্রেসের এ দাবী ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। কারণ কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ না নির্বাচকমন্ডলীর কাছে, আর না আইনসভার কাছে দায়ী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বশংবদ প্রজার ন্যায়। মধ্য প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ খারের এবং কোলকাতার সুভাস চন্দ্র বোসের সাথে কংগ্রেস হাই কমান্ডের আচরণ তার একনায়কত্বই প্রমাণ করে।

সুভাস চন্দ্র বোস ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তী বছরেও তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যথারীতি নির্বাচিত হন। কতিপয় কংগ্রেস নেতা তাঁর পদপ্রার্থিতার বিরোধিতা করেন এবং নির্বাচনে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। অনেকের ধারণা মিঃ গান্ধীর নির্দেশেই এ প্রতিবন্ধকতা করা হয়। মিঃ বোসের বিজয়কে গান্ধীজির পরাজয় মনে করা হয়। কংগ্রেসের কার্যকরী সংসদের সদস্যগণ একযোগে পদত্যাগ করেন। অবশেষে গান্ধীকে খুশী রাখার জন্যে কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতিকে অপসারিত করা হয়।

কংগ্রেস শাসন এবং মুসলমান

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার শাসন মুসলমানদের জন্যে ছিল এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। এসব প্রদেশে মুসলিম লীগকে নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠনে কংগ্রেসের অস্বীকৃতি মুসলমানদের জন্যে ছিল সাবধান বাণী। কিন্তু বাস্তবে কংগ্রেস যখন এসব প্রদেশে তাদের পরিকল্পিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকর করে, তখন মুসলমানগণ যা ভয় করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্বিষহ অবস্থার সম্মুখীন হয়। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সভ্যতা সংস্কৃতি বিলুপ্তির চরম আশংকা দেখা দেয় এবং সামাজিক প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকেও পরিকল্পিতভাবে তাদেরকে অপসারিত করার অভিযান শুরু হয়। এমনকি কংগ্রেস শাসনের অধীন তাদের জানমাল ইজ্জত আবরুও একেবারে লুণ্ঠিত হতে থাকে।

কংগ্রেস সরকার ও হিন্দু জনসাধারণের যেসব আচরণ মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবাবেগ মারাত্মকভাবে আহত করে তা হলো— 'বন্দে মাতরম' সংগীত, নামাজের আজানে বাধা দান, নামাজরত অবস্থায় নামাজীদের উপর আক্রমণ, মসজিদের সম্মুখ দিয়ে বাদ্যসহ শোভাযাত্রা পরিচালনা, গরুর গোশত নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি।

আইনসভার দৈনিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মুসলমানদের বাধাদান সত্ত্বেও অনিবার্যরূপে 'বন্দে মাতরম' সংগীত গাওয়া হতো। বংকিম চন্দ্র চ্যাটার্জি ১৮৮২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'আনন্দ মঠ' নামক উপন্যাসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের রণধ্বনি হিসাবে 'বন্দে মাতরম' সংগীত রচনা করেন। ১৯০৫ সালের পর হিন্দুদের 'বংগভংগ রদ' আন্দোলনে বন্দে মাতরম' জাতীয় সংগীত হিসাবে গাওয়া হয়। এ গানের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা।

যেসব মুষ্টিমেয় মুসলমান সরকারী চাকুরীতে ছিলেন তাঁদের মানসম্মান ও প্রভাবপ্রতিপত্তি শুধু ক্ষুণ্ণই করা হলো না, বরঞ্চ তাঁদের চাকুরীর মেয়াদকাল হুমকির সম্মুখীন করা হলো। বহু ঘটনার মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। মধ্য প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন যে, তাঁর মন্ত্রীসভা প্রদেশের একমাত্র মুসলমান বেসামরিক জেলা অফিসারের চাকুরী স্থায়ীকরণের বিষয়টির চরম বিরোধিতা করে। এর একমাত্র

কারণ ছিল এই যে তিনি ছিলেন একজন মুসলমান।

মুসলিম জনসাধারণ তাদের হিন্দু প্রতিবেশী এবং প্রশাসনযন্ত্রের চরম স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হয়ে পড়েছিল। মধ্য প্রদেশের কোন কোন বস্তিতে মুসলমানদের ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং মুসলিম মহিলাদের ইজ্জত আবরু লুণ্ঠন করা হয়। একটি গ্রামের দেড়শ' জন পুরুষ মুসলমানকে হত্যার অভিযোগে কয়েকদিন যাবত পানাহারের সুযোগ ব্যতীত থানায় আবদ্ধ রাখা হয়, নানানভাবে অপমানিত ও নির্যাতিত করা হয়। পরে কোর্ট তাঁদেরকে বেকসুর মুক্তি দান করে। মধ্য প্রদেশের মন্ত্রীগণ কোর্টে অভিযুক্ত মুসলমানদের বিচার চলাকালে (in sub judice cases) মতামত ব্যক্ত করতেন—যার ফলে বিচারকগণ অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতেন। নাগপুর হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি একটি মামলার রায়ে নির্ভিক চিত্তে একথা বলেন যে, পুলিশ, কংগ্রেস নেতা, ম্যাজিস্ট্রেট, হাকিম এবং মন্ত্রী একযোগে নিরপরাধ মানুষকে ফাঁসিমঞ্চের দিকে ঠেলে দিত। এসব হতভাগ্যদের মুসলমান হওয়া ছাড়া আর কোন অপরাধ ছিলনা। (Muslim Separatism in India, Abdul Hamid p. 122)

কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলমানগণ যে নানানভাবে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছিলেন, তার প্রতিকার কল্পে ২০শে মার্চ, ১৯৩৮ এ অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। পীরপুরের রাজা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাহদীকে সভাপতি করে আট সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি উক্ত বছরের ১৫ই নভেম্বর তার পূর্ণাংগ রিপোর্ট পেশ করে। ব্যক্তিগতভাবে সরেজমিনে তদন্ত করেই এ রিপোর্ট পেশ করা হয়।

পরবর্তী বছরের মার্চ মাসে শরীফ রিপোর্ট নামে আর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বিহার প্রদেশে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের নির্যাতনের কাহিনী বর্ণিত হয় এ রিপোর্টে। কংগ্রেস সরকারগুলোর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগপূর্ণ আর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে। এ রিপোর্টের প্রণেতা ছিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক।

এ তিনটি তথ্যপূর্ণ ও মূল্যবান দলিলপত্র এবং সমসাময়িক মুসলিম পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনাবলীর ফাইল কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলোর অগণতান্ত্রিক ও মুসলিম বিদ্বেষী ভূমিকার বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভিযোগের

মৌলিক উপকরণ ও মালমশলা উপস্থাপন করে। যেহেতু কংগ্রেস শাসনের স্বাভাবিক মেজাজ প্রকৃতি পরবর্তীকালে পাকিস্তানের ধারণা–মতবাদকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল এবং অখণ্ড ভারতের মতাদর্শ থেকে মুসলমানদেরকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল, সেজন্যে তদন্ত রিপোর্টে উদ্‌ঘাটিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করার এবং তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে।

পীরপুর রিপোর্ট

পীরপুর রিপোর্টে নিম্ন বিষয়গুলোর উপর জোর দেয়া হয়েছে ঃ

১. কংগ্রেস সরকার সংখ্যালঘুদের (মুসলমানদের) ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা দানে ব্যর্থ হয়েছে।

২. কংগ্রেস একটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন বলে প্রমাণিত।

৩. ক্ষমতামদমত্ত কংগ্রেসের রুদ্ধদ্বার নীতি (Closed door policy) অবলম্বন এবং কোয়ালিশন সরকার গঠনে অস্বীকৃতি হিন্দু–মুসলিম সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটিয়েছে।

৪. কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদের ধারণা অনুযায়ী সংখ্যাগুরুর শাসন ও অবিচার উৎপীড়ন থেকে অধিকতর উৎপীড়ন আর কিছু হতে পারেনা।

৫. মুসলিম লীগের কাছে অত্যন্ত অবমাননাকর প্রস্তাব পেশ ঃ যেমন মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি ভেঙ্গে দাও, আইনসভায় লীগদল ভেঙ্গে দিয়ে দ্বিধাহীনচিত্তে কংগ্রেস শপথনামায় স্বাক্ষর কর, ইত্যাদি।

৬. মুসলমানদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে গণসংযোগ আন্দোলন (Mass Contact Movement) এবং কতিপয় মুসলমানকে নানানভাবে খরিদ করে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লাগানো এবং

৭. কংগ্রেস শাসনাধীন প্রদেশগুলোতে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং মুসলমানদের জান–মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি।

ফজলুল হক সাহেবের বিবৃতি

কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলোর পদত্যাগের পর পরই বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব এ, কে, ফজলুল হক যে বিবৃতি দান করেন তা একটি প্রচারপত্রের আকারে পুনঃ প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর বিবৃতিতে বলেন ঃ

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস মারমুখো হিন্দুদেরকে চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের জন্যে মাঠে নামিয়েছে। সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর কংগ্রেস তার ইচ্ছা ও সংকল্প চাপিয়ে দেয়ার জন্যে এ কাজ শুরু করেছে। কংগ্রেস কি চায়? চায় যে, গোমাতা সংরক্ষিত হোক, মুসলমানদেরকে গোমাংস ভক্ষণ করতে দেয়া যাবেনা। মুসলমানদের ধর্মকে অবনত ও দমিত করে রাখতে হবে। কারণ এটা কি হিন্দুদের দেশ নয়?

তারপর শুরু হলো আযানের উপর বাধা নিষেধ। মসজিদে নামাযীদের উপর আক্রমণ। নামাযের সময়ে মসজিদের সম্মুখ দিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে বাজনা বাজিয়ে মিছিল পরিচালনা। দুঃখজনক ঘটনা পাল্টা দুঃখজনক ঘটনা ডেকে আনবে এতে আশ্চর্যের কি আছে?

তারপর বিবৃতিতে বিহারে সংঘটিত বাহাত্তরটি, যুক্ত প্রদেশে তেত্রিশ এবং মধ্য প্রদেশের কতকগুলি দুর্ঘটনার উল্লেখ করা হয়। কোন মুসলমান কোথাও একটি গরু কুরবানীর জন্যে জবাই করলে মুসলমানদের হত্যা করা হয়, তাদের বাড়ি–ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং মুসলিম নারী ও শিশুর উপর নির্যাতন চালানো হয়। এসবের কোন প্রতিকার করা হয় না। ফলে সংখ্যালঘু মুসলমানগণ বড়ো দুঃসহ জীবন যাপন করতে থাকে।

কংগ্রেস শাসনের অধীন মুসলমানদের চরম দুর্দশা বর্ণনা করে জনাব ফজলুল হক যে বিবৃতি দেন, হিন্দু পত্রিকাগুলো তা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। বরঞ্চ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগ ফলাও করে প্রকাশ করতে থাকে। (I. H. Qureshi—The Struggle for Pakistan, A. Hamid—Muslim Separatism in India)

শিক্ষার অংগনেও মুসলমানদের উপর চরম অন্যায় অবিচার শুরু হয়েছিল যার জন্যে মুসলিম সুধীবৃন্দ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে পড়েন। ব্রিটিশ শাসন আমলে মুসলমানগণ শিক্ষা ক্ষেত্রে খুবই পশ্চাদপদ ছিলেন যার জন্যে তাঁদেরকে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। কংগ্রেস শাসন আমলে তাদের শিক্ষানীতি তাদেরকে দারুণভাবে শংকিত ও বিচলিত করে। ১৯৩৮ সালের শেষভাগে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিলভারত মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্সের (All India Muslim Educational Conference) ৫২–তম অধিবেশনে নবাব কামাল ইয়ার জং বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

উদ্দেশ্য ছিল ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা এবং মুসলিম শিক্ষার একটি স্কীম তৈরী করা যাতে তাদের সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলী সংরক্ষিত হয়। বাংলার আইন পরিষদের স্পীকার এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আজিজুল হকের নেতৃত্বে একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। সাব কমিটি সঠিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান সফর করেন এবং ১৯৪২ সালে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেন। বিদ্যামন্দিরগুলোতে যে ওয়ার্ধা স্কীম অব এডুকেশন চালু করা হয়েছিল, রিপোর্টে তার তীব্র সমালোচনা করা হয়। বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশে এ এক জঘন্য আকার ধারণ করে। মুসলমানদের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী এ শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখা হয়। এ শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকর করার জন্যে মধ্য প্রদেশ আইনসভায় একটি বিল পেশ করা হয়। সকল মুসলিম সদস্য এবং ডাঃ খারে সহ কতিপয় হিন্দু সদস্য বিরোধিতা করেন। সকল বিরোধিতা উপেক্ষা করে বিলটি পাশ করা হয়।

এ ব্যবস্থার অধীনে যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচিত হবে। মুসলিম স্কুলগুলোর জন্যে কোন বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মিঃ গান্ধীর প্রতিকৃতির সামনে হিন্দুদের পূজা অর্চনার ভংগীতে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াতে হতো এবং তাঁর (মিঃ গান্ধীর) বন্দনা গাইতে হোত। এ মূল পরিকল্পনা—ওয়ার্ধা স্কীম ছিল গান্ধীমানসিকতার সৃষ্টি। শিশুদের মনে হিন্দু ধর্মীয় ভাবধারা অংকিত করা এবং হিন্দু পৌরাণিক মনীষীদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি করা। এভাবে মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও পরম্পরাগত ঐতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখাই ছিল এ শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য। কংগ্রেস শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতি ছাড়াও এর কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ও মুসলমানদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বোম্বে প্রদেশে স্কুলগুলোতে বহু নতুন প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক প্রচলিত করা হয়। স্থানীয় শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এসব পুস্তক থেকেই পাঠ্যতালিকা তৈরী করতেন। মুসলমানদের প্রবল আপত্তি ছিল এই যে, এসব পুস্তকে হিন্দু ঐতিহ্য ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির প্রশংসা করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র হিন্দুয়ানি শব্দমালা ব্যবহার করা হয়েছে।

বোম্বে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে যে, এ ধরনের প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের দ্বারা কংগ্রেস মুসলমানদের ভবিষ্যত

প্রজন্মকে তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রেখে এবং তাদের কচিকাঁচা মনকে হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতির ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে ভারতে মুসলিম সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংস করতে চায়।

বোম্বে মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মুসলমান সদস্যগণ প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রত্যাহার করার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। প্রতিবাদে মুসলিম লীগ সদস্যগণ অধিবেশন থেকে 'ওয়াক আউট' করেন। কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলোর পদত্যাগের পর, উর্দু টেক্সট বুক কমিটি পুনরায় উক্ত পাঠ্য পুস্তকগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তা পাঠের উপযোগী নয় বলে রিপোর্ট দেন এবং তার ফলে সেগুলো অনুমোদিত তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। (Times of India, dt. 11 and 26 July and 14 December, 1939)

উপমহাদেশের এগারোটির মধ্যে সাতটি প্রদেশে আড়াই বছরের কংগ্রেস শাসন এ কথাই প্রমাণ করে যে এখানে কংগ্রেস শাসনের অধীনে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সভ্যতা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যসহ অস্তিত্বই মুছে ফেলার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে মিঃ জিন্নাহ বলেন, কংগ্রেস সমগ্র উপমহাদেশে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, যে কেউ ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত সময়কালের ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপট পর্যবেক্ষণ করলে তিনি দেখতে পাবেন যে, কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এ দেশ থেকে অন্য সকল সংগঠন নির্মূল করে একটি অতি নিকৃষ্ট ধরনের ফ্যাসিবাদী সংগঠন কায়েম করা। এমতাবস্থায় ভারতে একটি সংসদীয় সরকার পরিচালনা করা অসম্ভব। এখানে গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে হিন্দুরাজ। এ অবস্থা মুসলমানগণ কিছুতেই মেনে নিতে পারেনা। [Jamiluddin Ahmad (Ed.) —Some Recent Speeches & Writings of Mr. Jinnah (Lahore, 1952]

কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলোর মুসলিম বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে নিরপেক্ষ মহলও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, এখানে সংখ্যাগুরুর শাসনে মুসলমানদের আশংকা অমূলক নয়। জনৈক ভারতীয় খৃষ্টানের মতে কংগ্রেস হচ্ছে জার্মানীর নাৎসী পার্টির ভারতীয় সংস্করণ। (Rev. Pitt Banarjee—Letter of Manchester Guardian, 18 August 1942; I.H. Qureshi —The Struggle for Pakistan)

বিভিন্ন পত্রিকার অভিমত

কংগ্রেসের সাতটি প্রদেশে সরকার গঠনের ফলে হিন্দু জাতীয়তা কেমন উগ্ররূপ ধারণ করে ও সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বৃদ্ধি পায় সে সম্পর্কে কোলকাতার ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা লেখে ঃ প্রত্যেক ভারতপ্রেমিক বিচলিত হবেন এই দেখে যে, প্রাদেশিক অটোনমি স্থাপিত হওয়ার দরুন কী ভয়ানক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইকনমিস্ট পত্রিকা মন্তব্য করেন, প্রদেশগুলোকে সরাসরি দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—মুসলিম ভারত ও কংগ্রেস ভারত। টাইমস্‌ অব ইন্ডিয়ার একজন প্রাক্তন সম্পাদক বলেন—সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের সন্দেহ শংকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৩৯ সালে ভারত সচিব বেসরকারীভাবে ভারত ভ্রমণ করে বলেছিলেন, হিন্দু মুসলিম বিরোধ কেবল ধর্মীয় কারণে নয়, জীবনধারায় দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ানক পার্থক্য রয়েছে। কংগ্রেসী প্রাদেশিক সরকারগুলো সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে শাসন চালাতে থাকে। এজন্যে এমন সার্বিক কংগ্রেসী প্রতাপের অভিব্যক্তিতে বৃটেনের কংগ্রেস সমর্থকগণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। কংগ্রেসের হিন্দুকরণ নীতি, বন্দে মাতরম সংগীত ও গান্ধীর প্রতিকৃতি পূজা শিক্ষাংগনে প্রবর্তন প্রভৃতি সহজেই প্রমাণ করে যে নতুন শাসন ব্যবস্থায় পুরোপুরি হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। (The British Achievement in India : A Survey, Rawlinson; p. 214; মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, আবদুল মওদূদ, পৃঃ ২৮৭)

হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ অন্য কোন সম্প্রদায় এবং বিশেষ করে মুসলমানদের কিছুতেই বরদাশ্‌ত করতে রাজী নয়। যার কারণে ভারতে হিন্দু-মুসলিম মিলন সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে মুসলমানগণ মোটেই দায়ী নন। মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে হিন্দুভারত সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু এ কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন যে তিনি ছিলেন হিন্দু মুসলিম মিলনের অগ্রদূত? তিনি বহু বছর ধরে এ মিলনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে নিরাশ হয়ে ভারতভূমি ত্যাগ করেন এবং আর কোন দিন ভারতে আসবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু পরে তাঁকে মুসলমানদের ন্যায্য দাবী ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামের লক্ষ্যে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয়।

হিন্দু মুসলিম মিলন তো দূরের কথা হিন্দুদের চরম মুসলিম-বিদ্বেষের কারণে ১৯২০ সাল থেকে সাত আট বছর সাম্প্রদায়িক দাংগায় সারা দেশ জর্জরিত হয়। ১৯২৩ সালে ১১টি, ১৯২৪ সালে ১৮টি, ১৯২৫ সালে ১৬টি, ১৯২৬ সালে ৩৫টি এবং ১৯২৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৩১টি বিরাট দাংগা অনুষ্ঠিত হয়। ফোর্ট নাইট্‌লী রিভিউতে জনৈক ইংরেজ লেখেন, হিন্দু ও মুসলমানের মিলন পৃথিবীর আরও অনেক অসম্ভব জিনিসের মতো একটা অসম্ভব ব্যাপার। এশিয়াটিক রিভিউ পত্রিকায় জনৈক প্যাটিক ফ্যাগান লেখেন, পরাধীন ভারতের মুসলমানের দুটি পথ খোলা আছে—হয় হিন্দু জাতিতে লীন হয়ে যাওয়া, না হয় দৈহিক শক্তি বলে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করা। (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, আবদুল মওদূদ-২৮৬)

ভারতে সাম্প্রদায়িক দাংগা-হাংগামা কোন বছরই বন্ধ থাকেনি। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে এসব দাংগা সংঘটিত হয়। একথাও সত্য যে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায় এসব দাংগার উদ্যোক্তা এবং তারাই মূলতঃ দায়ী। কিন্তু মিঃ গান্ধী চোখ বন্ধ করে সকল ক্ষেত্রেই মুসলমানদেরকে দায়ী করেছেন। ফলে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

আড়াই বছরের কংগ্রেসী শাসনে যে হিন্দু রামরাজ্যের নমুনা স্থাপিত হয়েছিল এবং মুসলমানদের ভাগ্যে যে চরম দুর্দশা নেমে এসেছিল তার কিঞ্চিৎ আলোচনা উপরে করা হয়েছে। এ সময়ে, ১৯৩৮ সালে সুভাসচন্দ্র বোস কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁকে অন্যান্যের তুলনায় খানিকটা উদারচেতা মনে করা হতো। তাঁর সাথে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর দীর্ঘ পত্র বিনিময় হয়। কায়েদে আজম বারবার মিঃ সুভাসচন্দ্র বোসকে একথা বলেন যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একত্রে মিলিত হয়ে সকল বিবাদ ও মতপার্থক্যের মীমাংসা করা হোক। কায়েদে আজম কংগ্রেস মুসলিম লীগ তথা হিন্দু মুসলিম মিলনের সর্বশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু সুভাস বোস কায়েদে আজমের পত্রের জবাবে বলেন ঃ

লীগের সাথে আলাপ আলোচনার ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটির করার আর কিছু নেই। (Muslim Political Thought through the Ages 1562-1947- G. Allana Moqbul Academy, Lahore, P-242)

কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৩৮ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বলেন ঃ

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চান যে মুসলমান ভারতে হিন্দুরাজ শর্তহীনভাবে মেনে নিক। · · · আপনারা অবশ্যই জানেন যে কংগ্রেস ফ্যাসীবাদী প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব করার উদ্দেশ্যে হিন্দু মুসলিম সমঝোতার সকল পথ রুদ্ধ করেছে। তিনি বলেন, ভারতে চারটি শক্তি ক্রিয়াশীল— (১) ব্রিটিশ, (২) ভারতীয় রাজ্যের শাসকবৃন্দ, (৩) হিন্দু এবং (৪) মুসলমান। কংগ্রেস পত্র-পত্রিকা যতোই ফলাও করে প্রকাশ করুক না কেন; সকালে, দুপুরে, বিকেলে ও রাতে তাদের সংস্করণ বের করুন এবং কংগ্রেস নেতারা যতোই গলাবাজি করুন যে, কংগ্রেস একটি জাতীয় সংগঠন, আমি বলি তা মোটেই সত্য নয়। এ একটা হিন্দু সংগঠন ব্যতীত কিছু নয়। এটাই সত্য কথা এবং কংগ্রেস নেতারা তা ভালো করে জানেন। এতে কয়েকজন মাত্র—কয়েকজন বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট—কয়েকজন মুসলমান খারাপ মতলবে সংশ্লিষ্ট থাকলেই তা জাতীয় সংগঠন হয় না, হতে পারে না। কংগ্রেস প্রধানতঃ একটি হিন্দু সংগঠন এবং আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি কেউ তা অস্বীকার করুক দেখি। আমি জিজ্ঞেস করি কংগ্রেস কি মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে?

শ্রোতাগণ সমস্বরে জবাব দেন—না, না, না।

আমি জিজ্ঞেস করি—কংগ্রেস কি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে? তফসিলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে? অব্রাহ্মণদের প্রতিনিধিত্ব করে? জনগণ প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে সমস্বরে বলে না, না, না।

তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস সকল হিন্দুরও প্রতিনিধিত্ব করেনা। হিন্দু মহাসভা-লিবারাল ফেডারেশন-এদেরও প্রতিনিধিত্ব করেনা। তবে নিঃসন্দেহে কংগ্রেস একটি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। এছাড়া আর কিছু নয়।

তিনি বলেন, দেশের জন্যে দুর্ভাগ্য যে, কংগ্রেস হাইকমান্ড অন্যান্য সম্প্রদায় ও সংস্কৃতি নির্মূল করে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে একেবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

কায়েদে আজম অতঃপর একটি একটি করে কংগ্রেসের ভূমিকার উল্লেখ করে প্রমাণ করেন যে, কংগ্রেস জাতীয় সংগঠন নয়। তিনি বলেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এসে কি করে? জাতীয়তাবাদের ভান করলেও 'বন্দে মাতরম' দিয়ে কাজ শুরু করে। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, 'বন্দে মাতরম' জাতীয় সংগীত নয়।

তথাপি তা জাতীয় সংগীত হিসাবে গাওয়া হয় এবং অন্যান্যদের উপরও চাপিয়ে দেয়া হয়। এ শুধু তাদের দলীয় সমাবেশেই গাওয়া হয় না। বরঞ্চ সরকারী ও মিউনিসিপাল স্কুলগুলোতেও তা গাইতে সকলকে বাধ্য করা হয়। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস তা গাইতে অনুমতি দিক না দিক, 'বন্দে মাতরম' জাতীয় সংগীত হিসাবে অবশ্যই মুসলমানদের মেনে নিতে হবে। এ হচ্ছে পৌত্তলিকতা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উদ্রেককারী স্তুতিগান।

তিনি বলেন, তারপর কংগ্রেস পতাকার কথাই ধরা যাক। এ ভারতের সর্বজনস্বীকৃত জাতীয় পতাকা নয়। তথাপি তার প্রতি প্রত্যেকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে এবং তা সরকারী বেসরকারী সকল গৃহে উত্তোলন করতে হবে। মুসলমানরা এ নিয়ে যতোই আপত্তি করুক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। কংগ্রেস পতাকা ভারতের জাতীয় পতাকা হিসাবে অবশ্যই উত্তোলন করতে হবে এবং মুসলমানদের উপর তা জোর করে চাপিয়ে দিতে হবে। অতঃপর তিনি হিন্দী হিন্দুস্থানী স্কীম সম্পর্কে বলেন যে, উর্দুকে দাবিয়ে রাখা ও তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

ওয়ার্ধা শিক্ষা প্রকল্প

মিঃ গান্ধীর সকপোলকল্পিত ওয়ার্ধা শিক্ষা প্রকল্পের (Wardha Scheme of Education) ভয়াবহ পরিণাম উপরের আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে।

কায়েদে আজম তাঁর ভাষণে বলেন ঃ আজকাল হিন্দু মানসিকতা ও দৃষ্টিভংগী সতর্কতার সাথে পরিপুষ্ট করা হচ্ছে এবং মুসলমানদেরকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে হিন্দু আদর্শ ও ভাবধারা অবলম্বনে বাধ্য করা হচ্ছে। মুসলমানরা কি কোথাও এ ধরনের কোন কিছু করছে? কোথাও কি তারা হিন্দুদের উপর মুসলিম সংস্কৃতি চাপিয়ে দিচ্ছে? বরঞ্চ মুসলমানদের উপর হিন্দু সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে তারা সামান্য প্রতিবাদ ধ্বনি করলেই তাদেরকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করা হয়। তাদেরকে বলা হয় শান্তি বিনষ্টকারী এবং সঙ্গে সঙ্গেই স্বৈরাচারী সরকারী প্রশাসন যন্ত্র তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে পড়ে। বিহারে সংঘটিত ঘটনাবলীর কথাই ধরুন না কেন, কংগ্রেস সরকারের অধীন কাদের সংস্কৃতির উপর আঘাত হানা হয়েছে? মুসলমানদের। কাদের বিরুদ্ধে দমননীতি অবলম্বন করা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে এবং কাদেরকে গ্রেফতার

করা হয়েছে? মুসলমানদের বিরুদ্ধেই এসব কিছু করা হয়েছে। কিন্তু এমন একটি দৃষ্টান্তও কি কেউ পেশ করতে পারে যে মুসলিম লীগ অথবা কোন মুসলমান মুসলিম-সংস্কৃতি হিন্দুদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে? (Creation of Pakistan, Justice Syed Shameem Hossain Kadir, pp. 139-143)

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম লীগ-কংগ্রেস আলোচনা

উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সাথে সমঝোতায় আসার বহু চেষ্টা করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের সাথে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর কয়েক দফা বৈঠক হয়। কিন্তু এসব বৈঠকে কোন লাভ হয়নি। সর্বশেষ উভয় নেতার পক্ষ থেকে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়, তাতে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট সকল দলের নিকট গ্রহণযোগ্য সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করে যে প্রচেষ্টা চালানো হয় তা অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় বলে তাঁরা দুঃখিত।

আটত্রিশের শুরুতে জিন্নাহ-গান্ধীর মধ্যে পত্র বিনিময় হয়। উভয় দলের মধ্যে যে মৌলিক মতপার্থক্য ছিল, তা এ পত্র বিনিময়ের দ্বারা সুস্পষ্ট হয়। কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ তেসরা মার্চ ১৯৩৮ মিঃ গান্ধীর নিকটে যে পত্র লেখেন, তাতে দুটি বাক্যে তিনি তাঁর আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলমানদের একমাত্র নির্ভরশীল ও প্রতিনিধি মূলক দল হিসাবে মেনে নিন এবং অপর দিকে আপনি কংগ্রেস ও সারা দেশের প্রতিনিধিত্ব করুন। একমাত্র এর ভিত্তিতে আমরা সম্মুখে অগ্রসর হতে পারি এবং অগ্রগতির প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে পারি। জবাবে মিঃ গান্ধী ৮ই মার্চ বলেন, যে অর্থে আপনি বলছেন, সে অর্থে আমি কংগ্রেস অথবা হিন্দু কোনটারই প্রতিনিধিত্ব করি না। তবে সম্মানজনক সমাধানে পৌছার জন্যে আমি হিন্দুদের প্রতি আমার নৈতিক প্রভাব খাটাব। (The full Text of Jinnah-Gandhi letters in Durlab Singh, pp. 16-32. The Struggle for Pakistan-I.H. Qureshi, p. 109)

মিঃ গান্ধীর উপরোক্ত জবাবে কোন সত্যতা ও আন্তরিকতা ছিলনা। কোন একটি সংগঠনের ঘোষিত নীতি-পলিসি যাই হোক না কেন, তার সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায় তার বাস্তব কার্যকলাপ ও আচার আচরণে। কংগ্রেস যে

পরিপূর্ণ একটি হিন্দু সংগঠন ছিল তা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। কংগ্রেসের আচার আচরণে সর্বদা হিন্দু চেতনা ও স্বার্থেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ভারতে খেলাফত আন্দোলনে কংগ্রেসের সহযোগিতার কারণে কারো মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু সে সহযোগিতায় কোন আন্তরিকতা ছিলনা। তাতে দুরভিসন্ধিই লুকায়িত ছিল, গান্ধীজির নিজের উক্তিই তার প্রমাণ। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি, খেলাফত আমাদের দুজনের নিকট কেন্দ্রীয় বিষয়—মুহাম্মদ আলীর নিকট এটা তাঁর ধর্ম। আর আমার নিকট হচ্ছে খেলাফতের জন্যে জীবনপাত করে আমি গো–নিরাপত্তা নিঃসংশয় করছি। অর্থাৎ আমার ধর্মকে মুসলমানের ছুরিকা থেকে রক্ষা করছি। (S.K. Majumder: Jinnah & Gandhi, p. 61; মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, আবদুল মওদুদ–পৃঃ ১৬৮)

নিজউ ক্রনিক্‌ল–এর প্রতিনিধির কাছে মিঃ গান্ধী বলেন, এখানে একটি মাত্র দল আছে যা উন্নতি ও কল্যাণ করতে পারে। আর তা হলো কংগ্রেস। কংগ্রেস ব্যতীত আর অন্য কোন দল আমি মেনে নিতে রাজী না।

তিনি আরো বলেন, যে কোন মন্দ নামেই ডাকুক, ভারতে একটি মাত্র দল আছে এবং তা হলো কংগ্রেস। (Muslim Separatism in India, Abdul Hamid, p. 217)

কায়েদে আজম পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর সাথেও পত্র বিনিময় করেন। উল্লেখ্য যে, প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর নির্বাচনের পর পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেছিলেন, দেশে মাত্র দুটি দল আছে— কংগ্রেস এবং সরকার। আর যারা আছে তাদেরকে অবশ্যই কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। যারা আমাদের সাথে নেই, তারা আমাদের বিরোধী। (Muslim Separatism in India, Abdul Hamid, p. 217)

জওহরলাল নেহরুর ফ্যাসীবাদী মনমানসিকতা জানা সত্ত্বেও কায়েদে আজম উভয় দলের মধ্যে একটা আপোস নিষ্পত্তির জন্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। পন্ডিত নেহরু ৬ই এপ্রিল (১৯৩৮) তারিখে লিখিত দীর্ঘ পত্রে কায়েদে আজমের সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস 'বন্দে মাতরম' সংগীত ত্যাগ করতে রাজী নয়। কারণ একটা জাতীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে এ ধরনের কিছু করা সংগত হবে না। কংগ্রেস পতাকা ব্যবহারেও তো কারো কোন আপত্তি

দেখিনা। মুসলিম লীগ একটি গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক সংগঠন বিধায় তার সাথে আমরা সে ধরনের আচরণই করি। অন্যান্য মুসলিম সংগঠনগুলোকেও উপেক্ষা করা যায় না। অতএব মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র সংগঠন হিসাবে স্বীকার করার প্রশ্নই ওঠেনা।

পত্রে তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস উর্দুকে খর্ব করার কোন চেষ্টা করছে, অথবা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে তা আমার জানা নেই। কে এসব করছে? তিনি আরও বলেন, কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা বলতে কি বুঝায় তা আমার জানা নেই।

তাঁর কথার সহজ সরল অর্থ এই যে, প্রদেশগুলোতে মুসলিম লীগ অথবা অন্য কোন দলের সাথে ক্ষমতার অংশীদারিত্বে কংগ্রেস কিছুতেই রাজি নয়, এ কথায় সে অটল। পত্রের শেষে নেহরু বলেন, কোন চুক্তি বা সমঝোতা এবং এ ধরনের কোন কিছু ব্যক্তিগতভাবে আমি পছন্দ করি না।

সুভাসচন্দ্র বোস ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। গান্ধী–নেহরুর সাথে পত্রালাপে ব্যর্থতার পর কায়েদে আজম সুভাস বোসের সাথে পত্র বিনিময় করেন। মে মাসে কায়েদে আজম মিঃ বোসের লিখিত পত্র আলোচনার জন্যে মুসলিম লীগ কার্যকরী পরিষদে পেশ করেন। এর উপর যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে বলা হয় যে, হিন্দু মুসলিম মতবিরোধের মীমাংসা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কংগ্রেসের সাথে কোন আলোচনা করতে মুসলিম লীগ রাজি নয় যতোক্ষণ না মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের আস্থাভাজন এবং প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসাবে মেনে নেয়া হবে। তদনুযায়ী কায়েদে আজম মিঃ বোসের নিকটে দুসরা আগস্ট লিখিত পত্রে বলেন,

লাখ্‌নোতে ১৯১৬ সালে যে কংগ্রেস–মুসলিম লীগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের আস্থাভাজন ও প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসাবে মেনে নেয়া হয়। সে সময় থেকে ১৯৩৫ সালে জিন্নাহ–রাজেন্দ্রপ্রসাদ আলোচনা পর্যন্ত এ নিয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। যেসব মুসলমান কংগ্রেসে আছে, তাঁরা ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনা। মুসলিম লীগের এ কথাও জানা নেই যে, কোন মুসলিম রাজনৈতিক দল ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবী করেছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এর এক বিস্ময়কর জবাব আসে। অর্থাৎ মুসলিম লীগের কোন দাবীই কংগ্রেস মানতে রাজি নয়। (The Struggle for Pakistan, I. H. Qureshi, pp. 107-112)

কংগ্রেস-মুসলিম লীগের আলাপ আলোচনা ও পত্র বিনিময়ের ফলে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয় যা অতি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলোর বিরুদ্ধে অত্যাচার অবিচারের অভিযোগ কংগ্রেস অস্বীকার করে। দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেস হিন্দু মুসলিম সমস্যাকে কোন সমস্যাই মনে করেনা। তার মতে এ এক সাময়িক ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস। সময়ের পরিবর্তনে তা বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হবে। তৃতীয়তঃ কংগ্রেসের দাবী এই যে, তা সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন। কংগ্রেস একমাত্র অকৃত্রিম জাতীয় সংগঠন যা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতিনিধিত্ব করে। অনেক মুসলিম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসকে সমর্থন করে। শুধুমাত্র মুসলিম লীগ দূরে অবস্থান করছে। আর কত দিন তারা এভাবে থাকবে? হয়তো সত্বরই কংগ্রেসের সাথে ভিড়ে যাবে। অতএব মুসলিম লীগের দাবীর প্রতি গুরুত্বদানের প্রয়োজন কি?

কংগ্রেসের উপরোক্ত দৃষ্টিভংগী মুসলিম লীগের মধ্যে স্বভাবতঃই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং মুসলিম লীগকে ঐক্যবদ্ধ, সংহত ও শক্তিশালী করে। এ দীর্ঘ আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয় যে কংগ্রেস হিন্দু ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী একটি দল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রাখাই শুধু তার উদ্দেশ্য নয়, তাদেরকে নির্মূল করাও তার উদ্দেশ্য। বাল গংগাধর তিলকের আন্দোলন, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি আন্দোলন, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার রাজনৈতিক দর্শনের একই লক্ষ্য ছিল এবং তা হলো মুসলমানদেরকে দমিত ও বশীভূত করে রাখা অথবা নির্মূল করে হিন্দু রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

উল্লেখ্য ১৯০৬ সালে বংগভংগ রদ আন্দোলন চলাকালীন সারা ভারতে হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে 'শিবাজী উৎসব' পালন করা হয়। সকল হিন্দু সমাজ নেতা, রাজনীতিবিদ, কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী এ উৎসবে সানন্দে যোগদান করেন। এ উপলক্ষে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "শিবাজী উৎসব' লিখে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন কর্মে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেন এবং 'শুভশঙ্খনাদে জয়তু শিবাজী' উচ্চারণ করে এ ধ্যানমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন ঃ

> ধ্বজা ধরি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন—
> দরিদ্রের বল।
> এক ধর্মরাজ্য হবে 'এ ভারতে' এ মহাবচন
> করিব সম্বল।

রাজনীতি ও হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন অংগাংগীরূপে মিশে গেল। ধর্মীয় বোধের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় রাজনীতিকে গণআন্দোলনে রূপায়িত করার চেষ্টা হলো।

(B. B. Misra : The Indian Class : Their Growth), আবদুল মওদুদ : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে 'দি টাইম্‌সের' সংবাদদাতা স্যার ভ্যালেন্টাইন চিরলকে তাঁর এক মুসলমান বন্ধু বলেন, তিলক, তাঁর অনুসারিগণ এবং পাঞ্জাব ও বাংলার হিন্দু জাতীয়তাবাদীগণকে প্রকাশ্যে বলাবলি করতে শুনা যায় যে, অতীতে স্পেন থেকে যেভাবে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করা হয়, ঠিক তেমনি ভারত থেকে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করা হবে। স্যার ওয়াল্টার লরেন্সও অনুরূপ কথা বলেন। তিনি ছিলেন ভাইসরয় কার্জনের ষ্টাফ সদস্য। তিনি ইদোরের মহারাজা স্যার প্রতাপ সিংকেও অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করতে শুনেন। তিনি বলেন ঃ তিনি (স্যার প্রতাপ সিং) মুসলমানদেরকে ঘৃণা করতেন। কিন্তু আমার ভারত ত্যাগের পূর্বে তাঁর এ ঘৃণার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারিনি। লর্ড কার্জন আমার এবং আমার স্ত্রীর সম্মানে শিমলায় যে ডিনার দিয়েছিলেন তাতে যোগদানের জন্যে স্যার প্রতাপও শিমলা আগমন করেন। ডিনার শেষে স্যার প্রতাপ রাত দুটো পর্যন্ত তাঁর আশাআকাংখা ও অভিলাষ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন। তাঁর অভিলাষের মধ্যে একটি হলো ভারতের বুক থেকে মুসলমানদের নির্মূল করা। ... তিনি ভালো ইংরেজী জানতেন, বহু জাতির সাথে মিশেছেন, ছিলেন বিশ্বজনীন সভ্যতায় বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁর মহৎ হৃদয়ের তলায় ছিল মুসলমানদের জন্যে দুরপনেয় ঘৃণা।

(Sir Walter Lawrence : The India We Served, p. 209; Abdul Hamid : Muslim Separatism in India, pp. 83-84)

নিরপেক্ষ মন নিয়ে যিনিই উপমহাদেশের হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের চুলচেরা বিশ্লেষণে সক্ষম হয়েছেন, তাঁর কাছে মুসলমানদের সম্পর্কে উক্ত হিন্দু মানসিকতাই ধরা পড়েছে। তাই এশিয়াটিক রিভিউ পত্রিকায় প্যাট্রিক ফ্যাগান তাঁর এক লিখিত প্রবন্ধে বলেন, পরাধীন ভারতে মুসলমানের দুটি মাত্র পথ খোলা আছে, একটি হিন্দু জাতিতে লীন হয়ে যাওয়া অন্যটি দৈহিক শক্তি বলে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি করা। অবশেষে ভারতের দশ কোটি মুসলমানের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ সংগ্রাম ব্যতীত উপায়ান্তর রইলোনা।

চতুর্থ অধ্যায়

পাকিস্তান আন্দোলন

এ উপমহাদেশের বুকে 'পাকিস্তান' নামে মুসলমানদের একটি স্বাধীন সার্বভৌম আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সকল যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে অত্যন্ত ন্যায়সংগত। কারণ এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উপরেই ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের অস্তিত্ব একান্তভাবে নির্ভরশীল। পাকিস্তান আন্দোলনের দাবী একদিকে যেমন বৃটিশ সরকার মেনে নিতে পারেননি, অপরদিকে হিন্দুকংগ্রেসও শুধু মেনে নিতেই অস্বীকার করেনি, বরঞ্চ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বিরোধিতা করেছে। তথাপি উপমহাদেশের দশকোটি মুসলমানের ক্রমাগত সাত বছর যাবত ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলে এবং লক্ষ লক্ষ মুসলিম নরনারীর রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তান নামে একটি স্বাধীন দেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। এ পাকিস্তান আন্দোলনের পশ্চাতে যে আদর্শিক ও ইসলামী চেতনা সক্রিয় ও বলবৎ ছিল তা মুসলিম জাতির এক চিরস্মরণীয় বস্তু এবং এর বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস ভবিষ্যৎ মুসলিম প্রজন্মের জানা ও স্মরণ রাখা একান্ত আবশ্যক।

লর্ড কার্জন কর্তৃক শুধুমাত্র প্রশাসনিক কারণে ১৯০৫ সালের বংগভংগ এবং হিন্দুদের বংগভংগ রদ আন্দোলন ও ১৯১১ সালে তা রহিতকরণ, উপমহাদেশের যত্রতত্র এবং যখন তখন মুসলমানদের গায়ে পড়ে হিন্দুদের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টি এবং মুসলমানদের জানমালের প্রভূত ক্ষতিসাধন এবং সাতটি প্রদেশে আড়াই বছর কংগ্রেসের কুশাসন সম্পর্কে এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনায় এ সত্যটি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, এ উপমহাদেশে হিন্দুজাতি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী হওয়ার কারণে মুসলিম জাতিকে হয় তাদের দাসানুদাস বানিয়ে রাখতে অথবা নির্মূল করতে চায়। এ লক্ষ্য হাসিলের জন্যেই কংগ্রেসের দাবী ছিল এই যে এ উপমহাদেশের অধিবাসীদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকারকে তার হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এই সাথে কংগ্রেসের আর একটি অদ্ভুত ও অবান্তর দাবী ছিল এই যে, এ উপমহাদেশে

বসবাসকারী সকলে মিলে একজাতি—ভারতীয় জাতি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এ উপমহাদেশ কোন এক জাতির নয় বরঞ্চ বহু জাতির আবাসভূমি। তাদের মধ্যে প্রধান ও উল্লেখযোগ্য হিন্দু ও মুসলিম জাতি। হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ এবং হিন্দুরামরাজ্য স্থাপনই ছিল কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য। কংগ্রেস ও তার কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন আচরণে এ বিশ্বাস মুসলমানদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় এবং এ কারণেই মুসলমানগণ পাকিস্তান আন্দোলন করতে বাধ্য হন।

এখন দেখা যাক কংগ্রেসের ভারতীয় জাতীয়তা ও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে হিন্দু ঐতিহাসিকগণ কি বলেন।

ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন ঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে হিন্দু জাতীয়তা জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তার প্রকৃত রূপ ছিল হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল 'রামরাজ্য' স্থাপন। তখন বাংলাদেশে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠায়, পুনায় সার্বজনীন সভা ও মাদ্রাজে মহাজন সভা প্রতিষ্ঠায় মৃগত প্রাচীন হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টাই লক্ষিত হয়েছিল। দয়ানন্দের ১৮৮২ সালে 'গোরক্ষিণী সমিতি' প্রতিষ্ঠা ও ১৮৯৬ সালে বালগংগাধর তিলকের 'শিবাজী উৎসব' অনুষ্ঠান একই অনুপ্রেরণা প্রসূত। বংকিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনাও একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাঁর 'আনন্দমঠ' গ্রন্থ ও 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র সমস্বরে প্রচারিত করেছে—হিন্দুধর্ম, জাতি ও জাতীয়তা জ্ঞান একই অবিভাজ্য বিষয়—এ তিনের একই চিন্তাধারার অভিব্যক্তি। এ জন্যে মুসলিম শিরে তাঁর অভিশাপ, গালাগালি ও বিদ্বেষ বিষ বর্ষণে কিছুমাত্র কৃপণতা ছিলনা। ··· সেকালে বাংলায় আমাদের মহৎ বীরদের সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায়, রাজপুত, মারাঠা ও শিখ বীরদের জীবনী আমদানী করতে হয়েছে। রাজা প্রতাপের দেশপ্রেম ও শিবাজীর বীরত্বব্যঞ্জক কর্মসমূহ তখন আমাদের ঘরে ঘরে কীর্তিত হতো। অন্য কোনও সাহিত্যে এমন বীর রসাত্মক কবিতার সাক্ষাৎ মিলবেনা, যেমন কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর উপর এবং শিখগুরু বান্দা ও গুরু গোবিন্দের উপর। বস্তুতঃ জাতি বৈরিতার যে তীব্র আন্দোলন সমকালীন বাংলা সাহিত্য ও সংবাদপত্রের মারফৎ উত্থিত হয়েছিল ও তীব্ররূপ ধারণ করেছিল, পৃথিবীর কোন দেশের সাহিত্যেই তার তুলনা নেই। (Dr. R. C. Majumdar : History of Freedom Movement. pp. 202-205; আবদুল মওদুদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ২৬৭)

কংগ্রেসের জাতীয়তার অর্থ যে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন এবং হিন্দু রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা তা ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের কথায়ই সুস্পষ্ট হয়ে গেল। এ জাতীয়তার মধ্যে মুসলমানদের স্থান কিভাবে হতে পারে? তার পরেও কংগ্রেসের ভারতীয় জাতীয়তার দাবী চরম প্রতারণা ব্যতীত আর কিছু হতে পারে কি? এ দাবীর উপরেও আলোকপাত করেছেন ডঃ মজুমদার।

তিনি বলেন : ১৮৩৩ সালে কি ভারতীয় জাতীয়তার অস্তিত্ব ছিল? এ প্রশ্নের জবাব হবে না। ··· তখন বাঙালী নেতারা, যায় রামমোহন রায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন অন্যান্য ভারতীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বৃটিশের জয়লাভের জন্যে। ··· ১৮৩৩ সালে বাংলাদেশে দুটি জাতির মানুষ ছিল—হিন্দু ও মুসলমান। যদিও তারা একই দেশের বাসিন্দা ছিল তবুও এক ভাষা ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে ছিল বিভিন্ন। ধর্মে, শিক্ষায়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তারা ছয়শ' বছর ধরে বাস করেছে যেন দুটি ভিন্ন পৃথিবীতে। ··· রামমোহন রায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রমুখ কোলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ মুসলমানদের মনে করতেন হিন্দুদের যতো দুর্গতি ও অলক্ষণের মূল উৎস হিসাবে যা হিন্দুরা নয়শো বছর ধরে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। আর তাঁরা বৃটিশ শাসনকে মনে করতেন বিধাতার আশীর্বাদ, যার প্রসাদে হিন্দুরা কুখ্যাত মুসলিম শাসন থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। সমস্ত বাংলাসাহিত্যে ও পত্র-পত্রিকায় মুসলমানদের উল্লেখ করা হতো 'যবন' হিসাবে—তখন বৃটিশকে বিতাড়িত করে হিন্দু বা ভারতীয় শাসন স্থাপনের কোন ইচ্ছাই ছিলনা। এমনকি রাজা রামমোহন রায়েরও এমন ইচ্ছা জন্মেনি। এমনকি প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মতো বিশিষ্ট নাগরিক প্রকাশ্যে বলতেন যে, যদি ঈশ্বর তাঁকে 'স্বরাজ' ও 'বৃটিশ শাসনের' মধ্যে একটি বেছে নিতে বলেন, তাহলে তিনি শেষেরটাই বিনা দ্বিধায় বেছে নেবেন। (Dr. R. C. Majumdar : History of Freedom Movement, p. 193)

ডঃ মজুমদার হিন্দু ও মুসলমানকে দুটি পৃথক জাতি বলেই প্রমাণ করেছেন। উপরে উল্লেখিত হিন্দু মনীষীগণ মুসলমানদেরকে হিন্দুজাতির শত্রুই মনে করতেন। এ পৃথক ও বিপরীতমুখী দুটি জাতিকে নিয়ে এক ভারতীয় জাতি গঠন কিভাবে সম্ভব? কখন এর উৎপত্তি হয়েছিল এবং এ এক জাতীয়তার উদ্যোক্তা কে ছিলেন?

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মরহুম কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীতই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেকে হিন্দু কংগ্রেসের সাথে সম্পৃক্ত রাখেন। তিনিও স্বয়ং হিন্দু ও মুসলমানকে দুটি পৃথক জাতিই মনে করতেন। এককালে তাঁর সম্পাদনায় কোলকাতা থেকে প্রকাশিত "দৈনিক আল হেলাল" পত্রিকায় তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন :

'হিন্দু আওর মুসলমানোঁকো আপস্ মে মিলা কর এক কওমিয়ত কি তা'মীর কীয়া চীয্ হ্যায়? কিয়া ইনমে সে এক তেল আওর দুস্‌রা পানি নিহি?"

"হিন্দু ও মুসলমানকে পরস্পর মিলিত করে এক জাতি গঠন কত হাস্যকর। এদের মধ্যে কি একটা তেল এবং দ্বিতীয়টা পানি নয়?

ডঃ মজুমদারও হিন্দু ও মুসলমানের সম্পূর্ণ পৃথক বৈশিষ্ট্যই তুলে ধরেছেন। তাহলে এক ভারতীয় জাতীয়তার ধারণা কাল্পনিক ও প্রতারণামূলকই বলতে হবে। ১৮৫৭ সালে মুসলমান সিপাহীদের প্রচেষ্টায় যে সর্বপ্রথম উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলন শুরু হয় হিন্দুজাতি তারও বিরোধিতা করে। রাজা রামমোহন তো এ স্বাধীনতা যুদ্ধে বৃটিশের জয়লাভের জন্যে 'ঈশ্বরের' কাছে প্রার্থনা করেছেন।

এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষ বলেন : সিপাহী বিদ্রোহের (সিপাহীদের আযাদী আন্দোলন) সময় আমাদের জাতীয় প্রেস বিদ্রোহীদের কোনও সহানুভূতি দেখায়নি। ··· তখন সমস্ত প্রেস বৃটিশ শাসনের সুফলের গুণগান করেছে এবং বিদ্রোহীদেরকে সমাজের ইতর শ্রেণীর লোক বলে গালাগালি দিয়েছে। প্রায় সকল সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা এ ভূমিকা পালন করেছে। কারণ তখনকার হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার বিদ্রোহ সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলনা। (Benoy Ghosh : History of Bengal 1757-1905, C. U. Contribution, pp. 227-28)

উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমানকে একত্রে মিলিত করে একভারতীয় জাতীয়তার ধারণা যে কত উদ্ভট তা মিঃ নিরোদ চন্দ্র চৌধুরীর বক্তব্যে প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন : বংগবিভাগ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে চিরন্তন বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দিল এবং আমাদের মনে তাদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করে বন্ধুত্বের বাঁধন চিরতরে ছিন্ন করে দিল। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটলো রাস্তাঘাটে, হাটে-বাজারে, শিক্ষাংগনে এবং স্থান করে নিল মানুষের হৃদয়ে।

তিনি আরও বলেন যে, তিনি যে স্কুলে পড়াশুনা করতেন সেখানে মুসলমান সহপাঠীদের সাথে একত্রে বসতে তাঁরা ঘৃণাবোধ করতেন যে, তাদের মুখ থেকে পেঁয়াজের গন্ধ বেরোতো। অতএব হিন্দুদের দাবী অনুযায়ী হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের বসার স্থান পৃথক করে দেয়া হয়েছিল।

মিঃ চৌধুরী বলেন, পাঠাভ্যাস করার আগেই আমাদেরকে বলা হতো যে, একদা এ দেশে মুসলিম শাসনকালে তারা আমাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করে এবং ভারতে তাদের ধর্ম প্রচার করে এক হাতে কুরআন এবং অন্য হাতে তরবারী নিয়ে। উপরন্তু মুসলিম শাসকরা আমাদের নারী অপহরণ করেছে, আমাদের মন্দির ধ্বংস করেছে এবং আমাদের পবিত্র ধর্মীয় স্থানের অবমাননা করেছে। (N. C. Chaudhury : The Autobiography of an Unknown Indian; Abdul Hamid : Muslim Separatism in India)

এই যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরে অবিরল বিদ্বেষাত্মক অপপ্রচার, হিন্দু কবি সাহিত্যিক কর্তৃক মুসলমানদেরকে 'যবন' ও 'ম্লেচ্ছ' নামে আখ্যায়িত করণ, তারপর তাদেরকে নিয়ে এক জাতি গঠনের অর্থ ছিল এই যে হিন্দুর ধর্মপ্রথা অনুযায়ী মুসলমানদেরকে একটি অতি নিম্নশ্রেণী হিসাবে হিন্দুর দাসানুদাস করে রাখা। অথবা শক্তি বলে তাদেরকে একেবারে নির্মূল করা। মুসলমানগণ এ ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন এবং তাঁরা কিছুতেই একজাতীয়তার ধারণা মেনে নিতে পারেননি।

যে কংগ্রেস উপমহাদেশের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন বলে দাবী করে, এক ভারতীয় জাতীয়তার দাবীদার তার জন্মইতিহাসটা একবার আলোচনা করে দেখা যাক যে সত্যিই সে মুসলমানদের শুভাকাংখী ও প্রতিনিধিত্বকারী কিনা।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

কংগ্রেসের জন্মের দু'বছর আগে, ১৮৮৩ সালে, জন ব্রাইট 'ইন্ডিয়া কমিটি' গঠন করেন এবং পঞ্চাশজন বৃটিশ এমপিকে তার সদস্য করেন। ১৮৮৫ সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত প্রভাবশালী বৃটিশ সিভিলিয়ান এলেন অক্টাভিয়ান হিউম (A.O. Hume) ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠন করেন। তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পরও ভারতে রয়ে যান। তিনি ভারতের

সামাজিক পুনরুত্থানের জন্যে একটি সর্বভারতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠার ধারণা পোষণ করতেন যা রাজনৈতিক অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে। তদনুযায়ী তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের নিকটে একখানি খোলা চিঠি প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি একটি সমিতি ও সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, জনগণের সাথে সরকারের সংযোগ সংস্পর্শ না থাকার কারণে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছেন। পুনর্গঠনের কাজ স্বয়ং দেশবাসীকেই করতে হবে যা বিদেশীদের দ্বারা আশা করা যায় না যতোই তাঁরা এ দেশকে ভালোবাসুক না কেন।

যাই হোক, এলেন হিউমের উপরোক্ত চিন্তাভাবনা ও চেষ্টাচরিত্রের ফলে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠিত হয়। এর পেছনে বড়োলাট লর্ড ডাফ্‌রিনের যথেষ্ট আশীর্বাদ থাকলেও তিনি সরাসরি এর সাথে জড়িত হতে চাননি। তবে তিনি আশা পোষণ করতেন যে সংগঠনটি সুদৃঢ় ও সুসংহত হয়ে দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। হিউম প্রস্তাব করেন যে একজন প্রাদেশিক গভর্ণরকে সভাপতিত্ব করার অনুমতি দেয়া হোক। লর্ড ডাফ্‌রিন তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের পর মাদ্রাজের গভর্ণর প্রতিনিধিবৃন্দকে এক সান্ধ্যভোজে আপ্যায়িত করেন। অতএব সরকার এবং কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণই ছিল। যেহেতু একজন ইংরেজের উদ্যোগেই কংগ্রেস গঠিত হয় সেজন্যে একদল ইংরেজ এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন (WEDDERBURN) জর্জ ইউল (YULE) এবং চার্লস্ ব্রাড্‌ল (BRADLAUGH)। চার্লস ব্রাড্‌ল (BRADLAUGH) ১৮৮৮ সালে কংগ্রেসের বেতনভুক কর্মচারী নিযুক্ত হন। উইলিয়ম ডিগ্‌বী ছিলেন লন্ডনের বিশেষ প্রচারকর্মী। ইন্ডিয়া পত্রিকা প্রকাশ করে কংগ্রেসের কর্মসূচী এবং ভারতীয় বিষয়াদি বিশেষভাবে ইংরেজ জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। উইলিয়ম হান্টার ছিলেন কংগ্রেসের বড়ো সমর্থক এবং তাঁর জীবনীকার বলেন, বৃটিশ জনমত প্রভাবিত করার পক্ষে হান্টারের কৃতিত্বই একমাত্র কার্যকর। অধ্যাপক সীলি অক্সফোর্ডের ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন, ইংল্যান্ড অথবা ফ্রান্সের সংগে ভারতের তুলনা হয় না। ইউরোপের বহু জাতির মতো ভারতে বহু জাতির বাস। স্যার হেনরী জেমসের মতে, ভারতে সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্যে হিন্দুর ধর্মীয়

আচরণই দায়ী। স্যার থিওডোর মরিসন বলেন, মুসলমানরা ইউরোপীয় সংজ্ঞায় জাতি না হলেও অন্য ভারতীয় থেকে নিজেদেরকে স্বতন্ত্র ভাবছে ও জাতি হিসাবে গড়ে উঠছে। (Abdul Hamid : Muslim Separatism in India, p. 29: Justice Syed Shameem Hussain Kadir : Creation of Pakistan, p. 12; আবদুল মওদুদ : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ; সংস্কৃতির রূপান্তর ঃ পৃঃ ২৭৯-৮০)

একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে কংগ্রেসের চরিত্র বৈশিষ্ট্য কি হতে পারতো, তা কংগ্রেসের দু'জন প্রখ্যাত ও অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতার নীতিপদ্ধতি ও রাজনৈতিক দর্শন ও মূলনীতি থেকে ভালোভাবেই অনুমান করা যেতো। তাঁরা ছিলেন বালগংগাধর তিলক ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।

তিলক গ্রাজুয়েশনের পর সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন বিগত শতাব্দীর আশির দশকের প্রথমদিকে। কিন্তু বংগভংগ রদ আন্দোলনের তিনি ছিলেন পুরোভাগে। তিনি দক্ষ রাজনীতিবিদ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে (Direct Action) বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সামরিক মনা মারাঠা জাতির ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করেন এবং কংগ্রেসকে সে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি গো হত্যা নিবারণ সমিতি (Anti-Cow-Slaughter Society) গঠন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এবং মসজিদের সামনে গীতিবাদ্য নিষিদ্ধ করণের প্রতিবাদে আন্দোলন করেন যার ফলে ভারতে সাম্প্রদায়িক হাংগামা শুরু হয়। অতএব তিলকের নেতৃত্বে সকল ক্ষেত্রে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের যে তৎপরতা শুরু হয়েছিল তা ছিল অবশ্যই মুসলিম বিরোধী এবং তাঁর 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' এবং 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের' মধ্যে কোনই পার্থক্য ছিলনা। (Abdul Hamid : Muslim Separatism in India, p. 30)

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী উনবিংশতি শতাব্দীর ষাটের দশকে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে (ICS) যোগদান করেন। কিন্তু কয়েক বছর পরে চাকুরী থেকে অপসারিত হওয়ার পর রাজনীতিতে যোগদান করেন। তিনি কংগ্রেসের একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সকল যোগ্যতা ও দক্ষতা মুসলিম স্বার্থ বিরোধী তৎপরতায় ব্যয়িত করেন।

বংগভংগ আন্দোলনে তিনিই সর্বপ্রথম শিংগা ফুঁকিয়েছিলেন। তিনি বলেন, বাংলা বিভাগের ঘোষণা শুনে মনে হলো যেন আকাশ থেকে আমাদের উপর বজ্রপাত হলো। আমাদেরকে অপমানিত, অপদস্ত ও প্রতারিত করা হয়েছে।

অতঃপর তাঁর উদ্যোগে ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) কোলকাতায় জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। সকল হিন্দু কালো ব্যাজ ধারণ করেন এবং মাথায় ভস্ম মাখেন। অনশন পালন করেন এবং গংগায় স্নান করেন। অতঃপর সন্ধ্যায় আয়োজিত জনসভায় বংগভংগ রহিত করার শপথ গ্রহণ করেন। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।

ছ'বছর যাবত হিন্দুদের তীব্র সন্ত্রাসী আন্দোলনের ফলে বংগভংগ ১৯১১ সালে রহিত করা হয়। বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের সান্ত্বনার জন্যে সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন। সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তে কতিপয় কংগ্রেস নেতা তাঁদের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, বাংলায় আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবে। অতএব সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বড়োলাট লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে সাক্ষাৎ করে। মুখপাত্র সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বলেন, প্রদেশে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা জাতীয় সম্প্রীতি বিনষ্ট করবে এবং যে দুটি ভিন্ন অঞ্চলে দুটি ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে সে দুটি অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান মতবিরোধ বহুগুণে বেড়ে যাবে। (A Hamid : Muslim Separatism in India, pp. 30, 93)

এসব দৃষ্টান্ত থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কংগ্রেস একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান। এর লক্ষ্য হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা।

উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কংগ্রেসকে ভালো চোখে দেখতে পারেননি। কংগ্রেসের জন্মইতিহাস, তার কেন্দ্রীয় কাঠামো, পরিচালকবৃন্দ, তার নীতিপলিসি ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য বিশ্লেষণ করে বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সাইয়েদ আহমদ উপলব্ধি করেছিলেন যে, কংগ্রেস প্রতি পদে পদে মুসলিম স্বার্থে আঘাত হানবে। তাই তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান কংগ্রেসে যোগদান করা থেকে বিরত থাকতে। তিনি বলেন, ভাইসরয়, সেক্রেটারী অব ষ্টেট এবং এমন কি গোটা হাউস্ অব্ কমন্স্ যদি প্রকাশ্যে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন করে, তথাপি তিনি দৃঢ়তার সাথে এর বিরুদ্ধে অবস্থান করবেন। তিনি আরও বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলো যদি কার্যকর করা হয়, তাহলে বৃটিশ সরকারের পক্ষে শান্তি রক্ষা করা অথবা সহিংসতা ও নিশ্চিত গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে

পড়বে। (Justice Syed Shameem Hussain Kadir : Creation of Pakistan, p. 12; I. H. Qureshi : Struggle for Pakistan, p. 29; The Times— 12 Nov. 1888)

সাইয়েদ আহমদের আশংকা ও ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। সমসাময়িক মুসলিম পত্র পত্রিকাও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের অভিমত ব্যক্ত করে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—মুহামেডান অবজার্ভার, দি ভিক্টোরিয়া পেপার, দি মুসলিম হেরাল্ড, রফিক-এ-হিন্দ, প্রভৃতি।

নিম্নের মুসলিম সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোও সমস্বরে কংগ্রেসের নিন্দা করে এবং তার তোষামোদে কান না দেয়ার জন্যে মুসলমানদের প্রতি আবেদন জানায় ঃ

সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মুহামেডান এসোসিয়েশন, দি মুহামেডান লিটারারী সোসাইটি অব বেঙল, দি আঞ্জুমনে ইসলাম অব মাদ্রাজ, দিন্দিগাল আঞ্জুমন, মুহামেডান সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব দি পাঞ্জাব। —(Justice Syed Shameem Kadir : Creation of Pakistan, p. 13, 14)

কংগ্রেস মিথ্যা ও কপটতাপূর্ণ প্রচারণার দ্বারা মুসলমান ও বহির্বিশ্বকে প্রতারিত করার চেষ্টা করে। কংগ্রেস সমর্থক কতিপয় ইংরেজও একই ধরনের প্রচারণা চালান। যুক্তরাজ্যে কংগ্রেসের প্রচারকর্মী ডিগবী বলেন, কংগ্রেস সকল জাতি ও শ্রেণীর মুখপাত্র, এমনকি মুসলমানেরও। কংগ্রেসের জন্মদাতা এলেন হিউম কংগ্রেসের সমালোচনা বরদাশ্‌ত করতে পারতেন না। ইংল্যান্ডে গঠিত ইন্ডিয়া কমিটিও কংগ্রেসের সাথে সুর মিলিয়ে কথা বলতো। কিন্তু এতো সবের পরেও উপমহাদেশের মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবেই তার পরিচিতি লাভ করে এবং এটাই ছিল পাকিস্তানের ভিত্তি।

পঞ্চম অধ্যায়

পাকিস্তানের আদর্শিক ভিত্তি

ধর্মীয় বিশ্বাস, আদর্শ, নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্বতন্ত্র জীবনবোধ ও জীবনবিধান এবং পরকালে স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের কাছে জবাবদিহির ভিত্তিতে মুসলমান একটি জাতি যা জাতীয়তার অন্যান্য সকল সংজ্ঞা অস্বীকার করে। উপমহাদেশে এ জাতীয়তার তথা ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপিত হয় হিজরী ৯৩ সালের রজব মাসে— তথা ৭১২ খৃষ্টাব্দে- যখন ইমাদ-আদ্দীন মুহাম্মদ বিন কাসিম নামক সতেরো বছর বয়স্ক এক যুবক অধিনায়ক দেবল (বর্তমান করাচী) পোতাশ্রয়ে অবতরণ করেন এবং রাজা দাহিরের বন্দীশালা থেকে মুসলমান নারী শিশুকে মুক্ত করেন। রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সেখানে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন।

কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা তখনই হয়, যখন প্রথম মুসলমান সিন্ধু ভূখণ্ডে প্রথম পদক্ষেপ করেন। (Justice Shameem Hussain Kadir : Creation of Pakistan, 1)

দেবল অর্থাৎ করাচীর পর নিরন (বর্তমান হায়দরাবাদ) এবং তারপর সিহ্ওয়ানে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। অতঃপর ১০ই রমজানুল মুবারক (হিঃ ৯৩) রাওর দুর্গ অধিকৃত হয় এবং যুদ্ধে দেবল রাজা পরাজিত ও নিহত হন। অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রাহ্মণাবাদ (বর্তমান সংঘর) এবং আলওয়ার (বর্তমান রুহ্রীর পূর্বে অবস্থিত শহর) মুসলমানদের করতলগত হয় যার ফলে মুলতান আত্মসমর্পণ করে। ৯৬ হিজরীতে উত্তর ভারতও স্বেচ্ছায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের বশ্যতা স্বীকার করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এমন সময় খলিফা তাঁকে দামেশ্‌কে ডেকে পাঠান।

দক্ষ মুসলিম সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর অধিকৃত ভূখণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন যা হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রজাদের এতোটা মন জয় করতে সক্ষম হয় যে, বিরাট সংখ্যক অমুসলিম প্রজা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর ইসলামী শিক্ষার প্রভাব এতো বিরাট ছিল যে, তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁদের জীবন ঢেলে সাজান। সিন্ধু ভাষার জন্যে আরবী বর্ণমালাও গৃহীত হয়।

উপমহাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, তার উত্থান ও পতন

মুহাম্মদ বিন কাসিম এ উপমহাদেশে শুধু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, তিনি ইসলামী সভ্যতা–সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠারও অগ্রদূত ছিলেন। ইসলামী শাসন ও ইসলামী সভ্যতা–সংস্কৃতিই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে অপ্রতিহত প্রেরণা সৃষ্টি করে। যে সভ্যতা সংস্কৃতির বীজ বপন করা হয়, তা অংকুরিত হয়ে কালপ্রবাহে বিকশিত ও বর্ধিত হয় এবং পরবর্তীকালে বহু মুসলিম শাসকের বিজয়ীর বেশে এ উপমহাদেশে আগমনের ফলে উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পর থেকে এগারো শতাধিক বছর এ উপমহাদেশে ইসলামী শাসন প্রচলিত থাকে। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিজেদের মধ্যে চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নৈতিক অধঃপতন এবং বৈদেশিক শক্তির আক্রমণের ফলে উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

ইসলামের সহজাত ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য

ইসলামের অর্থ আল্লাহতায়ালার নিরংকুশ দাসত্ব আনুগত্যের জন্যে স্বতঃস্ফূর্ততাবে আত্মসমর্পণ করা এবং এর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এই যে, ইসলামের অনুসারীগণ কোন খোদাহীন ব্যবস্থা অথবা অমুসলিমদের প্রাধান্য মেনে নিতে পারেনা। ইসলাম মানব জাতির জন্যে একটা পূর্ণাংগ জীবন বিধান পেশ করে এবং এর মৌল নীতি জীবনের সকল আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দিকের উপর সমভাবে প্রযোজ্য। ইসলামে রাষ্ট্র ও ধর্ম পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, বরঞ্চ জীবনের বৈষয়িক ও পার্থিব দিকগুলো জীবনের আধ্যাত্মিক দিকগুলোর সাথে একীভূত। একজন মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে অথবা সাধারণ নাগরিক হিসাবে তার সকল কাজকর্ম সম্পন্ন করে এ দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে যে, তার সকল ক্রিয়াকর্ম আল্লাহতায়ালা দেখছেন এবং তাঁর কাছে অবশেষে তার সমুদয় কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামের উপরোক্ত মৌল নীতি, আদর্শ ও নীতিনৈতিকতার ভিত্তিতে উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কয়েক শতাব্দী যাবত বলবৎ থাকে। দেশের আইন (Law of the land) ইসলামী হলেও ব্যক্তি ও পারিবারিক আইনের প্রশ্নে অন্য প্রত্যেক সম্প্রদায় তার নিজস্ব ধর্মীয় বিধান মেনে চলার অধিকারী ছিল।

উপমহাদেশের মুসলিম শাসকবৃন্দের মধ্যে আকবর ব্যতীত সকলেই ইসলামী সভ্যতা–সংস্কৃতির ধারকবাহক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ব্যক্তিজীবনে

ইসলামী অনুশাসন পুরোপুরি মেনে চলতে ব্যর্থ হলেও সর্বত্র দেশের আইন ছিল ইসলামী। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ শাসকবৃন্দ প্রত্যক্ষভাবে করেননি। এ কাজ নিষ্ঠা সহকারে করেছেন বহিরাগত বহু আলেম–পীর–দরবেশ। তবে মুসলিম শাসকগণ ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্যে অসংখ্য মসজিদ মাদ্রাসা ও খানকা স্থাপন করেছেন। এ সবের ব্যয়ভার বহনের জন্যে বহু লাখেরাজ জমি দান করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান নিঃসন্দেহে উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী দাওয়াত সম্প্রসারণে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশের অমুসলিমগণ ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। কালক্রমে উপমহাদেশের উত্তর–পশ্চিম ও দক্ষিণ–পূর্ব অঞ্চল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়ে—যা পরবর্তীকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়।

উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্রমশঃ ইসলামী শাসন রহিত করে ইসলামের মৌল বিশ্বাস ও নীতির সাথে সাংঘর্ষিক ইন্ডিয়ান সিভিল এন্ড ক্রিমিনাল কোড্স অব প্রসিডিওর এবং ইন্ডিয়ান পেনাল কোড্ প্রবর্তন ও বলবৎ করা হয়। মুসলমানদের রাজ্য কেড়ে নেয়া হলো, ইসলাম ও ইসলামী আইন থেকে দূরে ঠেলে দেয়ার ব্যবস্থা হলো এবং এমন বহু বিধিব্যবস্থা গৃহীত হলো, যার দ্বারা মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বস্বহারা করে রাখা হলো।

বৃটিশ ও হিন্দুজাতির যোগসাজস ও ষড়যন্ত্রে মুসলমানদেরকে সর্বস্বহারা করা হয়, ক্ষুধা দারিদ্রের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত করা হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের মনমস্তিষ্ক থেকে ইসলামের মৌল বিশ্বাস ও ইসলামী চিন্তাচেতনা নির্মূল করা যায়নি। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিগত শতাব্দীতে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে, বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে। সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভীর তাহরিকে মুজাহেদীন ও সশস্ত্র জিহাদ, বাংলাদেশে ফারায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের ইসলামী আন্দোলন প্রভৃতির মাধ্যমে দুর্বার ইসলামী চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। উপমহাদেশে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও কয়েক শতাব্দী যাবত তার লালন পালন এবং তা অক্ষুণ্ন রাখার সংগ্রামই পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করে।

মুসলমান একটি জাতি

উপরের আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে মুসলমান একটি জাতির নাম। ঈমান-আকীদাহ (ধর্মীয় বিশ্বাস), ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, ধর্মের ভিত্তিতে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও হালাল-হারাম নির্ণয়, জীবনের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন কাজের জন্যে পরকালে আল্লাহতায়ালার নিকটে জবাবদিহির অনুভূতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রুচি ও মননশীলতা, চিন্তাচেতনা—এ সকল দিক দিয়ে মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি। এ স্বাতন্ত্র্যবোধ ধর্মবিশ্বাস থেকেই নিঃসৃত। যারা তৌহীদ, রেসালাত ও আখেরাতে সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসী, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খোদাকর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যারা পুরোপুরি পালন করে, তারা গোটা মানবজাতির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং এ জাতিকে আল্লাহতায়ালা 'উম্মতে মুসলেমা' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। উপরের গুণাবলীবিশিষ্ট মানবসমষ্টি মুসলিম জাতি এবং বিপরীত গুণাবলীবিশিষ্ট মানব সমষ্টি অমুসলিম জাতি—তাদের মধ্যে রয়েছে হিন্দু-খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ প্রভৃতি। এর কোন একটির সাথে মিলেও মুসলমান এক জাতি হতে পারেনা। উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান দু'টি পৃথক পৃথক জাতি—তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, ন্যায়-অন্যায় ও হালাল হারামের মাপকাঠি সম্পূর্ণ পৃথক ও বিপরীতমুখী হওয়ায় উভয়ে দু'টি পৃথক জাতি। এ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের সৃষ্টি।

মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি এ তত্ত্ব আধুনিক যুগের কোন আবিষ্কার নয়। দুনিয়ার প্রথম মানুষ একজন মুসলমান, আল্লাহর নবী ও খলিফা ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে অগাধ জ্ঞান ভান্ডার দান করেন। তাঁর থেকে ইসলাম ও ইসলামী জাতীয়তার সূচনা। উপমহাদেশে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে এ তত্ত্বের ভিত্তিতে পৃথক ও স্বাধীন আবাসভূমি দাবী করা হয়েছিল। এ জাতীয়তা ইসলামের শাশ্বত 'থিওরি' বা মতবাদ। হিন্দু কংগ্রেস উপমহাদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানের উপর সংখ্যাগুরু হিন্দুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে এক জাতীয়তার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে বিরাট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন এক প্রখ্যাত আলেম, দেওবন্দের শায়খুল হাদীস মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী। তিনি কংগ্রেসের সুরে সুর মিলিয়ে ঘোষণা করেন একই ভৌগোলিক সীমারেখার ভিতরে বসবাসকারী মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে মিলে এক জাতি। উপমহাদেশে মুসলিম লীগ পরবর্তীকালে

দ্বিজাতিতত্ত্বের (Two Nation Theory) ভিত্তিতেই পাকিস্তানের দাবী করে। মাওলানা মাদানীর উপরোক্ত ঘোষণায় শুধু মুসলিম লীগ নয়, আলেম সমাজ ও সাধারণ মুসলমান বিস্মিত ও হতবাক হয়ে পড়ে। তখনো পাকিস্তান দাবী উত্থাপিত না হলেও মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি এ সত্যটি সকলের জানা ছিল এবং বারবার এ কথা বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা করা হয়।

মাওলানা মাদানীর উক্ত ঘোষণা পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবালকে অবহিত করা হয়। তিনি ছিলেন রোগশয্যায় শায়িত। তিনি ধীরে ধীরে কম্পিত কলেবরে শয্যার উপর উঠে বসেন এবং স্বভাব কবি রোগযন্ত্রণার মধ্যেও কয়েকছত্র কবিতার সুরে মাদানী সাহেবের উক্তির তীব্র সমালোচনা করেন—

আজম হনুয্ নাদানিস্ত রমু যে দ্বীন ওয়ার না,
যে দেওবন্দ্ হুসাইন আহমদ ইঁচেবুল্ আজবীস্ত্।
সরুদে বর সরে মেম্বর কে মিল্লাত আয্ ওতনস্ত্,
চে বেখবর আয্ মকামে মুহাম্মদে আরবীস্ত্।
বমুস্তাফা বরে সাঁ খেশ্‌রা কে দ্বীন হমাউস্ত,
আগার বাউ নারসীদী তামামে বু লাহাবীস্ত্।

(আল্লামা ইকবাল : আরমগানে হেজায্, পৃঃ ২৭৮)

অর্থ :

আজমবাসী দ্বীনের মর্ম বুঝেনি মোটে,
তাই দেওবন্দের হুসাইন আহমদ কন আজব কথা।
মেম্বর থেকে ঘোষণা করেন, 'ওয়াতন থেকে মিল্লাত হয়'
মুহাম্মদ আল আরাবীর মর্যাদা থেকে বেখবর তিনি।
পৌঁছিয়ে দাও নিজেকে মুস্তাফার কাছে,
এসেছে গোটা দ্বীন তাঁর থেকে,
পৌঁছাতে না পার যদি, সবই হবে বুলাহাবী।

ডঃ ইকবালের কয়েক ছত্র কবিতা যদিও মাওলানা মাদানী সাহেবের মতবাদ খন্ডন করলো, তথাপি তা এক জাতীয়তা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট ছিলনা। এ সময়ে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী উপমহাদেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির চুলচেরা পর্যালোচনা করে তাঁর সম্পাদিত মাসিক তর্জুমানুল কুরআনে ধারাবাহিকভাবে 'মুসলমান আওর

মওজুদা সিয়াসী কাশ্‌মাকাশ' শীর্ষক যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন তার মধ্যে ইসলামী জাতীয়তার উপর তথ্যবহুল আলোকপাত করেন। এ বিষয়ের উপরে শতাধিক পৃষ্ঠার একটি পৃথক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"যেসব গন্ডীবদ্ধ, জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও কুসংস্কারপূর্ণ ভিত্তির উপর দুনিয়ার বিভিন্ন জাতীয়তার প্রাসাদ গড়ে উঠেছে আল্লাহ ও তাঁর রসূল তা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেন। বর্ণ, গোত্র, জন্মভূমি, অর্থনীতি ও রাজনীতিক অবৈজ্ঞানিক বিরোধ ও বৈষম্যের ভিত্তিতে মানুষ নিজেদের মূর্খতা ও চরম অজ্ঞতার দরুন মানবতাকে বিভিন্ন ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খন্ডে বিভক্ত করেছিল, ইসলাম তার সবগুলোকে আঘাতে চূর্ণ করে দেয় এবং মানবতার দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষকে সমশ্রেণীর সমমর্যাদাসম্পন্ন ও সমানাধিকার প্রদান করেছে।

"ইসলামী জাতীয়তায় মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় বটে, কিন্তু জড়, বৈষয়িক ও বাহ্যিক কোন কারণে নয়। করা হয় আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিকতার দিক দিয়ে। মানুষের সামনে এক স্বাভাবিক সত্য বিধান পেশ করা হয় যার নাম ইসলাম। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য, হৃদয়মনের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা, কর্মের অনাবিলতা, সততা ও ধর্মানুসরণের দিকে গোটা মানব জাতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে, যারা এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে, তারা এক জাতি হিসাবে গণ্য হবে আর যারা তা অগ্রাহ্য করবে, তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ মানুষের একটি হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের জাতি এবং তার সমস্ত ব্যক্তিসমষ্টি মিলে একটি উম্মাহ। অন্যটি হচ্ছে কুফর ও ভ্রষ্টতার জাতি। তার অনুসারিগণ নিজেদের পারস্পরিক মতবিরোধ ও বৈষম্য সত্ত্বেও একই দল ও একই দলের মধ্যে গণ্য।

"এ দু'টি জাতির মধ্যে বংশ ও গোত্রের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য বিশ্বাস ও কর্মের। কাজেই একই পিতা-মাতার দু'টি সন্তানও ইসলাম ও কুফরের উল্লিখিত ব্যবধানের দরুন স্বতন্ত্র দুই জাতির মধ্যে গণ্য হতে পারে এবং দুই নিঃসম্পর্ক ও অপরিচিত ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কারণে এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

"জন্মভূমির পার্থক্যও এ উভয় জাতির মধ্যে ব্যবধানের কারণ হতে পারে না। এখানে পার্থক্য করা হয় হক ও বাতিলের ভিত্তিতে। আর হক ও বাতিলের

'স্বদেশ' বা জন্মভূমি বলতে কিছু নেই। একই শহর, একই মহল্লা ও একই ঘরের দুই ব্যক্তির জাতীয়তা ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন হতে পারে। একজন নিগ্রো ইসলামের সূত্রে একজন মরক্কোবাসীর ভাই হতে পারে।

"বর্ণের পার্থক্যও এখানে জাতীয় পার্থক্যের কারণ নয়। বাহ্যিক চেহারার রং ইসলামে নগণ্য। এখানে একমাত্র আল্লাহর রঙেরই গুরুত্ব রয়েছে। তা-ই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম রং।

"ভাষার বৈষম্যও ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণ নয়। ইসলামে মুখের ভাষার কোনই মূল্য নেই। মূল্য হচ্ছে মনের-হৃদয়ের-ভাষাহীন কথার।

"ইসলামী জাতীয়তার এ বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কালেমা—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বন্ধুতা আর শত্রুতা এ কালেমার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এর স্বীকৃতি মানুষকে একীভূত করে, অস্বীকৃতি মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়। এ কালেমা যাকে বিচ্ছিন্ন করে, তাকে রক্ত, মাটি, ভাষা, বর্ণ, অন্ন, শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি কোন সূত্র এবং কোন আত্মীয়তাই যুক্ত করতে পারে না। অনুরূপভাবে এ কালেমা যাদেরকে যুক্ত করে তাদেরকে কোন কিছুই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।"

মাওলানা আরও বলেন ঃ

"উল্লেখ্য যে অমুসলিম জাতি সমূহের সাথে মুসলিম জাতির সম্পর্কের দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমটি এই যে, মানুষ হওয়ার দিক দিয়ে মুসলিম-অমুসলিম সকলেই সমান। আর দ্বিতীয়টি এই যে, ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য হেতু আমাদেরকে তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেয়া হয়েছে। প্রথম সম্পর্কের দিক দিয়ে মুসলমানরা তাদের সাথে সহানুভূতি, দয়া, ঔদার্য ও সৌজন্যের ব্যবহার করবে। কারণ মানবতার দিক দিয়ে এরূপ ব্যবহারই তারা পেতে পারে। এমনকি তারা যদি ইসলামের দুশমন না হয়, তাহলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব, সন্ধি এবং মিলিত উদ্দেশ্যের (Common Cause) সহযোগিতাও করা যেতে পারে। কিন্তু কোন প্রকার বস্তুগত ও বৈষয়িক সম্পর্ক তাদেরকে ও আমাদেরকে মিলিত করে 'একজাতি' বানিয়ে দিতে পারেনা।"

মাওলানা মওদূদীর ইসলামী জাতীয়তা সম্পর্কিত উক্ত গ্রন্থখানি তৎকালীন চিন্তাশীল মুসলিম সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং মাওলানা মাদানীর বক্তৃতা ও

পুস্তিকা যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা কর্মীগণ একে একটি শাণিত হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ এ গ্রন্থখানিই দ্বিজাতিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনা করে এবং এটাই পাকিস্তান সৃষ্টির মূল কারণ হয়ে পড়ে। গ্রন্থখানি কংগ্রেসের মারাত্মক রামরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা এবং মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর আঞ্চলিক জাতীয়তার যুক্তিতর্ক নস্যাৎ করে তাকে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক, অনৈসলামী এবং অন্তঃসার শূন্য প্রমাণ করে।

উপরে বর্ণিত বুনিয়াদী কারণেই মানব সৃষ্টির সূচনা থেকেই মুসলমান ও অমুসলমান দু'টি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার উদ্ভব হয়েছে—এযাবত তা বলবৎ আছে এবং চিরদিন থাকবে। ঐ একই কারণে উপমহাদেশে মুসলমান ও অন্যান্য জাতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে শত শত বছর ধরে হিন্দু ও মুসলমান একত্রে বাস করে আসছে—একই শহরে, গ্রামে ও মহল্লায়—একই আঙিনার এপারে-ওপারে। একই ভাষায় উভয়ে কথা বলে, একই মাটিতে জন্ম, একই আলো-বাতাসে লালিত-পালিত ও বর্ধিত। কিন্তু উভয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে-যায়নি, একই জাতিতে পরিণত হয়নি। উপমহাদেশের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও এ সত্য স্বীকার করেন। স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। তিনি বলেন ঃ

"আর মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধও।

আমরা বহু শত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক ক্ষেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি। আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ দুঃখের মানুষ। তবু প্রতিবেশীর সংগে যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই।

আমরা জানি বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসেনা—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেয়া হয়, হুকার জল ফেলিয়া দেয়া হয়।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৯০৯; আবদুল মওদুদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৪২০)

বাবু নীরদ চৌধুরী বলেন ঃ

"সত্য বলতে মিঃ জিন্নাহ বা মুসলিম লীগের বহু পূর্বেই দুই জাতিতত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। আর এ শুধু তত্ত্বকথা না, এটা ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা। সকলেই বর্তমান শতকের প্রথমে এটির অস্তিত্বের কথা জানতো। এমনকি আমরা ছেলেবেলায় স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব থেকেই জানতাম"। (Autobiography of an Unknown Indian, pp. 229-31)

এ সত্যটি ইউরোপীয়দেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এ কথাটি পরিষ্কারভাবে বলেন ঃ

"হিন্দু ও মুসলমান এক গ্রামে, এক শহরে, এক জেলায় বাস করলেও বরাবর দু'টি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। বিশেষ করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইউরোপের দু'টি জাতির চেয়ে আরও বিচ্ছিন্ন থেকেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, ফরাসী ও জার্মান জাতি ইউরোপবাসীদের চক্ষে দু'টি কট্টর দুশমনের জাতি। তবুও একজন ফরাসী যুবক জার্মানীতে ব্যবসায় বা শিক্ষাব্যপদেশে গিয়ে যে কোন জার্মান পরিবারে সহজে বাস করতে পারে, একসাথে খানা খেতে পারে, একই উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু কোন মুসলিম কোন হিন্দু পরিবারে এমন প্রবেশাধিকার পায়না।" (S.T. MORISON : Political India p. 103)

স্বয়ং হিন্দুধর্মের অথবা ব্রাহ্মণদের স্বকপোলকল্পিত ধর্মীয় বিধি-বিধানের চরম সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কার, পরধর্মের প্রতি সহনশীলতার চরম অভাব মুসলমানদের প্রতি অমানবোচিত আচরণের জন্যে দায়ী। হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য তার বর্ণপ্রথা (CASTE SYSTEM)। এ প্রথা অনুযায়ী হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে বর্ণিত কিছুসংখ্যক মানুষকে নিম্নশ্রেণী বলে অভিহিত করা হয়। হিন্দুধর্ম তাদেরকে কোন মানবিক অধিকার দেয় না। তারা ঘৃণ্য, অপবিত্র, অস্পৃশ্য, তাদেরকে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করে তাদেরকে এ ধারণা দেয়া হয়েছে যে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের সেবা করার জন্যেই তাদের সৃষ্টি এবং এটাই তাদের ধর্ম, এটাই তাদের মহাপুণ্য কাজ। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সাথে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু একই গৃহে বাস করতে পারেনা, একই সাথে পানাহার করতে পারেনা, একই বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করতে পারেনা। হিন্দু হয়েও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পড়তে পারেনা, মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে

কথিত একটি হিন্দুশ্রেণীর সাথে হিন্দু সমাজের আচরণ এমন হলে মুসলমানদের সাথে অধিকতর বর্বরোচিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই মুসলমানের স্পর্শ করা সকল বস্তুই হিন্দুর কাছে অপবিত্র ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। তবে মুসলমানদের সাথে আচরণে অধিকতর কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে মুসলিম শাসনের অবসান ও বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর, উপমহাদেশে মুসলমানের অস্তিত্বই ছিল তাদের অসহনীয়।

মুসলমানদের প্রতি হিংসা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে হিন্দুরা মুসলমানের সাথে বিরোধের ছলছুতো তালাশ করতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীনকালে হিন্দুদের গরুর গোশত ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিলনা। গরুর গোশত এক অতি উপাদেয় খাদ্য এবং মুসলমানসহ দুনিয়ার সকল মানুষ তা ভক্ষণ করে থাকে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে পশু কুরবানী মুসলমানদের প্রতি ইসলামের নির্দেশ। যেসব পশু কুরবানী করা জায়েয তাদের মধ্যে গরু অন্যতম। উপমহাদেশে মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষ বাধাবার ছুতো হিসাবে গরুকে হিন্দুর উপাস্য দেবতার আসনে স্থান দেয়া হয়। অতঃপর 'গোহত্যা-নিবারণ সমিতি' 'গোরক্ষিনী সমিতি' প্রভৃতি স্থাপন করে মুসলমানদের সাথে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সূত্রপাত করা হয়। একই বস্তু একজাতির আহার্য এবং অন্য জাতির উপাস্য দেবতা। গরুকে দেবতা বলে স্বীকার করার পর দুনিয়ার প্রতিটি গরু ভক্ষণকারীকে নির্মূল করা হবে হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য। অতএব গরু ভক্ষণকারী ও গরুর পূজারী দুই জাতি কোন দিন কি এক হতে পারে? এ দুই জাতিকে মিলিত করে এক জাতি গঠন গোপূজারী জাতিই বা কি করে মেনে নিতে পারে? অতএব এ একজাতি গঠনের প্রচেষ্টা শুধু হাস্যকরই নয়, দুরভিসন্ধিমূলক।

হিন্দু ও মুসলমান যে দুটি পৃথক জাতি—কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহও তা অকাট্য যুক্তিসহ প্রমাণ করেন। ১৯৪০ সালের ২২শে মার্চ লাহোরের মিন্টু পার্কে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ২৭তম বার্ষিক অধিবেশনে তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন ঃ

"এ কথা বুঝা বড়ো কঠিন যে আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কেন বুঝতে পারেন না। আসলে এ দুটো কোন ধর্ম নয়, বরঞ্চ প্রকৃত পক্ষে দুটো পৃথক ও সুস্পষ্ট সামাজিক বিধিবিধান (social order) এবং হিন্দু ও মুসলমানকে মিলিত করে এক জাতীয়তা গঠন একটি কল্পনাবিলাস

মাত্র। এক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভুল ধারণাটি সীমালংঘন করে আমাদের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ হয়ে পড়েছে। যথাসময়ে আমাদের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হলে, ভারতকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হবে। হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতিনীতি ও সাহিত্যাবলী আছে। তারা পরস্পর কোনদিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, একত্রে পানাহার করে না। তারা দুটি স্বতন্ত্র সভ্যতা সংস্কৃতিরও অধিকারী যা দুটি বিপরীত ধারণা বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত। তাদের জীবনের ও জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগীও আলাদা। একথাও সত্য যে হিন্দু ও মুসলমান ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে প্রেরণা লাভ করে। তাদের রয়েছে পৃথক মহাকাব্য, মহাগ্রন্থ, পৃথক জাতীয় বীর এবং পৃথক প্রাসংগিক উপাদান ও ঘটনাপঞ্জী।

অধিকাংশক্ষেত্রে একজনের জাতীয় বীর অন্য জনের শত্রু। এ ধরনের বিপরীতমুখী দুটি জাতিকে যাদের একটি সংখ্যাগুরু এবং অপরটি সংখ্যালঘু—একই রাষ্ট্রে যুক্ত করে দিলে অশান্তি বাড়তে থাকবে এবং এমন রাষ্ট্রে সরকার পরিচালনার জন্যে যে কাঠামোই তৈরী হবে তা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে।

জাতির যে কোন সংজ্ঞা অনুযায়ী মুসলমান একটি জাতি এবং অবশ্যই তাদের থাকতে হবে একটি আবাসভূমি, একটি ভূখন্ড বা অঞ্চল এবং একটি রাষ্ট্র। ··· আমাদের জাতি প্রতিভা অনুযায়ী নিজস্ব আদর্শের ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে উন্নতি সাধন করুক—এটাই আমাদের কামনা।"

সর্বশেষে কায়েদে আজম বলেন ঃ

"ইসলামের অনুগত বান্দাহ হিসাবে এগিয়ে আসুন। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে জনগণকে সংগঠিত করুন। আমি নিশ্চিত আপনারা এমন এক শক্তিতে পরিণত হবেন যাকে দুনিয়ার কোন শক্তি পরাভূত করতে পারবেনা।"

পরদিন অর্থাৎ ২৩শে মার্চ উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এ প্রস্তাব পেশ করেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক। মূল প্রস্তাবের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

Resolved that it is the considered view of this Session of the All India Muslim League that no Constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles, viz. that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial re-adjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute 'Independent States' in which the Constituent units shall be autonomous and sovereign.

That adequate, effective and mandatory safeguards should be specially provided in the Constitution for minorities in these units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them, and in other parts of India where the Mussalmans are in a minority, adequate, effective and mandatory safeguards shall be specially provided in the Constitution for them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them.

—Justice Syed Shameem Husain Kadir : Creation of Pakistan, p. 192.

লাহোর প্রস্তাবের সাথে এ ঘোষণাও সুস্পষ্টরূপে করা হয় যে, এখানে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শক্রমে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত করা হবে। অনুরূপভাবে ভারতের যেসব অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যালঘু, সেসব অঞ্চলে তাদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত করতে হবে।

হিন্দুদের বিরোধিতা

লাহোর প্রস্তাবের ভালো দিকটার কোন প্রকার বিচার বিবেচনা না করেই হিন্দুদের পক্ষ থেকে তার চরম বিরোধিতা শুরু হয়। হিন্দু নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে অশালীন বক্তব্য বিবৃতি প্রকাশিত হতে থাকে। মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার এবং তাদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির সকল তৎপরতা শুরু হয়। ওয়ার্ধাও একই সুরে কথা বলতে থাকে। মিঃ গান্ধী আশা করেন যে, বৃটেন প্রস্তাবটি কার্যকর করতে দেবেনা।

হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন হিন্দু প্রভাবিত পত্র পত্রিকার পক্ষ থেকে লাহোর প্রস্তাবের বিরোধিতা ও অপপ্রচার সত্ত্বেও কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ লাহোর প্রস্তাবের উপর অবিচল থাকেন। তিনি বলেন, আমি এখনো আশা করি, বিবেকবান হিন্দুগণ আমাদের প্রস্তাব গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। কারণ এর মধ্যেই স্বল্প সময়ে স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা নিহিত আছে। এ স্বাধীনতা আমরা শান্তিপূর্ণভাবে দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে ধরে রাখতে পারবো।

ছাব্বিশে মে, ১৯৪০ বোম্বে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কায়েদে আজম কংগ্রেসের মিথ্যা প্রচারণার উল্লেখ করে বলেন :

এ অত্যন্ত বিস্ময়কর যে মিঃ গান্ধী ও মিঃ রাজা গোপালাচারিয়ার মতো লোক লাহোর প্রস্তাবকে 'ভারতের অংগচ্ছেদ' (Vivisection of India) এবং 'শিশুকে দুখণ্ডে কর্তিত করার' নামে আখ্যায়িত করছেন। ভারত অবশ্য প্রকৃতি কর্তৃকই বিভক্ত। ভারতের ভৌগোলিক মানচিত্রে মুসলিম ভারত এবং হিন্দুভারত স্থান লাভ করে আছে। তাহলে এ হৈ চৈ কেন তা আমি বুঝতে পারিনা। সে দেশ কোথায়, যা বিভক্ত করা হচ্ছে? কোথায় সে জাতি যা দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বিখণ্ডিত করা হচ্ছে? কোথায় সে কেন্দ্রীয় সরকার যার হুকুম শাসন লংঘন করা হচ্ছে? ভারত বৃটিশের শাসনাধীন থাকার ফলে অখণ্ড ভারত ও একটি একক কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে। ভারতীয় জাতি এবং কেন্দ্রীয় সরকার বলে কিছু ছিলনা। এ কংগ্রেস হাই কমান্ডের খোশখেয়াল মাত্র। ··· আমাদের আদর্শ ও সংগ্রাম কারো স্বার্থে আঘাত দেয়ার জন্যে নয়, বরঞ্চ নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে।

—(Justice Syed Shameem Husain Kadir : Creation of Pakistan, pp. 193-94)

উল্লেখ্য লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দের উল্লেখ না থাকলেও হিন্দু ভারতই একে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে অভিহিত করে। আর এটাই ছিল যথার্থ। বহু দিন পূর্বে চৌধুরী রহমত আলীর দেয়া নামটাই সার্থক হলো।

পাকিস্তানের চিন্তাভাবনা

পাকিস্তানের চিন্তাভাবনা অথবা পরিকল্পনা কোন অভিনব রাজনৈতিক দর্শন নয়। এ শব্দটির প্রকৃত মর্ম হলো ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা। তাই কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, পাকিস্তানের সূচনা তখন থেকে হয় যখন মুহাম্মদ বিন কাসিম বিজয়ীর বেশে সিন্ধুতে পদার্পণ করেন। অতঃপর এ উপমহাদেশে কয়েকশ' বছর ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। বৃটিশ শাসনের শেষের দিকে পুনরায় বৃটিশ ভারতে মুসলিম জাতির স্বাতন্ত্র ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তাভাবনা ও প্রচেষ্টা শুরু হয়। উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলগুলোতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাজনৈতিক চিন্তাশীলদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই বিশ্ব ইসলামী ঐক্যের অগ্রদূত সাইয়েদ জামালুদ্দীন আফগানী মধ্য এশিয়ার সোসালিস্ট রিপাবলিকসমূহ, আফগানিস্তান এবং উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে একটি মুসলিম রিপাবলিক গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রথম চিন্তাভাবনা করেন, এটাকে অনেকে প্যানইসলামিজম নামে অভিহিত করেন।

চৌধুরী রহমত আলী ১৯১৫ সালে 'বজমে শিবলী' অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে দাবী করেন যে, উত্তর ভারত মুসলিম অধ্যুষিত বলে তাকে মুসলিম দেশ হিসাবেই গণ্য করা হবে। শুধু তাই নয়, তিনি বলেন, "এটাকে আমরা মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করব। এটা তখনই সম্ভব যখন আমরা এবং আমাদের উত্তরাঞ্চল ভারতীয় হওয়া পরিহার করব। এটা পূর্বশর্ত। অতএব যতো শীঘ্র আমরা ভারতীয়তা (Indianism) পরিহার করব, ততোই আমাদের ও ইসলামের জন্য মংগলকর হবে। (I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, pp. 115-116)।

অতঃপর ১৯১৭ সালে ডাঃ আবদুল জাব্বার খাইরী এবং অধ্যাপক আবদুস সাত্তার খাইরী (তাঁরা খাইরী ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত) স্টকহলমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ভারত বিভাগের পরিকল্পনার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। (Syed

Sharifuddin Pirzada : Evolution of Pakistan, (Lahore, 1963 pp. 68-90)

বাদাউনের 'যুলকারনাইন' পত্রিকায় ১৯২০ সালের মার্চ-এপ্রিলে জনৈক আবদুল কাদির বিলগ্রামীর পক্ষ থেকে মিঃ গান্ধীর নামে খোলা চিঠি প্রকাশিত হয়। এ চিঠিগুলোতে তিনি উপমহাদেশ বিভাগের যুক্তি পেশ করেন। এ বিভাগের জন্যে তিনি মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলোর একটি তালিকাও পেশ করেন—যা প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের উভয় অংশের ভৌগোলিক সীমার সাথে প্রায় সামঞ্জস্যশীল। যেহেতু এ চিঠিগুলোতে উল্লেখ্য বিষয় অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে জন্যে তা দু'বার পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। (Muhammad Abdul Qadir Bilgrami : Hindu Muslim Ittehad par Khula Khat Mahatma Gandhi ke nam Aligarh. 1925)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে টাইমস অব ইন্ডিয়ার সম্পাদক লোভাট ফ্রেজার ডেইলী এক্সপ্রেস অব লন্ডনে একটি মানচিত্র প্রকাশ করেন যাতে কন্সটান্টিনোপল থেকে ভারতের সাহারানপুর-এর দিকে একটি তীর অংকিত করা হয়। এতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোর দিকে এক মুসলিম করিডোর দেখানো হয়েছে। (I. H. Qureshi : The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent, pp. 295-96)

হিন্দু মহাসভার সভাপতি সাভারকার প্রায় উল্লেখ করতেন যে, হিন্দু ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি। কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার অন্য এক নেতা লালা লাজপাত রায় ১৯২৪ সালে ভারত বিভাগের প্রস্তাব দেন। (I.H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, p. 116; Richard Symonds : The Making of Pakistan, 1950, p. 59)

ডেরা ইসমাইল খান জেলার সরদার মুহাম্মদ গুল খান ১৯২৩ সালে ফ্রন্টিয়ার ইনকোয়ারী কমিটির কাছে হিন্দু ও মুসলমানদের স্বার্থে ভারত বিভাগের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। পেশাওর থেকে আগ্রা পর্যন্ত অঞ্চল মুসলমানদের জন্যে নির্ধারণ করার দাবী জানান। (I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, p. 116-17)

আগা খান ১৯২৮ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত সকল দলীয় কনভেনশনে প্রত্যেক প্রদেশের স্বাধীনতার দাবী উথাপন করেন। (উক্ত গ্রন্থ)

ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ বার্ষিক সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার পর বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই অথবা বাইরে মুসলমানদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব উথাপন করেন।

ডঃ ইকবাল তাঁর প্রস্তাবিত মুসলিম রাষ্ট্রের কোন নাম দেননি। এ কাজটি করেছেন চৌধুরী রহমত আলী। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে, চৌধুরী রহমত আলী এবং তাঁর ক্যাম্ব্রিজের তিনজন সহকর্মী নাউ অর নেভার (Now or Never) শীর্ষক একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন।

চৌধুরী রহমত আলী তাঁর প্রচারপত্র ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে, লন্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানকারী মুসলিম ডেলিগেটদের কাছে এবং ইংলন্ডের প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকটে প্রেরণ করেন। একখানি পত্রসহ প্রচারপত্র পাঠানো হয়। তাতে বলা হয় আমি এতদ্‌সহ পাকিস্তানের তিন কোটি মুসলমানের পক্ষ থেকে একটি আবেদন আপনাদের সামনে পেশ করছি, যাঁরা ভারতের উত্তরাঞ্চলে পাঁচটি প্রদেশে বাস করে, যথা পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান।*

মুসলমানদের এক জীবন মরণ সন্ধিক্ষণে এ আবেদন করা হয়। বলা হয়, ভারত একটি জাতির দেশ নয়, বরঞ্চ বহু জাতির দেশ। ··· আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, আমাদের সামাজিক রীতি-নীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আমাদের উত্তরাধিকার ও বিবাহ সম্পর্কিত আইন ভারতে বসবাসকারী অন্যান্য জাতির থেকে মূলতঃ পৃথক। আমরা একত্রে আহার করিনা, পরস্পর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিনা। আমাদের জাতীয় রীতি-নীতি ও প্রথাপদ্ধতি এবং বর্ষ, মাস ও দিন পঞ্জিকা পৃথক। এমনকি আমাদের আহারাদি ও পোশাক পরিচ্ছদও সম্পূর্ণ আলাদা। ··· যদি আমরা, পাকিস্তানের মুসলমানকে আমাদের জাতীয়তার সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যসহ প্রতারিত করে প্রস্তাবিত ভারতীয়

* উল্লেখ্য চৌধুরী রহমত আলী উপরোক্ত পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবী করেন যার নাম তিনি 'পাকিস্তান' দেন।

ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে আমাদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হবে। এ প্রস্তাব আমাদের জাতির মৃত্যুঘন্টারই অনুরূপ। —(G. Allana : Muslim Political Thought Through the Ages : 1562-1947, pp. 295-300)

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'পাকিস্তান' নামটি চৌধুরী রহমত আলীরই উদ্ভাবন—যা লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক অংগনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং প্রায় সাত বছর পর তা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়।

সাইয়েদ শরীফুদ্দীন পীরজাদা তার Evolution of Pakistan গ্রন্থে বলেন :

এসব প্রস্তাব ও পরামর্শ যা স্যার আবদুল্লাহ হারুন, ডঃ লতিফ, স্যার সেকেন্দার হায়াত খান, জনৈক পাঞ্জাবী, ডঃ কাদেরী, মাওলানা মওদূদী, চৌধুরী খালিকুজ্জামান প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থাপন করেন তা সবই এক অর্থে পাকিস্তান সৃষ্টিরই পথ নির্দেশক ছিল।

সর্বশেষে ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ কর্তৃক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লাহোর প্রস্তাব তথা পাকিস্তান প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা

পাকিস্তান তথা ভারত বিভাগের প্রস্তাব হিন্দুরা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে মেনে নিতে পারেনা এবং তাই তারা তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ৬ই মে পুনাতে বলেন, হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগের কোন ইতিবাচক কর্মসূচী নেই। তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবকে নির্বুদ্ধিতা বলে আখ্যায়িত করে বলেন, এ চব্বিশ ঘন্টার অধিককাল টিকে থাকবেনা। হিন্দু মহাসভা ১৯শে মে পাকিস্তান প্রস্তাবকে হিন্দু বিরোধী এবং জাতীয়তা বিরোধী বলে উল্লেখ করে।

কংগ্রেস ও হিন্দুজাতির চরম বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পাকিস্তান আন্দোলন চলতে থাকে এবং হিন্দুদের বিরোধিতা ও অপপ্রচার মুসলমানদের ঐক্য সুদৃঢ় করতে থাকে।

পাকিস্তান আন্দোলনকে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণার জন্যে মুসলিম ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়, তা এই যে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জামিলুদ্দীন আহমদকে আহবায়ক করে একটি লেখক কমিটি গঠন করা হয়। প্রখ্যাত প্রবন্ধকারগণ বিভিন্ন প্রচারপত্র রচনা করেন এবং সেগুলো পাকিস্তান সাহিত্য অনুক্রম (Pakistan Literature Series) নামে লাহোরের শেখ মুহাম্মদ আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। জামিলুদ্দীন আহমদ বলেন, স্বাধীন পাকিস্তান এবং স্বাধীন হিন্দুস্তান বন্ধুত্বপূর্ণ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে অবস্থান করতে থাকবে। ভারতীয় ঐক্য এক অলীক কল্পনা বিলাস এবং ঐতিহাসিক সত্যের পরিপন্থী। (I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, p. 136)

পয়লা জুলাই, ১৯৪০, কায়েদে আযম শিমলা অবস্থানকালে ভাইসরয়ের নিকটে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেন এবং প্রস্তাবগুলোকে "পরীক্ষামূলক" বলে চিহ্নিত করেন। প্রস্তাবগুলো নিম্নরূপ :

ভারত বিভাগ এবং উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের যে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিবৃতি সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা যাবে না।

ভারতের মুসলমানদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা দান করতে হবে যে, মুসলিম ভারতের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন অন্তর্বর্তীকালীন অথবা চূড়ান্ত সাংবিধানিক স্কীম গঠন করা হবে না। ইউরোপে যেভাবে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে এবং ভারত বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে তাতে আমরা পুরোপুরি উপলব্ধি করছি যে, যুদ্ধ প্রচেষ্টা তীব্রতর করা উচিত। ভারতের সকল উপায় উপকরণ তার প্রতিরক্ষার জন্যে নিয়োজিত করা উচিত যাতে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শান্তি শৃংখলা নিশ্চিত করা যায় এবং বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু এসব কিছু লাভ করা সম্ভব যদি বৃটিশ সরকার কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিম নেতৃত্বকে সমান অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হন।

সাময়িকভাবে এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে সরকারের অধিকার এখতিয়ারে সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সরকারের সাথে সহযোগিতার ফরমুলা মেনে চলা যায় :

ক. বর্তমান সাংবিধানিক আইনের আওতায় ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সম্প্রসারিত করতে হবে। আলোচনার পরই অতিরিক্ত সংখ্যা নির্ধারিত হবে। কিন্তু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই হিন্দুর সমসংখ্যক হতে হবে যদি কংগ্রেস যোগদান করেন। অন্যথায়, অতিরিক্ত সদস্যদের অধিকাংশ মুসলমান হতে হবে। কারণ প্রধান গুরুদায়িত্ব মুসলমানদেরকেই বহন করতে হবে।

খ. যে সকল প্রদেশে আইনের ৯৩ ধারা বলবৎ, সেখানে নন-অফিসিয়াল উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে। আলোচনার পর সংখ্যা নির্ধারিত হবে। তবে উপদেষ্টাগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মুসলিম প্রতিনিধিগণের হবে। কিন্তু যেসব প্রদেশে কোয়ালিশন সরকার আছে, সেখানে সংশ্লিষ্ট দলগুলোর দায়িত্ব হবে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

গ. প্রেসিডেন্টসহ পনেরো জনের একটি সমর কাউন্সিল (War Council) হবে। ভাইসরয় সভাপতিত্ব করবেন। · · · এখানেও মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর সমান হবে যদি কংগ্রেস যোগদান করে।

সর্বশেষ কথা এই যে, সমর কাউন্সিলে, ভাইস্‌রয়ের কার্যকরী কাউন্সিলে (Executive Council) এবং গভর্ণরের নন–অফিসিয়াল উপদেষ্টাদের মধ্যে যাঁরা মুসলিম প্রতিনিধি হবেন, তাঁদেরকে বেছে নেবে মুসলিম লীগ।

পয়লা জুলাই সুভাসচন্দ্র বোস গ্রেফতার হন এবং তেসরা জুলাই মিঃ গান্ধী বৃটেনের প্রতিটি নাগরিকের কাছে অহিংস নীতি অবলম্বন করে অস্ত্র পরিহারের আবেদন জানান। সাথে সাথেই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার পুনর্দাবী করা হয়। সেইসাথে কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার গঠনের দাবীও জানানো হয়।

মিঃ জিন্নাহ ভাইস্‌রয়ের নিকটে তাঁর যে পরীক্ষামূলক (Tentative) প্রস্তাব পেশ করেন, সে সম্পর্কে ভাইস্‌রয় ৬ই জুলাই তারিখে লিখিত তাঁর পত্রে তাঁর দৃষ্টিভংগী মিঃ জিন্নাহকে জানিয়ে দেন। তিনি তাঁর কাউন্সিল সম্প্রসারণে সম্মত হন কিন্তু তার মধ্যে মুসলিম অংশীদারিত্বে অসম্মতি জানান। কাউন্সিলের মুসলিম সদস্যগণকে মুসলিম লীগ নমিনেশন দেবে এ দাবী মানতেও তিনি রাজী নন। কারণ, তিনি বলেন, এটা ভারত সচিবের অধিকার এবং কাউন্সিল সদস্যগণ রাজনৈতিক দলের মনোনীত হবেন না। প্রাদেশিক গভর্ণরদের নন–অফিসিয়াল উপদেষ্টা নিয়োগও তিনি মেনে নিতে পারেন না। ওয়ার কাউন্সিল (War Council) গঠনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এর বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নির্ধারিত করা হবে।

মিঃ জিন্নাহর পরীক্ষামূলক প্রস্তাবের শর্তাবলী প্রত্যাখ্যান করা হলো। কিন্তু অভিজ্ঞ রাজনীতিক মিঃ জিন্নাহ দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি তাঁর আলাপ আলোচনা অব্যাহত রাখেন।

সপ্তম অধ্যায়

ব্রিটিশ সরকারের আগস্ট প্রস্তাব

ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতানৈক্য এবং কংগ্রেস–লীগ ও বড়োলাটের মধ্যে মতবিরোধের কারণে হতাশ হয়ে পড়েননি। ১৯৪০ সালের ৮ই আগষ্ট ব্রিটিশ সরকার যে ঘোষণা দেন তা আগষ্ট প্রস্তাব নামে অভিহিত করা হয়। এ ঘোষণায় কিছু নতুন ধারণা দেয়া হয়। প্রথমতঃ ইন্দোব্রিটিশ ইতিহাসে এই প্রথমবার ভারতীয়দের নিয়ে একটি গণপরিষদ গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এ যাবত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ইচ্ছাই ছিল চূড়ান্ত এবং ভারত সরকার আইন ১৯৩৫ এ প্রাধান্য অনুমোদন করতো। এখন ভারতীয় গণপরিষদের ধারণা শুধু সমর্থনই করা হলোনা, বরঞ্চ তা গঠনের প্রতিশ্রুতিও দেয়া হলো। দ্বিতীয়তঃ গণপরিষদ সম্পর্কে কংগ্রেসের ধারণা প্রত্যাখ্যান করা হয়। একথাও সুস্পষ্ট করে বলা হয় যে, গণপরিষদ এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবেনা যার দ্বারা সংখ্যালঘুদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়। তৃতীয়তঃ ডমিনিয়ন ষ্টেটাসকেই ভারতের লক্ষ্য মনে করা হয়। এসব ব্যবস্থা গৃহীত হবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর। আগষ্ট প্রস্তাবের কিছু মন্দ দিকও ছিল যা লীগ ও কংগ্রেসের প্রস্তাবে তুলে ধরা হয়।

মিঃ জিন্নাহ ১২ই ও ১৪ই আগষ্ট উপরোক্ত প্রস্তাব নিয়ে মতবিনিময় করেন। তবে পয়লা ও দুসরা সেপ্টেম্বরে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র মুসলিম লীগের অনুমোদন ব্যতীত প্রণীত হবে না এ দাবী মেনে নেয়ায় মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সেইসাথে ওয়ার্কিং কমিটি এ কথা ঘোষণা করা যথার্থ মনে করে যে, কমিটি লাহোর প্রস্তাব ও তার শর্তাবলীর মূলনীতির উপর অবিচল আছে এবং তা এই যে, ভারতের মুসলমান একটি জাতি এবং তাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণের অধিকারী তারাই। মধ্যবর্তী ব্যবস্থার জন্যে সরকারের প্রস্তাব অসন্তোষজনক। মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ১৬ই জুনের দাবীগুলি মেনে নেয়া হয়নি। নিম্নলিখিত কারণে সরকারের আগষ্ট প্রস্তাব মেনে নেয়া যায় না বলে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় ঃ

১. বড়োলাটের এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যার যে প্রস্তাব করা হয়, সে সম্পর্কে লীগ সভাপতি অথবা ওয়ার্কিং কমিটির সাথে কোন আলাপ আলোচনা করা হয়নি।
২. কাউন্সিল কিভাবে গঠিত হবে তার ধরন সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটিকে অবহিত করা হয়নি।
৩. অন্য কোন্ দলের সাথে কাজ করতে লীগকে ডাকা হবে এ সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি অবহিত নয়।
৪. কাউন্সিলের নতুন সদস্যদের কোন্ কোন্ পদ (Portfolio) দেয়া হবে, সে সম্পর্কে লীগের কোন ধারণা নেই।
৫. যুদ্ধ উপদেষ্টা পরিষদ (War Advisory Council) সম্পর্কে যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য।

মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি তার সভাপতিকে এ ক্ষমতা দান করে যে, তিনি প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র, যুদ্ধ উপদেষ্টা পরিষদের গঠন পদ্ধতি ও দায়িত্ব কর্তব্য এবং বড়োলাটের এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলের কলেবর বৃদ্ধি সম্পর্কে বড়োলাটের কাছে ব্যাখ্যা দাবী করবেন।

মিঃ জিন্নাহ ২০শে সেপ্টেম্বর বড়োলাটের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পরদিন বড়োলাট লীগের উত্থাপিত প্রশ্নগুলির জবাব দেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে বড়োলাটের জবাব সম্পর্কে আলোচনা হয়। বড়োলাটের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয় বলে কমিটি অভিমত ব্যক্ত করে।

সরকারের আগষ্ট প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত তীব্র। কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ১০ই আগষ্ট বড়োলাটের সাথে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানান। কংগ্রেস প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে। বলা হয়, সরকার ক্ষমতা ছাড়তে রাজী নন এবং প্রস্তাবটি সরাসরি দ্বন্দ্ব সংগ্রামে ইন্ধন যোগাচ্ছে। সংখ্যালঘুদের বিষয়টি ভারতের উন্নতির পথে এক অলংঘ্য প্রতিবন্ধক। কংগ্রেসকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করতে হবে বলে ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

সরকারের আগষ্ট প্রস্তাব রাজনৈতিক দল কর্তৃক গৃহীত হয়নি। কিন্তু এতে মুসলমানদের কিছু লাভ হয়েছে। ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, তা মধ্যবর্তী হোক অথবা চূড়ান্ত, মুসলমানদের সন্তোষজনক অনুমোদন লাভ করা হবে বলে সরকার প্রতিশ্রুতি দান করেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক বছরের মধ্যে এবং লাহোর

প্রস্তাবের পর পাঁচ মাসের মধ্যে সরকারের এ ধরনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা মুসলিম লীগের কম কৃতিত্ব নয়। মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেসের আচরণের ফলেই এ কৃতিত্ব লাভ হয়। কংগ্রেসের হাতে মুসলমানদের ভাগ্য ছেড়ে দেয়া সরকার সমীচীন মনে করেননি।

কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন ও মুসলমান

মিঃ গান্ধী বড়োলাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর সাথে ২৭শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বর সাক্ষাৎ করেন ও তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে বড়োলাটকে অবহিত করেন। কংগ্রেস নেতা মনে করেন যে, সকল ভারতীয়দের এ অধিকার আছে যে তারা দেশবাসীকে এ আহ্বান জানাবে যে তারা যুদ্ধ প্রচেষ্টা থেকে দূরে থাকবে। বড়োলাট তাঁর এ দৃষ্টিভংগী মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলেন, একজন বিবেকবান বিরুদ্ধবাদী যুদ্ধ করতে না পারেন, তিনি জনগণের কাছে তাঁর দৃষ্টিভংগী পেশ করতে পারেন। কিন্তু তাঁকে এ অনুমতি দেয়া যেতে পারেনা যে, তিনি অন্যকে যুদ্ধে বাধা দান করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করবেন। ১১ই অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে সত্যাগ্রহ শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গান্ধীজির নির্দেশে সর্বপ্রথম বিনোবা ভাবে গ্রেফতারীর জন্যে নিজেকে পেশ করেন। রাজা গোপালাচারিয়া এবং আবুল কালাম আজাদও কারাবরণ করেন। কংগ্রেসপন্থীদের ব্যাপক কারাবরণ সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে পারেনি। বিশেষ করে মুসলিম প্রদেশগুলিতে এ সত্যাগ্রহ মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। সারা ভারতের মধ্যে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সবচেয়ে ক্ষীণ সাড়া পাওয়া যায়। প্রথম দিকে ডাঃ খান এ আন্দোলনে যোগদান করতে অনীহা প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৪ই ডিসেম্বর তাঁর গ্রেফতারী জনমতের শান্ত পরিবেশের উপর সামান্য তরংগ সৃষ্টি করে মাত্র।

একচল্লিশের এপ্রিলে মিঃ গান্ধী সকল কংগ্রেসীর জন্যে সত্যাগ্রহ উন্মুক্ত করে দেন। তার ফলে প্রায় ২০,০০০ লোক স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন। কংগ্রেসের জন্যে এ সংখ্যা খুবই নগণ্য। আন্দোলন ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে।

কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন মুসলমানগণ মেনে নিতে পারেননি। কারণ কংগ্রেসের দুরভিসন্ধি তাঁরা বুঝতে পারেন। ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে মিঃ জিন্নাহ দিল্লীতে প্রদত্ত তাঁর এক ভাষণে কংগ্রেসের দাবীর প্রতি উপহাস করে

বলেন যে, কংগ্রেস আন্দোলন করছে স্বাধীনতার জন্যে। তাঁর কাছে এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে এ কথা পরিষ্কার যে, কংগ্রেস সরকারকে ভীতি প্রদর্শন করে এ স্বীকৃতি আদায় করতে চায় যে কংগ্রেস ভারতবাসীর একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন। কংগ্রেসের মনোভাব হলো ঃ 'মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দাবী প্রত্যাখ্যান করে আমাদের দাবী মেনে নাও।' কংগ্রেস ক্ষমতা লাভ করতে চায় এবং চায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি বলপ্রয়োগের ক্ষমতা। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বল প্রয়োগ করতে চায়।

একচল্লিশের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে এবং এপ্রিলে অনুষ্ঠিত মাদ্রাজ মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে মিঃ জিন্নাহর ভাষণের সমর্থনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, সরকার যদি তাঁদের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভংগ করে কংগ্রেসের দাবী মেনে নেয় তাহলে উদ্ভুত পরিস্থিতি মুকাবিলা করার জন্যে মুসলিম লীগ যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে প্রস্তুত থাকবে। (The Struggle for Pakistan, Ishtiaq Hussain Qureshi, pp. 163-64)

লিবারাল পার্টি প্রস্তাব—১৯৪১

দুটি প্রধান দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নীতি পলিসি আলোচনার পর দেখা যাক ন্যাশনাল লিবারাল ফেডারেশন কি মনোভাব পোষণ করছে। আইন সভায় তাঁদের একটি ক্ষুদ্র দল আছে। তবে তাঁদের মধ্যে স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, স্যার চিমনলাল শিতলবন্দ এবং স্যার শ্রী নিবাস শাস্ত্রীর মতো অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকও আছেন। তাঁদের দৃষ্টিভংগী ও মনোভাব জানারও প্রয়োজন আছে। চল্লিশের ডিসেম্বরে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত তাঁদের বার্ষিক অধিবেশনে লিবারালগণ তাঁদের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির মূলনীতি ঘোষণা করেন এবং তা সমাধানের ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হবে বলে তাঁরা মনে করেন। এ বিষয়ে তাঁরা যে প্রস্তাব করেন তা নিম্নরূপ ঃ

১. যুদ্ধপ্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ সহায়তা দান।
২. যুদ্ধ শেষ হওয়ার দু'বছরের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা করা উচিত যে ভারত একটি ডমিনিয়ন হবে।

৩. কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনর্গঠিত করতে হবে যাতে ভাইস্‌রয় একটি পরিপূর্ণ জাতীয় সরকারের শাসনতান্ত্রিক প্রধান হতে পারেন।
৪. ভারত বিভাগ প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা ক্রমশঃ রহিত করতে হবে।
৫. কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন দুঃখজনক।

একচল্লিশের মার্চে লিবারালগণ বোম্বাইয়ে এক নির্দলীয় সম্মেলনে মিলিত হন। সম্মেলনকে নির্দলীয় বলা হলেও তা ছিল হিন্দুমহাসভা প্রভাবিত। এতে তিন চারজন মুসলমান অংশগ্রহণ করলেও তাঁরা মুসলিম স্বার্থে কোন কথা বলতে পারেননি। হিন্দু মহাসভার তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি—সাভারকার, ডাঃ মুঞ্জে ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্মেলনে যোগদান করেন। তেজ বাহাদুর সাপ্রু সভাপতিত্ব করেন এবং স্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকার কতিপয় প্রস্তাব পেশ করেন যা গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। এতে তথাকথিত লিবারালগণ উষ্মা প্রকাশ করেন এবং ২৯শে জুন পুনায় ন্যাশনাল লিবারাল ফেডারেশনের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সংকট নিরসনের জন্যে তাঁদের উত্থাপিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্যে সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয়। মুসলিম লীগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে ভারত সচিবের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। ভারত বিভাগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয় এবং প্রস্তাবিত বিভাগ প্রতিরোধের জন্যে সকল ভারতবাসীর প্রতি আহবান জানানো হয়।

সাপ্রু প্রস্তাব বা সুপারিশের উপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার গঠনের যে দাবী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে করা হয়েছে সাপ্রু প্রস্তাব তাই সমর্থন করে। এ প্রস্তাব মেনে নেয়া হলে তা হবে ব্রিটিশ সরকারের আগস্ট প্রস্তাব রহিত করার শামিল।

ভারত সচিব এল্‌· এম· অ্যামেরী ২২শে এপ্রিল ১৯৪১, হাউস্‌ অব্‌ কমন্সে এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ভারতে যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা বিরাজ করছে তা এ জন্যে নয় যে, বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা দিতে রাজী নয়, বরঞ্চ এ জন্যে যে ভারত তার দাবীতে একমত হতে পারেনি। অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন ধরনের যে এক্সিকিউটিভের প্রস্তাব করা হয়েছে, তা হিন্দু মুসলিম অনৈক্য প্রশমিত না করে অধিকতর বর্ধিত করবে, আমি সাপ্রুর মতো লোকের কাছে এ

আবেদন রাখব যে, তাঁরা যেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

গান্ধীর প্রতিক্রিয়া

ভারত সচিবের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন মিঃ গান্ধী। তিনি বলেন, অনৈক্যের জন্যে ভারতের স্বাধীনতা বিলম্বিত হচ্ছে এ কথা বলে অ্যামেরী ভারতীয় জ্ঞানবুদ্ধির (Indian intelligence) অবমাননা করেছেন। ভারতের শ্রেণী বিভেদের জন্যে ব্রিটিশ রাজনীতিকগণই দায়ী। যতোদিন ব্রিটিশ অস্ত্রের মাধ্যমে ভারতকে পদানত রাখবে ততোদিন এ বিভেদ মতানৈক্য চলতে থাকবে। আমি স্বীকার করি যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে এক দুর্লংঘ্য ব্যবধান রয়েছে। ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ কেন স্বীকার করেন না যে এ একটি ঘরোয়া বিবাদ (Domestic quarrel)? তারা ভারত ছেড়ে চলে যাকনা, তারপর আমি ওয়াদা করছি, কংগ্রেস, লীগ এবং অন্যান্য দল তাদের নিজেদের স্বার্থেই একত্রে মিলিত হয়ে ভারত সরকার গঠনের সমাধান বের করবে। ··· বাইরের কোন হস্তক্ষেপ আহবান না করতে যদি আমরা একমত হই— তাহলে সম্ভবতঃ এ সংকট এক পক্ষকাল বিদ্যমান থাকবে। অন্য কথায় ব্রিটিশ ক্ষমতা ছেড়ে চলে গেলে, হিন্দুই যথেষ্ট শক্তিশালী হবে— সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে মুসলমানদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যে। গান্ধীজির এ কথা কারো বুঝতে বাকী থাকার কথা নয়। ১৯৪৭–এর জুলাই পর্যন্ত তিনি তাঁর এ কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। মুসলিম জাতির অস্তিত্ব সহ্য করতে না পারা এবং উপরোক্ত অশোভন উক্তি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করে।

প্রতিরক্ষা পরিষদ (Defence Council) গঠন

একচল্লিশের ২০শে জুলাই বোম্বাই–এর গভর্ণর স্যার রজার লিউমলী মিঃ জিন্নাহর নিকটে এ মর্মে ভাইসরয়ের এক বাণী পৌঁছিয়ে দেন যে, ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদনক্রমে ভাইসরয় তাঁর এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিল (Executive Council) অতিরিক্ত পাঁচটি কোর্ট ফাইলসহ বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত করেছেন। নতুন পদ গ্রহণে যাঁরা সম্মত হয়েছেন তাঁরা হলেন স্যার হোমী মোদী, স্যার আকবর হায়দরী, আর রাও, এম্ এস্ এনী এবং স্যার ফিরোজ খান নূন। একই

সাথে ত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিরক্ষা পরিষদ (Defence Council) গঠনের কথাও বলা হয়। দেশীয় রাজ্য থেকেও দশজন সদস্য গ্রহণ করা হবে। এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব অপরিহার্য বিধায় বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রীগণকেও তিনি সদস্যপদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

পরের দিন মিঃ জিন্নাহ স্যার রজার লিউমলীর পত্রের জবাবে ভাইসরয়ের পদক্ষেপের প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, মুসলিম লীগের সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটিকে ডিঙিয়ে এসব ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো নীতিবহির্ভূত হয়েছে। আগস্টের ২৪, ২৫ ও ২৬ তারিখে বোম্বাইয়ে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ তারিখের গৃহীত প্রস্তাবে পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের প্রধানমন্ত্রী যথাক্রমে স্যার সেকান্দার হায়াত খান, ফজলুল হক ও স্যার সা'দুল্লাহকে ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিল থেকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।

আটজন মুসলমান প্রতিরক্ষা পরিষদে যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে পাঁচ জন সিকান্দার হায়াত, ফজলুল হক, সা'দুল্লাহ, বেগম শাহনওয়াজ এবং ছাতারীর নবাব, লীগের নির্দেশক্রমে পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের প্রধানমন্ত্রীগণ ১১ই সেপ্টেম্বর প্রতিরক্ষা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ছাতারীর নবাব হায়দরাবাদ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভাপতি হওয়ার কারণে পূর্বেই পদত্যাগ করেন। বেগম শাহনওয়াজ এবং স্যার সুলতান আহমদ পদত্যাগ না করার জন্যে পাঁচ বছরের জন্যে লীগ থেকে বহিষ্কৃত হন। লীগ ২৬ ও ২৭ তারিখের দিল্লীর বৈঠকে সেন্ট্রাল এসেম্বলীর গোটা অধিবেশন থেকে বাইরে আসার সিদ্ধান্ত করে। তদনুযায়ী ২৮ তারিখে মুসলিম লীগ দল হাউস থেকে ওয়াকআউট করে। তাঁরা অভিযোগ করেন যে, ব্রিটিশ সরকার কেন্দ্রে এবং প্রদেশে লীগকে তার সত্যিকার দায়িত্ব ও অধিকারের অংশীদারিত্ব প্রদানে অস্বীকার করেন (The Struggle for Pakistan : I. H. Qureshi, pp. 169-191)

অক্টোবরের মাঝামাঝি ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সম্প্রসারণ সম্পন্ন করা হয়। একই দিনে অসহযোগ আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট বহু কংগ্রেসীকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়। কংগ্রেসের একটি অংশ প্রস্তাব করে যে, প্রদেশে আবার ক্ষমতাগ্রহণ করা হোক। কিন্তু মিঃ গান্ধী এতে সম্মত হননি।

এদিকে লীগের অবস্থা সংকটমুক্ত ছিলনা। কারণ যেসব দল তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে মনে করে তারা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। যদিও বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক প্রতিরক্ষা পরিষদ থেকে এস্তেফা দান করেন, তিনি তা করেছিলেন অনিচ্ছাকৃতভাবে। লীগ বিরোধীমহল তাঁকে পরোক্ষভাবে তাদের সমর্থনের নিশ্চয়তা দান করে। মুসলিম লীগের একটি দল ফজলুল হক সাহেবের লীগ থেকে বহিষ্কার দাবী করে। অন্যটি নমনীয় হওয়ার পক্ষে ছিল। কায়েদে আযম স্বয়ং কিছু অবকাশ দানের পক্ষে ছিলেন যাতে বাংলার প্রধানমন্ত্রী পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারেন। ফজলুল হক দুঃখ প্রকাশ করে যে পত্র দেন তা লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচনার পর বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু বছরের শেষে মিঃ ফজলুল হক এবং তাঁর জনৈক সহকর্মী ঢাকার নবাব, বাংলার আইন পরিষদের লীগ দল থেকে বেরিয়ে কংগ্রেস এবং অন্যান্য হিন্দু দলের সংগে মিলিত হয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। পরিষদের ইউরোপিয়ান দলও তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। নতুন কোয়ালিশন সরকার এ কথাই প্রমাণ করে যে, একদিকে কংগ্রেস এবং অপরদিকে ব্রিটিশ সরকার বাংলায় মুসলিম লীগের প্রভাব বিনষ্ট করতে চান। লীগের পক্ষ থেকে ফজলুল হক সাহেবের কৈফিয়ৎ তলব করা হলে তিনি গড়িমসি করতে থাকেন। ফলে ১৯৪১ সালের ১১ই ডিসেম্বর ফজলুল হক সাহেবকে লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। (Creation of Pakistan : Justice Sayed Shameem Husain Kadir, pp. 226-27)

অষ্টম অধ্যায়

ক্রিপ্‌স্ মিশন

একচল্লিশের শেষ দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এবং তা ভারত উপমহাদেশের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। জাপানের হাতে বৃটেন ও তার মিত্রশক্তির দুর্গ সিংগাপুরের পতন ঘটে এবং বার্মার পতনও ছিল আসন্ন। কিছু লোকের সহানুভূতি ছিল জাপানের প্রতি। কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই বৃটেন ও তার শত্রুকে একই চোখে দেখতেন। গান্ধী বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুষ্কর্মের শাস্তিস্বরূপ ভগবান হিটলারকে পাঠিয়েছেন। কংগ্রেস মনে করতো যুদ্ধে বৃটেন কোণঠাসা হয়ে পড়লে তার থেকে বেশী বেশী রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা যাবে।

সাতই মার্চ ১৯৪২, জাপান বার্মা দখল করে। তার মাত্র চার দিন পর ১১ই মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চিল হাউস্ অব্ কমন্সে গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দানের পর ওয়ার কেবিনেট (War Cabinet) কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সিদ্ধান্তগুলো একটি খসড়া ঘোষণায় সন্নিবেশিত হয়। সেই খসড়া ঘোষণা নিয়ে স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ২৯শে মার্চ ভারতে আগমন করেন। খসড়ার ভূমিকায় বলা হয় যে, একটি নতুন ভারতীয় ডমিনিয়ন গঠন এ ঘোষণার উদ্দেশ্য।

খসড়া ঘোষণার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

যুদ্ধশেষ হওয়ার সাথে সাথে সংবিধান রচনার জন্যে ভারতে একটি 'বডি' বা পরিষদ গঠন করা হবে। দেশের প্রাদেশিক পরিষদগুলোর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এ পরিষদ নির্বাচিত করবে। এতে দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

এ বডি বা পরিষদ কর্তৃক রচিত যে কোন সংবিধান বৃটেন গ্রহণ করবে তিনটি শর্তে ঃ

১. যে কোন প্রদেশ প্রস্তাবিত ইউনিয়নে যোগদান করা থেকে বিরত থাকতে পারবে তাদের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদাসহ। এ ধরনের প্রদেশগুলো ইচ্ছা করলে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের অনুরূপ নিজেদের পৃথক ইউনিয়নও গঠন করতে পারবে।

২. যেহেতু ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা পরিপূর্ণরূপে হস্তান্তরিত হতে যাচ্ছে, সেজন্য এ সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে বৃটেন এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী পরিষদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পন্ন হবে। এ চুক্তি সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

৩. দেশীয় রাজ্যসমূহ যদি শাসনতন্ত্র মেনে না নেয়, তাহলে তাদের চুক্তি ব্যবস্থায় কিছু রদবদলের জন্যে তাদের সাথে আলোচনার প্রয়োজন হবে।

স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস্ ৩০শে মার্চ বেতার ভাষণের মাধ্যমে খসড়া ঘোষণার ব্যাখ্যা দান করেন। বেতার ভাষণের পর ক্রিপস্ স্কীমটি গ্রহণ করার জন্যে সকল ভারতবাসীর প্রতি আবেদন জানান।

ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া

স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস্ ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা অব্যাহত রাখেন। তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই এ আলোচনা চলতে থাকে। (এক) প্রস্তাবিত ভারতীয় ইউনিয়নে প্রদেশের যোগদান না করার স্বাধীনতা। (দুই) শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পরিষদে দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব এবং (তিন) সত্বর একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠন।

খসড়া ঘোষণার নন্ এক্সেশন ক্লজে (Non-accession Clause) প্রদেশগুলোকে এ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করা থেকে তারা বা কোন কোন প্রদেশ বিরত থাকতে পারে। এ সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়ানক তীব্র। তার ধারণা, এতে ভারতের অখন্ডতার প্রতি চরম আঘাত হানা হবে। তাই তা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।

দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে কংগ্রেসের দাবী হলো যে, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। এতে কংগ্রেসের সুবিধা এই যে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসকে সমর্থন করবে। এ ব্যবস্থা কিন্তু মুসলিম লীগ মেনে নিতে পারেনা। তৃতীয়তঃ কংগ্রেসের জোর দাবী এই যে কেন্দ্রে সত্বর একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা হোক। এতে মুসলিম লীগ ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে বলে তারা এ দাবী মেনে নিতে পারেনা।

স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসের সাথে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের কিছু দিন যাবত পত্র বিনিময় হয়। কিন্তু কংগ্রেসের দাবী মেনে নেয়া হয়নি বলে ১১ই এপ্রিল কংগ্রেস ক্রিপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার ঘোষণা করে।

মুসলিম লীগও ক্রিপস্ প্রস্তাব মেনে নিতে পারেনি। মুসলিম লীগের কথা এই যে, যতোক্ষণ না পাকিস্তান স্কীমের মূলনীতি মেনে নেয়া হয়েছে এবং মুসলিম ভারতের সত্যিকার রায় প্রতিফলিত হয় এমন কোন পদ্ধতিতে মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মেনে নেয়া না হয়েছে, ভবিষ্যতের কোন স্কীম বা প্রস্তাব মুসলিম লীগ মেনে নিতে পারবে না।

ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতার পর

ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর স্বয়ং কংগ্রেস চরম ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের শিকার হয়। কংগ্রেস চেয়েছিল একটি জাতীয় সরকার গঠনের মাধ্যমে উপমহাদেশের উপর তার শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে। এ ছিল ভারতীয় মুসলমানদের পদদলিত করে রাখার এক নির্মম দুরভিসন্ধি। যাহোক ব্রিটিশ সরকার তাঁদের স্বার্থেই কংগ্রেসের এ অন্যায় আবদার মেনে নিতে পারেননি।

বৃটেন যুদ্ধে হেরে গেছে এটাকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করে গান্ধী ১৯৪০-এর মে মাসে ভাইস্রয়কে লিখিত এক পত্রে বলেন, "এ নরহত্যা বন্ধ করতে হবে। তোমরা ত হেরে যাচ্ছ। এর পরও যদি জিদ ধরে থাক, তাহলে অধিকতর রক্তপাত ঘটবে। হিটলার একজন মন্দ লোক নয়। তোমরা আজ যুদ্ধ বন্ধ করলে, সেও তোমাদের অনুসরণ করবে।" ভাইস্রয় এ ঔদ্ধত্য ও বিশ্বাসঘাতকতার জবাব অতি নম্রভাবে দিয়ে বলেন, আমরা এখন যুদ্ধরত আছি। আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছার পূর্বে আমরা নড়চড় করব না। আমাদের জন্যে আপনার উৎকণ্ঠা বুঝতে পারছি। তবে সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবে।

গান্ধী ভাইস্রয়ের জবাবে তুষ্ট না হয়ে ৬ই জুলাই প্রত্যেক ইংলন্ডবাসীর প্রতি এক আবেদনে বলেন, অস্ত্র সংবরণ কর। কারণ এ তোমাদের নিজেদেরকে এবং মানবতাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তোমরা হিটলার ও মুসোলিনিকে ডেকে আনবে এবং তারা তোমাদের সব কিছুই কেড়ে নেবে। ঠিক আছে, তাদেরকে

তোমাদের মনোরম অট্টালিকাদিসহ তোমাদের সুন্দর দ্বীপ দখল করতে দাও।

—(The Struggle for Pakistan. I. H. Qureshi: Both the letter are quoted in G.D. Birla in the Shadow of the Mahatma : A Personal Memoir (Bombay, 1953, p. 302)

ক্রিপসের বেতার ভাষণ

স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্স্ ২৬শে জুলাই, আমেরিকাবাসীদের জন্যে তাঁর প্রদত্ত বেতার ভাষণে, তাঁর ভারত ভ্রমণের সময় থেকে সর্বশেষ ভীতিপ্রদর্শন পর্যন্ত কংগ্রেস রাজনীতির পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, কোন দায়িত্বশীল সরকার কংগ্রেসের দাবী বিবেচনা করতে পারেন না। কংগ্রেস আধিপত্যের চরমবিরোধী মুসলমানগণ এবং কয়েক কোটি অনুন্নত সম্প্রদায়ও এ দাবী মানতে পারে না। গান্ধীর দাবী মেনে নেয়ার অর্থ চরম অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা।

তিনি আরও বলেন, আমরা একজন কল্পনাপ্রবণকে প্রাচ্যে জাতিসংঘের বিজয় প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতে দিতে পারি না, তিনি অতীতে যতোবড়োই স্বাধীনতা সংগ্রামী থাকুন না কেন।

পন্ডিত নেহরু উক্ত বেতার ভাষণের প্রতিবাদে স্টাফোর্ড ক্রিপ্সকে 'শয়তানের উকিল' (Devil's advocate) বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, বৃটেন ভারতের যে অনিষ্ট করেছে এবং এখন ও করছে, তার জন্য তার উচিত ছিল অনুতপ্ত হ'য়ে অতি বিনীতভাবে আমাদের নিকটে আবেদন পেশ করা।

মুসলমানদের কংগ্রেস দাবীর বিরোধিতাকে নেহরু প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আমার মুসলমান দেশবাসীকে আমি স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্স্ অপেক্ষা ভালোভাবে জানি এবং তাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা অপবাদ মাত্র। (The Struggle for Pakistan, I.H. Qureshi; Documents on the Indian Situations Since the Cripps Mission, pp 47-48)

'ভারত ছাড়' আন্দোলন (Quit India Movement)

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত তার অধিবেশনে 'ভারত ছাড়' (Quit India) প্রস্তাব গ্রহণ করে। এর মনস্তাত্ত্বিক কারণ বড়ো দুঃখজনক।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন যে যুদ্ধে মিত্র শক্তির পরাজয় অবধারিত। এই সুযোগে দেশে চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি করে সমগ্র দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করা ছিল কংগ্রেসের পরিকল্পনার অধীন। এভাবেই মুসলমানদের সকল দাবী দাওয়া প্রত্যাখ্যান করে উপমহাদেশে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে। কংগ্রেসের এ পরিকল্পনার স্বীকৃতি পাওয়া যায় মাওলানা আবুল কালাম আযাদ-এর 'ইন্ডিয়া উইন্স্ ফ্রীডম' গ্রন্থে। তিনি বলেনঃ

তাঁর মনে এ পরিকল্পনা ছিল যে, যেইমাত্র জাপানীরা বাংলায় পৌঁছে যাবে এবং ব্রিটিশ সৈন্য বিহারে পিছু হটে আসবে, কংগ্রেস গোটা দেশের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করবে। কিন্তু কংগ্রেসের এ পরিকল্পনা অমূলক ও অবাস্তব প্রমাণিত হয়।

যাহোক, কংগ্রেস ৮ই আগস্টে গৃহীত তার প্রস্তাবে ঘোষণা করে যে, সময়ের দাবী এই যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন শেষ হতে হবে। ভবিষ্যতের কোন প্রতিশ্রুতি অথবা নিশ্চয়তা দান বর্তমান পরিস্থিতির কোন উন্নতি সাধন করবেনা। অতএব অতি সত্বর ভারতের স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হবে। অতঃপর দেশের প্রধান প্রধান দলগুলোর সহযোগিতায় একটি সাময়িক সরকার গঠিত হবে। তার কাজ হবে ভারতের প্রতিরক্ষা এবং আগ্রাসন প্রতিরোধ করা। কংগ্রেস কমিটি ভারতের স্বাধীনতার সমর্থনে অহিংস পন্থায় চরম গণআন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব অনুমোদন করে। গান্ধী একে প্রকাশ্য বিদ্রোহ (Open rebellion) বলে অভিহিত করেন যা কোন সরকারই বরদাশত করতে পারেনা। অতএব পরদিন ৯ই আগস্ট সকল কংগ্রেস নেতাকে গ্রেফতার করা হয় এবং কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়।

এমন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও কংগ্রেসের কর্মসূচী ব্যাহত করা সম্ভব হয়নি। গান্ধী যেটাকে অহিংস বলেন তাই প্রকৃত পক্ষে সহিংস। অতএব দেখা গেল সকল হিন্দু প্রদেশগুলোতে ব্যাপকহারে বিশৃংখলা ও ধ্বংসাত্মক

ক্রিয়াকান্ড শুরু হয়েছে। রেলস্টেশন জ্বালিয়ে দেয়া, রেল লাইন উৎপাটন, টেলিগ্রাফ তার কেটে দেয়া, পোষ্ট অফিস লুণ্ঠন করা ও জ্বালিয়ে দেয়া প্রভৃতি 'অহিংস' (?) তৎপরতা পুরা মাত্রায় চলতে থাকে। বহু স্থানে হত্যাকান্ডও সংঘটিত হয়।

মুসলিম লীগ ত দূরের কথা বহু হিন্দু সংগঠনও কংগ্রেসের এহেন হঠকারী কর্মসূচী সমর্থন করতে পারেনি। ডঃ আম্বেদকার কংগ্রেস অভিযানের তীব্র সমালোচনা করেন। লিবারালগণ এবং তেজবাহাদুর সাপ্রু ও জয়াকর বিরূপ মন্তব্য করেন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিষ্ট লীগ গান্ধীর এ নির্বোধ আচরণের নিন্দা করেন। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিও এ আন্দোলন থেকে দূরে থাকে। ভাই পরমানন্দ, হিন্দু মহাসভার ভাইস্ প্রেসিডেন্ট 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সমালোচনা করেন এবং প্রেসিডেন্ট ভিডি সাভারকার তাঁর অনুসারিদেরকে কংগ্রেস অভিযান সমর্থন না করার নির্দেশ দেন। (The Struggle for Pakistan, I. H. Qureshi, p. 190)

কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ 'কুইট্ ইন্ডিয়া' আন্দোলনকে বেয়নেটের মুখে বল প্রয়োগে তাদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য করার এবং মারাত্মক গৃহযুদ্ধের সমতুল্য মনে করেন। সরকারের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ প্রকৃত পক্ষে মুসলিম লীগ ও অন্যান্য অকংগ্রেসী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে কংগ্রেসের এ আন্দোলন অবৈধ এবং অসাংবিধানিক। কারণ এর উদ্দেশ্য একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার উচ্ছেদ করা।

বৃটেনবাসী এবং তথাকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এ আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করে। ইউরোপ আমেরিকার পত্র পত্রিকাও আগস্ট আন্দোলনের বিরূপ সমালোচনা করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংকটপূর্ণ সময়ে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিদ্রোহ ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল তড়িঘড়ি সমগ্র ভারতের ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। তার জন্যে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক তৎপরতা পরিচালনা করা হয়। এ কারণেই ক্রিপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়।

এ আগস্ট আন্দোলনের আরও একটি কারণ ছিল এই যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ক্ষমতা হস্তান্তর বিলম্বিত হলে দেশ বিভাগ তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত

হয়ে পড়বে। অতএব ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা বানচাল করতে হলে ভারতের ক্ষমতা হস্তগত করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। এ ছিল কংগ্রেসের অপরিণামদর্শী চিন্তা ও পলিসি।

সি, আর ফর্মূলা

উপমহাদেশে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুকংগ্রেসের বিদ্বেষাত্মক মনোভাব এবং তাদের নির্মূল করে অথবা নিদেনপক্ষে পদদলিত করে রেখে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার দুঃস্বপ্ন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলেছিল। এ কারণে তার আগাগোড়া পলিসি এই ছিল যে, যে কোন ব্যাপারে যদি দেখা যায় যে মুসলমানগণ সামান্য কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করছে, তখন নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভংগ করার ন্যায় কংগ্রেস তা কিছুতেই হতে দেবে না। ক্রিপস্ প্রস্তাবে কিছুটা পাকিস্তান বা ভারত বিভাগের গন্ধ আবিষ্কার করে কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর যুদ্ধে বৃটিশের পরাজয় অবধারিত মনে করে 'ভারত ছাড়' (Quit India) আন্দোলন তথা ভারতের সর্বত্র বিশেষ করে হিন্দু অধ্যুষিত প্রদেশগুলোতে চরম ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড শুরু করে। আশা করেছিল, জাপানীরা ভারতের একাংশ দখল করে ফেল্লে বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবী মানতে বাধ্য হবে এবং সারা ভারতে সে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু ফলটি হয়েছে উল্টো। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন কোন মহলই সমর্থন করেনি। এমন কি হিন্দু মহাসভা ও কমিউনিষ্ট পার্টি পর্যন্ত এর তীব্র সমালোচনা করেছে। কংগ্রেসকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, গান্ধীসহ সকল নেতাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

অপরদিকে মুসলিম লীগের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পলিসি তার জনপ্রিয়তা ভেতরে বাইরে বর্ধিত করেছে। ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সালে বাংলা, আসাম, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা বলবৎ ছিল। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিষ্ট পার্টির মন্ত্রীসভা বলবৎ থাকলেও তাঁরা মুসলিম লীগ ও ভারত বিভাগ সমর্থন করতেন। ফলে জনগণের সাথে গভীর যোগাযোগ থাকার কারণে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং পাকিস্তান আন্দোলনও শক্তিশালী হতে থাকে। এতে করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

সাতাশে জুলাই ১৯৪৩, ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের কাছে লিখিত এক পত্রে গান্ধী বলেন, অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করতঃ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে পরামর্শ দিতে তিনি প্রস্তুত, যদি সত্বর ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সংসদের নিকটে দায়ী একটি জাতীয় সরকার গঠন করা হয় এ শর্তে যে যুদ্ধ চলাকালে সামরিক তৎপরতা যেমন আছে তেমন চলতে থাকবে কিন্তু ভারতের উপর কোন আর্থিক বোঝা চাপানো হবেনা।

ভাইসরয় এ পত্রের জবাব দেন ১৫ই আগস্টে। এতে গান্ধীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। বলা হয়, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে প্রস্তুত আছেন। তার পূর্বে বৃটেনের সাথে একটি চুক্তিও সম্পাদিত হতে হবে। গান্ধীর দাবী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের নিকট দায়ী একটি জাতীয় সরকার গঠন করতে হলে বর্তমান শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করতে হবে। তা এখন কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে ভাইসরয় বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রচলিত শাসনতন্ত্রের অধীন একটি পরিবর্তনকালীন সরকার (Transitional Govt.) গঠনে সহযোগিতা করার জন্যে সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। সকল দল ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পন্থা পদ্ধতি নিয়ে নীতিগতভাবে একমত হলে প্রস্তাবিত সরকার ভাল কাজ করতে পারবে।

গান্ধী তাঁর স্বভাবসুলভ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, ব্রিটিশ সরকার ৪০ কোটি মানুষের উপর যে শাসন ক্ষমতা লাভ করে আছেন, তা ততোক্ষণ পর্যন্ত হস্তান্তর করতে রাজী নন, যতোক্ষণ না ভারতবাসী তা ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে।

মিঃ গান্ধীর এ কথায় আর একটি সহিংস আন্দোলনের হুমকি প্রচ্ছন্ন ছিল।

যাহোক ভাইসরয়ের নিকট থেকে নৈরাশ্যজনক জবাবে কতিপয় কংগ্রেস নেতা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজনীতা অনুভব করেন। তাঁদের ধারণা, কংগ্রেস তার প্রচেষ্টায় সরকারের সাথে একটা সমঝোতায় আসতে পারলে ত খুবই ভালো হতো। কিন্তু তা যখন

সম্ভব নয়, তখন মুসলিম লীগের সাথেই একটি সমঝোতা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

কংগ্রেসের এ ধরনের মনোভাব পরিবর্তনের পূর্বে প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা রাজা গোপালাচারিয়া এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার অবসানের জন্যে ভারত বিভাগ অপরিহার্য। তিনি এ বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে সম্মত করার জন্যে জনসভায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতে থাকেন। তেতাল্লিশের এপ্রিলে মাদ্রাজের এক জনসভায় তিনি বলেন, আমি পাকিস্তানের পক্ষে। কারণ আমি এমন রাষ্ট্র চাই না, যেখানে আমাদের হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের কোন মান সম্মান নেই। মুসলমান পাকিস্তান লাভ করুক। আমরা সম্মত হলে দেশটি রক্ষা পাবে। ব্রিটিশ সরকার অসুবিধা সৃষ্টি করলে তার মুকাবিলা আমরা করবো। ··· আমি পাকিস্তানের পক্ষে— তবে আমি মনে করি কংগ্রেস এতে রাজী হবে না। (The Struggle for Pakistan, I. H. Qureshi p. 205, Speech in Madras — April, 1943, quoted in Khaliquzzaman, p. 309)

রাজা গোপালাচারিয়া আরও বলেন, আমরা ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাই। হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক মতানৈক্যও আমরা মিটাতে চাই। মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বশীল হিসাবে মুসলিম লীগকে আমাদের মেনে নিতে হবে। তারা চায় যে আমরা তাদের দাবী মেনে নিই। তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবী পাকিস্তান।

—(The Struggle for Pakistan, I. H. Qureshi, pp. 204-205)

রাজা গোপালাচারিয়া তেতাল্লিশ সালে একটি ফর্মূলা তৈরার করেন যা সি, আর ফর্মূলা নামে অভিহিত। ফর্মূলাটি কংগ্রেস লীগের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে বলে তিনি মনে করেন। জেলে গান্ধীর অনশনরত অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে ফর্মূলাটি তাঁকে দেখানো হয় এবং গান্ধী তা অনুমোদন করেন। অতঃপর ১০ই জুলাই ১৯৪৩, ফর্মূলাটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিস্বরূপ ফর্মূলাটি মহাত্মা গান্ধী এবং মিঃ জিন্নাহ মেনে নিয়ে তাঁরা যথাক্রমে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে মেনে নেয়ার জন্যে চেষ্টা চালাবেন। ফর্মূলার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

১. স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে মুসলিম লীগ ভারত স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করছে এবং পরিবর্তনশীল সময়ে একটি সাময়িক মধ্যবর্তী সরকার গঠনে কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতা করবে।

২. ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে, যেখানে মুসলমান নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে সীমানা নির্ধারণের জন্যে একটি কমিশন নিয়োগ করা হবে। তারপর সে সব অঞ্চলে বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে এবং গণভোট দ্বারা ভারত থেকে পৃথক হওয়ার বিষয়টি মীমাংসিত হবে। ভারত থেকে পৃথক একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সপক্ষে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাওয়া যায় তাহলে সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। তবে সীমান্তের জেলাগুলোর যে কোন রাষ্ট্রে যোগদানের অধিকার থাকবে।

৩. গণভোট অনুষ্ঠানের পূর্বে সকল দলের বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে।

৪. ভারত থেকে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্তের পর প্রতিরক্ষা, ব্যবসাবাণিজ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যে পারস্পরিক চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে।

৫. অধিবাসী স্থানান্তর হবে সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত ও ঐচ্ছিক।

৬. ভারত শাসনের জন্যে বৃটেন কর্তৃক সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তরের বেলায় ফর্মূলার শর্তাবলী অবশ্য পালনীয় হবে।

মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ফর্মূলাটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব জিন্নাহর উপর অর্পিত হয়।

বিষয়টি নিয়ে গান্ধী-জিন্নাহর মধ্যে বহু পত্র বিনিময় হয়। জিন্নাহ কতকগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করেন। গান্ধী সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হন।

সি, আর ফর্মূলার ব্যর্থতার কারণ

রাজা গোপালাচারিয়ার ফর্মূলার ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে মনে কতকগুলো প্রশ্নের উদয় হয়। এ নিয়ে গান্ধীর জিন্নাহর সাথে দীর্ঘ পত্র বিনিময়ের উদ্দেশ্য কি ছিল? এ ব্যাপারে কংগ্রেসের মনোভাব কি ছিল? অন্যান্য দলের অভিমত কি ছিল?

আলোচনার ব্যর্থতার প্রধান কারণ, গান্ধী মুসলমানদের পাকিস্তান দাবী কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। টু নেশন থিয়রী তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং একমাত্র কংগ্রেসকেই তিনি সকল ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন বলে বিশ্বাস করেন। আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববাসীকে দেখানো যে তিনি একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

সাপ্রু প্রস্তাব

সি, আর ফর্মূলা ব্যর্থ হওয়ার পর স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু কতিপয় প্রস্তাব পেশ করে কংগ্রেস-মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। বিগত ১৯৪১ সালে তিনি একটি নির্দলীয় সম্মেলন আহবান করেন। তাতে ফল কিছু হয়নি।

সাপ্রু নির্দলীয় সম্মেলনের স্ট্যান্ডিং কমিটি ১৯৪৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর এলাহাবাদে মিলিত হয় এবং একটি কনসিলিয়েশন কমিটি গঠন করে। তার সদস্য হলেন, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু (চেয়ারম্যান), এম, আর জয়াকর (তিনি হাজির হননি), বিশপ্ ফস্ ওয়েষ্টকট্, এস, রাধাকৃষ্ণন, স্যার হোমি মোদী, স্যার মহারাজ সিংহ, মুহাম্মদ ইউনুস, এন্ আর সরকার, ফ্র্যাংক এন্টনী এবং সন্ত সিংহ।

অতঃপর সাপ্রু ১০ই ডিসেম্বর জিন্নাহর নিকটে লিখিত পত্রে কনসিলিয়েশন বোর্ডের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করে সাক্ষাতপ্রার্থী হন।

জিন্নাহ ১৪ই ডিসেম্বর পত্রের জবাবে বলেন, তিনি কোন নির্দলীয় সম্মেলন অথবা তার স্ট্যান্ডিং কমিটিকে কোনরূপ স্বীকৃতি দানে নারাজ। সাপ্রু পরের বছর, ১৯৪৫ সালের ৮ই এপ্রিল তার কনসিলিয়েশন কমিটির প্রস্তাবগুলির ঘোষণা দেন।

কমিটির প্রস্তাবগুলোতে কংগ্রেসের মনোভাবই পরিস্ফুট হয়েছে। প্রস্তাবের প্রথম দফায় ভারত বিভাগের দৃঢ়তার সাথে বিরোধিতা করা হয়েছে। পৃথক নির্বাচন রহিত করারও প্রস্তাব করা হয়েছে এ প্রস্তাবগুলো মুসলমানদের নিকটে যে কিছুইতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা তা বলার প্রয়োজন করে না। জিন্নাহ এ কমিটিকে কংগ্রেসের গৃহ চাকরানীর সাথে তুলনা করে বলেন, এ কমিটি গান্ধীর সুরে সুর মিলিয়েই কথা বলেছে।

দেশাই–লিয়াকত চুক্তি

নতুন বছর ১৯৪৫ আগমনের পর নতুন রাজনৈতিক হাওয়া প্রবাহিত হতে থাকে। বিগত আগষ্ট আন্দোলনের অপরাধে তখনও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারাগারে। ভারতের পত্রপত্রিকায় কংগ্রেস–লীগের মধ্যে চুক্তির খবর বা গুজব প্রকাশিত হতে থাকে। কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেস সদস্যগণ কয়েক মাস ধরে নিয়মিত আইনসভায় যোগদান করতে থাকেন এবং আইনসভার মুসলিম লীগ সদস্যদের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে থাকেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা ভুলাভাই দেশাই লীগ দলের নেতা লিয়াকত আলী খানের সাথে পুরোপুরি একমত হয়ে কাজ করছেন বলে শুনা যায়। একটি সাময়িক জাতীয় সরকারের সংবিধান নিয়ে উভয় নেতা একটি সমঝোতায় উপনীত হয়েছেন বলেও শুনা যায়। দেশাই ১৩ই জানুয়ারী ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্যার ইভান জেনকিন্সের সাথে এবং ২০শে জানুয়ারী ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাতে দেশাই–লিয়াকতের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে বলে ভাইসরয়কে অবহিত করা হয়। দেশাই বলেন, এ চুক্তির প্রতি গান্ধীর সমর্থন আছে। তিনি আরও বলেন যে, লিয়াকত আলীর সাথে আলোচনার বিষয় সম্পর্কে জিন্নাহ অবহিত আছেন এবং তিনি এ কথিত চুক্তি অনুমোদন করেন।

কথিত চুক্তিটি ছিল নিম্নরূপ :

কংগ্রেস এবং লীগ একমত যে তাঁরা কেন্দ্রে একটি মধ্যবর্তী সরকারে যোগদান করবেন। তা নিম্ন পদ্ধতিতে গঠিত হবেঃ

(ক) কংগ্রেস এবং লীগ সমসংখ্যক সদস্য মনোনয়ন করবে (মনোনীত ব্যক্তিগণের কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য হওয়া জরুরী নয়)।

(খ) সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি (বিশেষ করে তফ্‌শিলি সম্প্রদায় এবং শিখ)।

(গ) সামরিক বাহিনী প্রধান।

সরকার গঠিত হওয়ার পর তা ভারত সরকার আইনের (১৯৩৫) অধীন কাজ করতে থাকবে। মন্ত্রীসভা যদি কোন বিশেষ কর্মপন্থা বা ব্যবস্থা আইনসভার দ্বারা পাশ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে গভর্ণর জেনারেল বা ভাইসরয়ের বিশেষ ক্ষমতার শরণাপন্ন হয়ে তা বলবৎ করতে যাবেনা। এতে করে ভাইসরয়ের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ হবে।

এ বিষয়েও কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐকমত্য হয় যে, এ ধরনের সাময়িক সরকার গঠিত হলে তার প্রথম কাজ হবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে কারামুক্ত করা।

এ চুক্তির ভিত্তিতে গভর্ণর জেনারেলকে অনুরোধ করা হবে তিনি যেন সরকারের নিকটে এ ধরনের প্রস্তাব পেশ করেন যে, কংগ্রেস ও লীগের চুক্তির ভিত্তিতে একটি সাময়িক সরকার গঠনে তিনি আগ্রহী।

গভর্ণর জেনারেল দেশাই–লিয়াকত চুক্তির প্রস্তাবগুলো ভারত সচিবকে জানিয়ে দেন। তিনি এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করে তার ব্যাখ্যা দাবী করেন।

গভর্ণর জেনারেল দেশাই ও লিয়াকত আলীর সাথে সাক্ষাৎ করবেন এমন সময় জিন্নাহ এক বিবৃতির মাধ্যমে বলেন, তিনি চুক্তি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। দেশাই হতাশ না হয়ে চুক্তির বৈধতা সম্পর্কে দৃঢ়তা প্রকাশ করতে থাকেন। গভর্ণর জেনারেল বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্যে বোম্বাই–এর গভর্ণর স্যার জন কোলভিনকে জিন্নাহর সাথে দেখা করে অনুরোধ করতে বলেন যে তিনি তাঁর সাথে দিল্লীতে দেখা করলে খুশী হবেন। জিন্নাহ বলেন, তিনি দেশাই–লিয়াকত চুক্তি সম্পর্কে কিছুই জানেন না এবং এ চুক্তি মুসলিম লীগের অনুমতি ব্যতিরেকেই করা হয়েছে।

এদিকে গান্ধীর অনুমোদন থাকলেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেশাই–এর সমালোচনা করেন। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই চুক্তিটি প্রত্যাখান করে।

নবম অধ্যায়

ওয়াভেল পরিকল্পনা ১৯৪৫

দেশাই-লিয়াকত চুক্তি ব্যর্থ হওয়ার পর, ব্রিটিশ সরকারের সাথে আলাপ আলোচনার জন্যে ভাইসরয় মে মাসে লন্ডন গমন করেন। অতঃপর তিনি সরকারের পক্ষ থেকে অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্যে একটি প্রস্তাব নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন।

ভারত সচিব ১৪ই জুন হাউস্ অব্ কমন্সে এক বিবৃতির মাধ্যমে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান কল্পে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবে বলা হয়, ভাইসরয় তাঁর কার্যকরী কাউন্সিল এমনভাবে পুনর্গঠিত করবেন যাতে তিনি ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্য থেকে কিছু লোককে তাঁর কাউন্সিলর মনোনীত করতে পারেন। এতে প্রধান সম্প্রদায়গুলোর ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব থাকবে মুসলমান ও বর্ণহিন্দুর সমানুপাতে। এ কাউন্সিলে ভাইসরয় ও সেনাপ্রধান ব্যতীত সকলে হবেন ভারতীয়। এ কাউন্সিল পুনর্গঠনে সকলের সহযোগিতা লাভের পর সকল প্রদেশ থেকে ৯৩ ধারা প্রত্যাহার করা হবে যাতে জনপ্রিয় মন্ত্রীসভা গঠিত হতে পারে।

একই দিনে এ প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল দিল্লী থেকে এক বেতার ভাষণ দান করেন। গান্ধী এবং কংগ্রেস কাউন্সিলে মুসলমান ও বর্ণহিন্দুর সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

শিমলা সম্মেলন

ভাইসরয় তাঁর চেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্যে ২৫শে জুন শিমলায় সকল দলের সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের এবং অন্যান্য দলের একুশ জন যোগদান করেন—যাদের মধ্যে মুসলিম লীগের জিন্নাহ ও লিয়াকত আলীসহ ছয় জন ছিলেন। সম্মেলনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে চরম মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন, এমন কোন ব্যবস্থা, সাময়িক বা স্থায়ী হোক, কংগ্রেস মেনে নিতে পারেনা—যা তার জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে, এক

জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করে এবং কংগ্রেসকে একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত করে।

জিন্নাহ বলেন, পাকিস্তান ব্যতীত অন্য কোন কিছুর ভিত্তিতে গঠিত শাসনতন্ত্র লীগ মেনে নিতে পারে না। ২৬ এবং ২৭ তারিখেও আলোচনা অব্যাহত থাকে। ইউপি-এর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জি বি পন্তের (PANT) সাথে জিন্নাহর আলাপ আলোচনা চলছিল বিধায় ২৭ তারিখের বৈঠক অল্প সময় পর মুলতবী করা হয়। অতঃপর ২৮ ও ২৯ তারিখে সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জিন্নাহ-পন্ত আলোচনা ব্যর্থ হয় বলে জানা যায়। ভাইসরয় আলোচনার একটা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে সম্মেলনে যোগদানকারী প্রত্যেক দলকে একটি করে নামের তালিকা দাখিল করতে অনুরোধ করেন যারা হবেন ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সদস্য। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েরই ৮ জন থেকে ১২ জনের নামের একটি করে তালিকা পেশ করবেন।

তেসরা জুলাই কংগ্রেস তার নামের তালিকা ভাইসরয়ের নিকটে প্রেরণ করে। ৬ই জুলাই মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে পরদিন জিন্নাহ ভাইসরয়-এর কাছে নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করেন :

১. মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে নামের তালিকা গ্রহণ করার পরিবর্তে ভাইসরয়-এর সাথে জিন্নাহর ব্যক্তিগত আলোচনার পর কাউন্সিলের জন্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে।
২. কাউন্সিলের সকল মুসলিম সদস্য মুসলিম লীগ বেছে নেবে।
৩. কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্ত থেকে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে ফলপ্রসূ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

শেষবারের মতো ১১ই জুলাই ভাইসরয় ও জিন্নাহর মধ্যে আলাপ আলোচনার পর ভাইসরয় বলেন, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে চারজন মুসলিম সদস্য কাউন্সিলে নেয়া হবে এবং পঞ্চম ব্যক্তি হবেন একজন অ-লীগ পাঞ্জাবী মুসলমান।

একথার পর জিন্নাহ বলেন, লীগ সরকারের সাথে কাউন্সিল গঠনে সহযোগিতা করতে পারেনা। অতএব ভাইসরয়-এর শিমলা সম্মেলনও ব্যর্থ হয়।

ব্যর্থতার কারণ

শিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার একই কারণ যা কংগ্রেস–লীগ সমঝোতার সকল প্রচেষ্টা বানচাল করে দিয়েছে। তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসী মানুষ, তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত অস্বীকারকারীর সাথে মিলে এক জাতি হতে পারে না কিছুতেই। তাই মুসলমানগণ একটি স্বতন্ত্র জাতি—মুসলিমলীগের এ দাবী অকাট্য সত্য যা এ উপমহাদেশের বুকে সংঘটিত অসংখ্য ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত। অতএব জিন্নাহ যদি দাবী করেন যে, যেহেতু মুসলমানগণ একটা স্বতন্ত্র জাতি, সেহেতু ভাইসরয়–এর কাউন্সিলে মুসলিম প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার মুসলিম জাতির প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন মুসলিম লীগের, তাহলে তা নীতিগতভাবে সকলের মেনে নেয়া উচিত। আর মুসলমানগণ একটি স্বতন্ত্র জাতি হওয়ার কারণেই তাদের জন্যে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবী করা হয়েছে এবং তার জন্যে সংগ্রাম অব্যাহত আছে। কিন্তু কংগ্রেসের অন্যায় ও অবাস্তব দাবী হচ্ছে উপমহাদেশের সকল হিন্দু–মুসলমান নির্বিশেষে এক জাতি এবং তার প্রতিনিধিত্বকারী কংগ্রেস। দেশের ভবিষ্যৎ শাসন ক্ষমতা কংগ্রেস দাবী করে এবং তা হাতে পেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু শাসনের অধীনে মুসলমানদের নির্মূল করা যাবে। মুসলমানদের এ আশংকা কল্পনাপ্রসূত নয়, প্রমাণিত সত্য। এ সত্য কংগ্রেস মেনে নিতে রাজী নয়। ভাইসরয় ও কংগ্রেসের দাবীর সমর্থনে জিন্নাহর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হলে সম্মেলন ব্যর্থ হয়।

সাধারণ নির্বাচন

জাপানের আত্মসমর্পণের পর ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৫ বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তার পূর্বে জুলাইয়ের শেষ দিকে ইংলন্ডের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বহু পূর্ব থেকেই লেবার পার্টির সাথে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং এবারের নির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেসকে খুবই উল্লসিত করে। এর থেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য কংগ্রেস তৎপরতা শুরু করে। ব্রিটিশ পলিসিই ছিল ভারতের অখন্ডতার পক্ষে এবং এ ইস্যুটিতে লেবার পার্টির বেশী বেশী সমর্থন কংগ্রেস লাভ করবে বলে আশা করে। আর এ ইস্যুটিই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছিল। কংগ্রেসের দাবী মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে এক জাতি এবং অখন্ড ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ

দলের শাসন। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের দাবী, মুসলমানগণ একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি এবং সে কারণেই তাদের জন্যে হতে হবে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র। এ দুই বিপরীতমুখী দাবীর চূড়ান্ত ফয়সালার জন্যে বছরের শেষে শীতের মওসুমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার জন্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচনে মুসলিম লীগের দাবী পুরোপুরি স্বীকৃতি লাভ করে। কেন্দ্রীয় আইনসভার সকল মুসলিম আসন মুসলিম লীগ লাভ করে। প্রাদেশিক আইন সভাগুলোর ৪৯৫ মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ লাভ করে ৪৪৬টি আসন। হিন্দু প্রধান প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং তা ছিল অতি স্বাভাবিক। বাংলায় ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ লাভ করে ১১৩টি। এ, কে, ফজলুল হক মুসলিম লীগ ত্যাগ করার ফলে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের কারণে মুসলিম লীগের ছয়টি আসন হাতছাড়া হয়। এখানে হুসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

পাঞ্জাবে ৮৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৭৯টি মুসলিম লীগের হস্তগত হয়। সিন্ধুতেও মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সীমান্ত প্রদেশে সীমান্ত গান্ধী নামে কথিত চরম কংগ্রেসপন্থী আবদুল গাফ্ফার খানের প্রচন্ড প্রভাবের দরুন মুসলিম লীগ ৩৬টি আসনের মধ্যে ১৭টি লাভ করে এবং ডাঃ খান মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে এ সাধারণ নির্বাচনে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, একমাত্র মুসলিম লীগই মুসলিম ভারতের প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এতে কংগ্রেসের মুসলিম লীগ বিরোধিতা তীব্রতর আকার ধারণ করে। মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য মেনে নিয়ে তার সাথে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হওয়ার পরিবর্তে কংগ্রেস মুসলমানদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টির পলিসি অবলম্বন করে এবং মুসলমানদের আস্থাশীল প্রতিনিধিদের হাতে, এমনকি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেও রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক মতভেদ তীব্রতর হয় এবং উভয়ের মধ্যে আপস নিষ্পত্তি অসম্ভব হয়ে পড়ে।

পাঞ্জাব সম্পর্কে কংগ্রেসের গৃহীত পলিসি তার বৈরিতাপূর্ণ মানসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ ৮৬ মুসলিম আসনের মধ্যে ৭৯টি লাভ করে। শক্তিশালী ইউনিয়নিস্ট পার্টি মুসলিম লীগের নিকটে চরমভাবে পরাজিত হয়। এ দলে মাত্র দশজন সদস্য, তার মধ্যে ৩ জন অমুসলিম। কংগ্রেস ৫১, আকালী শিখ ২২। সর্ববৃহৎ দল মুসলিম লীগেরই মন্ত্রীসভা গঠন অত্যন্ত ন্যায়সংগত ছিল। হিন্দু ও শিখদের নিয়ে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারতো। কিন্তু কংগ্রেসের অন্ধ মুসলিম বিদ্বেষ এবং শিখদের অপরিণামদর্শিতার ফলে তা সম্ভব হয়নি। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আবুল কালাম আজাদ এবং বলদেব সিংহ, কংগ্রেস এবং আকালী শিখদলের সহযোগিতায় মন্ত্রীসভা গঠনের জন্যে ইউনিয়নিস্ট দলের নেতা খিজির হায়াতকে প্ররোচিত ও সম্মত করেন। এ নীতিহীন জোট গঠন করা হয়েছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাবে মুসলিম লীগকে ক্ষমতা গ্রহণ থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে। আবুল কালাম আজাদ পাঞ্জাবে অমুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারায় অত্যন্ত আত্মতৃপ্তি লাভ করেন ও গর্ববোধ করেন। (Maulana Abul Kalam Azad : India Wins Freedom, p. 137)

কংগ্রেসের পাঞ্জাব মন্ত্রীসভায় যোগদানের নিন্দা করেন জওহরলাল নেহরু এবং গান্ধী আবুল কালাম আজাদকে সমর্থন করে বলেন, কংগ্রেসের দৃষ্টিতে এর চেয়ে ভালো সমাধান আর কিছু ছিল না। (The Emergence of Pakistan : Choudhury Muhammad Ali, p. 49)

দশম অধ্যায়

কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা

বৃটিশ সরকার ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬, ঘোষণা করেন যে, ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনান্তে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে তিনজন কেবিনেট মন্ত্রী সমন্বয়ে একটি বিশেষ মিশন ভারতে প্রেরণ করা হবে।

এ প্রসংগে হাউস্ অব কমন্সে ১৫ই মার্চ এক বিতর্ক চলাকালে প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী বলেন, বহু জাতি, ধর্ম ও ভাষার দেশ ভারতে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার অপসারণ ভারতীয়দের দ্বারাই হবে। আমরা সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। ··· তাই বলে আমরা সংখ্যাগুরুর অগ্রগতিতে ভেটো প্রদান করার অনুমতি সংখ্যালঘুকে দিতে পারিনা।

প্রধানমন্ত্রীর উক্ত বক্তব্যে কংগ্রেস ভয়ানক উল্লসিত হয়। কিন্তু এতে লীগ মহলে সংশয় দেখা দেয় এবং জিন্নাহ মাকড়সার জালে মাছির আমন্ত্রণের দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেন—If the fly refuses, it is said a veto is being exercised and the fly is intransigent (মাছি মাকড়সার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে বলা হয় ভেটো প্রদান করা হচ্ছে এবং মাছি আপোসকামী নয়।

—('Cabinet Mission and After, Muhammad Ashraf, p. 1-3, Choudhury Mohammad Ali : Emergence of Pakistan', p. 52)

এর চেয়ে সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কিছু হতে পারেনা। সংখ্যাগরিষ্ঠের একচ্ছত্র প্রাধান্য ও আধিপত্যের ফাঁদে পা দিতে সংখ্যালঘু রাজী না হলে সেটাকে ভেটোর সমতুল্য মনে করে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, তা করতে দেয়া যাবেনা। এতে এট্‌লী তথা বৃটিশ সরকারের মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে পড়ে।

যাহোক প্যাথিক লরেন্স (ভারত সচিব), স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্স্ (প্রেসিডেন্ট অব দি বোর্ড অব ট্রেডস) এবং মিঃ এ, ডি, আলেকজান্ডারকে (ফার্স্ট লর্ড অব দি এডমিরাল্টি) নিয়ে গঠিত কেবিনেট মিশন ২৪শে মার্চ, ১৯৪৬ নতুন দিল্লী পৌঁছেন।

মিশন সদস্যগণ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে, প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীদের সাথে এবং আরও বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তির সাথে দেখাসাক্ষাৎ ও মত বিনিময় করেন। দেশীয় রাজ্যের শাসকবৃন্দ ও মন্ত্রীদের সাথেও তাঁরা আলাপ আলোচনা করেন।

কেবিনেট মিশনে ক্রিপ্‌স্ আছেন জেনে আবুল কালাম আজাদ গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। কারণ তিনি ছিলেন কংগ্রেসীদের পুরাতন অন্তরংগ বন্ধু। ক্রিপ্‌স্ ইতিপূর্বে ভারতে এসে জনৈক ভারতীয় হিন্দু সুধীর চন্দ্র গুপ্তের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। (Moulana Abul Kalam Azad : 'India Wins Freedom', p. 146)

আজাদ তেসরা এপ্রিল মিশনের সাথে দেখা করেন। স্বাধীনতাকে ভিত্তি করে তিনি তাঁর যুক্তিতর্কের প্রাসাদ নির্মাণ করে রেখেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, একটি গণপরিষদ ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র তৈরী করবে এবং কংগ্রেসের দাবী হচ্ছে একটি ফেডারেল সরকার গঠনের যার হাতে থাকবে অন্ততঃ দেশ রক্ষা, যোগাযোগ এবং বৈদেশিক বিভাগ। ভারত বিভাগ কংগ্রেস কিছুতেই মেনে নেবেনা।

জিন্নাহ ৪ঠা এপ্রিল মিশনের সাথে দেখা করেন। ১৭ই এপ্রিল আজাদ পুনরায় সাক্ষাৎ করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই তাদের নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করে। মুসলিম লীগের বক্তব্য কংগ্রেস সভাপতিকে জানানো হয়।

কংগ্রেস চায় যে একটি মাত্র গণপরিষদ হবে যা নিখিল ভারত ফেডারাল সরকার এবং আইন সভার জন্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। কেন্দ্রীয় ফেডারাল সরকারের হাতে বৈদেশিক বিভাগ, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, মৌলিক অধিকার, মুদ্রা, কাষ্টম এবং পরিকল্পনা বিভাগ থাকবে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার মুসলিম লীগ সদস্যদের নিয়ে ৯ই এপ্রিল, ১৯৪৬, যে কনভেনশন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়, তাতে গৃহীত প্রস্তাবে দাবী করা হয় যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলা ও আসাম এবং পশ্চিমে পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে একটি সার্বভৌম স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করা হোক এবং পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের লোকদের নিয়ে তাদের নিজ নিজ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য দুটি পৃথক পৃথক গণপরিষদ গঠন করা হোক। এ প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলিম লীগ কেবিনেট মিশনের নিকটে প্রস্তাব পেশ করেন যে পাকিস্তান গ্রুপের ছয় প্রদেশের জন্যে একটি এবং হিন্দুস্থান গ্রুপের ছয় প্রদেশের জন্যে অন্য একটি

গণপরিষদ গঠন করা হোক।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একে অপরের প্রস্তাব মেনে নিতে পারেনি। প্রধান বিতর্কিত বিষয় ছিল এই যে উপমহাদেশে একটি মাত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে, না দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। উভয় অবস্থাতেই সংখ্যালঘু সমস্যাও রয়েছে। কেবিনেট মিশন উভয় দলের মতপার্থক্য দূর করতে অপারগ হয়।

অবশেষে কেবিনেট মিশন এবং ভাইসরয় শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান কল্পে ১৬ই মে এক বিবৃতি প্রকাশ করে। তাঁদের বিবৃতির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল ভারতে একটিমাত্র রাষ্ট্রের সংরক্ষণ। প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কারণে বৃটিশ সরকার দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

কেবিনেট মিশন ২৪শে মার্চ ১৯৪৬, ভারতে আগমন করে এবং তিন মাসাধিক কাল অবস্থান করতঃ ২৯শে জুন ভারত ত্যাগ করে। বৃটিশ সরকারের ভারতে কেবিনেট মিশন প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একটি শাসনতান্ত্রিক সমাধান পেশ করা। কেবিনেট মিশনের সদস্যগণ এ বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। তবে এ কথা সত্য যে সমস্যা সমাধানে তাঁরা বিশেষ করে সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য ষ্টাফোর্ড ক্রিপস কংগ্রেসের অন্তরংগ বন্ধু হওয়ার কারণে সমস্যা সমাধানে কংগ্রেস তথা হিন্দুজাতির স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন, কেবিনেট মিশন ২৩ শে মার্চ ভারতে আসেন। পূর্বে একবার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ভারতে আগমন করলে জে, সি, গুপ্ত তাঁর আতিথেয়তার ভার গ্রহণ করেন। তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি ক্রিপ্‌সের সাথে দেখা করার জন্য দিল্লী যাচ্ছেন। আমি তাঁর হাতে পুনরায় ভারতে আসার জন্যে ক্রিপ্‌সকে মুবারকবাদ জানিয়ে একখানি পত্র পাঠাই। (Abul Kalam Azad : India Wins Freedom, p. 140)

তিনি আরও বলেন, ক্রিপ্‌সের ভারতে অবস্থান কালে বরাবর তাঁর সাথে আমার পত্রের আদান প্রদান চলতে থাকে। (Abul Kalam Azad : India Wins Freedom, p. 172)

ইশতিয়াক হুসেন কোরেশী তাঁর The Struggle for Pakistan গ্রন্থের ২৬৬ পৃষ্ঠার পাদটিকায় উল্লেখ করেছেন—

Sudihir Ghosh, Gandhi's Emissary (Bombay 1967) gives a revealing account of the backdoor secret negotiation between the Cabinet Mission and the Congress leaders. There were no such intimate contacts between the Muslim League and the Cabinet Mission, or for that matter between the League and the British government. The intimacy of the Congress-British Government relations worked against Muslim interests at every critical stage. The British had an eye on the future advantages to be reaped from friendship with the largest and more powerful community and were willing to go very far indeed to meet its desires.

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে বিষয়টি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বিরোধের মূল কারণ তা হলো পাকিস্তান নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী। এ ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের দাবী যা কংগ্রেস এবং বৃটিশ সরকার মেনে নিতে মোটেই রাজী ছিলনা। কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে ফাঁদে ফেলে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টা করেছে। তাদের ফাঁদে ফেলার এ চক্রান্তটি সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিবিদ কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সম্যক উপলব্ধি করে কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু কংগ্রেসের হঠকারিতার কারণে সকলই ভেস্তে যায়।

তিন মাসাধিককালব্যাপী কেবিনেট মিশনের তৎপরতা, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ভাইসরয়ের সাথে আলোচনার দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করে সংক্ষেপে বলতে চাই যে, একটি আপোসমূলক সিদ্ধান্তে পৌছার ক্ষেত্রে কংগ্রেস বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কারণ কংগ্রেসের অভিলাষ ছিল, ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের উপর একচেটিয়া প্রভুত্ব–কর্তৃত্ব লাভ করা। ক্ষমতার অংশিদারিত্ব মুসলিম লীগকে দিতে কংগ্রেস কিছুতেই রাজী ছিলনা। এ সময়ে ক্রিপ্সের কাছে লিখিত পত্রে গান্ধী বলেন, যদি তোমাদের সাহস থাকে তাহলে আমি প্রথম থেকেই যা বলে আসছি তাই কর। · · · কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নাও। (Pyarelal,Mohatma Gandhi : The Last Phase

vol. I, p. 225 Choudhury Muhammad Ali : The Emergence of Pakistan, p. 62)

অবশেষে কেবিনেট মিশন ও ভাইসরয়, একটি শক্তিশালী ও প্রতিনিধিত্বমূলক মধ্যবর্তী সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে বিবৃতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৬ই মে তাঁদের প্রকাশিত বিবৃতিতে চৌদ্দ জনের নাম ঘোষণা করা হয় যাঁদেরকে ভাইস্‌রয় মধ্যবর্তী কেবিনেটের সদস্য হিসাবে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানান। তফ্‌সিলী সম্প্রদায়ের একজনসহ এতে থাকবে কংগ্রেসের ছয়জন, মুসলিম লীগের পাঁচজন, একজন শিখ, একজন ভারতীয় খৃষ্টান এবং একজন পার্শী।

উল্লেখ্য যে ১৬ই মে প্রকাশিত বিবৃতির ৮ অনুচ্ছেদে এ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল যে, দুটি প্রধান দল অথবা দুয়ের যে কোন একটি যদি উপরোক্ত পদ্ধতিতে একটি কোয়ালিশন সরকারে যোগদান করতে রাজী না হয়, তাহলে ভাইসরয় একটি মধ্যবর্তী সরকার গঠনের জন্যে সামনে অগ্রসর হবেন। ১৬ই মে প্রকাশিত বিবৃতি মেনে নিয়ে সরকারে যোগদান করতে যারা রাজী হবে তাদেরকে নিয়ে এ সরকার যথাসম্ভব প্রতিনিধিত্বশীল হবে।

এরপর সপ্তাহব্যাপী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী এবং হিন্দু প্রেসের পক্ষ থেকে কেবিনেট মিশন এবং ভাইসরয়ের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঝড় সৃষ্টি করা হয়। গুজব রটনা করা হয় যে, কেবিনেটে মুসলমানদের শূন্য আসনগুলোতে মুসলিম লীগ সদস্যদের নেয়া হবে। কেবিনেটে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেয়া না হলে গান্ধী দিল্লী ত্যাগ করবেন বলে হুমকি প্রদর্শন করেন, যদিও কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদ লিখিতভাবে এ নিশ্চয়তা দান করেন যে, এ নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি কোন জিদ করবেনা। গান্ধী ধমকের স্বরে বলেন, তাহলে গণপরিষদ একটি বিদ্রোহী সংস্থায় পরিণত হবে। ক্রিপ্স দৌড়ে গান্ধীর শরণাপন্ন হলে তিনি (গান্ধী) বলেন, কেবিনেট মিশনকে দু'দলের যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে, সংমিশ্রণের চেষ্টা চলবেনা।

—(Pyarelal,Mohatma Gandhi : The Last Phase vol. I, p. 234-37, Choudhury Muhammad Ali : The Emergence of Pakistan, p. 62-63)

এক সপ্তার মধ্যেই কেবিনেট মিশন গান্ধীর কাছে আত্ম–সমর্পণ করে। ২২শে জুন ক্রিপ্‌সের বন্ধু সুধীর ঘোষ গান্ধীকে বলেন যে তিনি ক্রিপ্‌সের সাথে দেখা করেছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস যোগদান করতে রাজী না হলে, শুধু মুসলিম লীগের উপর নির্ভর করা যায় না।

সুধীর ঘোষ পুনরায় ক্রিপ্‌সের সাথে দেখা করে গান্ধীকে গিয়ে বলেন, কেবিনেট মিশন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, কংগ্রেস যদি স্বল্পমেয়াদী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা মেনে নেয় তাহলে মধ্যবর্তী সরকার গঠনের জন্যে এ যাবৎ যা কিছু করা হয়েছে তা সবই নাকচ করে নতুনভাবে চেষ্টা করা হবে। তাঁরা গান্ধী এবং প্যাটেলকে দেখা করতে বলেছেন।

গান্ধী প্যাটেল, (সর্দার বল্লব ভাই প্যাটেল) এবং সুধীর ঘোষকে নিয়ে কেবিনেট মিশনের সাথে দেখা করতে যান। প্যাটেল পূর্বেই প্যাথিক্ লরেন্সের সাথে কথা বলেছেন। প্যাথিক্ লরেন্স্ গান্ধীকে বলেন, আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি মধ্যবর্তী সরকারের গোটা পরিকল্পনা যা নিয়ে আমরা এ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছি, নাকচ্ করে পরিস্থিতি নতুন করে বিবেচনা করতে চান। বেশ ভালো কথা।

অতঃপর কেবিনেট মিশন ও গান্ধীর মধ্যে যে বুঝাপড়া হয় তা ওয়ার্কিং কমিটিকে অবহিত করা হয়, অতঃপর ২৫শে জুন কংগ্রেস সভাপতি ভাইসরয়ের নিকটে লিখিত পত্রে জানিয়ে দেন যে, কংগ্রেস অন্তরবর্তী সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

কংগ্রেসের এবং গান্ধীর এ ধরনের মানসিকতার পরিচয় ভারত বিভাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পাওয়া গেছে। উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় গান্ধী ও কেবিনেট মিশনের মনের কদর্য চেহারাটা ইতিহাসের পাতায় পরিস্ফুট হয়েছে।

লীগ প্রতিক্রিয়া

ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের যে আশার আলো দেখা গিয়েছিল, তা কেবিনেট মিশন এবং ভাইসরয় কর্তৃক তাঁদের কৃত ওয়াদা ভংগের কারণে নির্বাপিত হয়। এ পরিস্থিতি আলোচনার জন্যে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে বোম্বাইয়ে লীগ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে জিন্নাহ বলেন, মুসলিম

লীগ কেবিনেট মিশনের সাথে আলোচনায় কংগ্রেসকে একটির পর একটি সুবিধা দান করেছে, (made concession after concession)। কারণ আমরা চেয়েছিলাম একটা বন্ধুত্বপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত-হতে যাতে করে শুধু হিন্দু ও মুসলমানই নয়, বরঞ্চ উপমহাদেশে বসবাসকারী সকল মানুষ স্বাধীনতা লাভের দিকে অগ্রসর হতে পারে। · · · কিন্তু কংগ্রেস তাদের নীচতাপূর্ণ বাকচাতুরি ও দরকষাকষির দ্বারা ভারতবাসীর বিরাট ক্ষতি করেছে। সমগ্র আলাপ আলোচনায় কেবিনেট মিশন কংগ্রেসের সন্ত্রাস ও ভীতির শিকারে পরিণত হয়। · · · এসব কিছু এ কথাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, ভারতের সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র পাকিস্তান।

আমি মনে করি আমরা যুক্তি প্রমাণের কিছু বাকী রাখিনি। এখন এমন কোন ট্রিবিউনাল নেই যার শরণাপন্ন আমরা হতে পারি। এখন মুসলিম জাতিই আমাদের একমাত্র ট্রিবিউনাল।

অতঃপর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ প্রত্যাহার করা হয় এবং ভারত সচিবকে জানিয়ে দেয়া হয়।

একাদশ অধ্যায়

ডাইরেক্ট অ্যাকশন

উক্ত অধিবেশনে এ মর্মে আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, পাকিস্তান হাসিল করার উদ্দেশ্যে এবং বৃটিশের গোলামী এবং বর্ণহিন্দুর ভবিষ্যৎ প্রাধান্য থেকে মুক্তি লাভের জন্যে মুসলিম জাতির পক্ষে ডাইরেক্ট অ্যাকশন অবলম্বন করার সময় এসেছে। মুসলমানদের সংগঠিত করে প্রয়োজনীয় সময়ে সংগ্রাম করার লক্ষ্যে কর্মসূচী প্রণয়নের অনুরোধ জানানো হয়। উপরন্তু বৃটিশের মনোভাব ও আচরণের প্রতিবাদে বিদেশী সরকার প্রদত্ত সকল খেতাব পরিত্যাগ করার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি আবেদন জানানো হয়।

জিন্নাহ ৩১শে জুলাই আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা নয়। তিনি বলেন, একমাত্র মুসলিম লীগই সংবিধানের আওতায় থেকে সাংবিধানিক পন্থায় কাজ করেছে। কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনাকালে মুসলিম লীগ বৃটিশ সরকারকে কংগ্রেসের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত দেখতে পায়। তাদের ভয় ছিল এই যে, কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে তারা এমন এক সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে যা ১৯৪২ সনের সংগ্রাম অপেক্ষা সহস্র গুণে মারাত্মক হবে। বৃটিশের মেশিন গান আছে এবং ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারে। কংগ্রেস আর এক ধরনের অস্ত্রে সজ্জিত এবং তাকে তুচ্ছ মনে করা যায় না। অতএব আমরা এখন আত্মরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্যে সাংবিধানিক পন্থা পরিহার করতে বাধ্য হচ্ছি। সময়মত সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। (Cabinet Mission and After, Muhammad Ashraf, pp. 311-19; Emergence of Pakistan-Choudhury Mohammad Ali- pp. 69-70)

ডাইরেক্ট অ্যাকশনের জন্যে ১৬ই আগস্ট নির্ধারিত হয়। তার দুদিন পূর্বে জিন্নাহ তাঁর প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেন, দিনটি ছিল ভারতের মুসলিম জনসাধারণের কাছে ২৯শে জুলাই মুসলিম লীগ কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করা, কোন প্রকার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যাওয়ার জন্যে নয়। অতএব আমি মুসলমানদের প্রতি এ আবেদন জানাই তাঁরা যেন আমাদের নির্দেশ পুরোপুরি মেনে চলেন,

নিজেদেরকে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুশংখলভাবে পরিচালিত করেন এবং শত্রুর হাতের খেলনায় পরিণত না হন।

আবুল কালাম আজাদের বক্তব্য

আমি জনসাধারণের মধ্যে এ অনুভূতি লক্ষ্য করলাম যে ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগ কংগ্রেসীদের উপর আক্রমণ চালাবে এবং তাদের ধনসম্পদ লুন্ঠন করবে। · · · ১৬ই আগস্ট ভারতের ইতিহাসে একটি কালো দিবস। · · এ দিনে শত শত মানুষের জীবন হানি হয় এবং কোটি কোটি টাকার ধনসম্পদ লুন্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের মিছিলগুলি লুন্ঠন ও অগ্নি সংযোগ শুরু করে। (Abul Kalam Azad : India Wins Freedom, p. 168-169)

মাওলানা আজাদের প্রতি আমার আন্তরিক ও গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বলবো তিনি হিন্দু কংগ্রেসের মনের কথাই বলেছেন। সেদিন তিনি দিল্লী ছিলেন। অতএব ঘটনা স্বচক্ষে না দেখে অপরের কথা শুনেই উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন।

তিনি তাঁর উক্ত গ্রন্থে বলেন, মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিবসটি ভিন্ন ধরনের বলে মনে হচ্ছিল। কোলকাতায় এ সাধারণ মনোভাব লক্ষ্য করলাম যে, ১৬ই আগস্টে মুসলিম লীগ কংগ্রেসপন্থীদের উপর আক্রমণ চালাবে এবং তাঁদের ধনসম্পদ লুন্ঠন করবে। বাংলার সরকার কর্তৃক ১৬ই আগস্ট সরকারী ছুটি ঘোষণার ফলে অধিক মাত্রায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার আইন পরিষদের কংগ্রেস দল এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদে কোন ফল না হওয়ায় তাঁরা সংসদ ভবন থেকে ওয়াক আউট করেন। কোলকাতার জনমনে ভয়ানক উদ্বেগ বিরাজ করছিল এবং সে উদ্বেগ এ কারণে বেড়ে চলেছিল যে মুসলিম লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। (India Wins Freedom by Abul Kalam Azad pp. 168-169)

মাওলানা আবুল কালাম আজাদের উপরোক্ত বক্তব্যে কোলকাতার লোমহর্ষক সাম্প্রদায়িক হানাহানির প্রকৃত কারণ চিহ্নিত হয়েছে। কারণগুলো হচ্ছে—

১. বাংলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত যা হিন্দুদের জন্য ছিল অসহনীয়।

২. প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যাঁকে হিন্দুগণ মনে করতো হিন্দুবিদ্বেষী।

৩. ১৬ই আগষ্টের ক'দিন পূর্ব থেকেই এ মিথ্যা গুজব ছড়ালো যে মুসলিম লীগ তথা কোলকাতার মুসলমানগণ হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালাবে এবং তাদের ধনসম্পদ লুন্ঠন করবে। এ গুজব ছড়ানোর এ উদ্দেশ্য ছিল যেন হিন্দুগণ কোলকাতার শতকরা প্রায় পঁচিশ ভাগ মুসলমান নির্মূল করার জন্য তৈরী হয়।

আমি (অত্র গ্রন্থকার) সে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত থাকলেও পাকিস্তান আন্দোলন মনে প্রাণে সমর্থন করতাম। মুসলিম লীগ মহলের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলতাম। ১৬ই আগষ্ট মুসলমানদের পক্ষ থেকে হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালানো হবে এরূপ কোন পরিকল্পনার বিন্দু বিসর্গও কানে আসেনি। আমি তখন ফ্যামিলিসহ কোলকাতায় থাকতাম, বাসায় আমার সাথে আমার স্ত্রী ও চার বছরের কন্যা মাত্র। গোলযোগের কোন আশংকা থাকলে তাদেরকে একাকী ফেলে ১৬ই আগষ্টে মুসলিম লীগের জনসভায় নিশ্চিন্ত মনে কিছুতেই যেতে পারতাম না।

গড়ের মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় আমার মত আরো অনেকেই যোগদান করেন। আমরা জনসভায় উপস্থিত হয়ে দেখলাম রাজা গজনফর আলী খান ইংরেজিতে বক্তৃতা করছেন।

মুসলিম লীগ কর্মীদের হাতে কোন অস্ত্র ত দূরের কথা, কোন লাঠি–সোটাও দেখতে পাইনি। তবে পাকিস্তান লাভের আশায় সকলকে হর্ষোৎফুল্ল ও উজ্জীবিত দেখতে পেয়েছিলাম।

রাজা সাহেবের পর সোহরাওয়ার্দী সাহেব মঞ্চে ওঠার পর মুসলিম লীগ মিছিলের এবং জনসভায় আগমনকারীদের উপর হিন্দুদের সশস্ত্র আক্রমণের সংবাদ আসতে থাকলো। অতঃপর আক্রান্ত মুসলমানদের অনেকেই রক্তমাখা জামাকাপড় নিয়ে সভায় হাজির হয়ে হিন্দুদের সশস্ত্র হামলার বিবরণ দিতে লাগলো। শ্রোতাদের হর্ষ বিষাদে পরিণত হলো। ভয়ানক উত্তেজনা, ভীতি ও আশংকা বাড়তে থাকলো। কোলকাতায় শতকরা বিশ থেকে পঁচিশ ভাগ মুসলমান। প্রায় সকলেই দরিদ্র। তাদের শতকরা প্রায় পাঁচ ভাগ বহিরাগত, বিভিন্ন স্থানে চাকরি করে।

জনসভায় যোগদানকারীগণ কিভাবে নিরাপদে বাড়ি ফিরে যাবে, তাদের অরক্ষিত পরিবারের অবস্থাই বা কি—এমন এক আশংকা সকলের চোখে মুখে

দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারলেন। তাঁর বক্তৃতার কোন কথাই আমার মনে নেই। তবে জনতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে 'হাম্ সব দেখ্ লেংগে'—বলে সকলকে শৃংখলার সাথে ঘরে ফিরে যেতে বল্লেন। আমরা কোন রকমে 'আল্লাহ আল্লাহ' করে বাসায় ফিরলাম। কোলকাতার মুসলিম পল্লী পার্কসার্কাসে থাকতাম বলে বেঁচে গিয়েছি, নতুবা হিন্দুদের আক্রমণের শিকার অবশ্যই হতে হতো।

এ লোমহর্ষক ঘটনা সম্পর্কে তৎকালীন কোলকাতার দৈনিক ষ্টেটস্‌ম্যান (Statesman) পত্রিকার সম্পাদক— Ian Stephens বলেন—'সম্ভবতঃ প্রথম দিনের মারামারিতে এবং নিশ্চিতরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে—মুসলমানদের জানমালের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়।

(Ian Stephens, Pakistan, London, Ernest Bena, 1963, p. 106: Choudhury Mohammad Ali : The Emergence of Pakistan, p. 76)

এসব ঘটনার দ্বারা এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ১৬ই আগষ্ট হিন্দুদের উপর আক্রমণ করার কোন পরিকল্পনা মুসলিম লীগের ছিলনা। বরঞ্চ লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনকে নিজেদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য কংগ্রেস মুসলিম নিধনের নিখুঁত পরিকল্পনা তৈরী করে। তবে এর সুফল হয়েছে মুসলমানদের জন্যে। পাকিস্তান সৃষ্টি ত্বরান্বিত হয়েছে—যার সম্ভাবনা কিছুটা ক্ষীণ হয়েছিল কেবিনেট মিশনের প্রস্তাবের পর। জিন্নাহ খোলাখুলি ও অকপটে কোলকাতার নৃশংস ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পর

কোলকাতার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এক বিতর্কিত আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ে। উপমহাদেশে মাঝে মধ্যে এখানে সেখানে হিন্দু মুসলমানে দাংগাহাংগামা হয়েই থাকে। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্টে অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা ছিল তুলনাবিহীন। কোলকাতার মুসলমানদের নির্মূল করার এক সুচিন্তিত পরি–কল্পনার অধীনে এ হত্যাকান্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ভাইসরয় ২৪শে আগষ্ট মধ্যবর্তী সরকারের সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন।

তাদেরকে দুসরা সেপ্টেম্বর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ভাইসরয় ৬ই আগস্ট নেহরুকে মধ্যবর্তী সরকার গঠনের আহবান জানান। ৭ই আগস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সরকার গঠনে সম্মতি দান করে। ১৭ই আগস্ট নেহরু ভাইসরয়কে বলেন যে তিনি মুসলিম আসনগুলো লীগ বহির্ভূত লোকদের দ্বারা পূরণ করে একটি শক্তিশালী সরকার গঠন করতে চান। ভাইসরয় এতে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে আপাততঃ কিছু সময়ের জন্যে মুসলিম আসনগুলো উন্মুক্ত রাখা হোক। নেহরু এ প্রস্তাবে রাজী না হয়ে তার নিজের প্রস্তাবে অবিচল থাকেন।

একথাটি পরে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে কংগ্রেসী মধ্যবর্তী সরকারের শপথ গ্রহণের প্রাক্কালে ভাইসরয় ব্রিটিশ সরকারকে বলেন যে, মুসলিম লীগ সরকারে যোগদান করতে রাজী না হওয়া পর্যন্ত শপথ অনুষ্ঠান মুলতবী রাখা হোক। প্রধানমন্ত্রী এটলী ভাইসরয়ের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, এখন যে কোন বিলম্বকরণ প্রক্রিয়া কংগ্রেস নেতাদের মেজাজ তিক্ততর করবে এবং কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করবে। অতঃপর দিল্লী থেকে জারীকৃত এক সরকারী ইশ্‌তাহারে বলা হয় যে, নতুন কাউন্সিল দুসরা সেপ্টেম্বর কার্যভার গ্রহণ করবে।

নতুন কাউন্সিলে (The New Executive Council) যোগদানকারী সদস্যগণ ছিলেন ঃ নেহরু, প্যাটেল, রাজা গোপালাচারিয়া, রাজেন্দ্র প্রসাদ, আসফ আলী, শরৎচন্দ্র বোস, জন ম্যাথাই, বলদেব সিং, স্যার শাফায়াত আহমদ খান, জগজীবন রাম, আলী জহির এবং সি এইচ ভবা। দুজন মুসলমান পরে নেয়া হবে। (The Indian Register, 1946, vol. II, P. 228, Ishtiaq Husain Qureshi : The Struggle for Pakistan, pp. 274-275)।

মেজাজ প্রকৃতির পরিপন্থী কাজ সমাধা করার পর ভাইসরয় সাম্প্রদায়িক দাংগায় বিধ্বস্ত কোলকাতা পরিদর্শন করেন। কোলকাতা ভ্রমণের পর তিনি নিশ্চিত হন যে, কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে কোন সমঝোতা না হলে সমগ্র ভারত ভয়ংকর গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে পড়বে। কোলকাতা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কংগ্রেস নেতাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করেন এবং এ উদ্দেশ্যে ২৭শে আগস্ট গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বাংলায় এবং কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন এবং একটা ফর্মূলা পেশ করেন। ২৮শে আগস্ট

নেহরু ভাইসরয়কে জানিয়ে দেন যে ওয়ার্কিং কমিটি ফর্মূলাটি প্রত্যাখ্যান করেছে।

ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল একটি মীমাংসায় পৌছার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তার এ প্রচেষ্টা কংগ্রেস ভিন্নভাবে গ্রহণ করে। উপমহাদেশের উপর কংগ্রেসের একচেটিয়া প্রভুত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে ওয়াভেলকে তার প্রতিবন্ধক মনে করেন এবং তার শাস্তি বিধানের জন্য উঠে পড়ে লাগেন। ওয়াভেলের সাথে আলাপ আলোচনার পর ফিরে এসে গান্ধী এবং নেহরু উভয়ে পত্র লিখতে বসে যান। গান্ধী প্রথমে এটলীর নিকটে এ মর্মে তারবার্তা প্রেরণ করেন যে, ভাইসরয়ের মনের অবস্থা এমন যে শিগ্‌গির প্রতিকার হওয়া দরকার। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে কোলকাতার ঘটনায় তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। গান্ধী তাঁর স্থলে একজন যোগ্যতর ব্যক্তির দাবী জানান। গান্ধী ওয়াভেলকেও পত্রের দ্বারা শাসিয়ে দেন যে তিনি ভীতি প্রদর্শন করে কংগ্রেসকে তার স্বমতে আনতে চান। তিনি আরও বলেন যে ভাইসরয় যদি সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতিতে ভীত হয়ে পড়েন এবং তা দমন করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করতে চান, তাহলে বৃটিশের শিগগির ভারত ত্যাগ করা উচিত এবং ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কংগ্রেসের উপর অর্পণ করা উচিত।

অপরদিকে নেহরু বৃটেনে তার কতিপয় প্রভাবশালী বন্ধুকে পত্র দ্বারা জানিয়ে দেন যে, ভাইসরয় অত্যন্ত দুর্বল লোক এবং মানসিক নমনীয়তা হারিয়ে ফেলেছেন। জিন্নাহকে খুশী করার জন্যে তিনি ভারতকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। তিনি বলেন যে, ভাইসরয় স্যার ফ্রান্সিস্ মুডি এবং জর্জ এবেল এর পরামর্শ অনুযায়ী চলছেন এবং নেহরুর মতে এ দুজন হচ্ছেন প্রকট মুসলিম মনা (Rabidly pro-Muslim)। নেহরু তাদেরকে ইংলিশ মোল্লা বলেও অভিহিত করেন। মোট কথা নেহরুর পত্রাদির মর্ম হচ্ছে— 'ওয়াভেলকে যেতেই হবে'।

—(Leonard Mosley- op. cit- pp. 44 - Gandhi's letter to Wavel reproduced in full in Pyarelal's Mahatma Gandhi : The last Phase (Ahmedabad-1956); I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, p. 276)।

দ্বাদশ অধ্যায়

একজেকিউটিভ্ কাউন্সিলে লীগের যোগদান

অন্তর্বর্তী সরকার নির্দিষ্ট সময়ে, অর্থাৎ দুসরা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬, কার্যভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেস খুবই উল্লসিত। পট্টভি সিতারামিয়া ঘোষণা করেন, ক'বছরের মধ্যেই ভারতে একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। মুসলিম লীগ আসুক না আসুক—তাতে কিছু যায় আসে না। কাফেলা চলতেই থাকবে। এখন আমাদেরকে এ ভূখন্ডের শাসক মনে করতে হবে। (I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, p. 277)

ভারতে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম ভারত এবং বৃটেনের বিভিন্ন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন। জিন্নাহ ২৫শে আগষ্ট অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এক বিবৃতি দান করেন। তিনি ভাইসরয়ের সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, মুসলিম লীগকে যে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছিল এবং যে সব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, তার সিদ্ধান্ত সে সবের সাথে অসামঞ্জস্যশীল। নতুন সরকার যে দিন কার্যভার গ্রহণ করেন সেদিন মুসলমানগণ সমগ্র ভারতে তাদের গৃহে ও দোকানে কালো পতাকা উড্ডীন করেন।

বৃটেনে স্যার উইন্স্টোন চার্চিল সরকারী সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা গৃহযুদ্ধ ব্যতীত সফল হবেনা। হিন্দুদের সুযোগ সুবিধা দেয়ার জন্য ক্রিপ্স্ অন্যায়ভাবে তার প্রভাব কাজে লাগিয়েছেন। পরে তিনি বলেন, বর্ণহিন্দু মিঃ নেহরুর উপর ভারত সরকারের দায়িত্ব অর্পণ মৌলিক ভুল হয়েছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম প্রণেতা লর্ড টেম্পল্ উড্ একটি মাত্র সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় সরকার গঠনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। লর্ড স্কার বরো ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে একটি দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে ভারত থেকে বৃটিশ সরকারের উপর ভয়ানক চাপ সৃষ্টি করা হবে এবং তিনি আশা করেন যে তা প্রতিহত করা হবে। লর্ড ক্রাস্বর্ণ জুন মাসে মুসলমানদের সাথে কৃত ওয়াদা ভংগ করে আগষ্টে কংগ্রেসকে সরকার গঠনের অনুমতি দেয়ায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। এভাবে বৃটেনের বিভিন্ন মহল থেকে

তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। (I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, pp. 277-278)

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর এক মাস অতিক্রান্ত হতে না হতে মুসলিম লীগ উপলব্ধি করে যে, সরকারের বাইরে অবস্থান মুসলিম স্বার্থের চরম পরিপন্থী। নীতিগতভাবে মুসলিম লীগ সরকারে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এ নীতি বলবৎ থাকবে। তবে রাজনৈতিক প্রয়োজন এবং সেইসাথে দেশে শত্রুতাবাপন্ন একটি হিন্দু সরকার প্রতিষ্ঠা লীগকে তার নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করে। যতোদিন মুসলিম লীগ বাইরে থাকবে, ততোদিন মুসলমানগণ দুর্গতি ভোগ করতে থাকবে। আইন শৃংখলার অবনতি ঘটছে এবং বহু অঞ্চল থেকে মুসলমানদের নির্মূল হওয়ার আশংকা রয়েছে। কংগ্রেসের কোন মাথা ব্যথা নেই। হিন্দু সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে দুষ্কৃতিকারিগণ উৎসাহিত বলে মনে হচ্ছে। অতএব এমতাবস্থায় মুসলিম ভারত রক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগকে অবশ্যই সরকারে যোগদান করতে হবে। জিন্নাহর মতে কোয়ালিশন সরকারের বাইরে থাকার চেয়ে ভেতরে থেকে ভালোভাবে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাতে পারবেন।

কোয়ালিশন সরকারে মুসলিম লীগকে পাওয়ার জন্যে ভাইসরয় স্বয়ং বড়ো আগ্রহান্বিত ছিলেন। কারণ তিনি ভবিষ্যৎ সংকট সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এ কারণে দীর্ঘ জটিল আলাপ আলোচনা চলতে থাকে একদিকে জিন্নাহ ও নেহরুর মধ্যে এবং অপরদিকে জিন্নাহ ও ভাইসরয়ের মধ্যে। অবশেষে ২৫শে অক্টোবর ১৯৪৬, একজেকিউটিভ্ কাউন্সিল নিম্নরূপে পুনর্গঠিত হয় :—

কংগ্রেস

জওহরলাল নেহরু - (External Affairs and Commonwealth Relations)

বল্লভ ভাই প্যাটেল - (Home, Information & Broadcasting)

মি. রাজা গোপালাচারিয়া - (Education & Arts)

আসফ আলী - (Transport & Railway)

জগজীবন রাম - (Labour)

মুসলিম লীগ

লিয়াকত আলী খান – (Finance)
আই আই চুন্দ্রিগড় – (Commerce)
আবদুর রব নিশতার – (Communications)
গজনফর আলী খান – (Health)
যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল – (Legislative)

সংখ্যালঘু

জন্ ম্যাথাই – (Industries & Supplies)
সি এইচ ভবা – (Works, Mines & Power)
বলদেব সিং – (Defence)

নেহরু কোয়ালিশন সরকারে মুসলিম লীগের যোগদান ভালো চোখে দেখেননি। তদুপরি দপ্তর বন্টনেও তিনি চরম একগুঁয়েমির পরিচয় দেন। ভাইসরয় চাচ্ছিলেন তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর যথা External Affairs, Home and Defence –এর যে কোন একটি মুসলিম লীগকে দেয়া হোক। নেহরু এর চরম বিরোধিতা করেন। অবশেষে যে পাচটি দপ্তর মুসলিম লীগকে দেয়া হয় তার মধ্যে অর্থ(Finance) একটি। কংগ্রেস অর্থ বিভাগের দপ্তরটি মুসলিম লীগকে দিতে এ জন্যে রাজী হয়েছিল যে, তাদের বিশ্বাস ছিল এ দপ্তর চালাতে মুসলিম লীগ অপারগ হবে— বরঞ্চ চালাতে গিয়ে বোকা সাজবে। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের এ সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, তার সহকর্মীদের এ এক ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'India Wins Freedom' গ্রন্থে এ বিষয়ে যে উপভোগ্য আলোচনা করেছেন তা উপভোগ করার জন্য পাঠকবৃন্দের জন্য পরিবেশন করছি।

মাওলানা আজাদ বলেন ঃ

যেহেতু লীগ সরকারে যোগদান করতে সম্মত হয়েছে, কংগ্রেসকে সরকার পুনর্গঠিত করতে হবে এবং এতে মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের স্থান করে দিতে হবে। এখন প্রশ্ন কে কে সরকার থেকে সরে দাঁড়াবেন। মনে করা হলো যে, শরৎ চন্দ্র বসু, স্যার শাফায়াত আহমদ খান এবং সৈয়দ আলী জহির লীগ নমিনীদের স্থান করে দেয়ার জন্যে ইস্তাফা দেবেন। ভাইসরয়ের প্রস্তাব ছিল যে স্বরাষ্ট্র বিভাগ মুসলিম লীগকে দেয়া হোক। সর্দার প্যাটেল এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। আমার ধারণা মতে আইন শৃংখলা অবশ্যম্ভাবী রূপে একটি প্রাদেশিক বিষয়। কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার যে চিত্রটি সামনে রয়েছে তাতে এ ব্যাপারে কেন্দ্রের সামান্য কিছুই করার আছে। অতএব নতুন সরকার কাঠামোতে কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তেমন কোন গুরুত্ব নেই। এ কারণে আমি লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের পক্ষেই ছিলাম। কিন্তু প্যাটেল একেবারে নাছোড়বান্দা। তিনি বল্লেন, আমি বরঞ্চ সরকার থেকে বেরিয়ে যাব কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়বনা।

আমরা তখন বিকল্প চিন্তা করলাম। রফি আহমদ কিদওয়াই প্রস্তাব করেন যে অর্থ মন্ত্রণালয় মুসলিম লীগকে দেয়া হোক। তিনি আরও বলেন, এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। কিন্তু এ একটি উচমানের টেক্‌নিকাল বিষয় এবং মুসলিম লীগের মধ্যে এমন কেউ নেই যে এ বিভাগ ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারবে। কিদওয়াইয়ের ধারণা মুসলিম লীগ এ দপ্তর গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে। এতে কংগ্রেসের কোন ক্ষতি নেই। আর এ দপ্তর গ্রহণ করলে পরে তারা বোকা প্রমাণিত হবে।

প্যাটেল লাফ মেরে প্রস্তাবটির প্রতি তার অতি জোরালো সমর্থন জানান (Patel jumped at the proposal and gave it his strongest support)। আমি এ কথা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম যে অর্থ মন্ত্রণালয় হলো একটি সরকারের চাবিকাঠি এবং এ মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রণে থাকলে আমাদেরকে বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। প্যাটেল আমার বিরুদ্ধাচারণ করে বল্লেন যে, লীগ এ বিভাগ চালাতে পারবেনা এবং এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হবে। আমি এ সিদ্ধান্তে খুশী হতে পারিনি। তবে সকলে যখন একমত, আমাকে তা মেনে নিতে হলো।

লর্ড ওয়াভেল জিন্নাহকে প্রস্তাবটি সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি পরের দিন জবাব দেবেন বলেন।

জিন্নাহরও সংশয় ছিল যে কেবিনেটে লীগের প্রধান প্রতিনিধি লিয়াকত আলী এ বিভাগটি চালাতে পারবেন কিনা। অর্থ বিভাগের কতিপয় মুসলমান অফিসার

এ বিষয়টি জানার পর জিন্নাহর সাথে দেখা করেন। তারা বলেন যে, কংগ্রেসের এ প্রস্তাব অচিন্তনীয় পাকা ফলের মতো এবং এতে লীগের বিরাট বিজয় সূচিত হয়েছে।.... অর্থ বিভাগ নিয়ন্ত্রণের ফলে সরকারের প্রতিটি বিভাগে লীগের কর্তৃত্ব চলবে। তারা জিন্নাহকে এ নিশ্চয়তা দান করেন যে তার ভয়ের কোন কারণ নেই। লিয়াকত আলীকে সর্বপ্রকারে সাহায্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি তারা দেন যাতে যথাযথভাবে তিনি তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

কংগ্রেস শীঘ্রই উপলব্ধি করেছিল যে অর্থ বিভাগ লীগকে দিয়ে বিরাট ভুল করা হয়েছে– (Abul Kalam Azad: India Wins Freedom, pp. 177-179)।

এ প্রসঙ্গে চৌধুরী মুহাম্মদ আলী বলেন ঃ

জুন মাসে যখন সর্বপ্রথম একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তখন কায়েদে আজম লীগের সম্ভাব্য দপ্তরগুলো সম্পর্কে আমার সাথে আলোচনা করেন। তিনি স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা (Home & Defence) বিভাগ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি বল্লাম, আইন শৃংখলা ও পুলিশ প্রাদেশিক বিষয় যার উপর কেন্দ্রের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কংগ্রেস প্রদেশগুলো লীগ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কোন পরোয়াই করবেনা। অনুরূপ মুসলিম লীগ প্রাদেশিক সরকারগুলো তার উপদেশ গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করবেনা। আমি বল্লাম যে প্রতিরক্ষা দপ্তর অবশ্যই লাভজনক। কিন্তু যদি লীগ প্রতিটি বিভাগে সরকারের নীতি–পলিসি প্রভাবিত করতে চায়, তাহলে তার অর্থ বিভাগ নেয়া দরকার। আমি তখন তাকে অর্থ বিভাগের কৌশলগত গুরুত্ব বুঝাতে পারিনি। কিন্তু এখন ঘটনাচক্রে অর্থদপ্তর লীগের ঘাড়ে এসে পড়েছে। আমাকে যখন পুনরায় ডেকে পাঠানো হয় তখন অত্যন্ত জোরালোভাবে আমার পূর্ব পরামর্শের পুনরাবৃত্তি করি। লীগের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে লিয়াকত আলীর উপর অর্থ বিভাগ অর্পিত হওয়ায় তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। আমি সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতার প্রস্তাব দিলাম এবং কায়েদে আজম ও লিয়াকত আলী খান উভয়কেই সাফল্যজনক পরিণামের নিশ্চয়তা দান করলাম। আমার প্রস্তাব গৃহীত হলো এবং লিয়াকত আলী অর্থমন্ত্রী হলেন। (Chowdhury Mohammad Ali : The Emergence of Pakistan, p. 84)।

কোয়ালিশন সরকার গঠনের পর

লীগের প্রতি কংগ্রেসের পূর্ণ অনাস্থা ও বৈরাচরণের কারণে কংগ্রেস চাইছিল নেহরুকে গোটা কেবিনেটের নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে। লীগ তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে লিয়াকত আলী খান স্পষ্টভাষায় বলেন, নেহরু কেবিনেটে কংগ্রেস দলের নেতা ব্যতীত আর কারো নেতা নন। সাংবিধানিক অর্থে সম্মিলিত দায়িত্ব অস্বীকার করলেও তিনি বলেন, লীগ মন্ত্রীগণ তাদের সহকর্মীদের সাথে মিলেমিশে কাজ করবেন শুধু মুসলমানদের স্বার্থেই নয়, বরঞ্চ ভারতের সকল অধিবাসীদের স্বার্থে।

সাম্প্রদায়িক হানাহানি বেড়েই চলছিল বিধায় ঐক্য ও সহযোগিতার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে পূর্ব বাংলার নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলায় গোলযোগ শুরু হয় এবং মাস শেষ হবার পূর্বেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ সরেজমিনে তদন্তের পর এ মন্তব্য করেন যে সেখানে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিম জনসাধারণের কোন আক্রমণাত্মক অভিযান ছিলনা। গুন্ডাপ্রকৃতির লোকদের দ্বারা এ গোলযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল। লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্যার ফ্রান্সিস টুকার, জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং ইন্ চীফ্ কম্যান্ড, নিহতের সংখ্যা তিনশতের কম বলেন। কিন্তু বিকারগ্রস্ত হিন্দুপ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে ভয়াবহ ও লোমহর্ষক কল্পকাহিনী রচনা করে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। এসব প্রচারণা বিহার ও ইউপি–র হিন্দুদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের উদগ্র লালসা সৃষ্টি করে। [E. W. R. Lumby : The Transfer of Power in India—1945-47 (London George Allen and Unwin, 1954), p. 120; Sir Francis Tuker; While Memory Serves (London-Casell, 1950) p. 176; Choudhury Mohammad Ali : The Emergence of Pakistan, p. 85]।

নবেম্বরের পয়লা হপ্তায় পরিকল্পিত উপায়ে বিহারে মুসলিম নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। ছ'চল্লিশের সকল ভয়ংকর দাংগার মধ্যে বিহারের হত্যাযজ্ঞ ছিল সর্বাপেক্ষা লোমহর্ষক ও বেদনাদায়ক। এর সবচেয়ে কাপুরুষোচিত দিক হচ্ছে এই যে হিন্দু জনতা পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রস্তুতিসহ হঠাৎ মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসব মুসলমান ও তাদের পূর্বপুরুষ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের হিন্দু প্রতিবেশীর সাথে বসবাস করে আসছিল। এ দাংগায় নিহত নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ছিল

সাত আট হাজার। (Sir Francis Tuker : While Memory Serves, pp. 181-82; Choudhury Mohammad Ali : Emergencey of Pakistan, p. 86)।

ভাইসরয় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীবর্গ হিন্দু ও মুসলিম উপদ্রুত অঞ্চল সফর করেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তির জন্য আবেদন জানান। বিহারের ঘটনা জানা সত্ত্বেও গান্ধী নোয়াখালীর পথে তখন কোলকাতায় অবস্থান করছিলেন। কংগ্রেসী মুসলমানগণ গান্ধীকে বার বার অনুরোধ করেন বিহার গিয়ে রক্তপিপাসু হিন্দুদের নিবৃত্ত করার জন্যে। এতদ্‌সত্ত্বেও গান্ধী বিহারমুখী না হয়ে নোয়াখালী গমন করে চার মাস অবস্থান করেন।

অবশেষে সাতচল্লিশের মার্চ মাসে বিহারে যাওয়ার জন্য গান্ধীকে রাজী করা হয়। এবার গান্ধীর চোখ খুলে যায়। প্রদেশের মন্ত্রীসভা ছলচাতুরী করে সবকিছু এড়িয়ে চলেন এবং তাদেরকে মোটেই অনুতপ্ত দেখা যায় না। জেনারেল টুকার বলেন, আমাদের অফিসারদের কাছে যেটা সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয়েছে তা এই যে, হিন্দু মন্ত্রীগণ নৃশংস হত্যাকান্ডকে কি করে শান্তভাবে গ্রহণ করলেন। তারা বলেন যে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গান্ধী যখন বলেন যে, এখন পর্যন্ত কোন তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়নি, তখন প্রধানমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিনহা ভয় প্রকাশ করে বলেন যে এর থেকে লীগ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করবে।

বিহার হত্যাযজ্ঞের সাক্ষ্যপ্রমাণ এতো মজবুত যে কারো পক্ষে বিভ্রান্তি সৃষ্টি সম্ভব নয়। পিয়ারীলাল তার 'মহাত্মা গান্ধী দি লাষ্ট ফেজ'—গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন– The veil lifted. এতে তিনি বলেন যে, ছেচল্লিশের বিহারের দাংগা অখন্ড ভারতের স্বপ্নসাধ ভেঙে দিয়েছে। এ হত্যাকান্ড হিন্দুর সহজাত শান্তিবাদ (Pacifism)–এর প্রতিও গান্ধীর বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছে। এ সময় থেকে তার মধ্যে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। পূর্ববর্তীকালে প্রতিটি সাম্প্রদায়িক দাংগায় তার প্রধান উদ্বেগ ছিল হিন্দুদের রক্ষা করা। এখন তিনি মুসলমানদের রক্ষার জন্যেও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সমগ্র ভারতের উপর হিন্দুর রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা সত্ত্বেও, তিনি রক্তপাত এড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তার মানবিক আবেগ জাগ্রত হয়েছিল এবং জীবন দিয়ে এর মূল্য তাকে দিতে হয়।

বিহার হত্যাকান্ডের কিছুদিন পর ইউপি প্রদেশের গড়মুক্তেশ্বরে আর একটি মুসলিম নিধনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে প্রতিবছর হিন্দু মেলা হয়। কিছু সংখ্যক মুসলমান ব্যবসায়ী মেলায় দোকানপাট খুলে বসে। হঠাৎ তাদের উপর হামলা করা হয়। জেনারেল টুকার বলেন,

প্রত্যেক মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। হত্যাকান্ডের কোন সংবাদ লৌহ যবনিকা ভেদ করে বহির্জগতে পৌঁছতে পারেনি। প্রাদেশিক সরকার হিন্দু প্রশাসনযন্ত্রের সহযোগিতায় হিন্দুদের এ হত্যাকান্ডকে পর্দার আড়াল করে রাখেন। হিন্দু পত্র–পত্রিকায় ইচ্ছাকৃতভাবে ফলাও করে প্রচার করা হয় যে, মুসলমানরা কয়েকগুণে প্রতিশোধ নিয়েছে। এটা করা হয় হিন্দুদের অপকর্ম ঢাকার জন্য। প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত প্যান্ট ঘোষণা করেন যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি করা হবে। কিন্তু কোন কিছুই করা হয়নি। (Sir Francis Tuker : While Memory Serves; pp. 196-201; Chowdhury Mohammad Ali—Emergence of Pakistan, p 87)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গণপরিষদ

জুলাই ১৯৪৬-এর শেষে গণপরিষদের ২৯৬ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। নয়টি আসন ব্যতীত সকল সাধারণ আসনে কংগ্রেস জয়ী হয় এবং পাঁচটি আসন ব্যতীত সকল মুসলিম আসনে লীগ জয়ী হয়। গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ হওয়ার কথা। কিন্তু লীগ এতে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। এমনকি একে বৈধ বলে স্বীকার করতে রাজী না যতোক্ষণ না কেবিনেট মিশনের ১৬ই মে'র বিবৃতির ১৯ অনুচ্ছেদের মুসলিম লীগ কর্তৃক ব্যাখ্যা কংগ্রেস মেনে নিয়েছে। এ ব্যাখ্যা মেনে নেয়ার জন্য ভাইসরয় কংগ্রেসকে অনুরোধ করেন। এ অনুরোধের পুরস্কার এভাবে দেয়া হলো যে গান্ধী ও নেহরু ভাইসরয়কে অপসারণের জন্যে বৃটিশ সরকারের নিকটে তারবার্তা ও পত্র প্রেরণ করেন। উপায়ান্তর না দেখে ভাইসরয় কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার অধীন গণপরিষদে যোগদানের জন্য ২০ শে নবেম্বর আমন্ত্রণ জানান। সংগে সংগেই জিন্নাহ এটাকে মারাত্মক ধরনের ভুল পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, ভাইসরয় ভয়ংকর পরিস্থিতি ও তার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন এবং কংগ্রেসকে খুশী করার চেষ্টা করছেন। ৯ই ডিসেম্বর গণপরিষদের অধিবেশনে কোন লীগ প্রতিনিধি যোগদান করেন নি।

এরূপ পরিস্থিতিতে শেষ চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার দুজন কংগ্রেস এবং দুজন লীগ নেতাকে লন্ডন আমন্ত্রণ জানান। ভাইসরয়ের পরামর্শক্রমে একজন শিখ প্রতিনিধিকেও আমন্ত্রণ জানান হয়।

দুসরা ডিসেম্বর ১৯৪৭, লর্ড ওয়াভেল নেহরু, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান এবং বলদেব সিং সহ লন্ডন যাত্রা করেন। চারদিন যাবত আলাপ আলোচনা চলে।

কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য কেবিনেট মিশনের ১৬ই মে'র বিবৃতির ব্যাখ্যা নিয়ে অর্থাৎ প্রদেশগুলোর গ্রুপিং নিয়ে। কেবিনেট মিশন স্বয়ং সে ব্যাখ্যাই করে যা মুসলিম লীগের ব্যাখ্যা। কিন্তু নেহরু এ ব্যাখ্যা কিছুতেই মেনে নিতে রাজী হন না। চরম রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়।

কংগ্রেসের একগুঁয়েমি ও হঠকারিতার কারণে কোন আপোস মীমাংসা না হওয়ায় ৬ই ডিসেম্বর বৃটিশ সরকার এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। বিবৃতির শেষ

অনুচ্ছেদে বলা হয়, সর্বসম্মত কার্যধারার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত ব্যতীত গণপরিষদের সাফল্য আশা করা যায় না। গণপরিষদ যদি এমন কোন সংবিধান রচনা করে যার রচনাকালে ভারতবাসীর বিরাট সংখ্যক লোকের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই, তাহলে বৃটিশ সরকার এ ধরনের কোন সংবিধান অনিচ্ছুক জনগোষ্ঠীর উপর বলপূর্বক চাপিয়ে দিতে পারেনা।

সরকারের উপরোক্ত বিবৃতি এবং কেবিনেট মিশনের ২৫শে মে'র বিবৃতি কংগ্রেসের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়। নেহরু ও বলদেব সিং গণপরিষদে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী আরও কিছুদিন যুক্তরাজ্যে অবস্থান করেন। লন্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জিন্নাহ বলেন, কংগ্রেস যদি ১৬ মে প্রকাশিত বিবৃতির বৃটিশ সরকারের ব্যাখ্যা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মেনে নেয়, তাহলে লীগ কাউন্সিলকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানাব। লন্ডনের এক বক্তৃতায় জিন্নাহ দেখিয়ে দেন যে পাকিস্তানের জনসংখ্যা পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক। আমরা ভারতের তিন চতুর্থাংশের উপর কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিচ্ছি। পাকিস্তান মেনে নিতে কংগ্রেসের আপত্তি এ জন্যে যে তারা সমগ্র ভারত চায়। তাহলে আমরা আর থাকি কোথায়? এখন সমস্যা এই যে, বৃটিশ সরকার কি তাদের বেয়নেটের বলে হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চান? তা যদি হয় তাহলে বলব তোমরা তোমাদের মানসম্ভ্রম, ন্যায়পরতা ও সুবিচার ও সাধু আচরণের সর্বশেষ কণাটুকুও হারিয়ে ফেলেছ। [Some Recent Writings of Mr. Jinnah, Vol II— ed. by Jamiluddin Ahmad, (Lahore, Muhammad Ashraf 1947)— pp. 496-508; Chowdhury Mohammad Ali : The Emergence of Pakistan, pp. 91-92)।

একদিকে ভারতে কংগ্রেস তীব্র কণ্ঠে দাবী করতে থাকে যে লীগ গণপরিষদে যোগদান না করলে তাদেরকে অন্তর্বর্তী সরকার থেকে বহিষ্কার করা হোক, অপরদিকে বৃটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা অদূর ভবিষ্যতে এক নতুন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ইংগিত বহন করে।

কেবিনেট মিশন সেক্রেটারিয়েটের সাথে সংশ্লিষ্ট ই, ডবলিউ, আর লুম্বী বলেন; বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রথম ঘোষণা যে কেবিনেট মিশন

পরিকল্পনা পরিহার করা হবে। ক্রিপস্ প্রস্তাবের পর এটাই ছিল প্রথম সরকারী ঘোষণা যার মধ্যে কোন না কোন প্রকারে পাকিস্তানের ইংগিত আভাস ছিল। হাউস অব্ কমন্সে ভাষণ দানকালে ক্রিপস্ সরকারী ঘোষণার শেষ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, গণপরিষদে যোগদানের জন্যে লীগকে যদি সম্মত করা না যায়, তাহলে দেশের যে সব অঞ্চলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলোকে কোন সিদ্ধান্ত দ্বারা বাধ্য করা যাবেনা। (E.W.R. Lumby, op. cit. p. 129; I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, pp. 184-

এখন একটা প্রশ্ন রইলো এবং তা এই যে কংগ্রেস লীগকে সরকার থেকে বহিষ্কার করে দেয়ার দাবীতে এতো অনমনীয় কেন। এর কারণ কয়েকটি। অন্তর্বর্তী সরকারকে কংগ্রেস জাতীয় সরকার বলে অভিহিত করতো এবং এর দায়িত্ব ছিল সামষ্টিক। নেহরুকে এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনে করা হতো। বৃটেনেও কংগ্রেসপন্থী ও বামপন্থী প্রেসগুলো একই সুরে একই গীত গাইতো। যেমন, দি নিউ ষ্টেট্স্ ম্যান—এ সরকারকে সামষ্টিক দায়িত্বসম্পন্ন একটি কেবিনেট বলে অভিহিত করে যার প্রধানমন্ত্রী নেহরু— (7 September 1946)। ভারতে মাউন্ট্ ব্যাটেনের চীফ্ অব ষ্টাফ লর্ড ইস্‌মে নেহরুকে ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টার বলে উল্লেখ করেন— (The Memoirs of General the Lord Ismay, London, 1960, p. 418)। তার এ উক্তি ছিল অত্যন্ত হাস্যকর। কারণ নেহরু Dy. Prime Misnister হলে ভাইসরয় কি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন?

লীগ কাউন্সিলারগণ নেহরুকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন এমনকি নন-লীগ ব্লকের প্রধানও না। জিন্নাহ বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ভাইসরয়ের একজেকিউটিভ্ কাউন্সিল ব্যতীত আর কিছু ছিলনা। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটাকে পুনর্গঠিত করা হয়। ভাইসরয় তার বিশেষ ক্ষমতাসহ ছিলেন এর প্রধান। নেহরু শুধুমাত্র কাউন্সিলের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার কাজ ছিল ভাইসরয়ের অনুপস্থিতিতে শুধুমাত্র সভাপতিত্ব করা। কাউন্সিলারদের অধিক কোন ক্ষমতা ও মর্যাদা তাঁর ছিলনা।

এতে নেহরুর অহমিকা ক্ষতবিক্ষত হয় যার জন্যে লীগকে বহিষ্কারের অন্যায় আবদার করতে থাকেন। (I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, pp. 282-283)।

চতুর্দশ অধ্যায়

মাউন্টব্যাটেন মিশন

নতুন বছর, ১৯৪৭-এর প্রারম্ভে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিস্থিতি এমন ছিল যে কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তী সরকার অথবা ভাইসরয়ের একজেকিউটিভ্ কাউন্সিল রয়েছে যেখানে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বিরাট মতপার্থক্যসহ অবস্থান করছে। ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ থেকে গণপরিষদের অধিবেশন চলছে যা লীগ বয়কট করে চলেছে। তার ফলে কংগ্রেস লীগকে ভাইসরয়ের কাউন্সিল থেকে বহিষ্কারের দাবী জানাচ্ছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী নেহরু ভাইসরয়কে পত্র দ্বারা লীগকে বহিষ্কারের দাবী জানান। ১৫ই ফেব্রুয়ারী প্যাটেল হুমকি প্রদর্শন করে বলেন, লীগ সরকার থেকে বেরিয়ে না গেলে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার ত্যাগ করবে। (The Indian Annual Register 1947, vol. I, p. 35; I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan; p. 287)।

এরূপ উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ প্রধানমন্ত্রী এটলী একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের অনিশ্চিত পরিস্থিতি আর দীর্ঘায়িত হতে দেয়া যায় না। বৃটিশ সরকার পরিষ্কার বলে দিতে চান যে, জুন মাসের ভেতরেই দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করবে। পূর্ণ প্রতিনিধিত্বশীল গণপরিষদ কর্তৃক সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র এ সময়ের মধ্যে প্রণীত না হলে, সরকার বিবেচনা করবে বৃটিশ ভারতে ক্ষমতা কার কাছে যথাসময়ে হস্তান্তর করা হবে—বৃটিশ ভারতে কোন্ ধরনের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অথবা বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের অধীনে কোন্ কোন্ অঞ্চলের হাতে অথবা এমন অন্য কোন্ উপায়ে যা অত্যন্ত যুক্তিসংগত বিবেচিত হবে এবং যা ভারতীয় জনগণের স্বার্থের অনুকূল হবে।

বিবৃতির শেষে এ কথাও ঘোষণা করা হয় যে ওয়াভেলের স্থলে এডমিরাল দি ভাইকাউন্ট ম্যাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করা হচ্ছে।

চারদিন পর ভারত সচিব হাউস অব লর্ড্‌স্-এ ঘোষণা করেন যে, এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল ভারতের দায়িত্বশীল মহলের পরামর্শে। আর উদ্দেশ্য ছিল একটি

চাপ সৃষ্টি করা যাতে ভারতীয় দলগুলো একটা সমঝোতায় পৌঁছে।

এখানে ভারতের দায়িত্বশীল মহল বলতে যে গান্ধী নেহরুকে বুঝানো হয়েছে এবং সমঝোতা বলতে কংগ্রেসের দাবী লীগকে মেনে নেয়া বুঝানো হয়েছে তা বুঝতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

ভারতের রাজনৈতিক চরম মুহূর্তে লর্ড ওয়াভেলকে কেন অপসারণ করা হলো তা জানার ঔৎসুক্য পাঠকবর্গের অবশ্যই থাকতে পারে। কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল এটলী যতো কথাই বলুন, কংগ্রেসকে বিশেষ করে গান্ধী ও নেহরুকে খুশী করার জন্যই যে ওয়াভেলের শাস্তি হলো, কতিপয় ঘটনা তার সাক্ষ্য বহন করে।

প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলী ও তাঁর কেবিনেটের সাথে লর্ড ওয়াভেলের কি কোন চরম মতপার্থক্য হয়েছিল যার মূল্য ওয়াভেলকে দিতে হয়? এর কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এর কারণ অন্য কিছু। তাই অনুসন্ধান করে দেখা যাক।

উল্লেখ্য যে লর্ড ওয়াভেল প্রথমে কংগ্রেসের অতি প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৪৬-এর জুনে মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে চাইলে ওয়াভেল বাধা দেন। পরে আবার তিনি কংগ্রেসকে সরকার গঠনের অনুমতি দেন লীগকে বাদ দিয়েই। পূর্বে তিনি বেশ দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলেন যে ভারতের ভৌগলিক ঐক্য বা অখন্ডতা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। যার জন্য লীগ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। পরবর্তীকালে ভাইসরয়-কংগ্রেস সম্পর্কে উষ্ণতা হ্রাস পেতে থাকে। কোলকাতার রক্তক্ষয়ী দাংগার পর কংগ্রেস ভাইসরয়কে বলেছিল, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদত্ত অধিকার ক্ষুণ্ন করে হলেও বাংলার লীগ মন্ত্রীসভা ভেঙে দিতে। ভাইসরয় তাতে রাজী হননি। এর ফলে তিনি কংগ্রেসের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। তারপর লীগ কাউন্সিলারদেরকে ভাইসরয়ের Executive Council থেকে বহিষ্কার করার বার বার দাবী জানানোর পরও যখন ভাইসরয় তা মানতে অস্বীকার করলেন তখন সম্পর্কে ভাঙন চূড়ান্তে পৌঁছলো। তারপর ভাইসরয়কে অপসারণের জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে গান্ধীর তারবার্তা ও পত্রাদি প্রেরণ এবং একই উদ্দেশ্যে বৃটেনে নেহরুর বন্ধুবান্ধবকে তাঁর পত্র প্রেরণ; ভারত সচিব এ সবকেই বলেছেন 'ভারতের দায়িত্বশীল মহলের

পরামর্শ'। ওয়াভেলের অপসারণে এবং মাউন্টব্যাটেনের ভাইসরয় হিসাবে ভারত আগমনে নেহরু অত্যন্ত আনন্দিত হন।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ২২শে মার্চ দিল্লী পৌঁছেন। তাঁর নিয়োগ কংগ্রেসকে উল্লসিত করে। পূর্ব থেকেই নেহরুর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। তারতে তিনি কোন অপরিচিত লোক ছিলেন না। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি ছিলেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মিত্র বাহিনীর সুপ্রীম কম্যান্ডার। সে কারণে তাঁকে বার বার ভারতে আসতে হতো যা ছিল যুদ্ধের অপারেশন বেস্ (base for operation)। দুবছর পূর্বে মালয়ে নেহরুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁরা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হন। তবে তিনি যে কংগ্রেস ভক্ত ছিলেন তা জানা যায়নি। তাঁর ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা লর্ড ইস্‌মে ভয় করছিলেন যে— মাউন্টব্যাটেনকে হিন্দুভক্ত এবং মুসলিম লীগ বিদ্বেষী হিসাবে গ্রহণ করা হবে। (Cempbell-Johnson, Allan : Mission with Mountbatten, p. 23; Abdul Hamid : Muslim Separatism in India, p. 239)।

নিয়মমাফিক ভাইসরয় ষ্টাফের অতিরিক্ত একটি ব্যক্তিগত সেক্রেটারিয়েট গঠনের অনুমতি মাউন্টব্যাটেনকে দেয়া হয়। সেটা ছিল তাঁর 'কিচেন্ কেবিনেট'। তাঁর সাফল্যের মূলে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন ভি. পি. মেনন। ভাইসরয় তাঁকে তাঁর নীতিনির্ধারণী পরিমন্ডলে টেনে এনেছিলেন। ভদ্রলোক ১৯৪২ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিক পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করে আসছিলেন। তাঁর প্রশাসনিক যোগ্যতার সাথে রাজনৈতিক বিচক্ষণতাও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তিনি ছিলেন প্যাটেলের শরণাগত। তাঁর নিজের লিখিত গ্রন্থ 'The Transfer of Power, Calcutta, 1957' পাঠে পরিষ্কার জানা যায় যে তিনি ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত সেক্রেটারিয়েট সংশ্লিষ্ট হওয়ার পূর্বেও সর্বদা লীগের বিরুদ্ধেই তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এখন তিনি শাসনদন্ডের পেছনে এক বিরাট শক্তি হয়ে পড়লেন।

—(Abdul Hamid : Muslim Separatism in India, p. 239)।

মাউন্টব্যাটেন ইংলন্ড থেকে সযত্নে ও সাবধানতা সহকারে তাঁর ষ্টাফের লোক বেছে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন লর্ড ইসমে যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চার্চিলের ব্যক্তিগত সাধারণ উপদেষ্টা ছিলেন। আরও ছিলেন এরিক মিভিল, লর্ড উইলিংডনের প্রাক্তন প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং ৬ষ্ঠ জর্জের

এসিস্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী, এ দুজন ছিলেন ভাইসরয়ের সাধারণ ও বেসামরিক দিকের প্রধান উপদেষ্টা এবং লর্ড ইসমে ছিলেন চীফ্ অব স্টাফ। ভি, পি, মেনন ছিলেন সাংবিধানিক পরামর্শদাতা। প্রায়ই স্টাফের বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো। প্রথমতঃ মাঝে মাঝে মেননকে বৈঠকে ডাকা হতো। পরে প্রত্যেক বৈঠকে তাঁকে ডাকা হতো। ভাইসরয় এবং অন্যান্য সকলের জানা ছিল যে মেনন ছিলেন প্যাটেলের অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক। এর ফলে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের আভ্যন্তরীণ সকল গোপন তথ্যই শুধু প্যাটেল জানতেন না, বরঞ্চ তাঁর এ মুখপাত্রকে দিয়ে তিনি ভাইসরয়ের পলিসি প্রভাবিত করতেন। মেননের স্থলে কোন মুসলমান যদি হতেন এবং তিনি জিন্নাহর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন, তাহলে ভাইসরয় এবং কংগ্রেস কারো পক্ষ থেকেই তাঁকে বরদাশত করা হতোনা। এঁদের নিকটে মুসলিম লীগ তথা ভারতের মুসলমান সুবিচার আশা করতে পারতো কি?

তেসরা জুন পরিকল্পনার ক্রমবিকাশ

কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার ভিত্তিতে অখন্ড ভারতের জন্য সর্বসম্মত সমাধান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে মাউন্টব্যাটেনকে ভারতে ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতে পৌঁছার পর ঘটনা প্রবাহ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিপরীতমুখী দৃষ্টিভংগী লক্ষ্য করার পর সর্বসম্মত সমাধান এবং অখন্ড ভারতের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতএব প্রধানমন্ত্রীর ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণাকে কেন্দ্র করেই পরিকল্পনা তৈরীর প্রতি ভাইসরয় মনোনিবেশ করেন।

তিনি তাঁর পরামর্শদাতাগণের সাথে পরামর্শের পর ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি পরিকল্পনা তৈরী করেন। তার ভিত্তি হলো প্রদেশগুলোর হাতে, অথবা সেসব প্রদেশগুলোর কনফেডারেশনের হাতে যারা বাস্তবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে দলবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত করবে—তাদের হাতে ক্ষমতা ও অধিকার হস্তান্তর করা হবে। ১১ই এপ্রিল ইস্মে পরিকল্পনার খসড়া মেননকে দেন তার সংশোধনীসহ সময়সূচী তৈরীর জন্য। মেনন আদেশ পালন করেন এবং সেই সাথে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, এ একটি মন্দ পরিকল্পনা এবং এ কার্যকর হবে না। গভর্ণরদের সম্মেলনে চূড়ান্ত পরিকল্পনা পেশ করা হয় এবং তা অনুমোদিত হয়। দুসরা মে লর্ড ইস্মে এবং জর্জ এবেল হোয়াইট হলের অনুমোদনের জন্য

পরিকল্পনাটি নিয়ে লন্ডন রওয়ানা হন। ভাইসরয় আশা করছিলেন যে ১০ই মের ভেতরে অনুমোদন পেয়ে যাবেন এবং ১৭ই মে দলীয় নেতাদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য একত্রে মিলিত হওয়ার আবেদন জানাবেন।

অতঃপর মাউন্টব্যাটেন স্যার এরিক মিভিল ও মেননসহ শিমলা গমন করেন। এখানে মেনন ভাইসরয়ের সাথে নিরিবিলি কথা বলার সুযোগ পান এবং লন্ডনে প্রেরিত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, এ কার্যকর হবেনা। মেননের সকল যুক্তি শুনার পূর্বে হঠাৎ নেহরু এবং কৃষ্ণ মেনন ভাইসরয়ের সাথে থাকার জন্য ৮ই মে শিমলা পৌঁছেন। ভাইসরয় মেননকে নেহরুর সাথে কথা বলতে বলেন। ৯ই মে মেনন নেহরুকে বলেন, ডমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে ক্ষমতা দুটি ভারতের কাছে হস্তান্তর করা হবে—প্রদেশগুলো বা তাদের কনফেডারেশনের কাছে নয়। ১০ই মে ভাইসরয় নেহরু, মেনন ও স্যার এরিক মিভিলকে নিয়ে পরিকল্পনাটির উপর আলোচনা করেন যা কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ভারত সরকারের রেকর্ডের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়।

ঐদিনই লন্ডন থেকে অনুমোদিত পরিকল্পনা ভাইসরের হস্তগত হয় অবশ্য কিছু সংশোধনীসহ। ডিনারের পর ভাইসরয় নেহরুকে ডেকে পরিকল্পনাটি দেখান যা অনুমোদিত হয়ে এসেছে। পরিকল্পনাটি পড়ার পর নেহেরু ভয়ানক রেগে গিয়ে বলেন, আমি, কংগ্রেস এবং ভারত—কারো কাছেই এ গ্রহণযোগ্য নয়।

মাউন্টব্যাটেন ১১ই মে মেননকে ডেকে নেহরুর প্রতিক্রিয়া তাঁকে জানান এবং বলেন যে এখন কি করা যায়। মেনন বলেন, ৯ই এবং ১০ই মে আমার যে পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল তা গ্রহণ করা উচিত। অনুমোদিত পরিকল্পনা কার্যকর করার ফলে দেশ বহু ইউনিটে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং আমার পরিকল্পনা ভারতের অত্যাবশ্যক ঐক্য বজায় রাখবে। আর যেসব অঞ্চল ভারতের অংশ হিসাবে থাকতে ইচ্ছুক নয় তাদেরকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে।

তড়িঘড়ি স্টাফ মিটিং আহবান করা হয় এবং নেহরুকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। ভাইসরয় নেহরুকে জিজ্ঞাস করেন যে মেননের পরিকল্পনা তিনি অনুমোদন করেন কিনা। তা দেখার পর নেহরু অনুমোদন করেন।

অতঃপর ভাইসরয় ১৪ই মে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৮ই মে লন্ডন যাত্রা করেন পরিকল্পনাটি অনুমোদনের উদ্দেশ্যে কেবিনেটকে সম্মত করার জন্য। লর্ড ইসমে এবং জর্জ এবেল মেননের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। ভাইসরয় জোর দিয়ে বলেন, বৃটিশ সরকার এ পরিকল্পনা অনুমোদন না করলে আমি পদত্যাগ করব। কেবিনেট পরিকল্পনাটির একটি 'কমা' পর্যন্ত পরিবর্তন না করে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে অনুমোদন করেন। ভাইসরয় বিজয়ীর বেশে ৩১ মে তাঁর দলসহ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

এখন এ কথা দিবালোকের মতো সত্য যে, যে পরিকল্পনাটি ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ত্বরান্বিত করে এশিয়া ও পৃথিবীর মানচিত্রে একটি পরিবর্তন সূচিত করতে যাচ্ছে, তা তৈরী হলো ভাইসরয়ের একজন কংগ্রেসভক্ত হিন্দু উপদেষ্টার দ্বারা এবং নেহরু ও কৃষ্ণ মেননের সহযোগিতায়। দেশ ও দেশের কয়েক কোটি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের এ পরিকল্পনা নিয়ে ভাইসরয় একমাস যাবত তাঁর মুষ্টিমেয় প্রিয়জন নিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন, কিন্তু তার কোন এক পর্যায়ে একটি বারের জন্যও জিন্নাহকে ডাকা হলোনা। এর দ্বারা মাউন্টব্যাটেন তথা বৃটিশ সরকারের অতি সংকীর্ণ ও চরম মুসলিম বিদ্বেষী মানসিকতাই পরিস্ফুট হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় তা চিরদিন অংকিত থাকবে।

একটি প্রশ্ন যা মনকে আলোড়িত করে

ভারত বিভাগের পরিকল্পনা বৃটিশ সরকার কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। তেসরা জুন তা সরকারীভাবে ঘোষণা করা হবে। পরিকল্পনাটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পূর্বেই তার প্রতি নেহরু তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এখন প্রশ্ন এই যে এটা কি করে সম্ভব হলো? কংগ্রেস, হিন্দুভারত ও তার প্রধান মুখপাত্র গান্ধী, নেহরু ও প্যাটেল কিভাবে ভারতমাতার অংগচ্ছেদে রাজী হলেন? তাঁরা কি অখন্ড ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার বহুদিনের সোনালি স্বপ্ন পরিহার করলেন?

জেনারেল টুকার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রতিহিংসা পরায়ণ মনোভাবের উপর আলোকপাত করে বলেন—

অবশেষে তারা বল্লেন, আচ্ছা, মুসলিম লীগ যদি পাকিস্তান পেতে চায়, তা ঠিক আছে পেতে দাও। আমরা তাদের অঞ্চলের একটি ইঞ্চি কেটে কেটে নিয়ে নেব যাতে মনে হবে যে আর তা টিকে থাকবে না এবং যতোটুক থাকবে তা আর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চালানো যাবে না। (Sir Francis Tuker : While Memory Serves, London, Cassell, 1950, p. 257; Choudhury Mohammad Ali : The Emergence of Pakistan, p. 123)।

প্যাটেল ১৯৪৯ সালে ভারতের গণপরিষদে যে ভাষণ দেন, তা টুকারের উপরোক্ত মন্তব্যের যথার্থতাই ব্যক্ত করে। প্যাটেল তাঁর ভাষণে বলেন, আমি সর্বশেষ উপায় হিসাবে দেশবিভাগে সম্মত হই, যখন আমরা সব হারিয়ে ফেলেছিলাম। মিঃ জিন্নাহ কাটছাঁট করা পাকিস্তান চাননি কখনো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই তাঁকে গিলতে হলো। (Quoted in Kewnl L. Panjabi, The Indemiable Sardar, Bombay, Bharatiya Vidya Bhaban, 1962, p. 124; Choudhury Mohammad Ali- Ibid, p. 123)।

কংগ্রেসের দেশবিভাগ মেনে নেয়াটা ছিল একটা কৌশলগত পদক্ষেপ। কিন্তু লক্ষ্যস্থল অপরিবর্তিত ছিল: এ লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে প্রয়োজন—

১। হিন্দুস্থান বা ইন্ডিয়ান ইউনিয়নকে ভারতে বৃটিশ সরকারের উত্তরাধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। পাকিস্তানকে মনে করা হবে যে কিছু অঞ্চলসহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

২। পাকিস্তানের সাথে যেসব এলাকা সংশ্লিষ্ট করা হবে তা হবে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং তা পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের বাইরে থাকবে। ফলে পাকিস্তানকে কৌশলগতভাবে পরিবেষ্টিত করে রাখা হবে।

৩। সময়, উপায় উপাদান, সামরিক-বেসামরিক জনশক্তি ও মাল মশলা থেকে পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে যাতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে না পারে।

৪। পাকিস্তান যাতে টিকে থাকতে না পারে তার জন্যে যা কিছু করা দরকার তা করা হবে। (কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নিশ্চিত ছিলেন যে পাকিস্তান বেশী দিন টিকে থাকতে পারবেনা। এজন্যে তাঁদের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের অর্থনীতি ধ্বংস করার চেষ্টা করা)।

এসব হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে হিন্দুভারতের প্রয়োজন ছিল বৃটিশের সাহায্য যারা গোটা বেসামরিক প্রশাসন ও সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতো। বিদায়ের প্রাকালে মাউন্টব্যাটেন-র‍্যাডক্লিফ সহ গোটা প্রশাসন হিন্দুভারতের স্বার্থে কাজ করেছে যা পরে উল্লেখ করা হবে।

— (Choudhury Mohammad Ali : The Emergence of Pakistan, pp. 123-24)।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া

ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। বাংলার এবং পাঞ্জাবের প্রাদেশিক আইনসভাকে নির্দেশ দেয়া হয় যেন তারা প্রত্যেকে দুই দুই ভাগে মিলিত হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোকে নিয়ে এক ভাগ এবং অবশিষ্ট আর এক ভাগ। প্রত্যেক আইনসভার দুটি অংশের সদস্যগণ পৃথক পৃথকভাবে বসবেন এবং তাঁদেরকে এ অধিকার দেয়া হবে যে, তাঁর প্রদেশের বিভাগ চান কি চান না। যে কোন অংশের সরল সংখ্যাগুরু (Simple majority) যদি বিভাগের সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে বিভাগ কার্যকর হবে। বিভাগের সিদ্ধান্তের পর আইনসভার প্রত্যেক অংশ যে এলাকার প্রতিনিধিত্ব করে তাদের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেবে যে তারা বর্তমান গণপরিষদে যোগদান করবে, না নতুন গণপরিষদে। এ সিদ্ধান্ত হওয়ার পর গভর্ণর জেনারেল একটি 'বাউন্ডারী কমিশন' নিয়োগ করবেন পাঞ্জাবের দু'অংশের সীমানা চিহ্নিত করার জন্য। তা করা হবে মুসলিম ও অমুসলিমদের একত্রে লাগানো (Contiguous) সংখ্যাগুরু এলাকা নির্ণয়ের ভিত্তিতে। কমিশনকে অন্যান্য কারণ বিবেচনারও পরামর্শ দেয়া হয়। অনুরূপ নির্দেশ বেঙ্গল বাউন্ডারী কমিশনকেও দেয়া হয়।

সিন্ধু আইনসভার ইউরোপিয়ান সদস্যগণ ব্যতীত অন্যান্যগণ একত্রে বসে সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁরা বর্তমান গণপরিষদে—না নতুন পরিষদে যোগদান করবেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোট গ্রহণ করা হবে যে, সেদেশের ভোটারগণ কোন্ গণপরিষদে যোগদান করবে।

এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ বেলুচিস্তানকেও দেয়া হবে। বাংলা প্রদেশ বিভাগের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আসামের সিলেট জেলায় গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এর ফলে সিদ্ধান্ত হবে যে তারা আসামের অংশ হিসাবে সিলেটকে পেতে চায়, না পূর্ব বাংলার সাথে মিলিত হতে চায়। নতুন প্রদেশের সাথে মিলিত হতে চাইলে 'বাউন্ডারী কমিশন' সীমানা চিহ্নিত করবে।

পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে নিম্নলিখিত ভিত্তিতে গণপরিষদের নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে :

প্রদেশ	সাধারণ আসন	মুসলিম	শিখ	মোট
সিলেট জেলা	১	২	০	৩
পশ্চিম বংগ	১৫	৪	০	১৯
পূর্ব বংগ	১২	২৯	০	৪১
পশ্চিম পাঞ্জাব	৩	১২	২	১৭
পূর্ব পাঞ্জাব	৬	৪	২	১২

বৃটিশ সরকার জুন ১৯৪৮ এর পূর্বেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক বিধায় পার্লামেন্টের চলতি অধিবেশনেই আইন পাশ করা হবে যাতে এ বছরেই 'ডমিনিয়ন স্টেটাস'-এর ভিত্তিতে একটি বা দুটি কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়।

ভাইসরয় দুস্‌রা জুন সাত নেতার এক আলোচনা সভা আহবান করেন। তাঁরা হলেন নেহরু, প্যাটেল, কৃপালনী, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, আবদুর রব নিশ্‌তার এবং বলদেব সিং। পরিকল্পনাটি তাঁদের কাছে পেশ করা হয় এবং তা অনুমোদিত হয়। মাউন্টব্যাটেন গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে একথা ব'লে তাঁকে সম্মত করার চেষ্টা করেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিকল্পনাটি অতি উত্তম। যদিও গান্ধী পরিকল্পনাটি বৃটেনে প্রেরণের পূর্বেই সমর্থন করেন, এখন তিনিবিরোধিতাকরছেন— শুধু পৃথিবী এবং লীগকে ধোকা দেয়ার জন্যে।

তেস্‌রা জুন পরিকল্পনাটি সারা দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করা হয়। ভাইসরয় ৪ঠা জুন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে প্রতিটি পর্যায়ে ও মুহূর্তে তিনি নেতৃবৃন্দের হাত ধরাধরি করে কাজ করেছেন। সেজন্য পরিকল্পনাটি তাঁদের ক্ষোভ অথবা বিস্ময়ের কারণ হয়নি।

বিশ্ববাসীকে ধোকা দেয়ার জন্য এমন নিরেট মিথ্যা কথা বলতে তাঁর মতো দায়িত্বশীলের বিবেকে বাধেনি। পরিকল্পনাটি তাঁর ষ্টাফ সদস্যবৃন্দ, পরিকল্পনা প্রণেতা ভিপি মেনন এবং নেহরু ব্যতীত আর কেউ ঘূণাক্ষরেও জানতেন না। লীগের কাছেও তা গোপন রাখা হয়েছিল।

যাহোক উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে, ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরীক্ষামূলক তারিখ নির্ধারিত হয়।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৪ই জুন মিলিত হয় এবং পরিকল্পনা মেনে নেয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেই সাথে ভারত বিভাগ সম্পর্কে জোর দিয়ে একথা বলে যে, ভূগোল, পর্বতমালা ও সমুদ্র ভারতের যে আকার আকৃতি নির্মাণ করে দিয়েছে, যেমনটি সে আছে, কোন মানবীয় সংস্থা তা পরিবর্তন করতে পারেনা এবং তার চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ণয়ের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারেনা। কমিটি বিশ্বাস করে যে যখন বর্তমান ভাবাবেগ প্রশমিত হবে, তখন ভারতের সমস্যাসমূহ তার যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতেই বিবেচিত হবে এবং দ্বিজাতিত্বের ভ্রান্ত মতবাদ কলংকিত ও পরিত্যক্ত হবে। আবুল কালাম আজাদ বলেন, আমি নিশ্চিত যে বিভাগটি হবে ক্ষণস্থায়ী। হিন্দু মহাসভা বলে, ভারত এক ও অবিভাজ্য এবং যতোক্ষণ না বিচ্ছিন্ন এলাকাসমূহ ভারত ইউনিয়নের সাথে সংযুক্ত করা হবে, ততোক্ষণ কোন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

ভবিষ্যতে ভারত এক ও অখন্ড হবে এ আশা বিভিন্ন হিন্দু নেতা, গ্রন্থকার এবং পত্রপত্রিকা পোষণ করতেন এবং বিভাগের পূর্বে, বিভাগের সময়ে এবং পরে সে আশা ব্যক্ত করেছেন। ১৫ই আগষ্ট গান্ধী বলেন, আমি নিশ্চিত যে এমন এক সময় আসবে যখন এ বিভাগ পরিত্যক্ত হবে। কংগ্রেস মুখপত্র 'দি হিন্দুস্তান টাইমস'ও তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উক্তরূপ আশা ব্যক্ত করে। বিভাগ পরিকল্পনা প্রণেতা মেনন স্বয়ং বলেন, আগষ্ট ১৯৪৭ এর উদ্দেশ্য এ ছিলনা যে, দেড় শতাধিক বছর যাবত যে বন্ধনে ভারত বাঁধা আছে তা ছিন্ন করা হবে। হিন্দুদের মধ্যে এ এক সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে পাকিস্তান বেশী দিন টিকে থাকবেনা এবং কংগ্রেসের অধীনে ভারত পুনরায় একটি অখন্ড ভারতে পরিণত হবে— (Economist, 17 May 1947; Sunday Times 1 June 1947; Manchester Guardian 15 Aug. 1947, Round Table Sept. 1947, p. 370; Guy Wint : The British in Asia- p. 179; I.H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, pp. 195-96)।

এসব বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়া থেকে এ কথাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু ভারত মনে প্রাণে পাকিস্তানের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেনি। শুধু তাই নয়, ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ থেকে এ কথা লেখার সময় পর্যন্ত (অক্টোবর ১৯৯৩) হিন্দুভারত

সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান নামের সমগ্র ভূখণ্ড গ্রাস করে অখণ্ড ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। ১৯৪৭-পূর্ব ভারতের ভৌগলিক অবস্থা পুনরুদ্ধার করার কথা এখন বিভিন্ন সেমিনার জনসভায় প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে ভারতের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অত্যন্ত জোরদার করা হয়েছে।

বড়োলাটগিরি নিয়ে ক্যানভাসিং ও বিতর্ক

ভারতের এ উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ও ভাইসরয় কুঠির প্রত্যেকেই এ ধারণা পোষণ করতেন যে দুটি নতুন ডমিনিয়নের গভর্নর জেনারেল একই ব্যক্তি হবেন এবং তিনি মাউন্টব্যাটেন।

কয়েকদিন পূর্বে জিন্নাহ বলেছিলেন, দুটি ডমিনিয়নের গভর্ণর জেনারেলের উপরে একজন সুপার গভর্ণর জেনারেল হওয়া উচিত। এ ধারণা সম্ভবত এ জন্যে করা হয়েছিল যে বিভাগ সম্পর্কিত প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগীসহ সহজে সম্পন্ন করা হবে। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন এর বিরোধিতা করেন এবং হোয়াইট হল মাউন্টব্যাটেনকে সমর্থন করে।

নেহরু যখন মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হওয়ার প্রস্তাব দেন তখন তিনি নেহরু ও প্যাটেলকে বলেন যে তিনি অনুরূপ প্রস্তাবের আশা মুসলিম লীগ থেকেও করেন।

মাউন্টব্যাটেন বহু চেষ্টা তদবির করেও জিন্নাহকে সম্মত করাতে পারলেন না। দুসরা জুলাই জিন্নাহ তাঁকে জানিয়ে দেন যে তিনি স্বয়ং পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন। তারপরও মাউন্টব্যাটেন আশা ত্যাগ করেন নি। তিনি ভূপালের নবাবকে দিয়েও চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। মাউন্টব্যাটেন এতে তাঁর আত্মসম্মানে বিরাট আঘাত পান। তবে এ কথা সত্য যে মাউন্টব্যাটেনকে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল করা হলে তিনি হতেন পাকিস্তানের ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল। জিন্নাহ দেশকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। (I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, pp. 296-300)।

জুন ৩ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বেঙ্গল আইনসভার অধিবেশন ২০শে জুলাই অনুষ্ঠিত হয় এবং ১২৬-৯০ ভোটে নতুন গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর অমুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকার সদস্যগণ ৫৮-২১ ভোটে প্রদেশ বিভাগের এবং বর্তমান গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেন। পূর্ব বাংলা মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকার সদস্যগণ ১০৬-৩৫ ভোটে প্রদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে এবং সেই সাথে নতুন গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেন। অতঃপর সিলেটকে পূর্ব বাংলা প্রদেশের সাথে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করেন। পাঞ্জাব আইনসভা ৯১-২৭ ভোটে নতুন গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করে। অতঃপর প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকার সদস্যগণ ৬৯-২৭ ভোটে প্রদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে রায় দান করেন। পক্ষান্তরে হিন্দু সংখ্যাগুরু এলাকার সদস্যগণ ৫০-২২ ভোটে বিভাগের পক্ষে এবং ভারতীয় গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে রায় দান করেন।

সিন্ধু আইনসভা ২৬শে জুন মিলিত হয় এবং ৩০-২০ ভোটে নতুন গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করে। বেলুচিস্তানে শাহী জির্গা এবং কোয়েটা পৌরসভার বেসরকারী সদস্যগণ মিলিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেন।

অপরদিকে জুলাইয়ের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত সিলেটের গণভোটে বিপুল সংখ্যাগুরু ভোটার আসাম থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব বাংলায় যোগদানের সপক্ষে ভোটদান করেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গণভোটের শর্ত ছিল এই যে, ভোটারগণ ভারতীয় গণপরিষদে যোগদানের অথবা নতুন গণপরিষদে যোগদানের সপক্ষে ভোট দেবেন। আবদুল গাফফার খান দাবী করেন যে, ভোটারদের স্বাধীন পাখতুনিস্তানের সপক্ষে ভোটদানের সুযোগ দেয়া হোক। গান্ধী ও নেহরু আবদুল গাফ্ফার খানের দাবী সমর্থন করেন। ভাইসরয় এই বলে দাবীটি নাকচ করেন যে ৩ জুন পরিকল্পনায় যে কার্যবিধি সন্নিবেশিত করা হয়েছে তা উভয় দলের সম্মতি ব্যতিরেকে পরিবর্তন করা যাবেনা। জিন্নাহ এ পরিবর্তন মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। গাফ্ফার খান তাঁর অনুসারীদের ভোটদানে বিরত থাকার নির্দেশ দেন।

তার পরেও ২৮৯, ২৪৪ ভোট নতুন গণপরিষদের পক্ষে এবং মাত্র ২৮৭৪ ভোট ভারতীয় গণপরিষদের পক্ষে প্রদত্ত হয়।

প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী ভারত স্বাধীনতা বিল হাউস্ অব কমন্সে ৪ঠা জুলাই পেশ করেন। ১৫ই জুলাই হাউস অব কমন্সে এবং ১৬ই জুলাই হাউস অব লর্ডসে তা গৃহীত হয়। বিলটি ১৮ই জুলাই রাজকীয় সম্মতি লাভ করে। অতঃপর ভারত ও পাকিস্তানের জন্য ২০শে জুলাই পৃথক পৃথক দুটি প্রভিশনাল গভর্ণমেন্ট কায়েম হয়।

বিগত সাত বছরের সংগ্রামের ফসল হিসাবে পাকিস্তান নামে একটি নতুন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। এ ধরনের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দুনিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম।

পাকিস্তান কায়েম হলো বটে, কিন্তু কংগ্রেস, হিন্দুভারত ও বৃটিশ সরকার এর চরম বিরোধিতা করে যখন ব্যর্থ হয়, তখন হঠাৎ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাটছাঁট করা (Truncated Pakistan) এক পাকিস্তানে সম্মত হয়। ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনাটি তৈরী হয় একজন কংগ্রেসপন্থী হিন্দু অফিসার কর্তৃক। এ বিষয়ে জিন্নাহকে একেবারে অন্ধকারে রাখা হয়। ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে হস্তান্তরের মাত্র আড়াই মাস পূর্বে পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয় যেন মুসলিম লীগ কোন চিন্তাভাবনা করার কোন অবকাশ না পায়। এটা ঠিক যেন ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ শত্রু শিবির আক্রমণ করার মতো। কাটছাঁট করা পাকিস্তানকে আরও সংকুচিত করে বাউন্ডারী কমিশন। পাকিস্তানের ন্যায্য প্রাপ্য অনেক মুসলিম মেজরিটি এলাকা বলপূর্বক ভারতভুক্ত করা হয়। উপরন্তু বিভাগের পর পাকিস্তানের ন্যায্য প্রাপ্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকেও তাকে ষোল আনা বঞ্চিত করা হয়। সম্ভবতঃ এটা ছিল পাকিস্তান দাবী করার অপরাধের আর্থিক দন্ড। কংগ্রেস ও বৃটিশের ষড়যন্ত্রে এসব এজন্য করা হয়েছিল যাতে পাকিস্তান কিছু সময়ের জন্যও টিকে থাকতে না পারে।

তারপর পাকিস্তান দাবীর মূল কারণ ছিল এই যে হিন্দু সংখ্যাগুরুর কাছে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর করলে মুসলমানদের জানমাল ইজ্জৎ আবরুই বিপন্ন হবে না, তাদের জাতিসত্তাকেই নির্মূল করা হবে। চল্লিশের পূর্বে হিন্দু সংখ্যাগুরু

প্রদেশগুলোতে আড়াই বছরের কংগ্রেসী শাসন তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

কিন্তু ভারত বিভাগের পরও ভারতে মুসলিম নিধনযজ্ঞ বন্ধ করা হয়নি। খুনের দরিয়া সাঁতার দিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলিম নরনারী, শিশু সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়।

পাকিস্তান সরকারের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী জনাব আলতাফ গওহর বলেন—

দিল্লীতে হত্যাকান্ড শুরু হওয়ার পূর্বেই আমি করাচী পৌঁছে যাই। ···সীমান্ত অতিক্রম করে আগমনকারী মজলুম আশ্রয় প্রার্থীদের সংখ্যা বেড়েই চলছিল এবং ব্যাপক গণহত্যার লোমহর্ষক কাহিনী প্রত্যেককে অধিকতর জাতীয় খেদমতে বাধ্য করছিল। (পাকিস্তানের একটি দৈনিক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ)।

আলতাফ গওহর ভারতের রাজধানী স্বয়ং দিল্লীতে হত্যাকান্ডের ইংগিত করেছেন। দিল্লীর বিভিন্ন স্থানে লোমহর্ষক হত্যাকান্ড বন্ধের উদ্দেশ্যে মিঃ গান্ধী অনশন ব্রত পালন করতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবন দিয়েও তা বন্ধ করতে পারেন নি।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন ঃ

গান্ধীজি তাঁর অনশন ভাঙার শর্তগুলো বলতে থাকেন। তা হলো ঃ

১। হিন্দু ও শিখদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের আক্রমণ করা এক্ষুণি বন্ধ করতে হবে। তাদেরকে এ নিশ্চয়তা দিতে হবে যে তারা ভাইয়ের মতো একত্রে বাস করতে পারবে।

২। হিন্দু ও শিখকে এ নিশ্চয়তা দানে সকল চেষ্টা করতে হবে যেন কোন একজন মুসলমানও জানমালের নিরাপত্তার অভাবে ভারত থেকে চলে না যায়।

৩। চলন্ত রেলগাড়িতে মুসলমানদের উপর যে হামলা করা হচ্ছে তা বন্ধ করতে হবে এবং যে সকল হিন্দু ও শিখ হামলা চালাচ্ছে তাদেরকে অচিরেই বিরত রাখতে হবে।

৪। যেসব মুসলমান নিজামুদ্দীন আউলিয়া, খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী এবং নাসিরুদ্দীন চেরাগ দেহলীর দরগার আশে পাশে বসবাস করতো তাঁরা বাতিঘর ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁদেরকে তাদের বস্তীসমূহে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসিত করতে হবে।

৫। কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর দরগাহ ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। অবশ্যি সরকার এসব মেরামত করে দিতে পারে। কিন্তু হিন্দু এবং শিখদেরকেই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এ কাজ করতে হবে।

৬। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো এই যে মনের পরিবর্তন দরকার। শর্তগুলো পূরণ অপেক্ষা এর গুরুত্ব অধিক। হিন্দু ও শিখ নেতাদেরকে এ নিশ্চয়তা দিতে হবে যাতে এ কারণে আর অনশন করতে না হয়। অতঃপর গান্ধীজি বলেন— এটা আমার শেষ অনশন হোক। (Abul Kalam Azad : India Wins Freedom, p. 238)।

মাওলানা আজাদ বলেন ঃ

দেশ বিভাগের পর পরিস্থিতি চরমে পৌছে। এক শ্রেণীর হিন্দু হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবা সংঘের নেতৃত্বে প্রকাশ্যে বলা শুরু করে যে গান্ধীজি হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করছেন। ··· এ বিষয়ে প্রচার পত্রও বিতরণ করা হয়। একটি প্রচার পত্রে বলা হয়, গান্ধীজি যদি তাঁর নীতি পরিবর্তন না করেন, তাহলে তাঁকে হত্যা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। (Abul Kalam Azad : India Wins Freedom, pp. 240-41)।

অবশেষে গান্ধীকে ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ জীবন দিতে হলো। মাওলানা আজাদ বলেন, আমি পুনরায় বিড়লা হাউসে গেলাম এবং ফটক বন্ধ দেখে অবাক হলাম। হাজার হাজার লোক ভিড় করে আছে দেখলাম। আমি বুঝলাম ব্যাপার কি। গাড়ি থেকে নেমে তাঁর ঘরের দরজা পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। ঘরের দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ দেখলাম। একজন কাঁচের জানালা দিয়ে আমাকে দেখে ভেতরে নিয়ে গেলেন। একজন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বল্লেন, গান্ধীজি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। দেখলাম তিনি মেঝের উপর শায়িত। চেহারা বিবর্ণ, চক্ষু বন্ধ তাঁর দুই পৌত্র তাঁর পা ধরে কাঁদছে। আমি স্বপ্নের মতো শুনলাম গান্ধীজি মৃত। (Abul Kalam Azad : India Wins Freedom, pp. 141-42)।

দেশ বিভাগের পর কয়েক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে লক্ষাধিক মুসলিম স্বাধীন ভারতে নিহত, তাদের বহু মসজিদ ও ধর্মীয় স্থান ধ্বংস করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে কাউকে অনশন করতে দেখা যায়নি। তবে কেউ এ সাহস করলে তাঁকে গান্ধীজির ভাগ্যই বরণ করতে হতো। স্বাধীন ভারতে মুসলমানদের সপক্ষে কথা বলাকে বিরাট অপরাধ মনে করা হয়। হত্যাকান্ডে শতসহস্র মুসলমান নরনারী ও শিশু নিহত হয়, তাদের দোকানপাট, বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা হয়। কিন্তু হত্যাকারী খুঁজে বের করে তাদের শাস্তির কোন ব্যবস্থা সরকার করেন না, বা করতে পারেন না। ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার পর অপরাধীদের শাস্তি দেয়া ত দূরের কথা, তাদের হাতেই ভারত সরকারকে জিম্মী হয়ে থাকতে হয়েছে। এসব যে হবে তা নিশ্চিত বুঝতে পেরেই মুসলমানদের পৃথক ও স্বাধীন আবাসভূমির দাবী করতে হয়। বস্তুতঃ হিন্দুজাতি ও নেতৃবৃন্দের চরম মুসলিম বিদ্বেষই পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

উপসংহার

এ ইতিহাসের শেষ ভাগে সংক্ষেপে পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাসও লিখতে হয়েছে। কারণ এ আন্দোলনের সাথে বাংলার মুসলমান ওতপ্রোত সম্পৃক্ত ছিলেন। তদুপরি ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব তথা পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করার মর্যাদা লাভ করেন অবিভক্ত বাংলার মুসলিম দরদী কৃতি সন্তান ও বাংলার প্রধানমন্ত্রী মওলভী আবুল কাসেম ফজলুল হক (শেরে বাংলা)। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ থাকলেও এ আন্দোলনে বাংলার মুসলমানদের অবদান ছিল সর্বাধিক।

উনিশ শ' পাঁচ সালের ২০শে জুলাই বংগবিভাগের ঘোষণা এবং ১৬ই অক্টোবর থেকে তা কার্যকর করণ বাংলা এবং সমগ্র ভারতের হিন্দুজাতিকে অতিশয় ক্ষিপ্ত করে তোলে এবং বংগভংগ রদের তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে এক নবচেতনার জোয়ার সৃষ্টি করে এবং তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র মুসলিম জাতিসত্তার প্রেরণা জাগ্রত করে। এর ফলে ১৯০৬ সালে ঢাকায় উপমহাদেশের মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এ সালের ১লা অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ৩৬ জন মুসলমানের একটি প্রতিনিধি দল শিমলায় বড়োলাটের সাথে সাক্ষাৎ ক'রে—মুসলমানগণ একটি স্বতন্ত্র জাতি বিধায় তাদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রচলনের দাবী জানালে তা মেনে নেয়া হয়। ১৯০৯ সালে সম্পাদিত মর্লে মিন্টু রিফরমসে পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রতি স্বীকৃতি দান করা হয়। ফলে এ এক সাংবিধানিক ডকুমেন্টে পরিণত হয়।

দেশ বিভাগের পর কোন কোন মহল থেকে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, পাকিস্তান দাবীর পশ্চাতে কি শুধু সাময়িক ভাবাবেগ সক্রিয় ছিল, না এর কারণ ছিল শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। অথবা হিন্দু কংগ্রেসের বৈরিসুলভ আচরণের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুসলমানগণ পাকিস্তান দাবী করেন?

এর কোন একটিও পাকিস্তান আন্দোলনের মূল কারণ ছিলনা। ভাবাবেগ ত অবশ্যই ছিল। এ ভাবাবেগই মানুষকে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে

উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু এ ভাবাবেগ কোন সাময়িক ও অর্থহীন ভাবাবেগ ছিলনা। নিছক ভাবাবেগ এতোবড়ো ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটাতে পারেনা। গান্ধী, অনেক হিন্দুনেতা ও পত্রপত্রিকা এ ধরনের মন্তব্য করেছেন যে মুসলমানদের এ সাময়িক ভাবাবেগ প্রশমিত হলে পুনরায় তারা অখন্ড ভারতভুক্ত হয়ে যাবেন। চার যুগের অধিক কাল অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন পাকিস্তানকামী মুসলমানদের ভাবাবেগ কণামাত্র প্রশমিত হয়নি, তখন একথা সত্য যে তাদের ভাবাবেগ কোন সাময়িক বস্তু ছিলনা। এ ভাবাবেগ সৃষ্টির পেছনে একটা মহৎ উদ্দেশ্য ছিল।

যে মহান উদ্দেশ্যে পাকিস্তান দাবী ও আন্দোলন করা হয়, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মার্চ ১৯৪০ এ অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন :

It is extremely difficult why our Hidnu friends fail to understand the real nature of Islam and Hinduism. They are not religious in strict sense of the word, but are, in fact, different and distinct social orders. It is a dream that the Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality, and this misconception of one Indian nation has gone far beyond the limits, and will lead India to destruction, if we fail to revise our nations in time. The Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs and literature. They neither intermarry nor interdine together, and indeed they belong to two different civilizations, which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their aspect on life and of life are different. It is quite clear that Hindus and Mussalmans derive their aspirations from different sources of history. They have different epics, their heroes are different and they have different episodes. Very often the hero of one is a foe of the other and like wise their victories and defeats overlap. To yoke together two such nations under a singh state, one as a numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and the

final destruction of any fabric that may be built up for the government of such a state —(Ideological Foundations of Pakistan by Dr. Waheed Quraishy, pp. 96-97)।

কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর ভাষণে এ সত্যটিই তুলে ধরেছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান বহু দিক দিয়ে দুটি পৃথক ও স্বতন্ত্র জাতি এবং তাদেরকে একত্রে বেঁধে দিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন অসম্ভব ও অবাস্তব। এ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই ভারত বিভক্ত হয়েছে।

কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ও বিপরীতমুখী জাতিসত্তা—এ তত্ত্ব কি জিন্নাহ বা মুসলমানদের কোন নতুন আবিষ্কার? এর সঠিক জবাবের উপরই এ কথা নির্ভর করবে যে পাকিস্তান কোন্ ভাবাবেগ ও উত্তেজনা বশে অথবা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে দাবী করা হয়েছিল।

ইসলামী জীবনব্যবস্থা

উপরোক্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব পেতে হলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের প্রয়োজন। আল্লাহতায়ালা ও তাঁর নবী–রসূলগণ ইসলামের যে সঠিক ধারণা পেশ করেছেন, তা এই যে, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় শুধুমাত্র কতিপয় আচার অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর নাযিল করা মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ (সা) এর সুন্নাতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পূর্ণাংগ জীবন বিধান।

ধর্ম সম্পর্কে যে ধারণা বর্তমানকালে দুনিয়ায় প্রচলিত সেদিক দিয়ে ইসলাম একটি ধর্ম থেকে অনেক বেশী কিছু। এ নিছক স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে সম্পর্কের নাম নয়। ইসলামের ধর্মীয় ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। ঈমান আকীদাহ থেকে শুরু করে এবাদত এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগের উপর এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি আছে, ইতিহাস ঐতিহ্য আছে, নিজস্ব নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে। আছে আইন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, পারিবারিক ও শিক্ষাব্যবস্থা, আছে নিজস্ব যুদ্ধ ও সন্ধিনীতি এবং বৈদেশিক ব্যবস্থা। একটি বৃক্ষের মূল, শাখাপ্রশাখা, পত্র পল্লব ও ফুলফলের মধ্যে যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক, তেমনি এসব ব্যবস্থাও পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ও ওতপ্রোত জড়িত।

প্রকৃত পক্ষে ইসলাম মানব জাতির জন্যে দুনিয়ায় সার্থক জীবন যাপন করার এক পূর্ণাংগ জীবন বিধান। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে সার্থক জীবনযাপনের পদ্ধতি ইসলাম শিক্ষা দেয়। এ কারণে ইসলামের ধর্মীয় ধারণা অন্যান্য ধর্মের ধারণা থেকে একেবারে পৃথক।

ইসলামের ঐতিহাসিক ধারণা অনুযায়ী এ সত্য দ্বীন (ইসলাম) সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ) এর উপর আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে নাযিল হয়। আর হযরত আদম (আ) ছিলেন প্রথম মানুষ। তাঁর থেকেই মানব বংশ দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন থেকেই এ দ্বীনে হক—ইসলাম দুনিয়ায় প্রচলিত। তাঁর পর যুগে যুগে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে নবী–রসূল আগমন করে দ্বীনে হকের দাওয়াত পেশ করতে থাকেন। সর্বশেষে নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) দ্বারা ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করে।

ইসলামে জাতীয়তার ধারণা

এ দ্বীন ও ব্যবস্থাকে যারা মনেপ্রাণে মেনে নেয় তাদেরকে 'মুমেন' বলা হয়, আর যারা একে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে 'কাফের' বলা হয়। মুমেন ও কাফের উভয়ে কখনো এক হতে পারেনা। প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ) কে দুনিয়ায় পাঠাবার সময় আল্লাহতায়ালা যে নির্দেশ দেন তা এই ঃ

"আমি বল্লাম, তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। তারপর আমার নিকট থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছাবে, যারা আমার সে বিধান মেনে চলবে তাদের জন্যে চিন্তাভাবনার কোন কারণ থাকবেনা। আর যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং আমার বাণী ও আদেশ–নিষেধ প্রত্যাখ্যান করবে তারা হবে নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল (সূরা বাকারাহ ঃ ৩৮–৩৯)।

কুরআন পাকের উপরোক্ত আয়াত থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, হেদায়েতে ইলাহী মানুষকে দুটি দলে বা দুটি জাতিতে বিভক্ত করে দিয়েছে—একটি মুমেন, অন্যটি কাফের। এ বিভক্তি দুনিয়ায় মানব জীবনের প্রথম দিনেই করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক নবী তাঁর যুগে এ বিভক্তি অক্ষুণ্ন রাখেন। হযরত শুয়াইব (আ) এ দুটি দলকে দুটি পৃথক পৃথক মিল্লাত বা জাতি বলে ব্যাখা করেন। যেমনঃ

'তাদের সরদার মাতব্বরগণ যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের গর্বে গর্বিত ছিল তাকে বল্লো, হে শুয়াইব! আমরা তোমাকে ও তোমার প্রতি ঈমানদার লোকদেরকে এ জনপদ থেকে বের করে দেব—অন্যথায় তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতে হবে। শুয়াইব জবাব দিল, আমাদেরকে কি জোর করে ফিরিয়ে আনাহবে—আমরা যদি রাজী নাও হই?

আমরা খোদার প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হবো যদি তোমাদের মিল্লাতে ফিরে আসি যখন আল্লাহ এর থেকে আমাদেরকে মুক্তি দান করেছেন।'

—(সূরা আ'রাফ : ৮৯-৮৯)

এ আয়াত থেকেও এ কথা সুস্পষ্ট যে, হযরত শুয়াইব (আ) এর যুগেও মুসলমানদের মিল্লাত পৃথক ছিল এবং কাফেরদের মিল্লাত পৃথক। এই বিভক্তিকরণ এবং এই পরিভাষা উম্মতে মুহাম্মদীতেও প্রচলিত আছে এবং আজ পর্যন্ত তা ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইসলামে জাতীয়তার ধারণা বিশ্বজনীন। যে কোন দেশ ও জাতির কোন ব্যক্তি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার পর দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করে এবং ইসলামী জাতীয়তার সমান অংশীদার হয়ে যায়। ইসলামে ঈমান আকীদার প্রতি স্বীকৃতিই জাতীয়তা অর্জনের জন্য যথেষ্ট। জাতীয়তা লাভের ব্যাপারে দুনিয়ার অন্যান্য জাতির পন্থাপদ্ধতি থেকে ইসলামের পন্থাপদ্ধতি ভিন্নতর। ইহুদী জাতীয়তা লাভের জন্য ইহুদী আকীদার সাথে ইহুদী বংশোদ্ভূত হওয়া জরুরী। হিন্দু জাতীয়তা লাভের জন্য হিন্দু পূজাঅর্চনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণই যথেষ্ট।

স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থা

ইসলামের সর্বব্যাপী জীবন বিধান ও স্বতন্ত্র জাতীয়তার যুক্তিসংগত দাবী এই যে, এর জন্য একটা স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হতে হবে—যেখানে ইসলামের আদেশ নিষেধগুলো মেনে চলা যাবে। কিন্তু পরাধীনতার জীবনযাপন করতে হলে সেখানে অধিকাংশ হুকুম পালন সম্ভব নয়।

তের বছর মক্কায় মুশরিকদের নিয়ন্ত্রিত সমাজে জীবনযাপন করার পর নবী আকরাম (সা) যখন মদীনার অনুকূল পরিবেশে পৌছেন, তখন সেখানে তিনি

ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্র কায়েম করেন। তিনি ছিলেন এ রাষ্ট্রের পরিচালক। সেখানে তিনি পরিপূর্ণ রূপে ইসলামী বিধান জারী করেন। তারপর আল্লাহতায়ালা নিম্নের আয়াত নাযিল করেন ঃ

'তোমাদের জন্যে দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম।'

দ্বীন তার পরিপূর্ণতা লাভ করলো তখন যখন তার পরিপূর্ণতা, বাস্তবায়ন ও প্রচার প্রসারের জন্য একটা পৃথক আবাসভূমি পাওয়া গেল এবং একটা স্বাধীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো।

'পাকিস্তান' শব্দটি কোন ভৌগলিক অঞ্চল অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, এ ব্যবহৃত হয়েছে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র অর্থে। এই অর্থেই আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রকে 'প্রথম পাকিস্তান' বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন ঃ

আল্লাহতায়ালা কুদরাতের হস্ত অবশেষে রসূল মকবুল (সা) এর ঐতিহাসিক হিজরতের মাধ্যমে মদীনায় এক ধরনের 'পাকিস্তান' কায়েম করে দেয়।

(খুৎবাতে ওসমানী, আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী, পৃঃ ১৪০; তারিখে নযরিয়ায়েপাকিস্তান, অধ্যাপক মুহাম্মদ সালিম, পৃ: ৩১)।

লাহোর প্রস্তাবে যে একটি স্বাধীন আবাসভূমির দাবী করা হয়েছিল তার নাম পাকিস্তান বলা হয়নি। এ নামটি চৌধুরী রহমত আলী পছন্দ করেন। তিনি সর্বপ্রথম ১৯১৫ সালে 'বজমে শিবলী' অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন—উত্তর ভারত 'মুসলিম' এবং একে আমরা 'মুসলিম' রাখব। শুধু তাই নয়। একে আমরা একটি মুসলিম রাষ্ট্র বানাবো। এ আমরা তখনই করতে পারব যখন আমরা এবং আমাদের এ উত্তরাঞ্চল ভারতীয় হওয়া থেকে বিরত থাকব। এ হচ্ছে তার পূর্বশর্ত। যতো শীগগির আমরা ভারতীয়তাবাদ পরিহার করব ততোই ভালো আমাদের এবং ইসলামের জন্য (Choudhury Rahmat Ali : p. 172; I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, pp. 115-116)।

চৌধুরী রহমত আলীও প্রথমে পাকিস্তান নাম ব্যবহার করেননি। তিনি মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রের কথাই বলেছেন।

ইতিহাস আলোচনা করলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল হিজরী ৯৩, রজব মাসে (৭১২ খৃঃ) যখন ইমাদুদ্দীন

মুহাম্মদ বিন কাসিম, সতেরো বছরের সিপাহসালার দেবল বন্দরে (বর্তমান করাচী) অবতরণ করেন, রাজা দাহিরের কারাগার থেকে মজলুম মুসলমান নারীশিশুদের মুক্ত করেন এবং সেখানে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। কায়েদে আজম বলেন, পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয় তখন, যখন প্রথম মুসলমান সিন্ধুর মাটিতে পদার্পণ করেন যা ছিল ভারতে ইসলামের প্রবেশদ্বার।

দেবলের পর নিরন (বর্তমান হায়দরাবাদ) এবং তারপর সেহ্ওয়ান ইসলামী পতাকার কাছে মাথানত করে। ১০ই রমজান রাওর দুর্গ দখল করা হয় এবং যুদ্ধে রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হন। পরে ব্রাহ্মণাবাদ (বর্তমান সংঘর) এবং আলাওয়ার বিজিত হয়। ৯৬ হিজরী সনে মুলতান আত্মসমর্পণ করে এবং উত্তর ভারত স্বেচ্ছায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের বশ্যতা স্বীকারে প্রস্তুত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুহাম্মদ বিন কাসিমকে দামেশ্‌কে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি তাঁর অধীন অঞ্চলগুলোতে সত্যিকার ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। এ ব্যবস্থা হিন্দু এবং বৌদ্ধদেরকে এতোটা মুগ্ধ করে যে, তাদের বিরাট সংখ্যক লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে (Justice Syed Shameem Husain Kadri : Creation of Pakistan, pp. 1-2)।

ইসলামের সহজাত বৈশিষ্ট্য

ইসলামের সহজাত বৈশিষ্ট্য এই যে মুসলমান এক ও লা শারীক আল্লাহ ব্যতীত আর কারো বশ্যতা, প্রভুত্ব কর্তৃত্ব, আইন শাসন মানতে পারেনা। ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান এবং এর মূলনীতি মানব জীবনের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক দিক পরিবেষ্টন করে রাখে। রাষ্ট্র ও ধর্মকে একে অপর থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কালেমায়ে তাইয়েবার মাধ্যমে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রসূলের (সা) নেতৃত্ব মেনে নেয়া হয়েছে।

উপমহাদেশে ইসলামী আইন-শাসন প্রতিষ্ঠা

মুহাম্মদ বিন কাসিম শুধু এ উপমহাদেশে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না। বরঞ্চ তিনি ছিলেন ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রদূত। যে সভ্যতা-সংস্কৃতির বৃক্ষ তিনি রোপণ করেন তা কালক্রমে বর্ধিত ও বিকশিত হতে থাকে এবং সমগ্র ভারত উপমহাদেশে ইসলামী পতাকা উড্ডীয়মান হয়। মুসলমান

বিজয়ীর বেশে ভারতে আগমন করতে থাকেন। তাঁদের সাথে আসেন সৈনিক, কবি, সাহিত্যিক, আধ্যাত্মিক নেতা, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী। এসব শাসকদের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনে অনেকেই ভালো মুসলমান ছিলেন না, এবং অনেক দরবেশ প্রকৃতির লোকও ছিলেন। তবে মুসলিম শাসন আমলে আগাগোড়া দেশে ইসলামী আইন প্রচলিত ছিল।

কিন্তু মুসলিম শাসনের অবসানের পর ইসলামী আইনের স্থলে প্রবর্তিত হলো পাশ্চাত্যের মানব রচিত আইন; ইন্ডিয়ান সিভিল এন্ড্ ক্রিমিনাল কোড্‌স্ অব্ প্রসিডিয়র এবং ইন্ডিয়ান পেনাল কোড্ প্রবর্তন করা হলো। এভাবে মুসলমানগণ শুধু রাজ্যহারাই হলেননা, ইসলামী তথা আল্লাহর আইনের পরিবর্তে তাদের উপর কুফরী আইন চাপিয়ে দেয়া হলো। কিভাবে তাদের জীবন জীবিকার সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হলো, তাদের বহু লাখেরাজ ভূসম্পদ কেড়ে নেয়া হলো, তাদেরকে পথের ভিখারীতে পরিণত করা হলো—এ গ্রন্থে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রেডিও পাকিস্তানের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মাওলানা মওদূদী পাকিস্তানের আদর্শিক পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

যদি আমাদের আলোচনাকে 'পাকিস্তান আন্দোলন' শব্দগুলো এবং পরিভাষা পর্যন্ত সীমিত রেখে কথা বলি, তাহলে এ বিষয়টির প্রতি মোটেই সুবিচার করা হবেনা। কারণ একটা জিনিস হলো পাকিস্তানের শব্দ ও পরিভাষা এবং অন্যটি হলো এমন এক উদ্দেশ্য যা এ উপমহাদেশের মুসলমানদের সামনে সুদীর্ঘ কাল থেকে ছিল এবং মুসলমানগণ অবশেষে তাকে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিল যাতে তারা এ পরিভাষার সাথে একটা দেশও লাভ করার সংগ্রাম করতে পারে। এ লক্ষ্য তখনই ভারতীয় মুসলমানদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যখন এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের পতন ঘটে। তারা তখন অনুভব করেছিল যে, যেহেতু তারা জগত এবং জীবন সম্পর্কে এক বিশেষ দৃষ্টিভংগি পোষণ করে এবং তারা একটা বিশেষ সভ্যতার অনুসারী, সেজন্য নিজেদের জাতীয় সত্তা তারা তখনই অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে, যখন শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে। শাসন ক্ষমতা অমুসলমানদের হাতে চলে গেলে তারা এ দেশে মুসলমানের জীবন যাপন করতে পারবেনা এবং মুসলমান হিসাবে তাদের কোন জীবনই থাকবে না। এ অনুভূতি ভারতে মুসলিম শাসনের পতনের পরই তাদের মধ্যেই সৃষ্টি হতে থাকে। আর এ

অনুভূতি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

কখনো এ অনুভূতি এভাবে আত্মপ্রকাশ করে যে, হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী এবং হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ এক জিহাদী আন্দোলন নিয়ে আবির্ভূত হন। তাঁরা ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের জন্য নিজেদের জীবন অকাতরে বিলিয়ে দেন। এ অনুভূতি আবার কখনো এ রূপ ধারণ করে যে, স্থানে স্থানে দ্বীনী মাদ্রাসা কায়েম করা হয় যাতে মুসলমানগণ তাদের দ্বীন ভুলে গিয়ে ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত খোদাহীন সভ্যতা এবং ধর্মহীন চিন্তাধারা ও মতবাদের প্রবল প্লাবনে ভেসে না যায়।

তারপর দ্বিতীয় পর্যায় এভাবে শুরু হয় যে, ইংরেজ শাসন এখানে পাকাপোক্ত হয়ে পড়ে এবং এদেশে ক্রমশঃ ঐ ধরনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কাজ তারা শুরু করে, যে ধরনে তাদের আপন দেশে শাসন ব্যবস্থা চলছিল। তাদের জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের ধারণা ছিল এই যে, ইংলন্ডের সকল অধিবাসী এক জাতি এবং তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার গঠনের অধিকার স্বীকৃত। এ গণতান্ত্রিক মূলনীতি ইংরেজরা ভারতেও চালু করতে চায়। তাদের মতে ভারতের সকল অধিবাসীও এক জাতি এবং তাদের মধ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসননীতি চলতে পারে। এটাই মুসলমানদের মধ্যে এ অনুভূতির সঞ্চার করে যে, যদি এখানে সংখ্যাগুরু দলের সরকার কায়েম হয় তাহলে এখানে মুসলমানদেরকে চিরদিন সংখ্যালঘু হয়ে থাকতে হবে এবং তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জাতীয় সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কারণ সে সরকারের অধীনে মুসলমানগণ তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন আইন রচনা করতে পারবেনা। সরকারের ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে তাদের কোন অধিকার থাকবেনা। অন্য কথায়, মুসলমানগণ তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবন দর্শন বাস্তবায়িত করতে পারবেনা। বরঞ্চ একটা অনৈসলামী সভ্যতা ও জীবনদর্শন তাদের উপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেয়া হবে।

মাওলানা বলেন, এ ছিল সেই অবস্থা যা ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক প্রশ্ন বা চ্যালেঞ্জের রূপ নিয়ে মুসলমানদের সামনে দেখা দেয়। এর জবাব পেতে মুসলমানদের সুদীর্ঘ সময় কেটে যায়। সুদীর্ঘকাল ধরে তারা এ কঠিন প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করতে থাকে যে, এমন এক শাসন ব্যবস্থায় যেখানে ভারতের অধিবাসীদেরকে এক জাতি ধরে নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার গঠন

পদ্ধতি চালু করা হবে, সেখানে সংখ্যালঘু হিসাবে মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার কি রূপ হতে পারে। এ নিরাপত্তা লাভের ধরন এবং তা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যায়ন করা হয়। এক পর্যায়ে এ উদ্দেশ্যে পৃথক নির্বাচন প্রথার দাবী করা হয় (শিমলা প্রতিনিধি, ১৯০৬)। তারপর তার ভিত্তিতে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা হয় (লাখ্নো চুক্তি, ১৯১৬)। পরবর্তীকালেও বিভিন্ন প্রস্তাবাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়। ক্রমশঃ মুসলমানগণ বুঝতে পারে যে, এ ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন আইনগত নিরাপত্তা তাদের কোনই কাজে আসবে না। এ কথা তারা স্পষ্ট অনুভব করলো তখন, যখন ১৯৩৭ সালে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসের শাসন কায়েম হয়। সে সময়ে মুসলমানদের এ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় যে, এ উপমহাদেশে সংখ্যাগুরু দলের সরকার হওয়া এবং তাদের অধীনে মুসলমানদের সংখ্যালঘু হিসাবে বসবাস করার অর্থ এই যে, ক্রমশঃ তাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেয়া। এ অভিজ্ঞতা লাভের পর মুসলমানগণ এভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেন যে, এখন পর্যন্ত এ সমস্যাটির যেদিক দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা চলে আসছিল তা অর্থহীন ও অবাস্তব।

মাওলানা বলেন, সে সময়ে মুসলমানদেরকে বার বার এ নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছিল যে ভারতের মুসলিম-অমুসলিম মিলে এক জাতি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা কোন দিন এক জাতি ছিল না এবং হতেও পারেনা। মুসলমান যখন থেকে এ দেশে এসে বসবাস করতে থাকে তখন থেকে তাঁরা অমুসলিমদের সাথে কখনো এক জাতি হিসাবে বসবাস করেনি। ··· এক জাতি হলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এ ছুতমার্গ ব্যাধি কোথা থেকে এলো? তাদের জাতীয় নায়ক (National heroes) আলাদা আলাদা কেন? তাদের অনুপ্রেরণা ও আবেগ অনুভূতির উৎস বিভিন্ন কেন? এক জাতি হলে হিন্দুদের থেকে পৃথক জাতি হয়ে তারা কি করে বাস করতে পারতো? অতএব এ এক পরম সত্য যে, তারা এক জাতি কখনো ছিল না এবং কোন সময়ের জন্য হতেও পারেনা। এখন একটা অবাস্তব কল্পনা (Hypothesis) বলপূর্বক মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলে। এ যে কার্যকর ও ফলদায়ক হতে পারেনা তা কংগ্রেসের কয়েকটি প্রদেশে সরকার কায়েম হওয়ার পর (১৯৩৭-৩৯) দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে গেল। যারা হিন্দু মুসলমান মিলে এক জাতির ঘোষণা দিচ্ছিল তারা স্বয়ং

তাদের কার্যকলাপ দ্বারা একথা প্রমাণ করলো যে, হিন্দু মুসলিম এক জাতি নয়। বরঞ্চ এ ছিল একটা বিরাট রাজনৈতিক প্রতারণা যার দ্বারা তারা মুসলমানদেরকে এক গোলাম জাতিতে পরিণত করে রাখতে চেয়েছিল।

মাওলানা বলেন :

এ ছিল এমন এক সময় যখন আমি ১৯৩৭ সালে আমার সে প্রবন্ধগুলো লেখা শুরু করি যার দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে এ অনুভূতির সঞ্চার করি যে, আপনারা একটি অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অধীনে থেকে ··· নিজের জাতীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন না। ··· তখন আমি গভীরভাবে অনুভব করলাম যে, কোন প্রকার আইনানুগ নিশ্চয়তা দান মুসলমানদেরকে বাঁচাতে পারবেনা। এ জন্যে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, এ উপমহাদেশে মুসলমানদের নিরাপত্তার অন্য উপায় চিন্তা করতে হবে। আমার নিকটে বিকল্প পন্থা এই ছিল এবং তা আমি সুস্পষ্ট করে পেশ করলাম যে, সর্বপ্রথম মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত করা হোক যার দ্বারা তারা তাদের আপন পরিচয় জানতে পারবে। তারা জানতে পারবে তাদের জীবনের মূলনীতি কি, তারা কিভাবে অন্য জাতি থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র জাতি বরঞ্চ এক মিল্লাত এবং তাদের এ জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত রাখার পন্থা কি। সে সময়ে পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনাও হয়নি। সে সময়ে সর্বপ্রথম করার কাজ এই ছিল যে, যেমন আমি বলেছি, মুসলমানদেরকে সেই এক জাতীয়তার বেড়াজাল থেকে কি করে বাঁচানো যায় যা তাদের চারদিকে ছড়ানো হচ্ছিল।*

মাওলানা আরও বলেন, যখন মুসলমানদের মধ্যে পৃথক জাতীয়তার ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে, তাদের মধ্যে এ প্রয়োজনের অনুভূতিও বাড়তে থাকে যে, যেসব অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগুরু সেসব অঞ্চল নিয়ে মুসলমানদের একটা পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করা হোক। এভাবে পাকিস্তান আন্দোলন এক রীতিমত ও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। এ পরিস্থিতিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দেয়। এক এই যে, যেসব অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগুরু তাদের একটি অপরটি থেকে বহুদূরে অবস্থিত। কোন্ বস্তু তাদেরকে একত্রে আবদ্ধ রাখতে পারে? তার সহজ জবাব এই যে, এ বস্তু ইসলাম ছাড়া আর কিছু নয় এবং হতেও পারেনা। দ্বিতীয় প্রশ্ন

* মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তা প্রমাণ করে মাওলানা 'মাসয়ালায়ে কাওমিয়াত' নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তার ফলে মুসলমানদের মধ্যে পৃথক জাতীয়তার ধারণা বদ্ধমূল হয়।

এই ছিল যে, ভারতের বৃহৎ অংশে মুসলমান সংখ্যালঘু। যদি গণতান্ত্রিক সরকার [illegible]য়েম হয় তাহলে অনিবার্যরূপে সেখানে মুসলমানদেরকে সংখ্যাগুরুর গোলামি [illegible]ল করাতে হবে। এ অবস্থায় তাদের নিরাপত্তার কি উপায় হবে? এ প্রশ্নের কোন সুস্পষ্ট জবাব ছিল না। কিন্তু এর থেকে এ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, শেষ পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদেরকে যে ধ্যান-ধারণা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তা কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবাবেগ ছিলনা। বরঞ্চ তা ছিল একটা নির্ভেজাল দ্বীনী আবেগ অনুরাগ। নতুবা মাদ্রাজ, বোম্বাই, সিপি, ইউ,পি প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমানদের পাকিস্তান হাসিলের জন্য সংগ্রাম করার কোনই কারণ থাকতে পারেনা। তারা কখনো এ আশা করতে পারেনি যে, তাদের এলাকা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, পরবর্তীকালে যেসব অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো সেসব অঞ্চলে পাকিস্তান আন্দোলন এতোটা জোরদার হয়নি যতোটা হয়েছে মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চলগুলোতে। এর কারণ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, একমাত্র ইসলামী আবেগ অনুভূতিই ছিল এ আন্দোলনের প্রেরণাদায়ক শক্তি। মুসলমানদের এ পূর্ণ অনুভূতি ছিল যে, তাদের পরিণাম যা কিছুই হোক না কেন, তাদের কুরবানী দ্বারা অন্ততঃপক্ষে ইসলামের নামে একটা রাষ্ট্র ত অস্তিত্ব লাভ করবে যেখানে ইসলামের বানী সমুন্নত হবে এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবে কায়েম হবে। এটাই ছিল সেই আবেগ অনুরাগ যা এ শ্লোগানে রূপায়িত হয়েছিল— "পাকিস্তানের উৎস কি– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।"

এ এমন এক শ্লোগান ছিল যা শুনে মুসলিম পতঙ্গের মতো পাকিস্তান আন্দোলনের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর এমন বিরাট সংখ্যক লোক পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করে যে, বড়োজোর শতকরা দু'একজন মুসলমান মাত্র দ্বিমত পোষণ করে। আমার নিকটে পাকিস্তান আন্দোলনের দুটি মাত্র বুনিয়াদ ছিল। একটি এই যে, আমরা দুনিয়ার অন্য কোন জাতির অংশ নই, বরঞ্চ একটি স্বতন্ত্র জাতি। আর অন্য কোন জাতির সাথে মিলিত হয়ে কোন মিশ্র জাতীয়তাও বানাতে পারিনা। দ্বিতীয়তঃ আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি আমাদের দ্বীন। এ ছাড়া আমাদের জাতীয়তার অন্য কোন ভিত্তি নেই। আমার কাছে পাকিস্তান দর্শনের এই একমাত্র অর্থ।

—(একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার। রেডিও পাকিস্তান এ সাক্ষাৎ টেপ করে এবং পাঁচ বছর পর ১৯৮০ সালে তা লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হয়।)

এখন এ কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, নিছক কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে অথবা সাময়িক ভাবাবেগে পরিচালিত হয়ে পাকিস্তান আন্দোলন করা হয়নি। আন্দোলনের ভাবাবেগ ত অবশ্যই ছিল। কিন্তু সে ভাবাবেগের উৎস ছিল মুসলমানদের ঈমান ও আকীদাহ বিশ্বাস যার সূচনা হয়েছিল মানব জাতির সৃষ্টির সাথে সাথেই।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর দ্বিজাতিতত্ত্ব ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে বলে জোরেসোরে প্রচার করা হচ্ছে। প্রচারকগণ এতোটা কল্পনাবিলাসী যে, দ্বিজাতিতত্ত্ব ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে ধরে নিয়ে উপমহাদেশকে ১৯৪৭ পূর্ব ভৌগলিক অবস্থায় রূপান্তরিত করার আন্দোলন করছে।

একদিকে ভারতে ও কাশ্মীরে মুসলিম নিধনযজ্ঞ পূর্ণমাত্রায় চলছে, মসজিদ ধ্বংস করে মন্দির নির্মাণ করা হচ্ছে, অপরদিকে একজাতীয়তার মিথ্যা ও প্রতারণামূলক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তবে অতীতেও যেমন তাদের এ ধরনের প্রচারণা কোন কাজে লাগেনি, ভবিষ্যতেও লাগবেনা।

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হিন্দুগণ উপমহাদেশে মুসলমানদের কয়েক শ' বছরের শাসনের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে তাদেরকে তাদের গোলাম বানিয়ে রেখে অথবা নির্মূল করে। তার জন্য ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে এভাবে যে মুসলিম শাসন আমলে হিন্দুদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে, তাদেরকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে, তাদের নারীজাতিকে অবাধে ভোগ করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। হিন্দু সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলেছেন। এ ব্যাপারে হিন্দুজাতি ও বৃটিশ সরকার একে অপরের পূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, হিন্দুদের সক্রিয় সাহায্য সহযোগিতা ব্যতীত এ দেশে যেমন ইংরেজদের মসনদ পাকাপোক্ত হতে পারতো না ঠিক তেমনি ইংরেজদের আশীর্বাদ ব্যতীত হিন্দুগণ মুসলমানদের প্রতি অমানবিক ও পৈশাচিক আচরণ করতে পারতো না। সর্বশেষে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া মুসলমানদেরকে অন্ধকারে রেখে যেভাবে তড়িঘড়ি প্রণয়ন করা হলো, পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত করে পাকিস্তানকে ক্ষুদ্রতর ও সংকুচিত করা হলো এবং যেভাবে সীমানা চিহ্নিতকরণে মুসলমানদের প্রতি চরম অবিচার করা হলো, এর দ্বারা হিন্দুদেরকে খুশী করে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের বহুদিনের পুঞ্জিভূত বিদ্বেষের প্রতিশোধ নিলেন। উপরন্তু পাকিস্তানের ন্যায্য প্রাপ্য গুরুদাসপুর জেলাকে হঠাৎ দুদিন পর ভারতভুক্ত করে দিয়ে কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব সংঘাতের বীজ বপন করা হলো। বিভক্ত বাংলার সীমানা নির্ধারণেও অনুরূপ অবিচার করা হয়েছে।

এ ইতিহাস এখানেই শেষ হচ্ছে। যে প্রেক্ষাপটে এবং যে দৃষ্টিকোণ থেকে এ ইতিহাস লেখা হয়েছে, আমার বিশ্বাস অধিকতর সুন্দর করে লেখার যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাব সমাজে নেই। নতুন প্রজন্মকে তাদের অতীত ইতিহাসের সঠিক জ্ঞানদান করে মুসলিম জাতিসত্তার মধ্যে নতুন জীবনীশক্তি সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে—চিন্তাশীলগণ এগিয়ে আসবেন এ আবেদন রেখে আমার লেখার ইতি টানছি।

—o—

তথ্যসূত্র ঃ

১। মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস, মাওলানা আকরাম খাঁ।
২। তোহ্‌ফাতুল মুজাহেদীন, শেখ যয়নুদ্দিন।
৩। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক গেজেটিয়ার, চট্টগ্রাম। নীল কমিশন রিপোর্ট–১৮৬১।
৪। রিয়াযুস সালাতীন, গোলাম হোসেন সলিমী। তাবাকাতে নাসিরী।
৫। Hostory of Bengal , স্যার যদুনাথ সরকার।
৬। বাংলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়।
৭। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশ চন্দ্র সেন।
৮। বাংলা সাহিত্যের কথা, মাওলানা আকরাম খাঁ।
৯। Husain Shahi Bengal, M.R. Tarafdar.
১০। British Policy and the Muslims in Bengal, A.R. Mallick.
১১। মহানির্বাণতন্ত্র, ৪র্থ ও ৫ম উল্লাস।
১২। সিরাজউদ্দৌলার পতন, ডঃ মোহর আলী।
১৩। Census of India Report, 1911 A.D., হিলের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড।
১৪। মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, আবদুল মওদুদ।
১৫। Muslim Struggle for Freedom in India, Muinuddin Ahmad Khan.
১৬। Calcutta Review, 1850, 1913 এবং বিভিন্ন ইস্যু।
১৭। The Indian Mussalmans, W.W. Huter, Bangladesh Edition 1975.
১৮। The History, Antiquities, Topography & Statistics of Eastern India, M. Martin, London-1838, Vol.-II.
১৯। Calcutta Christian Observer, July 1832, November 1855.
২০। The Discovery of India, Pandit Jawaherlal Nehru.
২১। Oxford History of India.
২২। The Life of Charles Lord Metcalfe.
২৩। বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, রমেশচন্দ্র মজুমদার।
২৪। রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ।
২৫। The Great Divide, H.V. Hodson.
২৬। Survey of Indian History, কে এম পানিক্কর।
২৭। বড়বাবু, সৈয়দ মুজতবা আলী।
২৮। শতাব্দী পরিক্রমা, ডঃ হাসান জামান সম্পাদিত।
২৯। Bengali Muslim Public Opinion as reflected in the Bengali Press 1901-1930, Mustafa Nurul Islam.
৩০। রাজসিংহ; কপাল কুণ্ডলা; আনন্দমঠ, –বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৩১। বঙ্কিম রচনাবলী, ষষ্ঠ প্রকাশ, ১৩৮২। নবযুগের বাংলা, বিপিনচন্দ্র পাল।
৩২। মাসিক 'ইসলাম প্রচারক', জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩১৪।
৩৩। Times of India, July 1925, July & December 1938.
৩৪। সাপ্তাহিক 'সুলতান', মিয়াজুদ্দীন আহমদ ও মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, (১৯২৩)
৩৫। Indian Sedition Committee Report 1918.
৩৬। The Indian Middle Class : Their Growth, B.B. Misra.
৩৭। Jinnah and Gandhi, S.K. Majumdar.
৩৮। Muslim Separatism in India, A. Hamid.
৩৯। '[illegible]', মোহাম্মদী, কলিকাতা হিন্দু সমাজ সভা কর্তৃক প্রকাশিত, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪' '[illegible]' পুস্তিকা।
৪০। Political India, Cumming.
৪১। [illegible]
৪২। The Bengali Muslims & English Education, M. Fazlur Rahman.
৪৩। Appendix to Chadar Darvesh, L.F. Smith.
৪৪। Education in Muslim India, S.M. Jaffar, 1935.
৪৫। Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule, N.N. Law
৪৬। Economic History of India, R.C. Dutt.
৪৭। On the Education of the People of India, C.E. Trevelyan.
৪৮। Review of Buchanan's Treaties, Sharp.
৪৯। Report of Bengal Provincial Committee, Education Commission.
৫০। Life of Mahatma Raja Rammohan Roy, N. Chatterjee.
৫১। Vernacular Education in Bengal, H.A. Stark.
৫২। Macaulay's Minutes on Education in India, Woodrow, 1862.
৫৩। Life and Letters of Lord Macaulay, Trevelyan, vol-I.
৫৪। Select Committee Report, House of Commons, 1831-32.
৫৫। An Advanced History of India, John Marshall.
৫৬। Board's Collection 909, এবং বিভিন্ন ইস্যু।
৫৭। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, সজনীকান্ত দাস।
৫৮। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫৯। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আবু জাফর।
৬০। Journal of Asiatic Society of Bengal, Dr. James Wise, vol-LXIII, 1
৬১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬২। Encyclopaedia of Islam, vol-II.
৬৩। শহীদ তিতুমীর, আবদুল গফুর সিদ্দিকী।
৬৪। Bengal Criminal Judicial Consultations, 1832.
৬৫। Colvin's Report, J.R. Colvin.
৬৬। ওহাবী আন্দোলন, আবদুল মওদুদ।
৬৭। সাইয়েদ আহমদ শহীদ, গোলাম রসুল মেহের।
৬৮। তাওয়ারিখ-ই-আজীব, ('কালাপানি বন্দীর আত্মকাহিনী') মওলানা জাফর থানেশ্বরী।
৬৯। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকা, আবদুল মওদুদ।
৭০। Modern Religious Movment in India, Farquhar.
৭১। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ।
৭২। Some Personal Experience, Sir Fuller Bampfylde.
৭৩। Indian Politics Since the Mutiny, C.Y. Chintamoni.
৭৪। History of the Indian Mutiny, Col. J.B. Malleson.
৭৫। Partition of Bengal, A.R. Mallik.
৭৬। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ডঃ এম, এ, রহিম।
৭৭। India of Today, Sardar Ali Khan, Bombay, 1908.
৭৮। Iqbal : Selected Writings and Speeches.
৭৯। বঙ্গভঙ্গের ইতিহাস, [illegible]।